দোজখ্‌নামা
রবিশংকর বল

## আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে – যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

**There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance**

**SUBHAJIT KUNDU**

ভারত ও পাকিস্তানের কবরে
শুয়ে থেকে সংলাপ চালিয়ে যান মির্জা
গালিব ও সাদাত হাসান মান্টো। সিপাহি
বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ—ভারতীয়
ইতিহাসের আড়াইশো বছরের আখ্যান ধরা
থাকল এই উপন্যাসে
9 788129 510891

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ থেকে ১৯৪৭-এর দেশভাগ, দাঙ্গা। এই কালপর্বের ভিতরে ভারত ও পাকিস্তানের কবরে শুয়ে থেকে তাঁদের বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছেন মির্জা গালিব ও সাদাত হাসান মান্টো। ইতিহাসের দুই দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দু'টি উচ্ছিন্ন জীবন পরস্পরের আয়নায় দেখে নিতে চাইছে নিজেদের। তাঁদের ঘিরে বুনে উঠছে কত কিস্‌সা, কত কল্পকথা, আর ইতিহাসে জায়গা না-পাওয়া অনামা সব মানুষদের আখ্যান। উপন্যাসের এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করলেন রবিশংকর বল 'দোজখনামা'-য়।

ISBN : 978-81-295-1089-1

কেন লেখেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালে ঔপন্যাসিক রবিশংকর বল-এর মনে হয়, একটি সাপ লেজ থেকে নিজেকেই খেয়ে চলেছে। চাকরি করেন একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দফতরে। গোটা পনেরো বই এ-পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। প্রিয় ঔপন্যাসিক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি, ফ্রানজ্ কাফ্কা লেখা, গান ও নীরবতার মুখোমুখি নতজানু হয়ে আছেন।

# দোজখ্‌নামা

রবিশংকর বল

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

*DOJAKHNAMA*
A Bengali Novel by RABI SANKAR BALL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 200.00

ISBN : 978-81-295-1089-1

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮

প্রচ্ছদ : শান্তনু দে



২০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

'অলীক মানুষ'-এর লেখক
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ছায়াপুতুলের খেলা
এখানে তুষার ঝরে
স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর
পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
নির্বাচিত গল্প

# নিবেদন

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার' ক্রোড়পত্রিকায় ২০০৯ সালে এক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল এই উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদক শ্রীঋতুপর্ণ ঘোষ যে-আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার নানা পর্বে সাহায্য করেছেন ক্রোড়পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীঅনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ সহকর্মী শ্রীভাস্কর লেট। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সম্পাদক শ্রীসৃঞ্জয় বোস নানা বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন; এই উপন্যাস প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। বন্ধু শ্রীদেবাশিস বিশ্বাস প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ করে দিয়েছেন। দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীশুভঙ্কর দে-র (অপু) আন্তরিক উদ্যোগেই উপন্যাসটি বই হিসেবে প্রকাশিত হতে পারল।

এবার শুধু আপনাদের পৃষ্ঠা ওল্টানোর অপেক্ষা। পাঠিকা/পাঠক আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

রবিশংকর বল

শ্রাবণ ১৪১৭

আমার জীবনে এমন সব ঘটনা এসে হানা দিয়েছে, যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমি ঘটনাগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করেও এক সময় হাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করি না। মনে হয়, ওরা যে আমার জীবনে অযাচিত ভাবে এসেছে, তার চেয়ে গভীর অর্থ আর কী হতে পারে! একদিন রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে আপনি যদি এমন কাউকে দেখে ফেলেন, যাকে চিত্রে বা স্বপ্নে দেখা যায়, হয়তো একটি মুহূর্তের জন্য মুখোমুখিও দেখা হয়ে যেতে পারে, তবে কী মনে হবে আপনার? মনে হবে না, এক আশ্চর্য দরজা খুলে গেছে আপনার সামনে?

সেবার লখনউতে গিয়ে এমন এক আশ্চর্য দরজাই খুলে গিয়েছিল আমার সামনে। খবরের কাগজের কলম পেষা মজুর আমি, গিয়েছিলাম লখনউয়ের তবায়েফদের নিয়ে একটা লেখার খোঁজে। লখনউতে পৌঁছে প্রথম দেখা করি পরভিন তালহার সঙ্গে; তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, লখনউয়ের ইতিহাস তাঁর চোখের পর্দায় ভাসতে দেখেছিলাম। পরভিন আমাকে বলেছিলেন, যে-তবায়েফদের কথা আপনি হালির পুরনো লখনউ বইতে, উমরাও জান উপন্যাসে পড়েছেন, তাঁদের দেখা লখনউতে আর পাবেন না। সত্যিই পাইনি। আমি তাই নানা মানুষের মুখে শোনা গল্প লিখে নিচ্ছিলাম ডায়েরিতে। এইসব গল্পই বা কম কী? বংশ পরম্পরায় যে-গল্প বয়ে চলেছে, তাকে ইতিহাসের চেয়ে ছোট করে দেখা, অন্তত, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এইরকম, এর ওর মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমি গিয়ে পৌঁছলাম পুরনো লখনউতে, ফরিদ মিঞার কাছে। ধুলোয় ঢাকা ওয়াজিরগঞ্জ। রোদ থাকলেও এমন ছায়ায় জড়ানো যাকে একটা লুপ্ত শহরই বলা যায়। আমি দূর থেকে দেখেছিলাম 'আদাবিস্তান' নামের সেই বিরাট মহল, যেখানে উর্দু লেখক নাইয়ের মাসুদ থাকেন। এই নিয়তি-তাড়িত লেখককে দেখার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু উর্দু না জেনে, কীভাবে তাঁর গল্পের প্রতি মুগ্ধতা আমি জানাব? ইংরেজি বা হিন্দি বলা যেত, কিন্তু নাইয়ের মাসুদের সঙ্গে উর্দুতে কথা না বলতে পারলে, তাঁর কথোপকথনের রহস্য কী বোঝা সম্ভব? এসবই আমার কল্পনা। লেখক আর তাঁর লেখা তো মেলে না।

ফরিদ মিঞার বসার ভঙ্গি দু-হাঁটু মুড়ে নামাজ আদায় করার মতো। আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিলেন, একই ভাবে বসেছিলেন। তবায়েফদের অনেক গল্প বলার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কিস্‌সা লেখেন?'

—ওই আর কী—

—আমিও একসময় লিখতাম।

—এখন আর লেখেন না?

—না।

—কেন?

—কিস্‌সা লিখলে বড় একা হয়ে যেতে হয়, জনাব। আল্লা যাকে কিস্‌সা লেখার হুকুম করেন, তার জীবন জাহান্নম হয়ে যায় জি।

—কেন?

—শুধু ছায়া ছায়া মানুষদের সঙ্গে থাকা তো।

—তাই কিস্‌সা লেখা ছেড়ে দিলেন?

—জি জনাব। জীবনটা কারবালা হয়ে যাচ্ছিল। কারবালা জানেন তো?

—মহরমের কাহিনিতে—

—হ্যাঁ। কারবালা কী? সে কি শুধু মহরমের কথা? কারবালা মানে এই জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তর হয়ে ওঠে। কিস্‌সা লেখকের নিয়তি এইরকমই জনাব।

—কেন?

—ওই যে, ছায়া ছায়া মানুষেরা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে কথা বলে, আর কী যে পাগলামির দিকে নিয়ে যায় ওরা। আপনার কখনও এমন হয়নি?

—হ্যাঁ।

—আপনার বিবি জিজ্ঞেস করেননি, কেন এই কিস্‌সাটা লিখলে?

—হ্যাঁ।

—আমাকেও কতবার বিবি জিজ্ঞেস করেছেন। কী বলব? আমি যা বলব, তাতেই তিনি হাসবেন, আর বলবেন, আপ পাগল হো গিয়া মিঞা।

—তাই কিস্‌সা লেখা ছেড়ে দিলেন?

—জনাব, আমি আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পেরেছি। দাওয়াত দিতে পারব না। এই তো কিস্‌সা লেখক।

তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। আমি তাঁর অন্দরমহলের চবুতরা থেকে ভেসে আসা পায়রাদের বকবকম শব্দের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। এক সময় তাঁর গলা কবুতরের ডাকের ধূসরতার ভিতরে ঢুকে পড়ল, 'আমি একটা কিস্‌সা নিয়ে বড় মুশকিলে আছি, জনাব।'

—কোন কিস্‌সা?

তিনি কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, 'আপনি একটু বসতে পারবেন?'

—জরুর।

—কিস্‌সাটা তা হলে আপনাকে দেখাই।

—আপনার লেখা?

—না। ফরিদ মিঞা হাসেন।—একটু অপেক্ষা করুন। এও এক আশ্চর্য কিস্‌সা জনাব।

তিনি হেলেদুলে হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে চলে গেলেন। ভিতরে যাওয়ার দরজার ওপরে একটি মৎস্যকন্যা। হঠাৎ দৌড়ে কে একজন ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। কালো, লোমে ভরা একটা শরীর, আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলতে শুরু করল, 'মিঞা, পাগল হয়ে গেছে আপনি জানেন না?'

—জানি।

—তা হলে?

—আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি।

—কেন?

—আপনি কে?

—আমি মিঞার নোকর হজুর। মিঞা আবার পাগল হয়ে যাবেন।

—কেন?

—আবার একা একা কথা বলবেন।

—কেন?

—কিস্‌সার কথা কেউ তুললেই—

ভিতর থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতেই কালো লোকটি 'এবার চলে যান, হুজুর' বলে দৌড়ে পালাল। আমার চোখ আবার সেই মৎস্যকন্যার শরীরে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। একটু পরেই ফরিদ মিঞা পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। এক পরিতৃপ্তির আলো তাঁকে ঘিরে আছে, আমার মনে হল। একটু আগেও তাঁকে বেশ অস্থির মনে হয়েছিল। তিনি বুকের কাছে ধরে রেখেছেন নীল মখমলে মোড়া একটা পুঁটুলি। সেইরকম নামাজ আদায়ের ভঙ্গিতেই বসলেন তিনি, যেন এক সদ্যোজাত শিশুকে শোয়াচ্ছেন তেমন ভাবেই পুঁটুলিটি রাখলেন ফরাসের ওপর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।—এবার আপনাকে আমি যা দেখাব, মনে হবে খোয়াব দেখছেন।

কী খোয়াব দেখাবেন আমাকে ফরিদ মিঞা? স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তো আমি এই সবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এলাম। আর আমি এও জানি যে, আমাদের এই জীবন, যাকে বাস্তব জীবন বললে বেশির ভাগ মানুষ খুশি হয়, তাও অন্য আরেকজনের দেখা

স্বপ্ন। তখন মনে হয়, আমি একটা ছবি মাত্র, যে ভেসে উঠেই হারিয়ে গেছে। কে যেন একজন প্রজাপতির স্বপ্ন দেখেছিল। জেগে উঠে তার মনে হয়েছিল, আসলে কি প্রজাপতিটাই তাকে স্বপ্নে দেখেছিল!

মখমলের আবরণ খুলতেই একটা পুরনো পাণ্ডুলিপি জেগে উঠল আলোয়। কোথাও কোথাও পোকায় কাটা। পাণ্ডুলিপিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই কবিতাটা মনে পড়ল আমার।

> আমি তো ওই নদীর ওপার থেকেই এসেছিলাম
> বিশ্বাস না হলে অপ্রকাশিত
> উপন্যাসকে জিজ্ঞাসা করো   তার মাংস খুঁটে
> খাওয়া রুপোলি পোকাদের জিজ্ঞাসা করো
> আর আরশোলার বাদামি ডিমদের,
> জিজ্ঞাসা করো পাণ্ডুলিপির শরীরে উঁইয়ে
> কাটা নদীদের   সেই সব নদীরা, যারা
> মোহনায় পৌঁছনোর আগেই মরে যায়

কে লিখেছিল কবিতাটা? অনেক ভেবেও তার নাম মনে পড়ল না। নিশ্চয়ই মনে পড়ার মতো বিখ্যাত সে ছিল না। সে হয়তো এমন একজন কবি, কবিতার মধ্যে যে শুধু আমাদের জীবনের ক্ষতচিহ্নগুলি এঁকে রাখে, তারপর একদিন অনায়াসে হারিয়েও যায়।

পাণ্ডুলিপিটাকে ফরিদ মিঞা শিশুর মতো আদরে দু'হাতে তুলে নিলেন। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন'।

মানুষ যেভাবে পুরোহিতের হাত থেকে অঞ্জলির ফুল নেয়, সেভাবেই তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটা নিলাম। খর্ খর্ শব্দ পেলাম। পাতারা কি এই সামান্য স্পর্শেও ভেঙে যাচ্ছে? ফরাসের ওপর পাণ্ডুলিপিটা রেখে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করলাম। উর্দুতে লেখা; এই ভাষা তো আমি বুঝি না। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে আমি স্থির হয়ে যাই, লিপির সৌন্দর্য আমাকে সম্মোহিত করে রাখে। শুধু বুঝতে পারি, হারিয়ে যাওয়া অনেক সময় এখন আমাকে ছুঁয়ে আছে। একসময় ফরিদ মিঞাকে জিজ্ঞেস করি, 'কার পাণ্ডুলিপি?'

—সাদাত হাসান মান্টোর। আপনি নাম জানেন?

পাণ্ডুলিপির ওপর আমি ঝুঁকে পড়ি। আমার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'সাদাত হাসান মান্টো!'

—কিস্‌সারা তাঁকে খুঁজে বেড়াত।

—আপনি কী করে পেলেন?

—এন্তেকালের কিছুদিন আগে আব্বাজান আমাকে দিয়ে যান। তাঁর কাছে কীভাবে এসেছিল বলেননি।

—কী লিখেছেন মান্টো?

—দস্তান। আপনারা যাকে নভেল বলেন। তবে কী জানেন, দস্তান ঠিক নভেল নয়। দস্তানের গল্প শেষ হতেই চায় না, আর নভেলের তো শুরু শেষ থাকে।

—কিন্তু মান্টো তো নভেল লেখেননি।

—এই একটাই লিখেছিলেন।

—তা হলে ছাপা হয়নি কেন?

—কেউ যে বিশ্বাস করতে চায় না। আমি কতজনকে বলেছি। অনেকে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখে বলেছেন, এ ঠিক মান্টোসাবের হাতের লেখা নয়। কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর জীবনের সব কথা মিলে যায়। আপনি দেখবেন, ছাপা যায় কি না?

—আমি?

—আপনি তো আখবারে কাজ করেন। দেখুন না। মান্টোসাবের লেখা এভাবে পোকায় কাটতে কাটতে শেষ হয়ে যাবে?

আমি পাণ্ডুলিপির শরীরে হাত বোলাতে থাকি। আমার সামনে সাদাত হাসান মান্টোর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি? বিশ্বাস হয় না। তবু আমি পাণ্ডুলিপিকে ছুঁয়ে থাকি। এই তো সেই কাহিনি-লেখক, তাঁর কবরের ফলকে লিখতে চেয়েছিলেন, কে বড় গল্প লেখক, খোদা, না মান্টো?

—আপনি পড়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

—আলবৎ। কতবার পড়েছি মনে নেই।

—কী লিখেছেন মান্টোসাব?

—মির্জা গালিবকে নিয়ে। মির্জাকে নিয়ে উপন্যাস লেখার খোয়াব দেখতেন মান্টোসাব। মির্জাকে নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিল বম্বেতে। স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন মান্টোসাবই। আপনি জানেন?

—না।

—মান্টোসাব তখন বম্বেতে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখেন। গালিবকে নিয়ে তাঁর লেখা ছবিটাই হিট করেছিল। তবে দুঃখের কথা, ফিল্মটা যখন তৈরি হল, মান্টোসাব তখন ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে চলে গেছেন। মির্জা গালিবের সেই প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুরাইয়া বেগম। ফিল্মটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল। প্রথম হিন্দি ফিল্মের ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া, বুঝতে পারলেন? মির্জাকে সারা জীবন মান্টোসাব ভুলতে পারেননি। মির্জার গজল তাঁকে পাগল করত, মির্জার জীবনও। কত যে মিল দু'জনের মধ্যে। মির্জার গজল তাঁর মুখে মুখে ফিরত।

—এই উপন্যাস তা হলে পাকিস্তানে লিখেছিলেন?

—তাই তো। মান্টোসাবের স্বপ্নের দস্তান। আপনি নিয়ে যান, দেখুন ছাপতে পারেন কি না।

—উর্দুতে কেউ ছাপবে না?

—কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। আমি আর কতদিন বইব, বলুন। কবে আছি, কবে নেই। তারপর তো একেবারে হারিয়ে যাবে।

ফরিদ মিঞা আমার দুই হাত চেপে ধরেন।

—আমাকে এই দস্তানের হাত থেকে রেহাই দিন। আমাকে সবাই এখন পাগল বলে। বলে, কিস্‌সা আমাকে খেয়ে নিয়েছে।

মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা মান্টোর অপ্রকাশিত উপন্যাস, আসল কি নকল আমরা কেউই জানি না, আমার সঙ্গে এই শহরে এসে পৌঁছল। উর্দু জানি না, তাই এমনি এমনি মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপিটা দেখি। সত্যিই মান্টোর লেখা, না অন্য কারোর? তারপর একদিন মনে হল, আমরা সবাই যদি কারও দেখা স্বপ্ন হই, তা হলে স্বপ্নের গালিবকে নিয়ে একজন স্বপ্নের মান্টো উপন্যাস লিখতেই পারেন। এখানে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?

উপন্যাসটা পড়ার জন্যই আমাকে উর্দু শেখার কথা ভাবতে হল। আমার বন্ধু উজ্জ্বল একজন শিক্ষিকা ঠিক করে দিলেন। তার নাম তবসুম মির্জা। আমি তার কাছে শিখতে যাওয়া শুরু করে কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম, নতুন করে ভাষা শেখার মতো ধৈর্য ও অভিনিবেশ আমি হারিয়ে ফেলেছি। একদিন তবসুমকে বলেই ফেললাম, 'উর্দু শেখাটা এ-জীবনে আমার আর হবে না।'

তবসুম বলল, 'তা হলে উপন্যাসটা পড়বেন কী করে?'

—আপনি যদি পড়ে পড়ে অনুবাদ করে দেন, আমি লিখে নেব।

—আমি কোথাও কোথাও ভুলও তো করতে পারি। আপনি বুঝবেন কী করে?

—ভুল ছাড়া কিছু হয় কি তবসুম?

—কেন?

—ভুল করেই তো আমি আপনার কাছে উর্দু শিখতে এসেছিলাম।

—তার মানে?

—কয়েকদিন পরেই আপনার নিকাহ্। জানলে তো আসতাম না। বিয়ের পর আপনি মুখে মুখে অনুবাদ করে যাবেন, আমি লিখে নেব। জীবন একরকম অনুবাদ, জানেন তো তবসুম?

তবসুমের চোখদুটো বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান আলোর মতো আমাকে কাটছিল।

এক বৃষ্টি ঘনঘোর সন্ধ্যায় আমি তবসুমের কাছে উর্দু শেখার জন্য প্রথম গিয়েছিলাম। দীর্ঘ, অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তবসুমের বাবার নাম করে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িটা কোথায়?

—কার কাছে যাবেন?

তবসুমের বাবার নাম বললাম।

দোকানি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সাব তো মর গিয়া। আপনি জানেন না?'

—তবসুম মির্জা—

—উসকা লেড়কি। দোকানি হেঁকে ওঠেন, 'আনোয়ার, সাব কো কোঠি দিখা দো।'

আনোয়ারের পিছন পিছন হেঁটে আমি একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। নিঝুম দোতলা বাড়িটা বৃষ্টিতে ভিজছে। আনোয়ার দরজা ধাক্কাতে থাকে। একসময় দরজা খুলে যায়, কিন্তু কাউকে দেখা যায় না, শুধু কথা শোনা যায়, 'কওন হ্যায়?'

—ম্যায় আনোয়ার হুঁ, সাব।

—কী হয়েছে?

—মেহমান, সাব।

বৃষ্টির ভিতরে একটা মুখ ডেকে ওঠে। 'কে? কে-রে আনোয়ার?'

আনোয়ার আমার মুখের দিকে তাকায়।

—তবসুম মির্জা আছেন? আমি সেই দেখা-না-দেখা মুখের দিকে তাকিয়ে বলি।

—কী দরকার?

—আমার আসবার কথা ছিল।

—স্টুডেন্ট?

—হ্যাঁ।

—আসুন—চলে আসুন—আগে বলবেন তো—

আমি ভিতরে ঢুকে পড়ে আরও ভিজে যেতে থাকি। এই বাড়ির মাঝের খোলা চত্বরের ওপর উন্মুক্ত আকাশ। যে আমাকে ডেকেছিল, তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু সে চিৎকার করতে থাকে, 'তবসুম দরজা খোল্—দরজা খোল্ তবসুম—স্টুডেন্ট-স্টুডেন্ট—'

দরজা খুলে যায়। বৃষ্টিছায়া ও অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে আছে, তবসুম, আমার শিক্ষিকা, তার মাথায় ঘোমটা। গভীর রাতের ট্রেনের হুইসলের মতো তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আসুন—আসুন—এত বৃষ্টি—ভেবেছিলাম আপনি আর আসবেনই না।'

বৃষ্টির জলে আমার জুতোকে ভিজতে দিয়ে তরমুজের মতো একফালি বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি। ছোট ঘরে বিরাট এক পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ—হয়তো দু-তিন পা হাঁটা যায়।

—চা খাবেন তো?

—না-না—

—এত বৃষ্টিতে ভিজে এলেন।

—তাতে কী?

—বসুন, আগে একটু চা খেয়ে নিন।

তবসুম পাশের ছোট বারান্দায় চা বানাতে চলে গিয়েছিল। ভাবছিলাম আমি একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছি। তবায়েফদের খোঁজে লখনউ গিয়ে জড়িয়ে পড়লাম সাদাত হাসান মান্টোর অপ্রকাশিত উপন্যাসের সঙ্গে আর সেই উপন্যাস পড়বার জন্য প্রস্তুত হতে আমাকে হাজির হতে হল মধ্য কলকাতার অন্ধকার গলিতে তবসুম মির্জার ঘরে। কী আশ্চর্য, আমার আগে খেয়াল হয়নি, মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা উপন্যাস পড়বার জন্য উর্দু শিখতে আমি এসেছি তবসুম মির্জার কাছে। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একটা রাক্ষুসে আয়নার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। খেয়ালই করিনি, দেওয়াল থেকে ঝুলছিল প্রায় চারফুট লম্বা একটা আয়না, তার ফ্রেম কারুকাজ করা সেগুন কাঠের, মহার্ঘ বেলজিয়ান কাচ, যার ভিতরে পুরো ঘরটাই প্রায় ঢুকে পড়েছে, আর সেই ঘরের ভিতরে আমি, আমার দিকে নিমেষনিহত তাকিয়ে আছি। আয়নাটা যেন তার দিকে আমাকে টানছিল। এই ঘোর কাটল চায়ের কাপ নিয়ে তবসুম ঘরে আসায়।

—কী দেখছিলেন? তবসুমের ঠোঁটের কোণে ফালিচাঁদের হাসি।

—আয়নাটা, কোথায় পেলেন?

—আয়নাটা কার ছিল জানেন?

—কার?

—ওয়াজিদ আলি শাহর এক বেগমের।

—এখানে এল কী করে?

—আমার দাদা—দাদা জানেন তো—বাবার বাবা এনেছিলেন।

আমি আয়নার দিকে ফের তাকালাম। ওয়াজিদ আলি শাহ'র সেই বেগম এখন কোথায়? আয়নার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া তবসুম মির্জা।

আমার উর্দু শিখতে আসার কারণ শুনে অবাক হয়ে গেল তবসুম। শুধু একটা উপন্যাস পড়ার জন্য উর্দু শিখবেন? আর কিছু করবেন না?

—আর কী করব?

—আপনি লেখেন শুনেছি। গজলও লিখতে পারেন।

—গজলের দিন শেষ হয়ে গেছে।

—গজলের দিন কখনও শেষ হবে না।

আয়নার তবসুমের দিকে তাকিয়ে আমি তার কথা শুনি। গজলের দিন কখনও শেষ হবে না, তার এই কথা যেন একটা মেঘপ্রবাহের মতো ভেসে যায়।

—এই গজলটা জানেন? তবসুম বলতে থাকে :

গলি তক্ তেরি লায়া থা হমেঁ শওক্

কহাঁ তাকত কেহ্ অব ফির জায়েঁ ঘর তক।

শব্দগুলো তবসুমের গলা থেকে ঝরনার মতো ছড়িয়ে পড়ে। সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'কার গজল জানেন?'

—কার?

—মীর। মীর তকী মীর। মীরসাব কী বলছেন দেখুন। তোমার ঘরের দুয়ার পর্যন্ত তো টেনে এনেছিল আমার বাসনা, এখন শক্তি কই যে নিজের ঘরে ফিরে যাই? এরপরও বলবেন, গজলের দিন শেষ হয়ে গেছে?

—তবু—

—বাদ দিন, এসব নিয়ে তর্ক চলে না। আপনার উপন্যাসটার কথা বলুন।

আমি কোন্ উপন্যাস পড়তে চাই, কার লেখা, কাকে নিয়ে লেখা, কীভাবে পেলাম এই উপন্যাস, সব কথা মাথা নিচু করে শোনে তবসুম। তার এই শোনার মধ্যে একধরনের ধ্যানের মুদ্রা আছে। এই শহরের অধিকাংশ মানুষদের মতো নয় সে, যারা শুনতে ভুলে গেছে, আর তাই অপেক্ষা শব্দটাই তাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আমার সব কথা শোনবার পর অনেকটা নীরবতা ঘনিয়ে উঠতে দিয়ে সে ধীরে ধীরে বলে, 'হঠাৎ এই উপন্যাসটা পড়ার ইচ্ছে হল কেন?'

—মান্টো আমার প্রিয় লেখক। তিনি যে উপন্যাস লিখেছেন, জানতাম না, তাও মির্জা গালিবকে নিয়ে।

—গালিবও আপনার প্রিয়?

—হ্যাঁ। সত্যি বলতে কী, আমি অনেকদিন ধরে মির্জা গালিবকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি।

—কবে লিখবেন?

—দেখি। আমার খুব তাড়াতাড়ি কিছু হয়ে ওঠে না। যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতাম, তা হলে সহজেই লিখে ফেলা যেত। কিন্তু আমি—

তবসুম কোনও কথা বলে না, আমিও না। আয়নার ভিতরে আমাকে ও তবসুমকে দেখতে থাকি আমি।

এরপর আমার উর্দু শিক্ষা শুরু হয়েছিল। আলিফ... বে... পে... তে...। সে আমার হাত ধরে ধরে লেখা শিখিয়েছে, হয়তো কখনও বলে উঠেছে, 'বাঃ! কত সহজে আপনি লিখতে পারেন।' কিন্তু একদিন আমি ঘোষণা করে দিলাম, এই বয়সে শেখার ধৈর্য ও অভিনিবেশ আমার নেই। অনেক তর্কাতর্কির পর তবসুম বলেছিল, 'আমি জানি, আপনি কিন্তু পারতেন।'

আমার প্রস্তাব তবসুম মেনে নিয়েছিল। সে উপন্যাসটা পড়ে মুখে মুখে অনুবাদ করে যাবে আর আমি লিখে নেব। তবসুমের বিয়ের বেশ কিছুদিন পর থেকে আমি রোজ সন্ধ্যায় তার কাছে যেতে থাকি। তবসুমের উচ্চারণে মান্টোর গালিবকে নতুন

করে আবিষ্কার করতে থাকি এবং বাধ্য লিপিকরের মতো একটি হারানো, অপ্রকাশিত উপন্যাস বাংলায় লিখতে থাকি।

তবসুমের বলা মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ লিখতে লিখতে আমি একসময় বুঝে যাই, মির্জা গালিবকে নিয়ে আমি কখনও উপন্যাস লিখতে পারব না।

এরপর আপনারা যা পড়বেন, তা মির্জা গালিবকে নিয়ে মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ। মাঝে মাঝে আমি ও তবসুম ফিরে আসতেও পারি।

## ভূমিকা

এই দস্তান কে লিখছে? আমি, সাদাত হাসান মান্টো, না আমার ভূত? মান্টো সারা জীবন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। মির্জা মহম্মদ আসদুল্লা খান গালিব। আব্দুল কাদির বেদিলের একটা গজল মির্জার খুবই প্রিয় ছিল, মাঝে মাঝেই দু'টো লাইন বলে উঠতেন। আমার গল্প সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু আমি তো একটা শূন্যতা। বেদিল যেন মির্জার কথা ভেবেই লাইন দু'টো লিখেছিলেন। আমার কথাও কি ভেবেছিলেন?

আমার সবসময়েই মনে হয়েছে, মির্জা আর আমি যেন মুখোমুখি দু'টি আয়না। সেই আয়না দু'টোর ভিতরে শূন্যতা। দুই শূন্যতা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। শূন্যতারা কি কথা বলতে পারে নিজেদের মধ্যে?

আমি কতদিন মির্জার সঙ্গে একা একা কথা বলেছি। মির্জা চুপ করে থেকেছেন। কবরে শুয়ে থেকে কীভাবেই বা কথা বলবেন আমার সঙ্গে? কিন্তু এখন, এত বছর অপেক্ষা করার পর আমি জানি, মির্জা এবার আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমিও আমার কবরে গিয়ে ঢুকেছি। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানে আসার পর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, এবার আমার কবর আমাকে খুঁড়তে হবে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি মাটির গভীরের অন্ধকারে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারি। আমার কবরের ফলকে লেখা থাকবে : 'সাদাত হাসান মান্টো এখানে চিরনিদ্রায়। তার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখার সব রহস্যও কবরে চলে গেছে। টন টন মাটির নীচে শুয়ে সে ভাবছে, কে সবচেয়ে বড় গল্প

লেখক, মান্টো না আল্লা'? ওরা তো জানে না, খোদার পাগলামি মাথায় নিয়ে মান্টো এসেছিল বলেই সারা জীবন ধরে গল্পরা মান্টোকে খুঁজে ফিরেছে। মান্টো কখনও গল্পদের খুঁজতে যায়নি।

মির্জা এবার আমার সঙ্গে কথা বলবেন, আমরা কথা বলে যাব অনর্গল, মির্জা যা সারা জীবন কাউকে বলতে পারেননি, আমি যে কথা কাউকে বলতে পারিনি, সব—সব কথাই এবার আমরা বলব, কবরের ভিতরে শুয়ে শুয়ে। মির্জা শুয়ে আছেন, সেই দিল্লিতে, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার কাছে সুলতানজির কবরে, আর আমি লাহোরে মিঞাসাহেতার কবরে। একসময় তো একটাই দেশ ছিল, ওপরে যতই কাঁটাতারের বেড়া থাকুক, মাটির গভীরে তো একটাই দেশ, একটাই পৃথিবী। মৃতের সঙ্গে মৃতের কথাবার্তা কেউ আটকাতে পেরেছে?

কাকে বলে হেমন্ত? ওরা কাকেই বা বলে বসন্তকাল? সারা বছর আমরা খাঁচার ভিতরে বেঁচে থাকি, এখনও বিলাপ করি, একসময় আমরা উড়তে পারতাম। একটা গজলে মির্জা এইসব কথা লিখেছিলেন। মির্জা কখনও উড়তে পারেননি, আমিও পারিনি। কিন্তু এবার কবরের অন্ধকারে আমরা ডানা লাগিয়ে নেব; বন্ধুরা, আমরা সেইসব কিস্‌সা বলে যাব, যা আপনারা কখনও শোনেননি; সেইসব পর্দা সরিয়ে দেব, যার ওপারে কী আছে, আপনারা দেখেননি। মির্জাকে বাদ দিয়ে মান্টো নেই, হয়তো মান্টোকে বাদ দিয়েও মির্জা নেই।

কবরের ভিতরে তা হলে কথাবার্তা শুরু হোক। আদাব।

সাদাত হাসান মান্টো

১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫

ভূমিকা অনুবাদের পর আমি মান্টোর স্বাক্ষরের নীচের তারিখটির দিকে তাকিয়ে থাকি। তারিখটা যেন এক প্রহেলিকার মতো জেগে আছে। দীর্ঘ সময় নীরব নিশ্চলতায় আমি পাথর। গভীর শীত এসে ঘিরেছে কি আমাকে? বহু দূর থেকে তবসুমের গলা ভেসে আসে, 'আজ আর লিখবেন না?' আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে একখণ্ড কুয়াশা দেখতে পাই।

—কী হল?

—হুঁ—

—আজ লিখবেন না আর? আপনি বড় অলস, ফাঁকিবাজ।

—ঠিক বলেছেন।

—কী?

—অলস, ফাঁকিবাজ।

—কী হয়েছে আপনার? তবসুমের কণ্ঠস্বরে বেহালার দ্রুত ছড়।

—এই তারিখটা—

—হ্যাঁ, মান্টো ওইদিন ভূমিকাটা লিখেছিলেন।

—তা কী করে সম্ভব?

—কেন?

—মান্টো তো ওইদিনই মারা যান।

—ওইদিন? তবসুম যেন কোনও গহ্বরের ভিতর থেকে কথা বলছে।

—হ্যাঁ। যেভাবে মারা যান, তাতে মান্টোর পক্ষে কলম ধরা সম্ভব ছিল না।

—তা হলে?

—এটা একটা নকল উপন্যাস।

—তার মানে?

—অন্য কেউ মান্টোর নাম নিয়ে লিখেছে।

তবসুম এবার হেসে ওঠে।—ভালই তো।

—কেন?

—একটা নকল উপন্যাস মান্টোর নামে ছাপা হয়ে যাবে।

—সে কী করে হয়?

—হোক না।

—কিন্তু তা কি ঠিক তবসুম?

—ঠিক-ভুলের কথা বাদ দিন। আপনি মির্জা গালিবকে নিয়ে মান্টোর লেখা একটা উপন্যাস পড়তে চান তো?

—হ্যাঁ।

—তা হলে ধরে নিন, এটাই মান্টোর লেখা উপন্যাস।

—কেন?

—আপনি কি জানেন, মান্টো যা লিখেছেন, সবই তাঁর লেখা? কেউ হয়তো বলে গেছে, মান্টো লিখে গেছেন। যেমন আমি বলছি, আপনি লিখছেন। আপনি, আমি, মির্জা গালিব, মান্টো—কেউ হয়তো একদিন থাকবে না, তাদের নামটুকুও নয়, কিন্তু গল্পগুলো ঠিক ভেসে বেড়াবে। তাই বা কম কী? নিন, এবার লিখতে শুরু করুন তো।

তবসুমের মুখ পাণ্ডুলিপির অক্ষরের নৈঃশব্দ্যে হারিয়ে যায়।

> মিহরবাঁ হো কে বুলা লো মুঝে চাহো জিস ওয়ক্ত হো
> মৈঁ গয়া ওয়ক্ত নহি হুঁ ফির আ না সকুঁ।
> (দয়া করে যখন খুশি আমাকে ডেকে নাও।
> আমি বিগত সময় নই যে আবার আসতে পারব না।)

অনেক দূর থেকে আপনাকে দেখতে পাই মির্জাসাব, এই চিত হয়ে শুয়ে ওপরের

দিকে তাকিয়ে আছেন, কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে এমনভাবে শুয়ে থাকেন, মনে হয় যেন কবর আপনার মাতৃগর্ভ, হয়তো উঠে বসে দুলে দুলে নিজের মনে কী বলে যাচ্ছেন, কখনও মাথা নিচু করে আপনাকে পায়চারি করতে দেখতে পাই। তবে আমার এখন বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকতেই ভাল লাগে, এই অন্ধকারে। সেই ১৮৬৯ থেকে আপনি শুয়ে আছেন, কবরটা ঘরবাড়িই হয়ে গেছে, তাই না? আমি তো সবেমাত্র এসেছি ওপরের জগৎ থেকে, বড় ঝড়ঝাপটা গেছে সারা জীবন, তাই শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আপনারও নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম এইরকম অবস্থাই ছিল। আমি তো জানি, শেষ পর্যন্ত আর জীবনটাকে বইতে পারছিলেন না আপনি। ইউসুফ মির্জাকে লেখা একটা চিঠিতে ফুটে উঠেছিল সেই ক্ষত, আপনার জীবন; আপনি লিখেছিলেন, 'আমি তো একটা মানুষ, দৈত্য নই, জিনও নই।'

আপনি আসলে কে, শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন আপনার কাছে অবান্তর হয়ে গেছিল। অথচ আপনার জীবনের মূল প্রশ্ন ছিল এটাই; কিন্তু শেষের বছরগুলোতে সবকিছু আপনার কাছে অর্থহীন মনে হত; শুধু মৃত্যু আর আল্লার কথাই বারবার বলেছেন। আপনি নামাজ পড়েননি, রোজা রাখেননি, ঠাট্টা করে নিজেকে অর্ধেক মুসলমান বলতেন, আর এজন্য উমরাও বেগমের থেকেও ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে হয়েছিল আপনাকে; অথচ, সেই আপনি, শেষের বছরগুলোতে শুধু খোদার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিঠির পর চিঠিতে আপনি লিখেছেন, খোদা যেন দয়া করে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন। আমি জানি, আপনি আর লড়াই করতে পারছিলেন না, গজল অনেকদিন আগে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, মুনিরাবাইয়ের স্মৃতিও তখন কয়েকটা হাড়গোড় মাত্র, এমনকী আপনার প্রিয় সুরাও আর নিয়মিত জোটে না, এই অবস্থায় একজন মানুষ খোদা ছাড়া আর কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? আপনার শেষ জীবনের কথা ভাবলে আমার সেই গজলের কথাই মনে পড়ে :

> য়া রব, জমানা মুঝকো মিটাতা হৈ কিসলিয়ে
> লওহ্-এ জহাঁ-পে হরফ্-এ মুকর্‌রর নহিঁ হুঁ মৈঁ।।
> (হে ঈশ্বর, কাল আমাকে মুছে ফেলছে কেন?
> পৃথিবীর পৃষ্ঠার ওপর আমি বাড়তি হরফ তো নই।)

কিন্তু এভাবে, প্রায় না-খেতে পেয়ে, রোগে ভুগতে ভুগতে, অন্ধ হয়ে মুছে যাওয়াই কি আপনার নিয়তি ছিল?

আপনার জীবনের কথা ভাবলে, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ধুলোর ঝড়। ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা নদী পেরিয়ে আসছে সমরখন্দ থেকে। সূর্যের আলোয় ঝলসাচ্ছে তাদের হাতের ঘূরন্ত তরবারি। কত দূর দূর প্রান্তর পেরিয়ে, কত হত্যা ও রক্তপাতের কারবালা পেরিয়ে তারা আসছে ভারতবর্ষের দিকে। মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখছি, নাকি সিনেমার পর্দায়? ওই আপনার পূর্বপুরুষেরা, তাদের সারাদিন কেটে যায়

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে, পথে কোনও জনপদ পড়লে চলে খুন, লুঠতরাজ, তারপর রাতে মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম। জ্বালানো হয়েছে আগুন, ঝলসাচ্ছে মাংস, বেজে উঠেছে রবাব বা দিলরুবা। দূরে বসে কেউ একা একা মরুভূমির বেদুইনদের গান গাইছে, নিঃসীম আকাশের জন্য। কোনও কোনও তাঁবুতে লুঠ করে আনা মেয়েদের নিয়ে জমে উঠেছে শরীরের উৎসব। সৈনিক পূর্বপুরুষদের নিয়ে আপনার গর্ব কিছু কম ছিল না মির্জা সাহেব; নিজে হাতে অবশ্য কখনও তরবারি ধরেননি। গর্ব থাকলেও মনে মনে জানতেন, অন্যের প্রাণ নেওয়া আর নিজের প্রাণ দেওয়া ছাড়া তাদের জীবনে আর কিছু ছিল না। মাঝে কিছু নারীসঙ্গ, সুরা আর ক্ষমতার দম্ভ। আমি জানি, এই সৈনিক পূর্বপুরুষদের জীবন ছিল আপনার কাছে স্বপ্নের মতো। 'দু'জন গালিব আছে', আপনি একবার বলেছিলেন, 'একজন সেলজুক তুর্কি, সে বাদশাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, আর অন্যজন হা-ঘরে, মাথায় ঋণের বোঝা, অপমানিত।' বাদশাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, তুর্কি সৈনিকদের উত্তরাধিকারী গালিব ছিল আপনার স্বপ্নের গালিব। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যে যখন সূর্য পাটে বসতে বসেছে, তখন সেই স্বপ্নের গালিবকে আপনি খুঁজে পাবেন কোথায়? আর নিয়তিও তো ছিল, আপনার নিজস্ব নিয়তি, যা আপনার জীবনে কবিতার বীজ বুনে দিয়েছিল। একজন ফরাসি কবি র‍্যাঁবো বলেছিলেন, 'I am the other'. আপনি তো সেই 'other'-কে সঙ্গে করে জন্মেছিলেন। তাকে তো ঘেয়ো কুকুরের মতোই মরতে হয়।

আপনার পরদাদা সমরখন্দের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন শুনেছি। আপনার দাদা কুকান বেগ খাঁ সেই অশ্বারোহীদের ঝড়ের সঙ্গে এসে পৌঁছলেন এ-দেশে। আমি কি ঠিকঠাক বলছি মির্জাসাব? ভুল হলে শুধরে দেবেন। আরে, আরে, আপনি উঠে বসে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন! জানি, এসব কিস্‌সা শুনতে আপনার বেশ ভালই লাগে। রক্ত কি টগবগ করে ফুটতে থাকে মির্জাসাব? আপনি সেই প্রথম গালিবকে দেখতে পান, তাই না? বাদশাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তাঁর। আমি আপনাকে ব্যঙ্গ করছি না, মজাও করছি না আপনার সঙ্গে। কাশ্মীরি বলে আমারই বা কি কম গর্ব ছিল? জবাহরলালকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে যে সাহস পেয়েছিলাম, সে তো ওই কাশ্মীরি গর্বের জন্যই। মির্জাসাব, আমরা মাটির মানুষ, মাটির ভিতরে তো কাঁকর থাকেই, তাও তো খোদারই দেওয়া। খোদা যেমন আপনাকে মেহেরবানি করেছিলেন, আমাকেও না করলে কি আমি এত তাড়াতাড়ি কবরে এসে শুতে পারতাম? আমিও তো আপনারই মতো তাঁকে মানিনি, কিন্তু খোদার কাছে তাঁর সব সন্তানই সমান।

আপনাকে আবার আমি সব মনে করিয়ে দিচ্ছি নতুন করে মির্জাসাব। কবরের দীর্ঘ জীবনে হয়তো কত কিছুই ভুলে গেছেন আপনি। স্বাভাবিক। জীবনেই কতকিছু মনে রাখতে পারি না আমরা, আর মৃত্যু তো আসে একটা পর্দার মতো, যার ওপারে আর

কিছুই দেখা যায় না। এক একটা মৃত্যুর পর্দা এসে কীভাবে সব মুছে দিয়ে গেছে, তা তো আমি ১৯৪৭-এ দেখেছি। আল্লার দয়ায় আপনাকে তা দেখতে হয়নি। আপনি ১৮৫৭ দেখেছেন। কিন্তু ১৯৪৭ দেখলে আপনি আত্মহত্যা করতেন মির্জাসাব। বা হয়তো পূর্বপুরুষদের মতো আপনার হাতেও তরবারি ঝলসে উঠত। এত হত্যা, ধর্ষণ, নেমকহারামি পৃথিবী আর কখনও দেখেনি; ১৯৪৭ থেকে যা শুরু হয়েছিল, শুধু দু'টো দেশের নামে; এক দেশের কবরে আপনি শুয়ে আছেন, অন্য দেশের কবরে আমি।

মির্জাসাব, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, কোথা থেকে কোথায় চলে যাই, এই কবরের ঠাণ্ডাতে শুয়েও মনে হয়, ভিতরে কোথায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। আমি তাই অনেকক্ষণ এলোমেলো কথা বলছি। কিন্তু আপনার দাদা কুকান বেগ খাঁর কথাই বলছিলাম, তাই না? ভুল হওয়ার কথা নয়। যদিও আমি অনেকদিন জনি ওয়াকার খাই না। পাকিস্তানে এসে তো দিশিই রপ্ত করতে হয়েছিল। আপনি তো ফ্রেঞ্চ ওয়াইন ভালবাসতেন। শেষকালে রাম ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু আসল কথাটা তো বলতে হবে মির্জাসাব, ওই কুকান বেগ খাঁর কথা। ও বাবা, আপনি আবার নড়েচড়ে বসলেন দেখছি। পূর্বপুরুষদের কথা শুনতে খুব ইচ্ছে হয়, না? রক্তে ঘোড়ার খুরের ঝড় ওঠে বুঝি? ভুলতে পারেন না, আপনি একটা ভিখিরি জেলখাটা আদমি? আর কবি গালিবকে কী বলত লোকে? মুশকিল পসন্দ। মনে আছে? কেউ কেউ বলত, মুহমল-গো। কবিটা প্রলাপ বকে। সেই গজলটা আপনার মনে পড়ে?

য়া রব বহ ন সমঝে হৈঁ
ন সমঝেঙ্গে মেরি বাত।
দে উন দিল উনসে, জো ন দে
মুঝকে জবান ঔর।
(ঈশ্বর, তারা আমার ভাষা বোঝে না।
তুমি তাদের অন্য মন দিও।
তা যদি না দাও,
আমাকে অন্য ভাষা দিও।)

কথার এই এক পাগলামি। আমি তো কথা বলতে শুরু করলে থামতেই পারতাম না। কেন জানেন? মনে হত, যা বলছি, তা সবাই বুঝছে তো? আপনার খুতুত্‌ পড়লে বুঝতে পারি, কথা বলার কী নেশাই না ছিল আপনার। চিঠির পর চিঠিতে আপনি শুধু কথা বলে গেছেন, আপনার চিঠিগুলো পড়তে পড়তেই তো, মির্জাসাব একদিন আপনার গলা শুনতে পেয়েছিলাম আমি। আপনি কী বলেছিলেন, জানেন?

নহ্‌ গুল-এ নগ্‌মহ্‌ হুঁ, নহ্‌ পরদ্‌হ-এ সাজ,
মৈঁ হুঁ অপনি শিকস্ত্‌-কী আবাজ।।

(রাগিণীর আলাপ নই, সেতারের তার নই;
আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ।।)

একজন দণ্ডিত, পরাজিত মানুষকে আমি সেই প্রথম দেখতে পেলাম। মির্জাসাব, আপনি কখনও জানবেন না, আমার কত গল্পে তারা এসেছে, যারা নিজের পরাজয়ে ভেঙে পড়া আওয়াজ শুধু, কথা বলতে বলতে তাদের কিছু কিস্‌সাও আমি শোনাব আপনাকে। তাদের বাদ দিয়ে মান্টো কে? একটা ঝোড়ো হাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু এবার কুকান বেগ খাঁর কথাটা বলে নিতেই হবে। আমি বুঝতে পারছি, গল্পটা শোনার জন্য আপনি অপেক্ষা করে আছেন। কবরের মাটি যেমন সব ধুয়ে মুছে দেয়, এইসব গল্পও হয়তো সেভাবে ফতুর হয়ে গেছে। কুকান বেগ খাঁ, আপনার দাদা, এই দেশে এসে লাহোরের নবাবের ফৌজে কাজ নিলেন। এই নবাব বেশিদিন বাঁচেননি। কুকান বেগ খাঁর মতো ভাড়াটে সৈনিক তা হলে কী করবেন? তাঁকে নতুন কোনও নবাব, বাদশা, নিদেনপক্ষে মহারাজা খুঁজে নিতে হবে। ভাড়াটে সেনারা তো এইভাবে রেন্ডির মতোই বেঁচে থাকে, যতই তার হাতে তলোয়ার ঝকমক করুক। মির্জাসাব ভাড়াটে সেনাদের এই জীবন আপনি জানতেন, তাই তলোয়ারকে পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। ঠিক কি না, বলুন? মান্টোর মত হারামির চোখকে আপনি ফাঁকি দেবেন কী করে?

আপনার দাদা এবার দিল্লি এসে পৌঁছলেন। হায় আল্লা, কখন? দিল্লি যখন ফতুর হতে বসেছে। আওরঙ্গজেব সব লাটে তুলে দিয়েছিল, তারপর বাইরে থেকে আক্রমণের পর আক্রমণ, বাদশা শাহ আলমের দিল্লি তখন মুঘল সাম্রাজ্যের কঙ্কাল ছাড়া কিছু নয়। মুঘল দরবার তখন আসলে একটা বেতো ঘোড়ার মতো ধুঁকছে। শাহ আলমের পঞ্চাশ অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি হয়ে জায়গির পেলেও কুকান বেগ খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন, এই দরবারে উন্নতির আশা নেই। তারপর তো জয়পুরের মহারাজার সেনাবাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পত্তি বেশি কিছু করতে পারেননি। শুনেছি, আগ্রাতেই এন্তেকাল হয়েছিল তাঁর।

এবার আপনার ওয়ালিদ আবদুল্লা বেগ খান ছুটলেন লখনউতে, নবাব আসফ-উদ-দৌলার বাহিনীতে চাকরি নিতে হল তাঁকে। ভাড়াটে সেনার যা ভবিতব্য হয়; এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছোটো; নবাব-বাদশাকে খুশি করো, যখনই দেখলে তাঁর সিংহাসন টলোমলো, তখন অন্য নবাব-বাদশার কাছে ছোটো। সেইসব মেয়েদের মতো, মির্জাসাব, যাদের আমি অমৃতসরের কাচ্চা ঘানিয়া, লাহোরের হিরামান্ডি, দিল্লির জি টি রোড, বম্বের ফরাস রোডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সারা রাতের লড়াই তাদের। মির্জাসাব, তাদের গল্প আমি আপনাদের একদিন বলব; তাদের মাংসের গল্প, তাদের হৃদয়ের গল্প, তাদের ঘাম-রক্ত-চোট-অশ্রুর গল্প। তাদের গল্পগুলো আমাকে দিনের পর দিন খুঁজে ফিরছিল, আর সেইসব গল্পের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমি

একদিন আল্লাকে বিশ্বাস করেছি; তাদের সারা জীবনের সঙ্গী তিনিই, রহিম—বিসমিল্লা। সেইসব গল্প কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি; বলেছে, আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি। তাদের কথা লেখার জন্য আমাকে বেশ্যাদের লেখক—পর্নোগ্রাফার বলা হয়েছে; কিন্তু আমি কী করে চুপ করে থাকব মির্জাসাব? এত—এতগুলো—এত হাজার হাজার মেয়ের হিরামান্ডি, ফরাস রোডে এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল? মির্জাসাব, আমাকে মাফ করবেন, শফিয়া বেগম, আমার বিবিও বলত, সাদাতসাব আপনি এত এলোমেলো কথা বলেন কেন?

গোস্তাকি মাফ করুন হুজুর, পুরনো কথাগুলো তড়িঘড়ি বলে নিই। ওই যে, কথায় পেয়ে বসলে, আমি যে কোথা থেকে কোথায় যাব নিজেই জানি না। লোকজনকে গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারতেও বেশ লাগে আমার। একবার রটিয়ে দিলাম, আমেরিকা আমাদের তাজমহল কিনতে আসছে। তার মানে? সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল, তাজমহল কিনবে কী করে? কিনলে নিয়ে যাবেই বা কী করে? আমি বললাম, আমেরিকানরা সব পারে, ওরা একটা নতুন যন্ত্র বানিয়েছে, সেই যন্ত্র দিয়েই তাজমহলকে তুলে নিয়ে যাবে। কত লোকে যে কথাটা বিশ্বাস করেছিল, মির্জাসাহেব। বিশ্বাস করবে নাই বা কেন? সবাই তো বিশ্বাস করে, আমেরিকা যা খুশি তাই করতে পারে, আমেরিকা যেন একটা জাদুকর। কাকে বোঝাবেন বলুন, হাতে যন্ত্রপাতি থাকলেই সবকিছু করা যায় না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, এবার তা হলে বলেই ফেলি, লখনউতে আপনার ওয়ালিদ বেশিদিন চাকরি করতে পারেননি। তাঁকে চলে আসতে হল হায়দরাবাদে, নবাব নিজাম আলি খানের বাহিনীতে। তিনশো পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি হলেন। বেশ কয়েক বছর ছিলেন নিজামের বাহিনীতে। কী যে গণ্ডগোল হল—সব ইতিহাস তো লেখা নেই মির্জাসাব, লেখা থাকলেই বা আর কী—আবদুল্লা বেগ চলে এলেন অলোয়ারে। রাও রাজা বক্তওয়ার সিংয়ের সেনাবাহিনীতে। ইতিহাস লেখেনি, কোন যুদ্ধে, কীভাবে আপনার ওয়ালিদের মৃত্যু হয়েছিল। ভাড়াটে সৈন্যদের কথা তো ইতিহাস লেখে না; কিন্তু চমকদার সব ইতিহাস বানানোর জন্য ভাড়াটে সৈন্যদেরই কাজে লাগানো হয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, তখন আপনার পাঁচ বছর বয়স।

আপনি এতিম হলেন পাঁচ বছর বয়সে। ওয়ালিদ নেই মানেই তো এতিম। শুধু আপনি নন, আপনার ভাই ইউসুফ, বোন ছোটি খানম। আপনার ওয়ালিদের কোনও বাড়ি ছিল না। আপনারও সারা জীবনে কোনও বাড়ি হয়নি। আগ্রার কালে মহল—আপনার দাদুর বিরাট হাভেলি—আপনাদের তিন ভাই-বোনের শৈশব-কৈশোর কেটেছিল সেখানে, কিন্তু কবে বুঝেছিলেন বলুন তো, আপনার আসলে কোনও বাড়ি নেই? কালে মহলের ভিতরে কেমন দিন কাটত আপনার,

জানতে খুব ইচ্ছে করে আমার। আপনার মা, শোকজর্জর মা, জেনানামহলের এককোণে নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকতেন। আমি দেখতে পাই, আপনারা তিন ভাই-বোন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, তিনি আপনাদের দু'হাতের ডানায় আঁকড়ে ধরতেন, আর হয়তো বিড়বিড় করে বলতেন, 'ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা! ইস বাচ্চোকো ইনসাফ করো।'

কবরের ভিতরে আপনি এক একদিন ছটফট করছেন দেখতে পাই, আর গোঙাতে থাকেন, 'আম্মা—মেরি আম্মাজান—'

আমি সেই বেগমের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, যাঁর নাম আমরা কেউ জানি না, আপনার আম্মা ডাকছেন, 'আসাদ, মেরি জান—'

—ঘর লে চলো আম্মা।

—কাঁহা?

—কাঁহি হো।

মির্জাসাব, আপনি আবার শুয়ে পড়লেন কেন? আমার কথা শুনতে আপনার ভাল লাগছে না? তা হলে আপনি কিছু বলুন মির্জাসাব। আমার বখোয়াস ভুলে যান।

বুদকদহ্‌মেঁ মানীকা কিস্‌সে করে সওয়াল
আদম নহী হ্যয়, সুরৎ-এ আদম বহুৎ হ্যয় য়াঁ।
(এই মাটির পুতুলের রাজ্যে কার কাছে বিশ্বরহস্যের অর্থ শুধাব?
এখানে মানুষ নেই, মনুষ্যাকৃতি অবশ্য অনেকেই আছে।)

এত দূর থেকে কি আমার কথা শুনতে পাবেন মান্টোভাই? আপনি বড় নাছোড়বান্দা, তাই এতদিন বাদে আবার আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। ১৮৫৭-র পর বারো বছর আমি বেঁচেছিলুম ঠিকই, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হত না। তবুও কথা বলতে হত, কথা বেচেই তো রোজগার করতে হত আমাকে। রুজি-রোজগারের জন্য যতটুকু, তা বাদে কথা আমার কাছে হারাম হয়ে গেছিল। ভাঙাচোরা দিবানখানায় আমি শুধু শুয়ে থাকতুম। কাল্লু এসে ওখানেই আমার

দু'বেলার খাবার, ওই একটু পরোটা, কাবাব বা ভুনা গোস্ত আর দারু দিয়ে যেত। শুধু ঘুম আর ঘুম। একটা গজলও মাথায় আসত না। কী করে আসবে বলুন? আমি তো তখন পচে যাচ্ছি, সারা শরীরে বদ্‌বু, কেউ না পেলেও আমি সেই গন্ধ পেতুম, পচে যাওয়ার গন্ধ। একদিন ওই গন্ধ সহ্য করতে না পেরে সন্ধেবেলা মহলসরায় গেলুম। আমি ওখানে পারতপক্ষে যেতুম না। উমরাও বেগম সারাদিন নামাজ-তসবিমালা নিয়ে পড়ে থাকত; তার কাছে আমি থাকা-না-থাকা তো সমান। আমারও তো তার সঙ্গে কোনও কথা ছিল না। ভাবুন মান্টোভাই, দু'টো মানুষ পঞ্চাশ বছরের ওপর পাশাপাশি রয়ে গেল, তাদের মধ্যে কোনও কথা হল না, কেউ কাউকে জানতেই পারল না। এরই নাম নিকাহ্; এখানে মহব্বত-এর কী দরকার? ভাববেন না, আমি উমরাও বেগমের ওপর দোষ চাপাচ্ছি, আমিই তো একটা কাফের। মীরসাব একটা শের-এ বলেছিলেন না, তাকে কীভাবে নিজের কাছে নিয়ে আসব আমি জানতুম না; সে কখনও আসেনি, কিন্তু সে তো তার দোষ নয়।

মহলসরায় গিয়ে দেখি বেগম তখন কাল্লুর মা, মাদারির বিবিকে খুব গম্ভীর হয়ে কী সব যেন বলে যাচ্ছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শোনবার চেষ্টা করলুম। বেগম ওদের বলছিল, 'হজরতের কত বিবিই না ছিলেন। কারুর প্রতি কম নজর ছিল না নবির। পালা করে সব বিবির কাছে থাকতেন তিনি। শুধু বিবি সুদা নিজের পালা বিবি আয়েশাকে দিয়েছিলেন। সুদা, সফিয়া, জুবিরা, ওম্মহবিবা, ময়মুনা—এই পাঁচ বিবিকে দূরে রাখলেও, তাদের বঞ্চিত করেননি। তাঁর কাছে ছিলেন আয়েশা, হফ্‌সা, ওম্মসলম, জয়নব। হজরতের মতো সমান নজর ক'জনের থাকে?' বেগম থামতেই আমি গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম। কাল্লুর মা, মাদারির বিবি সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে। উমরাও বেগম আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'বসুন মির্জাসাব।'

—সবাইকে সমান দেওয়া যায় বেগম? আমি তাকে হেসে জিজ্ঞেস করলুম।

—নবি ছাড়া আর কে পারবেন জি? কিন্তু আপনি হঠাৎ জেনানামহলে? কোনও ফরমায়েস থাকলে কাল্লুকে বলতে পারতেন।

—ফরমায়েস? আমি কি তোমার কাছে কখনও ফরমায়েস পাঠিয়েছি বেগম?

—তা হলে, আমার মহলে এলেন?

আমি তার হাত চেপে ধরে বললুম, 'আমার গায়ের গন্ধ একবার শুঁকবে বেগম?'

—ইয়া আল্লা! আপনি কী বলছেন মির্জাসাব?

উমরাও বেগম অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'সে সব তো অনেক আগের কথা। আপনার কী হয়েছে মির্জাসাব?'

—বেগম, তুমি কি বদ্‌বু পাও?

—বদ্‌বু?

—এই যে আমি তোমার সামনে—বদ্‌বু পাও না?

—কেন মির্জাসাব?

—আমার শরীর থেকে সবসময় বদ্‌বু পাই। পচা মাংসের।

—ইয়া আল্লা! সে আর্তনাদ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে। দুই হাতে আমার পিঠ ডলতে ডলতে বলে, 'কী হয়েছে আপনার মির্জাসাব? কী হয়েছে? জাদা পি লিয়া আজ? বদ খোয়াব দেখেছেন?'

আমি হেসে ফেলেছিলাম—বদ খোয়াব? আমিই তো একটা বদ খোয়াব। আল্লা বোধহয় সারা জীবনেও আমার মতো বদখোয়াব আর দেখেননি।

—মির্জাসাব—

—বলো।

—আল্লার কাছে দোয়া মাঙুন।

—আল্লার কাছে তো আমি দোয়া করি বেগম।

—কী মাঙ্গেন?

—হম্ হৈঁ মুশ্‌তাক অওর বোহ্ বেজার,

য়া ইলাহী য়েহ্ মাজ্‌রা কেয়া হৈ?

—কে সে? কে আপনার ওপর বেজার?

—খোদা। বলতে বলতে আমি তাঁর কাঁধের ওপর মাথা রেখেছিলুম।

—চলুন মির্জাসাব, আপনাকে দিবানখানায় দিয়ে আসি।

—কেন?

আমরা দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম। আমি বুঝতে পারছিলুম, এই বরফ ভাঙার সাধ্য আমাদের নেই। বেগমও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল। তার দুই গাল ভিজে যাচ্ছিল। এই বয়সে এসব কার সহ্য হয় মান্টোভাই? কী হবে কান্না দিয়ে? কান্না আর আমার ভাল লাগে না। কান্না শুনলেই আমি কারবালা দেখতে পাই। কাসেমের মৃত্যুর পর সখিনার সারা শরীর যেমন কান্নার সমুদ্র হয়ে উঠেছিল।

বেগম আমাকে সেদিন দিবানখানায় পৌঁছে দিয়েছিল, আমাকে বিছানায় শুইয়ে অনেক সময় আমার মাথায় হাত রেখে পাশে বসেছিল। বেশ কয়েকবার ডেকেছিল, 'মির্জাসাব—মির্জাসাব—'। আমি কোনও উত্তর দিইনি। কী হবে উত্তর দিয়ে? সব তো শেষ হয়ে গেছে, কারোর কথা আর কারোর কাছে পৌঁছবে না। চোখ বুজে আমি বিড়বিড় করে সেই গজলটা বলে যাচ্ছিলুম!

বোহ্ ফিরাক অওর বোহ্ বিসাল কহাঁ,

বোহ্ শব ও রোজ় ও মাহ্ ও সাল কহাঁ।।

প্রদীপ নিভিয়ে বেগম একসময় চলে গেল। অন্ধকারে, রোজকার মতো, আমার কয়েদখানায় শুয়ে রইলুম, আর খুব শীত লাগছিল, মাঝে মাঝে মনে হয় শীত ছাড়া আমার জীবনে যেন কোনও ঋতুই নেই। ঘুমের ঘোর এসেছিল, একসময় কাল্লুর গলা শুনতে পেলুম, 'হুজুর—মেহরবান—হুজুর—মির্জাসাব—'।

কাল্লু কখনও সময় ভোলে না, রোজ ঠিক সময়ে আমার দাওয়াই নিয়ে আসে। বাক্সের চাবি ওর কাছেই থাকে। ও ঠিক মাপমতন আমাকে এনে দেয়। একফোঁটা দারুও কাল্লু বেশি দেবে না। খেতে খেতে আমি রোজ কাল্লুর কাছে কিস্‌সা শুনি। কিস্‌সা বলতে পারলে কাল্লু আর কিছু চায় না। আমি সেদিন বললুম, 'কাল্লু, আজ আমি তোকে কিস্‌সা বলি শোন।'

—জি জনাব।

—ক'টা দুনিয়া আছে তুই জানিস?

কাল্লু চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—দো দুনিয়া। একটা আল্লার, সেখানে তিনি থাকেন জিব্রাইল আর ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে। আর একটা আমাদের, এই পৃথিবী, মাটি-জলের পৃথিবী। দুই দুনিয়ার মালিক একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেয়ামতের দিন এই দুনিয়া কার হবে?' উত্তর কে দিলেন? সেই মালিক। তিনি ছাড়া কে উত্তর দেবেন? মালিক বললেন, 'সব, সবই আল্লার।' কাল্লু, কী মজা দেখ, আল্লা শুধু আল্লার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে কে? আল্লা খুব একা কাল্লু।

—ইয়া আল্লা। আর্তনাদ করে ওঠে কাল্লু।

—কী হল?

—আল্লা—

—ধুত্তোরি আল্লা। তুই আগে আমার কিস্‌সাটা শোন। এই পৃথিবীতে যারা গুনাহ্‌ করে, আল্লার দরবারে তো তাদের শাস্তি পেতেই হবে। আল্লার দুনিয়াতেও কারও কারও গুনাহ্‌ থাকে। তাদের আল্লা কী করে জানিস? এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন শাস্তি পাওয়ার জন্য। আমি আল্লার দুনিয়ায় গুনাহ্‌ করেছিলুম কাল্লু।

—জনাব—

—তাই আল্লা আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠালেন। কাল্লু, তেরো বছর কয়েদখানায় কাটানোর পর আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। কবে জানিস? বেগমের সঙ্গে যেদিন আমার নিকাহ্‌ হল। তারপর দিল্লি। এ এক ভয়ঙ্কর কয়েদখানা কাল্লু। কে আমার বেড়ি খুলে দেবে বল তো? কে—কে খুলে দেবে? সারা জীবন ধরে লিখে চলা কী যে শাস্তি কাল্লু, তুই বুঝবি না।

কাল্লু খুব ভাল কিস্‌সা বলতে পারত, মান্টোভাই। সময় পেলেই দৌড় লাগাত

জামা মসজিদে। মসজিদের চাতালে দস্তানগোদের পাশে বসে বসে কিস্‌সা শুনত। দস্তানগোরা ভারী আশ্চর্য মানুষ। সারা দিন জামা মসজিদের চাতালে বসে বসে তারা কিস্‌সা বলত, মানুষকে কিস্‌সা শুনিয়েই তাদের রোজগার। ঝোলা ভরা কিস্‌সা, কখনও ফুরোত না, যেন সারা পৃথিবী ঘুরে তারা সেইসব কিস্‌সা খুঁজে নিয়ে এসেছে। পয়সা না দিতে পারলেও শোনাত; শুধু তো রোজগারের ধান্দা নয়, কিস্‌সা বলতে বলতে তারা নিজেরাই খোয়াবে ডুবে যেত। মান্টোভাই, আমাদের সময়টাই ছিল কিস্‌সার সুতোয় বোনা একটা চাদর। কোনটা যে জীবনের, আর কোনটা কিস্‌সার সুতো, বোঝাই যেত না। সিপাই বিদ্রোহের পর গোরারা দিল্লির দখল নিল, সে এক দিন গেছে মান্টোভাই, গোটা দিল্লি যেন কারবালা হয়ে গেল, তারপর থেকে দস্তানগোরাও হারিয়ে গেল দিল্লি থেকে। গোরাদের দিল্লিতে কিস্‌সার আর কোনও জায়গাই রইল না; আপনি তো জানেন, গোরারা কিস্‌সা চায় না, ওরা চায় ইতিহাস। আমাকেও তো একবার ইতিহাস লেখার কলে জুতে দিয়েছিলেন জাঁহাপনা, সে যে কী বিরক্তিকর কাজ! গোরাদের ইতিহাসের কথা দু'একজনের মুখে শুনেছি; সে এক দমবন্ধ-করা অন্ধকূপ মনে হয় আমার।

আপনি তো কিস্‌সা লিখতেন, তাই বুঝতে পারবেন, কিস্‌সা ক'টা লোক বলতে পারে, ক'জনের লেখার ক্ষমতা আছে? ইতিহাস সবাই লিখতে পারে। সেজন্য দরকার শুধু দানেশমন্দি। কিন্তু কিস্‌সা লেখার জন্য চাই খোয়াব দেখার ক্ষমতা। তাই কি না বলুন? খোয়াব ছাড়া লায়লা-মজনুনের কিস্‌সা জন্ম নিতে পারত? খোয়াব না দেখলে কেউ ইউসুফ-জুলেখার কিস্‌সা বিশ্বাস করবে? কিস্‌সা বলেই কি তা মিথ্যে? কত যুগ যুগ ধরে এই কিস্‌সা বেঁচে আছে। আর সিকন্দর? তাঁর নামই লোকে জানে; তাঁর সাম্রাজ্য আজ কোথায়? ইতিহাস একদিন ধুলো হয়ে যায় মান্টোভাই; কিস্‌সা বেঁচে থাকে।

দিল্লি কারবালা হয়ে যাওয়ার পর, কাল্লুকে মাঝে মাঝেই দেখতাম দিবানখানার কোনও কোণে বসে কাঁদছে। কী হয়েছে কাল্লু? কাল্লুর ফোঁপানি বেড়ে যেত; সেই সময় ওকে মনে হত গুলি খাওয়া একটা জন্তু, মৃত্যু ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কী হয়েছে কাল্লু?

কাল্লুর ভিতর থেকে যেন মরণ-চিৎকার বেরিয়ে আসত। —জনাব, দস্তানগোরা আর দিল্লিতে ফিরবে না?

—না রে কাল্লু।

—কিঁউ হুজুর?

—বাদশাকেই ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। দস্তানগোরা কী করে ফিরবে বল?

একদিন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আমি সকালবেলা বাড়ির সামনের বারান্দায়

বসেছিলুম। হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক এসে হাজির হল, ছেঁড়াফাটা আলখাল্লা পরা, চুলে জট ধরে গেছে, চোখ টকটকে লাল। সে এসে সরাসরি আমার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসল।

—মিঞাসাব, ক'দিন কিছু খাইনি।

—তা আমি কী করব? রাস্তার কুকুরের মতো আমি খেঁকিয়ে উঠলুম।

—কিছু দানাপানি যদি দেন হুজুর—

—আমারই বলে জোটে না।

—দু'টি খেতে দ্যান হুজুর। আমি দস্তান শোনাই আপনাকে।

হঠাৎ কাল্লু এসে হাজির। সে চোখ বড় বড় করে বলে, 'দস্তান?'

লোকটা তার সবক'টা হলুদ দাঁত বার করে বলল, 'দস্তান বলাই আমার কাজ জি।'

কাল্লু সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে বসে পড়ে বলে, 'শোনাও, তবে, শোনাও।'

—আগে কিছু খেতে দাও।

কাল্লু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে দৌড়ল, একটু পরেই কোথা থেকে যে ও কয়েকটা কাবাব আর ছেঁড়া পরোটা নিয়ে এল, কে জানে! লোকটা নিমেষের মধ্যেই কাবাব-পরোটা শেষ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—বলো, বলো। কাল্লু লোকটাকে তাড়া দেয়।—কিস্‌সাটা কাকে নিয়ে মিঞা?

—মির্জা আসাদুল্লা খান গালিব।

কাল্লু একবার আমার মুখের দিকে, তারপর লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

—মির্জা আসাদুল্লা খান গালিবকে তুমি চেনো মিঞা? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—না, হুজুর।

—তার কিস্‌সা তবে জানলে কোথায়?

—আগ্রাতে।

—তুমি আকবরাবাদে থাকো?

—জি হুজুর?

—কিন্তু মির্জা তো কবেই আকবরাবাদ ছেড়ে দিল্লি চলে গেছেন, মিঞা।

—জানি হুজুর। আগ্রাতে আমরা মির্জার দস্তান বলি। বহুত লোক ভিড় করে শুনতে আসে।

—তা হলে, বলো শুনি। আমি কাল্লুর দিকে তাকিয়ে হাসলুম; কাল্লুর মুখেও দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল।

লোকটা প্রথমে পতঙ্গবাজি নিয়ে একটা মসনবি আবৃত্তি করল। মান্টোভাই, নয় বছর বয়সে পতঙ্গবাজি নিয়ে মসনবিটা লিখেছিলুম। তখন আমার তখল্লুশ অসদ্।

আপনি জানেন তো, নবাব হুসাম-উদ-দৌলা লখনউ গিয়ে মীরসাবকে আমার গজল দেখিয়েছিলেন? মীরসাব বলেছিলেন, "অগর ইস লড়কে কো কোই কামিল উস্তাদ মিল গয়া অওর ইসে সিধে রাস্তে পর ডাল দিয়া তো লা-জওয়াব শায়র বনেগা—বরনা মোহমল বকনে লাগে গা।" মীরসাব আমার সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন, ভেবে দেখুন।

ইরতেদা-এ ইশকমেঁ রোতা হ্যয় কেয়া
আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যয় কেয়া।
(সবে তো প্রেমের শুরু, এখনই কাঁদছ?
দেখো ক্রমে ক্রমে আরো কত কী ঘটে।।)

ইশ্‌ক। ভালবাসার জন্য মীরসাবকে পাগল হয়ে যেতে হয়েছিল, পাগল বানানো হয়েছিল তাঁকে। তাঁর খানদানেরই একজন বেগমের জন্য ইশ্‌ক-এ দেওয়ানা হয়েছিলেন মীরসাব। সেজন্যই তাঁর ওপর চলেছিল লাগাতার নির্যাতন। আগ্রা থেকে দিল্লি পালিয়ে গিয়েও রেহাই পাননি। শেষে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, ছোট একটা কুঠুরিতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল। দূর থেকে খাবার ছুঁড়ে দেওয়া হত। চিকিৎসার নামে কী যন্ত্রণাই না দেওয়া হয়েছিল মীরসাবকে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এতসবের পরেও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মীরসাব। দিল্লিতে আর থাকতে পারেননি, চলে গিয়েছিলেন লখনউ। ১৮১০-এ লখনউতে মারা গেলেন মীরসাব। তখন আমার বয়স তেরো। সেই বছরেই উমরাও বেগমের শেকলে আটকে গেলাম।

—আরে, আসল দস্তান তো বলো। কাল্লু লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকায়।

—সে এক বিরাট মহল। কালে মহল। খাজা গুলাম হুসেন খানের মহল। ইয়া ফটক, মহলের ভিতরে বিরাট চবুতরা, সেই চবুতরায় কত রকমের খাঁচা, মোর দ্যাখো, হিরণ দ্যাখো, কত রকমের পাখি, একটা খাঁচায় নাকি হোদহোদও ছিল।

আমি হা হা করে হেসে উঠলুম।—হোদহোদ? আরে সে পাখির কথা তো কোরানে লেখা আছে, সোলয়মানের কাছে ছিল। সেই হোদহোদ তুমি খাজা গুলাম হুসেন খানের মহলে দেখেছ মিঞা?

—আমি দেখিনি। তবে অনেকে বলে দেখেছে।

—বেশ, তারপর?

—খাজা গুলাম হুসেন খানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আবদুল্লা বেগ খানের। তিনি কখনও লখনউতে, কখনও হায়দরাবাদে, কখনও অলোয়ারে—নবাব-রাজাদের সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন তো। তাঁর নিজের ঘরবাড়ি ছিল না। মির্জা আসাদুল্লার জন্ম হয়েছিল কালে মহলেই।

—মির্জার পাঁচ বছর বয়সে তার ওয়ালিদ যুদ্ধে মরেছিল, তাই না?

—হুজুর, জানেন?

—কিছু কিছু শুনেছি। মির্জা গালিব বলে কথা, তার কিস্‌সা তো হাওয়াতেই উড়ে বেড়ায়। তারপর?

—মির্জার চাচা ছিলেন নসরুল্লা বেগ খান। তিনি—

—বখোয়াস বন্‌ধ করো। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।—তোমার কাজ কী? বলো, কী কাজ?

—জি, আমি তো দস্তান বলি।

—ইয়ে দস্তান হ্যায়? কে জানতে চায় নসরুল্লা বেগের কথা? যারা ইতিহাস লেখে, তাদের ওসব বলো গিয়ে। ওসব জেনে আমার লাভ কী? হঠো, হঠো, ইধর সে।

—হুজুর। কাল্লু এবং লোকটা একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমি জানি। হাসতে হাসতে তাকে বললুম।

—জি হুজুর। লোকটা আমার পা জড়িয়ে ধরে।

—আমি জানি, সেই পাঁচবছর বয়স থেকে নিকাহ্‌ হওয়া পর্যন্ত আসাদুল্লা কীভাবে কালে মহলে থাকত।

—বলুন হুজুর। কাল্লু এবার আমার হাত চেপে ধরে।

—মির্জা একটা গজল লিখেছিল অনেক পরে। শুনে রাখ্‌, কালে মহলের সেই দিনগুলো—

নওম্মীদী-এ মা গার্দিশ-এ অয়াম নহ্‌ দারদ্‌;

রোজ কেহ্‌ সিয়হ্‌ শুদ সহর ও শাম নহ্‌ দারদ্‌।।

(আমার ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে কালের গতি রুদ্ধ;

যে-দিন মিশকালো তার প্রভাতই বা কী, সন্ধ্যাই বা কী।।)

মান্টোভাই, আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে এবার একটু শুয়ে থাকতে দিন। তারপর না হয় আপনার কথাগুলো শোনা যাবে। কবরে শুয়ে এইসব খোয়াব কতদিন দেখতে হবে, কে জানে!
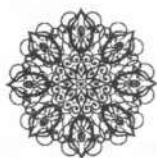
একদিন মসল-ই-পতঙ্গ-ই-কাগজি,
লে কে, দিল, সর রিস্তা-ই-আজাদগি
(একদিন আমার হৃদয়, ঘুড়ির মতো
মুক্তির পথে উড়ে যেতে চেয়েছিল)

মির্জাসাবকে একটু ঘুমোতে দেওয়া দরকার। আরও আরও মৃতরা, যাঁরা আমাদের আশেপাশে শুয়ে আছেন, আমাদের দুজনের কথা আপনারা শুনছেন, চলুন এবার আমরা উড়ে যাই, বাল্লিমারোঁ মহল্লায়, কাসিম জানের গলিতে মির্জাসাবের বাড়ির আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ব আমরা, চলুন, চলুন, উঠে পড়ুন, মির্জাসাব আর কাল্লুকে দস্তানগো যে-কিস্‌সাটা বলছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে তা শুনে আসা যাক। সত্যি বলতে কী, লুকনোর তো প্রয়োজন নেই আমাদের, কেই বা আমাদের দেখতে পাবে? তবে মির্জাসাব টের পেলেও পেতে পারেন, শুনেছি সারা রাত ঘুমের মধ্যে নাকি উনি মৃতদের সঙ্গে কথা বলতেন।

কাল্লু মির্জাসাবের হাত ধরে বলে চলেছে, 'বলুন হুজুর, আপনার মুখেই মানাবে ভাল।'

—না। এই মিঞাই বলুক। কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হল না মিঞা।

—জি বান্দার নাম আবিদ।

—বলো, আবিদ মিঞা। মির্জা গালিবের কিস্‌সাটা তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।

—এ হুজুর আসাদের কিস্‌সা।

—আসাদ?

—জি। তখনও তো মির্জা গালিব হননি। আগ্রায় সবাই তাকে আসাদ বলে ডাকত। গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর, নসরুল্লা বেগ খানের কথাটা—

—আবার?

—কিন্তু ওয়ালিদ মরে যাওয়ার পর চাচা নসরুল্লাই তো আসাদের সব দায় নিয়েছিলেন হুজুর। সে কথা ভুলি কী করে? হাতির পিঠ থেকে পড়ে মারা গেল আসাদের সেই চাচা। হুজুর, আসাদ আবার এতিম হল।

—কী যে আজেবাজে বকো। মির্জা গালিবের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়।—আরে, মির্জা গালিব তো এতিম হয়েই এই দুনিয়াতে এসেছিল। নতুন করে আবার এতিম হবে কী!

—হুজুর, কথাটা বুঝলাম না।

—তাহলে একটা কিস্‌সা শোনো মিঞা। মির্জা গালিব হাসলেন।—ধরো গিয়ে, তার নাম হামাজ। তো হামাজ একদিন তার ইশ্‌কের দরজায় গিয়ে টোকা দিল। অন্দর মহল থেকে কথা ভেসে এল, 'কে বাইরে?'

হামাজ বলল, 'আমি।'

ভিতর থেকে শোনা গেল, 'এখানে তোমার-আমার জন্য কোনও ঘর নেই।' দরজা খুলল না।

বছরখানেক একা একা নানা জায়গায় ঘুরে হামাজ আবার সেই দরজার সামনে ফিরে এসে টোকা দিল। ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা ভেসে এল, 'বাইরে কে?'

হামাজ বলল, 'তুমি'। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

—তারপর হুজুর? কাল্লু চোখ বড় বড় করে তাকায়।

—তারপর আর কিছু নেই রে। হামাজ যে-উত্তরটা দিয়েছিল, আসাদ সেই উত্তরটা দিতে পারেনি। তাই আল-মুক্তাদির তাকে এতিম করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। দরজা খুলল না।

—কিস্‌সাটা কার কাছে শুনেছিলেন হুজুর? আবিদ মিঞা বলে।

—তোমারই মতো একজন দস্তানগোর কাছে। তবে কিস্‌সাটা অনেকদিন আগে বলেছিলেন শেখ জালালুদ্দিন রুমি তাঁর মসনবিতে।

নামটা শুনেই আবিদ মিঞা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে কয়েক পাক ঘুরে নেয় আর হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় সুরেলা ঝরনা, 'মওলা...মেরে মওলা...।'

—শেমা থামাও আবিদ মিঞা। কিস্‌সাটা শুরু করো। মির্জা গালিব চেঁচিয়ে ওঠেন।

—জি হুজুর।

মির্জা গালিবের কদমবুশি করে আবিদ মিঞা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর বলে, 'চোখে জল আসে জনাব, যখন তাকে দেখি।'

—কাকে?

—আসাদ মিঞা।

—কেন, চোখে জল আসে কেন?

—সবে ন'বছর বয়স, ওয়ালিদ নেই, দেখভাল করার চাচাও কবরে চলে গেল, আসাদ মিঞা একা একা কালে মহলে ঘুরে বেড়ায়।

—একা একা?

—জি হুজুর। শুনেছি, সে নাকি মহলে কারোর সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললেও উত্তর দিতে চাইত না। সে ঘুরে বেড়াত, কখন আম্মাজানের সঙ্গে দেখা হবে। একা একা আগ্রার গলির পর গলিতে দৌড়ত। তাজমহলের সামনে গিয়ে বসে থাকত। রোজ রাতে মহলের ছাদে উঠে বসে থাকত, তারা গুনে যেত।

—আসাদ তারা গুনত না, মিঞা।

—তবে? আপনি জানেন হুজুর?

—তাহলে কে জানে? কাল্লু চিৎকার করে ওঠে।— হুজুর ছাড়া কে জানে, মিঞা?

—কী করত আসাদ?

—একটা তারা খুঁজত।

—কোন তারা জি?

—যে-তারা থেকে আসাদকে দুনিয়াতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তার ইশ্‌ক।

—তারাটা চিনতে পেরেছিল আসাদ?

—না, মিঞা। তারায় একরকম জীবন, আর এই দুনিয়ায় আরেক রকম। দুনিয়ায় এলে তারাটাকে আর চেনা যায় না। কী করেই বা চেনা যাবে? তারারা কত খতরনক, তুমি জানো আবিদ মিঞা? আকাশে আজ রাতে যে-তারাটাকে তুমি জ্বলতে দেখবে, সে-আসলে কয়েক লক্ষ বছর আগে মরে গেছে। এতদিনে তার আলো এসে পৌঁছল আমাদের দুনিয়ায়। কী করে বুঝবে বলো, কোন তারায় তোমার ঘর ছিল? তুমি তার চেয়ে কিস্‌সাটা বলো মিঞা।

—জি হুজুর। একদিন আসাদ ঘুরতে ঘুরতে তাজমহলের পাশে যমুনার তীরে এসে বসেছে। বেশ কয়েকদিন আম্মার সঙ্গে দেখা হয় না তার। তাকে তো থাকতে হয় দিবানখানায়; মহলসরা থেকে আম্মা ডাকলে তবেই যেতে পারবে। আম্মা তাকে ডাকে না কেন? সে বেশির ভাগ সময় মহলসরার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, আর ধমক শোনে, এখানে কেন রে আসাদ? জেনানামহলের সামনে ঘুরে বেড়াস কেন? তোর আর কোনও কাজ নেই? সে মহলের ছাদে উঠে যায়, রাগে ফুঁসতে থাকে, একা একা কথা বলে, আব্বাজান, কোথায় তুমি, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় চলে গেছ, আর কখনও ফিরবে না, আমাকে এই মহলে রেখে গেলে...আব্বাজান, ওরা তো আম্মার সঙ্গেও দেখা করতে দেয় না, কেন দেয় না আব্বাজান?

—কেন দেয় না মিঞা?

—কেন হুজুর?

—দস্তান বলছো তুমি, আর তুমিই জানো না? মির্জা গালিব হা-হা করে হেসে ওঠেন।

—ওয়ালিদ তো আসাদের জন্য কিছু রেখে যায়নি জাঁহাপনা। আবদুল্লা বেগ খানের

ঘর ছিল না; ঘর থাকলে তবেই না বিবির কথা; তবেই না আসাদ তার আম্মাজানকে পাবে। কেমন যে নিকাহ্ হয়েছিল আবদুল্লা আর আসাদের মায়ের। কে কাকে কতটুকু পেয়েছিল বলুন? আবদুল্লার তো দিন কাটত এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে; আসাদের মা কালে মহলে শুধু অপেক্ষায় দিন কাটাতেন। তারপর একদিন আবদুল্লার মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছল। খবরটুকু মাত্র, হুজুর। আবদুল্লা বেগ খান যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কোথায় কোন অচেনা দেশে তাকে গোর দেওয়া হয়েছিল কে জানে! তুর্কীদের এক আজিব তরিকা ছিল হুজুর, জানেন তো? কেউ মারা গেলে তার তলোয়ার পেত ছেলে আর বাড়িঘর-সম্পত্তি পেত মেয়ে। আবদুল্লা বেগ কোথায় হারিয়ে গেল; আসাদ তার তলোয়ার পেল না। বাড়িঘর সম্পত্তি বলতে তো কিছুই ছিল না আবদুল্লার।

—আবিদ মিঞা—

—হুজুর।

—সেই দিনটার কথা ভুলে গেলে?

—কোন দিন হুজুর?

—আসাদ তাজমহলের পাশে যমুনার তীরে গিয়ে বসল। তারপর কী হয়েছিল মিঞা?

—গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। দস্তানের কখন যে কী মর্জি হয়, বুঝতে পারি না। হুজুর, আমার চাচা বলত, দস্তান বড় আজিব, তুমি যদি ভাবো, এই পথে যাব, একটু পরেই দেখবে, দস্তান তোমাকে অন্য পথে নিয়ে গেছে।

—ঠিকই তো বলত। মির্জা গালিব হাসেন।—গোরাদের ইতিহাসই শুধু সোজা, একটাই পথ ধরে চলে। দস্তানের তো হাজার হাজার পথ। আমির হামজার দস্তান শোনোনি?

—জি হুজুর। ওই যে বলে না—

মৎ সহল হমেঁ জানো, ফিরতা হ্যয় ফলক বরসোঁ<br>
তব খাককে পর্দেসে ইনসান নিকলতে হ্যয়ঁ।।

—ঠিক, ঠিক মিঞা। আমরা সামান্য না কি? কত কত বছর—হাজার-লক্ষ বছর ধরে নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুরেছে, তারপরেই না মাটির পর্দা ঠেলে মানুষের জন্ম হয়েছে। কিস্‌সা কি কখনও একটা সোজা পথে চলতে পারে?

—আসাদ যমুনার তীরে বসেছিল হুজুর। শুনেছি, তাজমহল নাকি আসাদের তেমন ভাল লাগত না।

—কেন ভাল লাগবে, মিঞা?

—হুজুর—

—মমতাজমহলের সমাধি কোথায় জান? বুরহানপুরে। কেউ সেখানে যায় না। ছোট একটা সমাধি। তাহলে তাজমহল বানানো কেন? এসব রাজা-বাদশার খেয়াল মিঞা। আর যদি মহলের সৌন্দর্যের কথাই বলো, তবে ফতেপুর সিক্রির পাশে তাজমহল দাঁড়ায় না। আর জামা মসজিদের কথা যদি বলো, সে তো জন্নতের ফুল।

—যমুনার নীল জল থেকে এক দরবেশ উঠে এলেন। আবিদ মিঞা চোখ বড় বড় করে বলে।

—মিঞা, তুমি কি খোয়াব দেখ? যমুনার জল থেকে দরবেশ উঠে এলেন?

—জি হুজুর। দরবেশ-ফকিররা কোথায় না থাকে, হুজুর?

—তারপর?

—দরবেশ আসাদকে বললেন, তুই একা একা ঘুরে বেড়াস কেন আসাদ? তুই পাখি হবি?

—আমাকে পাখি বানিয়ে দেবেন? আসাদ অবাক হয়ে দরবেশের দিকে তাকায়।

—দেবো। দরবেশ আসাদের মাথায় হাত রাখেন।—আশমানে উড়ে যেতে চাস না? সেই পাখিটার গল্প বলি, শোন। এক সওদাগরের খাঁচায় ছিল তার প্রিয় পাখি। একবার সওদাগর ব্যবসার কাজে ভারতবর্ষে যাবে। পাখিটাকে এক সময় ভারতবর্ষ থেকেই এনেছিল সে। যাওয়ার আগে সওদাগর খাঁচার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোর জন্য কী নিয়ে আসব, বল।'

—জি আজাদি। আমার জন্য আজাদি নিয়ে আসবেন মিঞা। পাখি বলে।

—আজাদি? সওদাগর হেসে ওঠে।—তার মানে তো তোকে ছেড়ে দিতে হবে। তা কখনও হয়? অন্য কিছু বল।

—তাহলে যে বনে আমি থাকতাম সেখানে একবার যাবেন। ওখানকার পাখিদের আমার কথা বলে আসবেন। জেনে আসবেন, ওরা কেমন আছে?

—বেশ। তুই চিন্তা করিস না। সকলের খবর নিয়ে আসব আমি।

সওদাগর বাণিজ্যে চলে গেলেন। সব কাজ শেষ হওয়ার পর মনে পড়ল, পাখির পরিজনদের খোঁজ নেওয়ার কথা। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর খাঁচার পাখিরই মতো একটা পাখি দেখতে পেলেন তিনি। সওদাগর তাঁর খাঁচার পাখির কথা বলতেই বনের পাখিটা ঝপ্ করে নীচে পড়ে গেল। সওদাগর বুঝলেন, এতদিন পরে আত্মীয়ের খবর পেয়ে পাখিটা মারা গেছে। খুব দুঃখও হল তাঁর; ইস্, পাখিটা আমার জন্যই মারা গেল।

একদিন দেশে ফিরে এলেন সওদাগর। খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পাখি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে আমার বন্ধুরা? মিঞা, ওদের কথা বলুন।'

—কী বলব, বল? তোরই মতো দেখতে একটা পাখিকে তোর কথা বলতেই ঝপ্ করে গাছ থেকে পড়ে মরে গেল।

সওদাগরের কথা শুনেই তাঁর পাখিও ডানা মুড়িয়ে, চোখ বুজে খাঁচার নীচে পড়ে গেল। আঙুল দিয়ে অনেকবার খোঁচাতেও পাখিটা নড়ল না। পাখিকে খাঁচা থেকে বার করে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সওদাগর ভাবল, খবরটা না দিলেই ভাল হত, বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে আমার পাখি তাহলে এভাবে মরত না। পাখিটাকে সে জানলার উপর রেখে দিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গেই পাখি উড়ে গিয়ে বসল সামনের গাছের ডালে। সওদাগর তো অবাক, সে ছুটে গিয়ে গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল, পাখিকে ডাকতে লাগল। পাখিটা তখন উড়তে উড়তে বলছিল, 'আমার বন্ধু মরেনি মিঞা। কীভাবে আবার উড়তে পারব, সেই পথটাই সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে। খবরটা আপনিই আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন মিঞা। সালাম।'

বলতে বলতে সেই পাখি অনেক দূর উড়ে গেল।

—এই কিস্‌সাটা শোনার পর আসাদ সেই দরবেশকে কী বলেছিল, তুমি জান আবিদ মিঞা? মির্জা গালিব বললেন।

—না হুজুর।

—এই জীবন যে কী, তা আজও বুঝতে পারলাম না, আবিদ মিঞা। দস্তানও তাকে ছুঁতে পারে না। শুধু কুয়াশা—তা ছাড়া কিছু নেই। তাহলে শোনো, পরের কিস্‌সাটা তোমাকে বলি।

—কোন কিস্‌সা হুজুর?

—আসাদ সেই দরবেশকে বলেছিল, আপন'র সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলুন, খিদ্‌র।

—কোথায়? দরবেশ বললেন।

—আপনি যেখানে যাবেন।

তিনি অনেকক্ষণ আসাদের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কী বললেন, সে জানে না। যমুনার তীরে, রোদ্দুরে বসেও আসাদের বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। একসময় দরবেশ বললেন, 'তুই কোথাও যাস না আসাদ। তোর ওয়ালিদ, তোর হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে যাননি। তুই কখনও তলোয়ার চালাতে পারবি না আসাদ। তলোয়ার চালানো বড় কঠিন কাজ; এক একটা কোপের সঙ্গে তুইও মরবি আসাদ।'

—তাহলে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন আমাকে। আসাদ বলে।

—কোথায়?

—আপনি যেখানে যাবেন। আমিও আপনার মতো দরবেশ হব।

—সে-পথ তোর নয় আসাদ। বলতে বলতে তিনি তাঁর ঝোলা থেকে একটা আয়না বের করে আসাদের হাতে দিলেন। আয়নায় ফুটে ওঠে আসাদের ঝাপসা মুখ।

—মোছ, ভালো করে মোছ আয়নাটা।

আসাদ আয়নাটা মুছতে থাকে। দরবেশ দুলে দুলে গানের ভিতর ডুবে যেতে থাকেন।

—তারপর আবিদ মিঞা?

—আসাদ তো আয়নাটা মুছেই চলেছে; যত মোছে ততই ঝকঝক করতে থাকে আয়না। একসময় দরবেশের গান থামল। তিনি বললেন, 'আয়নায় একবার তাকিয়ে দেখ।'

আসাদ আয়নার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। আয়নায় তো তাকেই দেখতে পাওয়ার কথা, কিন্তু সে নেই, আয়নার ভিতরে ফুটে উঠেছে আম্মাজানের পশমিনার মতো নীল আকাশ। পশমিনাতে যেমন কতরকমের নকশা, এখানেও তাই, এই আকাশে জেগে আছে পাখিদের নকশা। একটা বড় পাখির পিছন উড়ে যাচ্ছে অগুনতি পাখি, তাদের হরেক রং আর চলনে তৈরি হয়ে উঠেছে নকশাটা। আসাদ মুখ তুলে দরবেশের দিকে তাকাল।

দরবেশ বললেন, 'ওই পাখিটাকে চিনিস।'

—না।

—ও হল গিয়ে হোদহোদ। আর ওই যে সব পাখিদের দেখছিস, ওরা হোদহোদের সঙ্গে চলেছে ওদের রাজার খোঁজে।

—ওদের রাজা কে?

—সিমুর্গ।

—সে কোথায় থাকে?

—কাফ পাহাড়ে।

—সিমুর্গকে পেলে কী হবে?

—তুই পরে বুঝতে পারবি। আয়নাটা যত মুছবি, ততই দেখতে পাবি, পাখিরা একের পর এক উপত্যকা পেরিয়ে যাচ্ছে। সাতটা উপত্যকা পেরোতে হবে ওদের। তারপর একদিন সিমুর্গকে দেখতে পাবি। ততদিন পর্যন্ত তোকে লিখে যেতে হবে।

—কী লিখব?

—ইশ্‌কের কথা। সেই ইশ্‌ককে তুই কখনও পাবি না, কিন্তু তার কথাই তোকে লিখতে হবে আসাদ।

—তারপর আবিদ মিঞা? মির্জা গালিবের চোখ যেন কোনও শূন্য প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই প্রান্তর জুড়ে শুধু জেগে আছে কাঁটাঝোপ।

গুল ও আঈনহ্‌ কেয়া খুরশীদ ও ম্যহ্‌ কেয়া
জিধর দেখা তিধর তেরা হী রূ থা।।
(ফুলের দিকে তাকাই, আয়নার দিকে তাকাই,
চন্দ্রসূর্যের দিকে তাকাই।
যেদিকে তাকাই, তোমারই মুখ দেখতে পাই।।)

অরূপের সমুদ্রে আমার তরী ভাসল, মান্টোভাই। যাকে কখনও দেখা যায় না, তার পেছনে আমার সারা জীবনের দৌড় শুরু। তারপর থেকে কলমই আমার নিশান। আমার কলমগুলো কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল জানেন? আমার যোদ্ধা পূর্বপুরুষদের ভাঙা তির দিয়ে। যেদিন প্রথম একটা শের লিখলুম, মনে হল, অনাদি-অনন্ত থেকে যেন আমি কবিতার বীজ বুকে নিয়েই এসেছি। কবিতা তো চেষ্টা করে লেখা যায় না; যায়, বলুন? কবিতা যার কাছে আসে, সে-ই শুধু পারে। কিন্তু কেন সে আসে, কী ভাবে আসে, তা তো আমরা জানি না। আমার কী মনে হয় জানেন, হাজার হাজার দারুণ গজল লিখলেও তাকে কবি বলা যায় না, কিন্তু এমন একটা শেরও যদি সে লিখতে পারে, আর্তনাদের মতো, যাতে তার হৃদয়ের সব রক্ত লেগে আছে, তবেই তাকে কবি বলতে পারি আমরা। কবিতা তো মসজিদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া নয়; খাদের কিনারে এসে দাঁড়ানো, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ কয়েকটা কথা বলা। মান্টোভাই, রক্তমাখা কাগজে আমি আমার ইশ্‌কের কথা লিখে গেছি দিনের পর দিন, আমার হাত অবশ হয়ে গেছে, তবু লিখে গেছি। আমি জানতুম, একদিন আমার গজল অনেক মানুষকে আশ্রয় দেবে। গর্ব নয় মান্টোভাই, ক্ষত—আমার ক্ষতর পর ক্ষতের কথা লিখে গেছি—তা কাউকে ছোঁবে না, তা কি হতে পারে?

কীভাবে হৃদয় থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে, আমি দিনের পর দিন দেখে গেছি। ছোটবেলার কয়েকটা কথা তবে আজ আপনাকে বলি। তখন থেকেই তো রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর জমাট বেঁধে আমার বুকের ভেতরে এক একটা পাথর তৈরি হয়েছে। মীরসাব একটা শের-এ কী বলেছিলেন জানেন তো?

হুঁ শমা-এ আখির-এ শব, সুন সরগুজ়শ্‌ত মেরী,
ফির সুবহ্‌ হোনে এক তো কিস্‌সা হী মুখত্‌সর হ্যায়।।

সত্যিই তো আমি শেষ রাত্রির চিরাগ। ভেবে দেখুন, আমি যখন জন্মালুম, তখন একটা সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে। কতবার স্বপ্ন দেখেছি, যদি জাঁহাপনা আকবরের সময়ে জন্মাতুম; জাঁহাপনা জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহানের সময়ে জন্মালেও আমাকে সারা জীবন এমন রাস্তার কুকুরের মতো কাটাতে হত না। খোদা আমাকে পাপের জন্য এমন নরকে এনে ফেললেন, যখন দরবার বলতে আছে সামান্য খুদকুঁড়ো। আর ওই বাহাদুর শাহ, এক লাইনও গজল লিখতে পারতেন না, তাঁর খিদমতগারি করতে হল আমাকে। তবে কিনা, আল্লা রহিম, তাঁর হয়তো আমার জন্য এই ইচ্ছাই ছিল।

আমি আমার ওয়ালিদকে কখনও দেখিনি। অনেকে বলত, তাঁর সঙ্গে নাকি আমার অনেক মিল আছে। একটু বড় হওয়ার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের প্রতিচ্ছবিতে আবদুল্লা বেগ খান বাহাদুরকে খুঁজতুম। কোথায়, কোন যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন তিনি, আম্মাজান তাঁর মরা মুখটাও দেখতে পাননি। একটা মানুষ হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছিলেন, কোনও চিহ্ন ছিল না তাঁর, কেউ তো তাঁর তসবিরও এঁকে রাখেনি যে তাঁকে মনে পড়বে। জাঁহাপনা ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে তো তসবির আঁকাকে হারাম মনে করত সবাই। না হলে ভাবুন, মুঘল দরবারের মতো তসবিরখানা দুনিয়ার আর কোথাও কেউ কখনও দেখেছে? পারস্যের মতো মুসাব্বিররা আর কোথায় জন্মেছে বলুন তো? আপনি বিহ্‌জাদের নাম শুনেছেন? হাজার বছরেও অমন একজন শিল্পী জন্মান কি না সন্দেহ হয়।

হায়, আমার আম্মাজান। তাঁর জন্য একটা তসবিরও রইল না। আম্মাজানের কথা না জানলে আমার শৈশব-কৈশোরকে বুঝতে পারবেন না মান্টোভাই। অনেক পরে, আমি যখন বুড়ো হতে চলেছি, আম্মাজানের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হত, তাঁর জীবন আসলে একটা শব্দ : অপেক্ষা। অপেক্ষার রং নীল, জানেন তো? বিষাদ থেকে চুঁইয়ে পড়া নীল রং। অপেক্ষা ছাড়া তাঁর জীবনে আর কী ছিল বলুন? তাঁর নিজের কোনও সংসার ছিল না, মহল ছিল না। তিনি শুধু অপেক্ষা করে থাকতেন, কবে আমার ওয়ালিদ আসবেন। হয়তো কয়েকদিনের জন্য আসতেন তিনি। কয়েকটি রাত্রি কাটাতেন আম্মাজানের সঙ্গে। তাই আমি, ইউসুফ, ছোটি খানম পয়দা হয়েছিলুম। আমাদের মাঝে আর কেউ জন্মেছিল কি না জানি না। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয়, আবদুল্লা বেগ খান সত্যি সত্যিই আমাদের ওয়ালিদ তো? কালে মহলের দেওয়ালে কান পাতলে নাকি অনেক গোপন কিস্‌সা শোনা যেত। সে যাক্‌ গে। দিল্লি-আগ্রা মানেই তো কিস্‌সা।

আম্মাজানকে নিয়ে আমার একটা দস্তান লেখার ইচ্ছে ছিল, মান্টোভাই। কিন্তু দস্তান লেখা তো সহজ কাজ নয়। মুটে-মজুর যেমন কাজ করে, সেইভাবে লিখে যেতে হয়। আমার সে ক্ষমতা কোথায়? আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আমি দস্তম্বু লিখেছি,

এত এত খতুত্ লিখেছি, তাহলে আম্মাজানকে নিয়ে দস্তানটা লিখতে পারতুম না? হয়তো পারতুম। মাঝে মাঝে কলম নিয়ে বসতুমও, কিন্তু কী এক ক্লান্তির অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরত, আমি একটা শব্দও লিখতে পারতুম না—আমার চোখ জলে ভরে যেত—মনে হত, এই দুনিয়ায় কোনও ঘর ছিল না আমাদের—আম্মাজানের।

একদিনের কথা বলি আপনাকে। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখলুম, ঘরের এককোণে চৌকিতে বসে আছেন আমার ওয়ালিদ আর আম্মাজান। তিনি আম্মাজানের দু'হাত ধরে আছেন; তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা রক্তমাখা তলোয়ার। বাইরে থেকে ভেসে আসছিল হ্রেষাধ্বনি, ঝড়ের আওয়াজের মতো একটানা। আবদুল্লা বেগ খান বাহাদুরের বুকে মাথা রেখে আম্মাজান।

—এত ভয় পাও কেন? আব্বাজান জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—জনাব, আপনি কোথায়, কখন থাকেন, জানতে পারি না। তাই—

—আমি অনেক দূরে থাকি বিবিজান।

—কোথায়?

—যেখানে শুধু রক্ত আর রক্তের স্রোত। আব্বাজানের গলায় ক্লান্তির কুয়াশা।

—আপনি আবার কবে আসবেন জনাব?

—জানি না। যদি কখনও মরে যাই, দুনিয়ায় আমার কবর খুঁজো না বিবিজান। তোমার দিল্-এ গোর হবে আমার।

—জনাব—

—বিবিজান।

—আমাদের মহল হবে না কখনও?

—যদি শেষবার ফিরে আসি।

—কালে মহলে থাকতে আমার ভাল লাগে না, জনাব। এ তো আমার ঘর নয়। আপনার মহল হবে না?

আব্বাজান হা-হা করে হেসে উঠলেন, 'আমার মহল যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমি কখনও সেখানে যেতে পারবে না।'

—আমি যাব।

—কোথায়?

—আপনার সঙ্গে জনাব। আপনি যেখানে যাবেন, সেখানেই আমার মহল।

আমি দেখলুম, আবদুল্লা বেগ খান বাহাদুর আম্মাজানকে আরও কাছে টেনে নিলেন। আম্মাজানের প্রতি তিনি এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল মরুভূমির আকাশে যেন মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। আপনি কখনও বারোমাসা তসবির দেখেছেন, মান্টোভাই? কী সব তসবির যে এক কালে দেখেছি, কী সব কিতাব, সে-ও এক একটা তসবির। আমির হামজার দস্তানের কিতাব দিয়ে শুরু হয়েছিল—জাঁহাপনা আকবরের

সময়ে—সেই কিতাবের ছবি এঁকেছিলেন মীর সৈয়দ আলি। জাঁহাপনা হুমায়ুন তাঁকে পারস্য থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সম্রাটদের প্রাসাদের কারখানায় কত যে মুসাব্বির ছিলেন, তাঁরা সব পারস্য থেকে আসতেন। খাজা আবদুস সামাদকে বলা হত 'শিরিন কলম'। কত কত ছবিওয়ালা কিতাবের জন্ম হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, নল-দময়ন্তীর কিতাবও ছিল; আর, হ্যাঁ, কেশবদাসের রসিকপ্রিয়া। সে এক আশ্চর্য কিতাব মান্টোভাই। 'রসিকপ্রিয়া'তে কতরকম নায়িকার কথাই না বলেছেন কেশব দাস, মুসাব্বিররা একের পর এক নায়িকাদের ছবি এঁকে গেছেন। কী যে সৌন্দর্য সেই নায়িকাদের, যেন পূর্ণ চাঁদের আলো। চকোর পাখি পূর্ণিমার আলো খেয়ে বেঁচে থাকে জানেন তো? পূর্ণিমায় এক নায়িকাকে দেখে তো চকোর পাখির বেভুল অবস্থা; কোন চাঁদের আলো দেখবে সে, বুঝতেই পারে না। জাঁহাপনা ঔরঙ্গজেব সব শেষ করে দিলেন। তসবির ছিল তাঁর কাছে হারাম। মুঘল কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। শাহজাহানাবাদ ছেড়ে মুসাব্বিররা পাহাড়ি দেশের রাজাদের দরবারে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। দিল্লির তসবিরখানা শূন্য হয়ে গেল; যেটুকু খুদকুঁড়ো পড়ে ছিল, তাও ধুয়েমুছে সাফ করে দিল নাদির শাহ আর মারাঠারা, তারপর গোরারা। নাদির শাহ দিল্লি লুঠ করে চলে যাওয়ার পর মীরসাব কি লিখেছিলেন জানেন?

দিল্লি যো এক শহর থা, আলম মে ইন্তিখাব
রহতে থে মুন্তাখাব হি, জাঁহা রোজগার কি
উসকে ফলক নে লুটকে, বরবাদ কর দিয়া
হাম রহনেওয়ালে হ্যায়, উসি উজরে দিয়ার কে।

আপনি হাসছেন, মান্টোভাই? ঠিকই ধরেছেন, আপনারই মতো বদভ্যাস আমার, কথা বলতে শুরু করলে কোথায় যে চলে যাই, তাল থাকে না। আসলে কী জানেন, কথা বলতে গিয়ে মনে হয়, আরে এরা সব আসছে কোথা থেকে, তখন তো আমি দুনিয়াতেই আসিনি। আমার ভেতর থেকে তা হলে কে কথা বলছে? তাজ্জব বনে যাই মান্টোভাই, সত্যিই তাজ্জব, এক একজন মানুষের ভেতরে ক'টা মানুষ লুকিয়ে থাকে? মানুষটার জন্মের আগের মানুষরাও তার ভেতরে রয়ে যায়? কী মনে হয় জানেন? মাথার ভেতরে বহু দূর থেকে আসা কুয়াশা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বারোমাসা তসবিরের কথাই তো বলছিলুম, তাই না? এসব তসবিরের জন্ম পাহাড়ি দেশে। আমার ওয়ালিদ যেভাবে আম্মাজানের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতে সেই বারোমাসা তসবিরের কথা মনে পড়েছিল আমার। পাহাড় থেকে মুসাব্বিররা মাঝে মাঝে শাহজাহানাবাদে আসতেন তসবির বিক্রি করতে। তাঁদেরই কারো কাছে ভাদোঁর একটা তসবির দেখেছিলুম। ভাদোঁর রহস্যটা আগে আপনাকে বলতে হয় মান্টোভাই। এই প্রেমের মাসে আশিক্‌কে ছেড়ে কেউ থাকতে পারে না। বাণিজ্য করতে যারা বাইরে যেত, তারাও ভাদোঁতে বিবির কাছে ফিরে আসত। আকাশ জুড়ে

ঘন মেঘ, সারারাত গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে, লতারা হাওয়ায় কাঁপছে, তখন আশিক্‌কে ছেড়ে থাকা যায় বলুন? বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় হাওয়ায় জুঁইফুল আর চাঁপার গন্ধে এক শরীর তো অন্য শরীরকে চাইবেই। সেই তসবিরে ঘন কালো মেঘকে আদর করছিল সোনালি বিদ্যুতের রেখা, সারসের দল তৃষ্ণার্তের মতো মেঘের গভীরে উড়ে যাচ্ছে, হাওয়া সোহাগ করছে গাছেদের সঙ্গে, দোতলার বারান্দায় বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা, আপনি দেখলেই বুঝতেন, তারা আসলে রাধা ও কৃষ্ণ, বিদ্যুতের গর্জনে কপট ভয়ে রাধা জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণকে, বারান্দার নীচের আলসেয় বসে ময়ূর তাকিয়েছিল ঘনকৃষ্ণ আকাশের দিকে, আর নীচের তলায় খোলা বারান্দায় বসেছিলেন এক নারী, বেখোদ, যেন কারও অপেক্ষায়। সেই হয়তো আমার আম্মাজান। আম্মাজান যেন আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ, আবদুল্লা বেগ খান সোনালি বিদ্যুতের মতো হঠাৎই তাঁর কাছে এসেছেন। কত দীর্ঘ অপেক্ষার পর দু'জন দু'জনকে এভাবে কাছে পেতে চায় মান্টোভাই, যেমন আজান আল্লার কাছে পৌঁছতে চায়। আবদুল্লা বেগ খান সেদিন তাঁর বিবিকে খুব আদর করলেন, বিবির সঙ্গে মিলিত হলেন। আমি বসে বসে সেই খোয়াব দেখলুম। সেজন্য আমার ভিতরে এতটুকু পাপবোধ নেই মান্টোভাই; কৃষ্ণ রাধার উপগত হয়েছেন দেখলে কি কোনও পাপ হতে পারে? খোয়াবের মধ্যে একবারই ওয়ালিদকে দেখেছিলুম আমি।

আম্মাজানের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারতুম না। সারাদিন জেনানামহলে কত কাজ তাঁর; আমরা তিন ভাই-বোন তাঁর আশপাশ ঘোরাফেরা করতুম, তিনিও চোখ তুলে তাকানোর ফুরসৎ পেতেন না। ছোটি খানম অবশ্য রাতে আম্মাজানের কাছে থাকতে পারত। আমি আর ইউসুফ থাকতুম দিবানখানায়। মান্টোভাই, খুব ছোটবেলাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম, কালে মহল আমার ঘর নয়, এখানে আমরা থাকি ঠিকই, কিন্তু তিন ভাই-বোন সবার থেকে আলাদা হয়ে। ইউসুফ হয়তো এজন্যই পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছোটি খানমও বেশিদিন বাঁচেনি। শুধু আমাকে আল্লা শাস্তি দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন, দোজখের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কালো করে দিলেন। রহমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো মানুষ যেতে পারে না। কালে মহলের আসাদের জন্যই হয়তো মীর সাব লিখেছিলেন :

কেয়া মীর হ্যয় য়হী জো তেরে দরপে থা খড়া
নমনাক চশ্‌ম্ ও খুশ্‌ক্‌লব ও রংগজর্দ থা।।
(সেই কি মীর যে তোমার দরজায় দাঁড়িয়েছিল,
ভেজা চোখ, শুকনো ঠোঁট, বর্ণ ফ্যাকাশে?)

আসাদকে শেষ পর্যন্ত দু'টো খেলাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল, মান্টোভাই। পতঙ্গবাজি আর সতরঞ্জ। দু'টো খেলায় একা একা লড়তে হয়, পাশে কেউ থাকে না। দু'টো খেলাতেই চোখ এক জায়গায় আটকে রাখতে হয়—আকাশে আর সাদা-কালো

চৌখুপির মধ্যে। না হলেই আপনি হারবেন। খেলায় আমি জিতে গেছি মান্টোভাই; জীবনে শুধু পরাজয়ের পর পরাজয়।

পতঙ্গবাজি, কবুতরবাজির দিনগুলো এখনও বড় মনে পড়ে। সেই সময় আমার তুর্কি রক্তে যেন ঝড় উঠত, মান্টোভাই। কালে মহলে থাকতে আমার ভাল লাগত না; হয় আগ্রার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম, নয়তো কারুর বাড়ির ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতুম; একেক দিন বংশীধরের মহলে অনেক রাত অবধি দাবা খেলে কেটে যেত। কালে মহলের পাশেই একটা বড় হাভেলির ছাদ থেকে আমরা ঘুড়ি ওড়াতুম। আমি, ইউসুফ, কানহাইয়ালাল, আরও অনেকে ছিল, সবার নাম মনে নেই। প্রায়ই রাজা বলবন সিংয়ের সঙ্গে ঘুড়ির প্যাঁচ খেলতুম। যেদিন হেরে যেতুম, মনে হত, আরে সামনেই তো কালকের দিন, কাল বলবন সিংকে হারাবই। মান্টোভাই, আমার শরীরে তুর্কি রক্ত বইছে, রোজ রোজ কি আমি হেরে যেতে পারি? অনেক বছর পর কানহাইয়ালাল দিল্লিতে এসে একটা মসনবি দেখিয়েছিল আমাকে; আমারই লেখা—আট-ন বছর বয়সে লিখেছিলুম। পতঙ্গবাজির রহস্যের কথা। একদিন মসল্‌-ই-পতঙ্গ-ই-কাগজি, লে কে, দিল, সর রিস্তা-ই-আজাদগি...

সতরঞ্জ আমাকে পতঙ্গবাজির চেয়েও বেশি টানত। কেন জানেন? সতরঞ্জ আসলে একটা লড়াইয়ের ময়দান। এক একটা চালে যখন বংশীধরের ঘুঁটি খেতুম, রক্তের গন্ধ পেতুম আমি। এইভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আমার। একদিন চৌসর খেলাও ধরলুম। চৌসরের জুয়া। ম্যায়খানা, মহ্‌ফিল, শরাব। তবায়েফদের কোঠিতেও যেতুম। কী করব বলুন? কালে মহলে থাকতে আমার ভাল লাগত না; আম্মাজানকে কতটুকুই বা কাছে পেতুম; তিনি ছাড়া তো আমার কাছের মানুষ কেউ ছিলেন না। তাঁর জায়গা তো ছিল জেনানামহলে। মীর আজম আলির মাদ্রাসায় পড়তে যেতুম; শেখ মুয়াজ্জামও পড়াতেন আমাকে, কিন্তু সেই সব পড়াশোনা আমার ভাল লাগত না মান্টোভাই। কত আশ্চর্য সব শব্দ এসে আমার দিল্‌-এর দরজায় এসে কড়া নাড়ত; রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমি শব্দগুলোকে সাজাতুম, কারা যেন আমার ভিতরে কথা বলে উঠত, আমি চমকে উঠতুম, আরে বা—ইয়ে তো শের হ্যায়, হ্যাঁ মান্টোভাই, আমি, মির্জা গালিব, গর্ব করে বলতে পারি, ন'বছর বয়স থেকে আমি গজল লিখেছি। তারপর জনাব আবদুস সামাদ এলেন, দু'বছর কালে মহলে ছিলেন, ফারসির সৌন্দর্য ও রহস্য আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। মান্টোভাই, উর্দুতে আমি গজল লিখেছি ঠিকই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, গজলের ভাষা একমাত্র ফারসি। আর তসবির মানে তো পারস্যের মুসাব্বিরদের আঁকা তসবির।

আম্মাজান একদিন বললেন, 'মাদ্রাসায় যাস রোজ?'

—জি।

—লেখাপড়া কর আসাদ। এই মহলে তো সারা জীবন থাকতে পারবি না।

—জি।

—তুই মহল বানাবি। আমি, ইউসুফ, ছোটি খানম তোর কাছে গিয়ে থাকব।

মান্টোভাই, আপনি তো জানেন, আমার নিজের মহল কোনওদিন হয়নি। একদিন আম্মাজানকেও আগ্রায় ফেলে আমি শাহজাহানাবাদে চলে এলুম। তার মাঝে আমার নিকাহ্ হল উমরাও বেগমের সঙ্গে। আবার বন্দি হলুম, মান্টোভাই। কবরে শুয়ে বসে আমার কত বন্দিত্বের গল্পই যে শুনতে হবে আপনাদের।

চাহতে হৈঁ খূবরুয়োঁ-কো অসদ;
আপ-কী সূরৎ তো দেখা চাহীয়ে।।
(সুন্দর মুখ ভালবাসেন, আসাদ;
নিজের মুখখানিও তো একবার দেখা চাই।।)

কিস্‌সাটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যাক ভাইসব। কবরে শুয়ে বসে আমাদের দু'জনের বকবক শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগারই কথা। খামোখা লাগাতার আমাদের কথা শুনবেনই বা কেন আপনারা? আপনাদের জীবনেও তো কিস্‌সা কিছু কম নেই, যদি কখনও বলতে চান, আমরা দু'জন মন দিয়ে শুনব, খোদার কসম বলছি। তবে এখন, মির্জাসাব ও আমাকে বাদ দিয়ে অন্য একটা কিস্‌সাই শোনাই আপনাদের। ভারী পাথরের মতো মির্জাসাবের জীবনের বাইরে এই হাল্কা-ফুল্কা কিস্‌সাটা আপনাদের ভালই লাগবে, কিস্‌সার মধ্যে মাঝে মাঝে হাওয়া খেলাতে হয়; যারা তা পারে না, তাদের আমি কিস্‌সা লেখকই বলি না। এদের লেখা পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে, যেন একটা কয়েদখানায় ঢুকিয়ে ওরা হুকুমত চালাতে থাকে। আরে বাবা, শব্দ তো এক-একটা ফুল, তার রং-গন্ধই যদি না পাওয়া যায়, তবে সে তো মরা এক একটা হরফ। হাফিজসাব বলেছিলেন না,

রৌনকে অহাদ শবাবস্ত
দিগর বোস্তারাঁ
মী রসদ মুয়্‌দা-এ-গুল
বুলবুলে খুশ ইলহাঁরা।

(বাগানে বাগানে বনে উপবনে
নওজোয়ানের কাল এসে গেছে;
পেল সুকণ্ঠ বুলবুল আজ
সেই সুখবর গোলাপের কাছে)

বুলবুলের গানই যদি গোলাপের কাছে না পৌঁছয়, তা হলে পাতার পর পাতা শব্দ লেখা কেন? ভাষার ভিতরে খুবই অভিমান আছে, ভাইসব।

সেই দরবেশের কথা মনে আছে তো? যমুনা নদী থেকে উঠে তিনি আসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যেমন শামসউদ্দিন তাবরিজি একদিন জালালুদ্দিন রুমির জীবনে এসেছিলেন, আর তারপর তো রুমি এক অন্য জীবনের ভিতরে ঢুকে গেলেন। এই শামস এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, ভাইসব। এক দিব্যোন্মাদ পুরুষ। তাঁর একটা কিস্‌সা জিভের ডগায় এসে গেছে, তাই বলেই ফেলি। ভাববেন না, মির্জাসাবের জীবনের সঙ্গে এই কিস্‌সার কোনও সম্পর্ক নেই। মির্জাসাবের জীবনটা যে কত কিস্‌সায় জড়িয়ে আছে, আমি ভেবে কূলকিনারা পাই না। শামসের কিস্‌সাটা শুনলে বুঝতে পারবেন, মির্জাসাব এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছেন।

ওয়াউদ্দিন কিরমানি ছিলেন এক সুফি শেখ। তিনি মনে করতেন, এই যে দুনিয়া—এই সৃষ্টির সব খুবসুরতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাকে। একদিন এক হ্রদের জলে চাঁদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন তিনি। শামস তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'জলের দিকে কেন তাকিয়ে আছেন শেখ?'

—চাঁদের ছায়া দেখছি।

—কেন, আপনার ঘাড়ে কি ব্যথা হয়েছে?

—না।

—তা হলে আশমানে তাকালেই তো চাঁদকে দেখা যায়। নাকি, আপনার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে? সোজা জিনিসকে তো সোজা ভাবেই দেখতে হয়।

শামসের কথা শুনে শেখ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।

—হুজুর, আপনি আমার পীর, আপনার পায়ে আমাকে ঠাঁই দিন।

শামস বললেন, 'আমার মুনাসিব হওয়ার তাকত্‌ আপনার নেই।'

—আছে হুজুর। আপনার পথে আমাকে নিয়ে চলুন।

শামস হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'তা হলে দারু নিয়ে আসুন। বাগদাদের বাজারে বসে আমরা একসঙ্গে বসে দারু খাব।'

ইসলামে তো দারু হারাম। শেখ বাজারে বসে দারু খেলে লোকে কী বলবে? তাঁর মান-ইজ্জত ধুলোয় লুটোবে। শেখ মিন মিন করে বললেন, 'তা কী করে হয় পীরজাদা?'

শামস চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনি কখনও আমার মুনাসিব হতে পারবেন না।

আল্লার দরবারে পৌঁছনোর ক্ষমতাই আপনার নেই। আমি তাকে খুঁজছি যে আলাওয়াজিদের কাছে পৌঁছতে পারবে।'

জালালউদ্দিন রুমির মধ্যেই সেই মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন শামস। আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই, জামা মসজিদের সামনে বসে শামসের সঙ্গে মির্জাসাব দারু পান করে চলেছেন। তাঁদের মুখোমুখি বসে আছেন মওলা রুমি। নতুন একটা মসনবি লিখছেন তিনি, তাঁর প্রেমিক শামস আর মির্জাসাবকে নিয়ে। এইসব যদি সত্যিই হত, ভাবুন একবার, দুনিয়াটা যেন তা হলে জামেয়ার হয়ে যেত।

না, না, ওইরকম অবিশ্বাসী চোখে তাকাবেন না আমার দিকে ভাইজানেরা। আমি কিছু ভুলিনি। আমার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। দেখুন, যে-দুনিয়ায় আমি বড় হয়েছি, দুই দেশের মোহাজিরদের যে-স্রোত আমি দেখেছি, সেখানে স্মৃতির নূরই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এত মোহাজির—এত উদ্বাস্তু—আমার কি মনে হয় জানেন, বিংশ শতাব্দীর নাম দেওয়া উচিত উদ্বাস্তুদের শতাব্দী। নাম হারিয়ে যাওয়া, নাম বদলে যাওয়ার শতাব্দী। আমার 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পটা আপনারা কি কেউ পড়েছেন? গল্পটা লেখার জন্য অশ্লীলতার দায়ে আমার বিচার হয়েছিল লাহোরের কোর্টে। কী বলছেন? 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পটা শুনতে চান? কিন্তু আজ তো আমরা অন্য একটা কিস্‌সা শুরু করেছি ভাইসব। 'ঠাণ্ডা গোস্ত'-এর কথা না হয় পরে একদিন বলা যাবে। আরে, এই দুনিয়াটা হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কত কত শতাব্দী তো কবরেই থাকতে হবে আমাদের, 'ঠাণ্ডা গোস্ত'-এর কিস্‌সা বলার ফুরসত একদিন পাওয়া যাবেই।

হ্যাঁ, সেই দরবেশ এসে আসাদের হাতে একটা আয়না তুলে দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? আয়নায় আসাদের আম্মাজানের পশমিনার মতো নীল আকাশে ফুটে উঠেছিল পাখিদের উড়ালের নকশা। পাখিরা চলেছে তাদের রাজা সিমুর্গের খোঁজে। এ এক গভীর কিস্‌সা ভাইসব। আসাদকে দেওয়া দরবেশের আয়নায় কেন যে এই কিস্‌সার ছবি দেখা গিয়েছিল, তা একমাত্র খোদাই জানেন। আল-খালিক কখন কী পাঠাবেন, তা আমরা কতটুকু জানতে পারি? আমার কী মনে হয় জানেন, এই যে জানাতে পারি না, তাই এত এত শব্দ লিখে যেতে পারি। দস্তানের এই এক মজা, তুমি লেখো, লিখে যাও, কোন চুতিয়া সমালোচক কী বলল, তাতে তোমার কী এসে যায়? দস্তান তো দস্তানই; তারা একা একা বাঁচে, একা একা মরে যায়।

মাফ করবেন ভাইসব, কথা বলতে বলতে আমি আসলে একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ি। সারা জীবন আমি কত যে জীবিত আর মৃতদের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা না বলতে পারলে মনে হত, আমাকে কেউ পাথরচাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। ইসমত আমার কথা শুনে খুব হাসত, ইসমতকে চেনেন তো, ইসমত চুঘতাই, ওকে কাছে পেলেই কথার নেশায় পেয়ে বসত আমাকে, ইসমতও খুব সুন্দর কথা বলতে পারত, চশমার আড়ালে ওর চোখ দু'টো ছিল যেন হ্রদের মতো। আমি সেই হ্রদের ভিতরে

ডুবে কথা বলে যেতাম শুধু, ইসমত বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকত, আর আমার ইচ্ছে হত, ওর চোখ দু'টো আমি একদিন গিলে খাব। ইসমতকে অবশ্য একথা বলা হয়নি কখনও। তা হলে আমার মাথার চুলগুলো খাবলে তুলে ফেলত ও।

দরবেশ বাবার দেওয়া আয়নার ভেতরে পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল মনে আছে তো? ফরিদউদ্দিন আতরের লেখা কিস্‌সা ফুটে উঠল দরবেশের আয়নায়। কী আশ্চর্য ভাবুন! আয়নার ভিতরে কিস্‌সা। আর সব কিস্‌সাই তো এক একটা আয়না, তাই না? আয়না আর কিস্‌সা কখন যে একাকার হয়ে যায়, আমি তো কোনওদিন বুঝতে পারিনি। যাক্‌গে। কিন্তু ওই পাখিদের কিস্‌সাটা বলার আগে বাবা আতরসাবের কথা একটু যে বলে নিতেই হবে। আল্লার দূত তিনি, সুফি সাধক, আবার কিস্‌সা লেখাতেও তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র আবদুল-রহমান জামির সঙ্গেই হয়তো কিছুটা তুলনা করা যায়। আতরসাবের জন্ম হয়েছিল পারস্যের নিশাপুরে, সে প্রায় আটশো বছর আগের কথা। দারুখানার মালিক ছিলেন তিনি; সেখানে ওষুধ তৈরি হত, আবার নানারকমের আতরও। বেশ জমিয়েই ব্যবসা করছিলেন ফরিদউদ্দিন। একদিন একজন দরবেশ এসে হাজির তাঁর দারুখানায়। কত বড় দোকান, তিনি তো হাঁ করে দেখতে লাগলেন সব কিছু, তারপর আতরসাবের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এভাবে কেউ যদি নাগাড়ে কারুর দিকে তাকিয়ে থাকে, তবে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। আতরসাব জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে এভাবে দেখছেন কেন হুজুর?'

দরবেশ হাসলেন।—আমি ভাবছিলাম, এত ধনসম্পদ ফেলে তুমি কীভাবে গোরে যাবে?

আতরসাব একটু রেগে গিয়েই বললেন, 'আপনার মতোই আমারও এন্তেকাল আসবে। আলাদা আর কী হবে?'

—কিন্তু আমার এই ছেঁড়া আলখাল্লা আর ভিক্ষাপাত্র ছাড়া কিছু নেই ভাইজান। তোমার সম্পত্তি তো অনেক। তা হলে আমার মতো করে কী করে মরবে তুমি?

—আপনার মতোই মরব আমি।

তারপর কী হল জানেন ভাইসব? ভিক্ষাপাত্রটি মাথার বালিশ করে শুয়ে পড়লেন দরবেশ। চোখ বুজে বললেন, 'বিসমিল্লাহ আর-রহমান আর-রহিম।' তাঁর জিকির শেষ হতেই জিব্রাইল এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। আতরসাব পাথরের মতো দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য মৃত্যু দেখলেন। তারপর চিরদিনের জন্য দারুখানা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর দীন্‌-এর পথে।

দরবেশ বাবার দেওয়া আয়নায় আসাদ যে পাখিদের দেখেছিল, তাদের জন্ম হয়েছিল আতরসাবের কিস্‌সায়। অনেক বখোয়াশ আপনারা এতক্ষণ ধরে সহ্য করলেন, এবার তা হলে কিস্‌সাটাই হোক। তবে কী জানেন, এক কিস্‌সা থেকে আর এক কিস্‌সায় ঢুকে পড়তে আমার খুব ভাল লাগে; কিস্‌সাগুলোর ভিতরে আমি

কখনও দরবেশ হয়ে যাই, কখনও আতরসাব, কখনও কাল্লু। আর মির্জাসাব? তিনি তো আমার ভেতরেই ঢুকে বসে আছেন। মির্জাসাবের সেই শেরটা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন :

হুয়ী মুদ্দৎ কেহ্ গালিব মর গয়া, পর য়াদ আতা হৈ
বোহ্ হরেক বাত-পর কহনা কেহ্ 'য়ুঁ হোতা তো কেয়া হোতা।'
(কতকাল হল গালিব মারা গেছে, তবু মনে পড়ে
কথায়-কথায় তার বলা—'এমন যদি হত তা হলে কী হত?')

সাদাত হাসান মান্টো যদি মির্জা আসাদুল্লা খান গালিব হয়ে যায়, তা হলে কী হত? শফিয়া বেগমকে একবার কথাটা বলেছিলাম; বেগম কী বলেছিল জানেন, ভাইসব? সারা জীবন আপনি অন্যের চরিত্র হয়ে বেঁচে থাকলেন মান্টোসাব, কবে আপনি নিজেকে দেখাবেন? শফিয়া বেগম তো বুঝত না, মান্টো অনেক চরিত্রের মধ্যেই বেঁচে থাকে। সেই চরিত্ররা ছাড়া মান্টো বলে আসলে কেউ নেই। শফিয়া বেগম একবার আমাকে বলেছিল, 'মান্টোসাব, এইসব কিস্‌সা লিখে কী পেলেন আপনি? কেউ কিছু দেবে না। তার চেয়ে একটা দোকান খুলুন।'

—আর আমার মাথার ভেতরের দোকানটা নিয়ে কী করব বেগম?

—মাথার ভেতরে দোকান?

—কত কিস্‌সার দোকান। বেগম, ওই দোকানটা বন্ধ হয়ে গেলে মান্টো মরে যাবে।

গোস্তাকি মাফ করবেন ভাইজানেরা, কথায় কথায় আমি অনেক দূর চলে এসেছি। আপনাদের চোখ জ্বলজ্বল করছে, আমি জানি, কিস্‌সাটা শোনার জন্যই আপনারা অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু আপনাদের মান্টোভাইকে একটু ক্ষমাঘেন্না করে দেখবেন। স্মৃতি, বুঝলেন ভাইসব, কত যে স্মৃতি, কথা বলতে বলতে আমাকে শুধু পিছনের দিকে টানতে থাকে, আমি সেই টান এড়াতে পারি না; যদি পারতাম, পাকিস্তানে অমন বেওয়ারিশ কুকুরের মতো মরতে হত না আমাকে।

কিন্তু এবার পাখিদের কথা হোক। এই দুনিয়ার সবচেয়ে কোমল প্রাণের কথা। কী জানেন, আমাদের হৃদয় এক একটা পাখি, কখনও খাঁচায় বন্দি থাকে, কখনও উড়ে যায় আশমানে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, একটা চড়ুই পাখিকে বুকে জড়িয়ে সারা রাত ঘুমিয়ে থাকব, কিন্তু ওদের তো ধরা যায় না, বড় ছটফটে, এই বসে আছে তো, এই উড়ে যাচ্ছে, এই কিচমিচ করে ঝগড়া করছে তো, পরক্ষণেই উদাস হয়ে কোথায় তাকিয়ে আছে। পাখিরা এইরকম, ওরা শুধু জানে, দুনিয়াটা আসলে বেড়ানোর জায়গা, ঘোরো, ফেরো, ওড়ো, তারপর অজান্তেই একদিন মরে যাও।

একদিন পাখিরা সব একসঙ্গে এসে মজলিসে বসেছে। কেন? তাদের কোনও জাঁহাপনা নেই, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। সব খোঁজের জন্যই তো একজন মুর্শিদ

লাগে। কে হবে মুর্শিদ? সবাই মিলে ঠিক করল, হোদহোদই হতে পারে তাদের মুর্শিদ। হোদহোদ ছিল সোলয়মানের প্রিয় পাখি। শেবা নগরী থেকে রানি বিলকিসের খবর সে নিয়ে আসত। হোদহোদই তো তাই একমাত্র মুর্শিদ হতে পারে; সে-ই তো তাদের রাজার কাছে পাখিদের পৌঁছে দিতে পারে। হোদহোদের মাথায় পালকের কুঞ্জবন, তার ঠোঁটে বিসমিল্লা। হোদহোদ পাখিদের বলল, 'দেখো, রাজার খোঁজে তোমরা যেতেই পারো, কিন্তু সে-পথ বড় দীর্ঘ আর কঠিন। সেই পথে যেতে হলে এতদিনের জীবন ঝেড়েমুছে ফেলতে হবে; যদি পারো, সবাইকে ছেড়ে যদি ভালবাসতে পারো, তবেই আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারি।'

শুনে তো পাখিদের মাথায় হাত; এক এক পাখির, এক এক অজুহাত, না, না, এত দীর্ঘ যাত্রায় তারা যেতে পারবে না। বুলবুল তো প্রথমেই বলল, 'আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার ভালবাসার গোপন কথা একমাত্র গোলাপই বোঝে। তাকে ছেড়ে কোথায় যাব? গোলাপের ভালবাসাতেই আমার এই জীবনটা কেটে যাবে।' হোদহোদ তাকে বলল, 'তুমি বাইরের খুবসুরতির দিকে তাকিয়ে আছ বুলবুল। গোলাপ যে হাসে, তা তোমার জন্য নয়। মনে হয়, তোমার দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর ঝরে যায়। তোমার দিকে তাকিয়ে কেন হাসে জানো? ও যে একটু পরেই ঝরে যাবে, তুমি তা বোঝ না বলে।'

—কিন্তু গুলবাহার ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মুর্শিদ।

—তা হলে একটা কিস্‌সা বলি শোনো। হোদহোদ কয়েকবার ডানা ঝাপটে স্থির হয়ে বসে। বিড়বিড় করে বলে, 'বিসমিল্লা, আর-রহমান, আর-রহিম। খোদা, আমাকে ভাষা দাও, কিস্‌সাটা যেন বুলবুলকে ঠিকঠিক বলতে পারি।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে চিৎকার করে বলে, 'শোন, বুলবুল, কিস্‌সাটা শুনে রাখ। তারপর তোর যা মনে হয় করিস।'

—গোলাপ যখন ফোটে, তার কাছে কোনও কিস্‌সার দাম নেই পীরসাব।

—তা তো বটেই। তবু শোনই না। কিস্‌সা শুনলে তো আর তোর পেট গরম হবে না।

—বলো, তবে শুনি। বুলবুল কিচকিচ করে ওঠে।

—এক নবাবের ছিল এক কন্যে। কী যে তার রূপ, বলে বোঝানো যাবে না। তারা না-ফোটা রাতের আকাশের মতো কালো চুল, সারা শরীরে যেন মৃগনাভির গন্ধ, আর সে কী চাউনি, যখন কথা বলত, মনে হত চিনির চেয়েও সে মিষ্টি। আর তার গায়ের রং? পদ্মরাগমণিকেও হার মানাত। সত্যি বলতে কী, কন্যেকে যে দেখত, সে-ই প্রেমে পড়ে যেত। খোদার মর্জি তো বোঝা দায়, একদিন এক দরবেশ কন্যেকে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। দরবেশ তখন রুটি খাচ্ছিল, কন্যের খুবসুরতি দেখে তার হাত থেকে রুটি

পড়ে গেল। তাই দেখে কন্যে মুচকি হাসল। ওই হাসিই হল কাল, দরবেশ একেবারে দিবানা হয়ে গেল।

—তারপর?

—সে নবাবের হাভেলির সামনে পড়ে রইল সাত বছর। রাস্তার কুকুর বেড়ালদের সঙ্গে দিন কাটাত। সাত বছর ধরে দরবেশ কেঁদেই চলল তার আশিককে পাওয়ার জন্য। তখন কন্যের পাহারাদাররা ঠিক করল, দরবেশকে খুন করতে হবে।

—খুন করল?

—দরবেশকে খুন করা হবে জেনে কন্যের মনে মায়া হল। সে একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে এসে দরবেশকে বলল, 'আচ্ছা মানুষ তো তুমি। আমি নবাবের মেয়ে, আমাকে নিকে করার কথা তুমি ভাব কী করে? দ্যাখো, এখান থেকে চলে যাও, আর কখনও এসো না। কাল এখানে থাকলে তুমি মারা পড়বে।'

—দরবেশ কী বলল? বুলবুল অধীর হয়ে ডানা ঝাপটায়।

—দরবেশ বলল, 'তোমাকে যেদিন থেকে দেখেছি, আমার কাছে জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে গেছে। কেউ আমাকে মারতে এলেও আর ভয় পাব না। দুনিয়ার কোনও ক্ষমতা আমাকে তোমার হাভেলির দরজা থেকে সরাতে পারবে না। তোমার পাহারাদাররা তো আমাকে মারতে চায়, তাই না? তাই হবে। কিন্তু তার আগে ধাঁধাটার উত্তর দেবে আমাকে?'

—কোন ধাঁধা?

—তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে কেন?

—তুমি সত্যিই একটা উজবুক। তোমাকে দেখে দয়া হয়েছিল, রুটিটা পর্যন্ত হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, হাসব না তো কী?

—তারপর? বুলবুল চোখ ছলছল করে তাকায়।

হোদহোদ বলে, 'তোমার গোলাপ হচ্ছে ওই কন্যের মতো। শুধু বাইরের খুবসুরতি।'

এইভাবে নানারকম কিস্‌সা শুনিয়ে পাখিদের না যাওয়ার অজুহাত উড়িয়ে দিল হোদহোদ। তখন পাখিরা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের জাঁহাপনার জন্যে তো তহ্‌ফা নিয়ে যাওয়া উচিত। আপনিই বলুন মুর্শিদ, জাঁহাপনা সিমুর্গের জন্য আমরা কী নিয়ে যাব?'

—জিকির। আত্মার জিকির। জাঁহাপনার দরবারে সব আছে। কিন্তু তিনি চান সেই আত্মা, যা আগুনে পুড়ে পুড়ে, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে শুদ্ধ হয়েছে।

কত বছর ধরে যে পাখিরা উড়ে চলল হোদহোদের পেছনে। সাত-সাতটা উপত্যকা পেরিয়ে যেতে হল তাদের। পথে কত পাখি মারা পড়ল, কত পাখির আর ওড়বার ক্ষমতাই রইল না। শেষ পর্যন্ত কাফ পাহাড়ে জাঁহাপনা সিমুর্গের প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছল তিরিশটি পাখি। দারোয়ানরা তো কিছুতেই পাখিদের ঢুকতে দেবে না। কিন্তু

এত পথ পেরিয়ে এসে তারা এতটাই শান্ত হয়েছে, দারোয়ানের গালাগালিতেও তারা কিছু মনে করল না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল। শেষে জাঁহাপনার নিজের নোকর এসে তাদের দরবারে নিয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। যেদিকে তারা তাকায়, দেখতে পায় নিজেদেরই, তিরিশটি পাখি, একে অপরের দিকে তাকিয়ে হতবাক। জাঁহাপনা সিমুর্গ তা হলে কোথায়? ভাইসব, ফারসিতে সিমুর্গ মানে তিরিশটি পাখি। তারা এবার তাদের আত্মার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের জাঁহাপনা সিমুর্গ। পাখিরা তখন গেয়ে উঠল, 'তেরে নাম সে জি লু, তেরে নাম সে মর যাউঁ...'।

কহতে হ্যাঁয় আগে থা বুতোঁ মেঁ রহম্
হায় খুদা জানীয়ে য়হ্ কবকী বাত।।
(লোকে বলে আগের দিনে প্রতিমাদের বুকে দয়ামায়া ছিল,
হায়, ঈশ্বরই জানেন ওঁরা কবেকার কথা বলছেন।।)

মান্টোভাই, কালে মহলের জীবনে যতই নিঃসঙ্গতা থাক না কেন, তেরো বছর বয়স পর্যন্ত আগ্রা আমাকে যা দিয়েছে, তা আমি সারা জীবনেও ভুলিনি। আগ্রার হাওয়া আর জল ছিল আমার আত্মার অংশ। আগ্রার প্রতিটি পথে এখনও আমার স্মৃতির মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে। যে-ইশ্‌ক আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তার খেলাঘর তো ছিল আগ্রাই। প্রতিটি বাগানের ফুল থেকে ঝরে পড়ত অনাস্বাদিত ভালবাসা, প্রতিটি গাছের পাতা আমাকে যেন আদর করতে চাইত। সত্যি বলতে কী, মান্টোভাই, আগ্রা আমার ভেতরে নীল ঝকঝকে আশমান ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই আশমানে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠত এক ফলক আরা। সে এক [illegible] নিঃশেষ হাসির ঝরনা। আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম, সেই নক্ষত্রের হার আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলে ফেলত। সে কী রঙের বাহার। সম্রাট আকবরের তসবিরখানার ছবিতেই সেইসব রং দেখা যেত। কে সে? পুরা জিন্দেগি গুজর গিয়া মান্টোভাই, আমি তবু তাকে চিনতে পারলুম না, কখনও হাত দিয়ে ছুঁতে পারলুম না। একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমি চহরবাগের সামনের রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছিলুম। হঠাৎ দেখি,

এক বেগম সাহেবা বসে আছেন বাগানে, আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। হাফিজসাব বোধ হয় তার জন্যই লিখেছিলেন,

অগর আঁ তুর্ক-এ-শিরাযী
বদস্ত আরদ দিল-এ-মারা
বখাল-এ হিন্দবশ বখ্‌শম
সমরকন্দ ব বুখারারা
(গালে-কালো-তিল সেই সুন্দরী
স্বহস্তে ছুঁলে হৃদয় আমার,
বোখারা তো ছার, সমরখন্দ্‌ও
খুশি হয়ে তাকে দেব উপহার।)

তাঁকে দেখে আমার ঘোর লেগে গেল, আমি বাগানে ঢুকে, তার পিছনে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, 'ফলক আরা।'

বেগম সাহেবা ফিরেও তাকালেন না। শুধু মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর কোঁকড়ানো চুল, যেন পানপাত্র ভেঙে ছড়িয়ে গেল সুরা, মান্টোভাই। আহা হা, মীরসাবের সেই শের মনে পড়ে গেল বেগম সাহেবার কেশবাহার দেখে,

উসকে কাকুলকী পহেলী কহো তুম বুঝে মীর,
'কেয়া হ্যয় জঞ্জীর নহী, দম নহী, মার নহী।।
(তাঁর কোঁকড়ানো চুলের ধাঁধা কিছু বুঝতে পারলে, মীর?
কী এটা? এ তো শিকল নয়, সাপ নয়, ফাঁদ নয়।।)

আমি আবার ডাকলুম, 'ফলক আরা।'

এবার বেগম সাহেবা ফিরে তাকালেন। তাঁর হাসির কথা বলব, এমন সাধ্য আমার নেই। সেই হাসি দেখে আমার আবার হাফিজসাবের শের মনে পড়ল :

বাদা-এ-গুলরংগ ব তল্‌খ্‌ ব
অজব খশ্‌খ্‌বারে সুবুক
নুক্লে অয লালে নিগার ব
নুক্লে অয য়াকুতে জাম।
(পেয়ালায় দাও হালকা মধুর
নেশায় মাতানো রসাস্বাদন
ধারালো তীব্র সেই শরাবের,
যার রং ঠিক ফুলেরই মতন।)

—তুম কৌন হো? তিনি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকলেন।

আমি পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলুম। তিনিও আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'ফলক আরা কৌন হ্যয়?'

তাঁর খুবসুরতির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলব? কোনও কথাই তো খুঁজে পাই না। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'ফলক আরা কৌন হ্যায়?'

এবার আমি সাহস করে বলে ফেললুম, 'জানি না, জি।'

—এই নাম তুমি কোথায় পেলে?

—আগ্রার আকাশে, জি।

বেগম সাহেবা হেসে উঠলেন।—ইনশাল্লা, আগ্রার আকাশে এই নাম লেখা আছে বুঝি'

—জি।

—তুমি দেখেছ?

—জি।

—কব দেখা?

—হর রোজ।

—মীরসাবের একটা শের জানো?

—বলুন, জি।

—ফির কুছ এক দিল-কো বেকার রী হৈ
সীনহ্ জুয়া-এ জ়খমকারী হৈ।।

মান্টোভাই, সত্যিই তো, আমার হৃদয় তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি তাকেই তো খুঁজতে বেরিয়েছি, যার আঘাতে আবারও কলিজা ফেটে যাবে আমার। কিন্তু তাকে না খুঁজেই বা কোথায় যাব আমি? আমার জীবনে নিজের কানও মহল নেই, ঘর তো আমাকে খুঁজতেই হবে, কিন্তু ঘর খুঁজতে গিয়ে আমি দোজখের পর দোজখ পার হয়ে গেছি, সে-পথ এক দীর্ঘ শীতের রাত, আর রহমান-আর রহিম, আমি নীরবে চিৎকার করেছি, আমাকে বাঁচাও, আল-বশীর, আমাকে একবার খোশনসিব করো।

তারপর, কী হল জানেন, মান্টোভাই? তিনি আমার হাত ধরে চহরবাগের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে একটা খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খাঁচার ভেতরে উড়ছে অনেক ময়নাপাখি। বেগম সাহেবা আমার দিকে তাকালেন। কীরকম তাকানো জানেন, মান্টোভাই? সেই দৃষ্টিতে যেন লেখা ছিল হাফিজসাবের শের :

অলা ঐ আহূ-এ-বহ্শী কুজাঈ
মরা বা তূস্ত্ বিস্য়ার আশ্নাঈ।
(হে উদভ্রান্ত বাউল হরিণ,
তুমি আছ কোনখানে কোন বনে!
তোমার আমার ভাব-ভালবাসা
সেই কবে থেকে! পড়ে না কি মনে?)

এই শের শোনার পর, মান্টোভাই, কোনও সুন্দরীর দিকে যদি কেউ চোখ তুলে

তাকাতে পারে, তা হলে আমি বলব, ইশ্‌ক কাকে বলে, সে জানে না। এরপর আপনি শুধু সেই বেগমের কদমবুশি করে বলতে পারেন :

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ ঐসী কেহ্ হর খ্বাহিশ-পে দম নিক্‌লে,
বহুৎ নিকলে মেরে অর্‌মান, ফির-ভী কম নিকলে।।

হ্যাঁ, মান্টোভাই, আমার শত-শত বাসনা এমনই যে প্রত্যেকটার জন্য প্রাণ যায়-যায়, অনেক বাসনা আমার পূর্ণ হল, তবুও কম হল। এই যে কম হল, এ-জন্যই তো আমরা বেঁচে থাকি, তাই না? অপেক্ষা করি, তবু পাত্র পূর্ণ হয় না। আমি তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গাইলুম,

ভরা থাক, ভরা থাক, স্মৃতিসুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।

কোথা থেকে ভেসে এল এই গান আমি জানি না, মান্টোভাই। আগে তো কখনও শুনিনি। কোথা থেকে যে কী আসে! কোন অতীত থেকে, কত দূরের ভবিষ্যৎ থেকে? অতীত ভবিষ্যতকে ধারণ করে থাকে বলেই কি আশমান এত জ্বলজ্বল করে? আমাদের জীবন পোড়া অঙ্গারের মতো ধিকিধিকি জ্বলে। এইভাবে জ্বলতে বড় কষ্ট হয় না মান্টোভাই?

খাঁচার ভেতরে ময়নারা কিচমিচ করতে করতে উড়ছিল। বেগম সাহেবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানেও একজন ফলক আরা আছে। দেখি চিনতে পার কি না।'

আমি পাখিদের দেখতে থাকলুম। একসময় কী যে হল, আমি একটা ময়নার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে উঠলুম, 'ওই তো ফলক আরা।'

ময়নাটা দাঁড়ের ওপর বসেছিল।

বেগম সাহেবা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কী করে চিনলে? আগে কখনও দেখেছ?'

—না।

—তা হলে?

—ও খুব কাঁপছে।

—কে?

—ফলক আরা।

—কেন? বেগম সাহেবার গলায় নীল রং ফুটে উঠল, আমি বুঝতে পারলুম।

—ও কারও সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—কার সঙ্গে?

সত্যিই তো, কার সঙ্গে? আমি কি জানতুম, মান্টোভাই? যেন একটা পানপাত্র, সেভাবেই দু'হাতে বেগম সাহেবা আমার মুখ চেপে ধরলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি কে?'

মান্টোভাই, আমি তাঁকে বলতে পারিনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম, কিন্তু মনে মনে বলেছি,

হাফিজ ইঁ হালে অজব
বা কে গুফ্‌ত কি মা
বুলবুলাঁনেম কি দর
মোসমে গুল খামোশেম।

সত্যিই, হাফিজসাব যেন আমার কথাই বলে গেছেন, কাকে বলি এই কথা, বড় শোচনীয় হাল আমার, কুসুমের মাস এসেছে, আর বুলবুলের মুখে কথা ফোটে না।

—আমার নামও যে ফলক আরা, তুমি কী করে জানলে? যেন আতরের শিশি থেকে মৃদু গন্ধের মতো বেগম সাহেবার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

—জানি না।

—কী করে জানলে, বলো।

—তুমি ফলক আরা—তুমি—তুমিই ফলক আরা। আর কেউ নেই।

আমার খোয়াব ভেঙে গেল, মান্টোভাই। এসব একেবারে সত্যি কথা নয়। আমার খোয়াব। একদিন এইরকম একটা খোয়াব দেখেছিলুম। আমার জীবনের কথা শুনতে চাইলে, এসব খোয়াবের কথাও তো শুনতে হবে। যেমন একদিন খোয়াব দেখেছিলুম, ওস্তাদ তানসেন আমার হাত ধরে ফতেপুর সিক্রির একের পর এক ঘর পেরিয়ে যাচ্ছেন, তারপর একটা ঘরে পৌঁছে আমাকে বসতে বললেন। সেই ঘরে সেদিন বর্ষা নামল; আর আমি ঘামে ভিজে ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে ডাকলুম, 'কাল্লু—কাহাঁ গিয়া—কাল্লু বেটা—'।

কাল্লু সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির।—জি হুজুর।

আমি বিড়বিড় করে বললুম, 'তার্জুমান আল-আশক্‌'।

—হুজুর।

—হম হ্যায় তার্জুমান আল-আশক্‌।

—জি, হুজুর।

—বার বার হুজুর বলিস কেন?

—কেয়া চাহতে হ্যায় আপ?

—আজ সকালে একটু খাওয়াবি কাল্লু?

—দারু?

—জি হুজুর। আমি হেসে বলি।

কাল্লু আমার পা চেপে ধরে।—মাফ কিজিয়ে হুজুর। সুবহ মে—

—দে না একটু কাল্লু।

—কেন?

—খোয়াব দেখি।

—কী খোয়াব হুজুর?

—ফলক আরা।

—ময়না দেখবেন? কত ময়না দেখতে চান, আমার সঙ্গে চলুন।

—আমি আমার ফলক আরাকে দেখব কাল্লু, ও তুই বুঝবি না।

কে ফলক আরা, মান্টোভাই? আমার জীবনের একটা খোয়াব। আগ্রার আকাশে তাকে দেখা যেত। আমি জানতুম, কোনওদিন তাকে আমি পাব না। আমার ফলক ময়নাকে। সে কোনও না কোনও খাঁচায় বন্দি থেকে যাবে। মীরসাব একবার লিখেছিলেন, জিজ্ঞেস করলুম, কতদিন ফুটবে এই গোলাপ; গোলাপকুঁড়ি আমার প্রশ্ন শুনে এক চিলতে হেসেছিল, কিছুই বলেনি। তো, সেই দাঁড়ের ময়না, ফলক আরাকে দেখে আমি চিনব না? আগ্রার রাতের আকাশে রোজ তার হাসি দেখতে দেখতে মনে হত, কত জন্ম থেকে আমি ওকে চিনি। আর কাল্লু আমাকে দেখাবে ময়না? ছোঃ! সব ময়নাই কি ফলক আরা হয়, মান্টোভাই, বলুন?

আমি আজও ভাবি, কোথা থেকে আমার খোয়াবে বেগম সাহেবা এসেছিলেন, যাঁর নাম ফলক আরা? এমন বেগমকে তো আমি কখনও দেখিনি। বেগমরা যে পর্দার আড়ালেই ঢাকা থাকতেন, সে তো আর নতুন করে বলবার কথা নয়। তা হলে কে এই বেগম সাহেবা?

এরপর মোতি মহলে একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। সেদিন তাঁকে আর আমি ডাকিনি। দূর থেকে বসে দেখছিলুম। তিনি একবার কানের দুল খুলছেন, আবার পরছেন; নাকছাবিটা খুলে রুপোলি ঔজ্জ্বল্যের দিকে তাকিয়ে আছেন, তারপর পরে নিলেন, আবার খুললেন, আবার দেখলেন; মান্টোভাই, নাকছাবিতে কি কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, না হলে তিনি অতবার ধরে নাকছাবিটা খুলছিলেন কেন; আমার খুব কৌতূহল হল, কী আছে ওই নাকছাবিতে? আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

তিনি চমকে উঠে বললেন, 'ফির তুম?'

—বেগম সাহেবা—

—তুম কিঁউ মেরে পিছে পড় রহি হুঁ?

—নাকছাবিটা—

—কেয়া হ্যায় ইসমে?

—আপনি তা হলে বার বার দেখছেন কেন?

বেগম সাহেবা হা-হা করে হেসে উঠলেন।—খোয়াব কতবার দেখতে ইচ্ছে করে জানো?

—কতবার?

—জন্নত অউর জাহান্নম তক।

—উও তো একই হ্যায় বেগমসাহেবা।

—বোলো ফলক আরা।

তাঁর কণ্ঠস্বরে আমি কুয়াশায় ঢেকে যাই, মান্টোভাই।

—জি?

—আমার নাম ফলক আরা। তুমি জানো না?

বেগম সাহেবা আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। আমার দুই হাতের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কী করো?'

—কিছু না।

—মানে?

—কালে মহলে ঘুরে বেড়াই। আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি।

—আর কী করো? তিনি হাসলেন।

—পতঙ্গবাজি, সতরঞ্জ, শরাব—

—অউর জেনানা?

আমি হেসে ফেললুম। মান্টোভাই, জেনানার শরীর কী, ততদিনে আমি ছানবিন করে দেখে নিয়েছি। এক এক শরীর যেন এক এক নকশার পশমিনা। আগ্রার এক তবায়েফের সঙ্গে বেশ আশনাইও হয়েছিল আমার। সে যেন হুসন-এ লব্-বাম, একেবারে ভোরের মতো তাজা। পাকা আতাফল দেখেছেন? আমি ছিলুম সেইরকম। একা একা ফল যেভাবে পেকে যায়, আমি সেভাবেই পেকে গিয়েছিলুম। সারা শরীরে ভোমরার গুনগুন শুনতে পেতুম।

—জি। আমি মাথা নিচু করে বললুম।

—কেয়া, জি?

—জি ইস্তেমাল কিয়া।

সে এক গুলফাম দস্তান, মান্টোভাই। তিনি আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। যে-সব কবুতর আমি মহলের ছাদে ছাদে দেখেছি, তাদের চেয়েও আজিব দুই কবুতর তিনি আমাকে দেখালেন। আমি সেই কবুতরদের ঠোঁটে মুখ ঘযতে লাগলুম, তাদের পালকে হাত বুলিয়ে দিতে কী আরাম, কী আরাম। মান্টোভাই, আমার কী মনে হয়েছিল জানেন? এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর...।

—একবার বোলো—। তিনি আমার কানে জিভ বুলোতে বুলোতে বলছিলেন, 'ফির একবার বোলো মিএগ্রা—'

মান্টোভাই, তার ঘাড়ে, কোঁকড়ানো চুলের গভীরে লুকিয়ে ছিল একটি তিল। তিল মানে বিন্দু, আপনি তো জানেনই। নোক্তা থেকেই তো সৃষ্টির শুরুয়াৎ। আমি সেদিন শুধু সেই বিন্দুমাত্রকেই খাচ্ছিলুম; সেই বিন্দু আমার ভেতরে এমন এক খিদে জিইয়ে রেখে গেল, এ-জীবনে আর মিটল না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য নিগার—ছবি—যার মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে গিয়েছিলুম।

এ সব সত্যি, একবারও ভাববেন না, মান্টোভাই, আল্লা রহিম, আমি কবুল করছি, আমার জীবনে কোনও সত্যি নেই, সব কিস্‌সা, খোয়াব, দস্তান। আমি তো তখন অনেক ছোট, বেগম সাহেবার বুকে মুখ চেপে বলেছিলাম, 'মুঝে ছোড়কে মৎ যাইয়ে।'

—কিঁউ?

—আপ মেরি জান—

—মুঝে জান না কহো মেরি জান।

—কেয়া বলুঁ?

—ফলক আরা।

মান্টোভাই, আগ্রা ছাড়ার সময় সেই নক্ষত্রের হার আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। ফলক আরা শুধু একটা নাম হয়ে বেঁচে রইল। বিন্দু, নোক্তা, শুরুয়াৎ। এমন এক শুরুয়াৎ, মান্টোভাই, তার ভেতরে শেষও লুকিয়ে আছে।
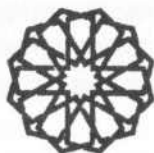
দু'সপ্তাহ তবসুমের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আমার এইরকম হয়, একটা কাজ শুরু করার পর হঠাৎই উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। আমার স্ত্রী অতসী বলে, কোনও কাজে লেগে থাকার মতো মনের জোর আমার নেই। হবেও বা। কিন্তু কাকে বলে মনের জোর? একটা কাজ শেষ করার জন্য জরুরি প্রত্যয়? কিন্তু এই প্রত্যয় কি শেষ পর্যন্ত মানুষের কোনও কাজে লাগে? ভাবতে গেলে, আমার তো মহাভারতের যুদ্ধের পরবর্তী মৃতদেহ-শিবা-শকুনে ভরা শ্মশানের কথাই মনে পড়ে। অনুশাসন পর্বের সেই কাহিনি ফিরে ফিরে আসে। চক্রাকার এই গতিপথ। রাজশেখর বসুর বই খুলে আমি আবারও গল্পটি পড়ি।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুপ্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে আবৃত ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত দেখে আমি অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে নিন্দিত কর্ম করেছি তার ফলে আমাদের গতি কী প্রকার হবে? দুর্যোধনকে ভাগ্যবান মনে করি, তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

যদি আমাদের প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন যাতে পরলোকে পাপমুক্ত হ'তে পারি। ভীষ্ম বললেন, মানুষের আত্মা বিধাতার অধীন, তাকে পাপপুণ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তার হেতু অতি সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—

গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তাঁর পুত্র সর্পের দংশনে হতচেতন হয়। অর্জুনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ ক'রে গৌতমীর কাছে এনে বললে, এই সর্পাধম আপনার পুত্রহন্তা, বলুন একে কি ক'রে বধ করব; একে অগ্নিতে ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব? গৌতমী বললেন, অর্জুনক, তুমি নির্বোধ, এই সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পুত্র বেঁচে উঠবে না, একে ছেড়ে দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা করে কে অনন্ত নরকে যাবে?

ব্যাধ বললে, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্থ মানুষের উপযুক্ত, কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ত্বনা হয় না, যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝে তারা শত্রুনাশ ক'রেই শোকমুক্ত হয় এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে বধ করে আপনি শোকমুক্ত হ'ন। গৌতমী বললেন, যারা আমার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়তির বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আমি সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়। তুমি এই সর্পকে ক্ষমা ক'রে মুক্তি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত।

ব্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গৌতমী সর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন সেই সর্প মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ অর্জুনক, আমার কি দোষ? আমি পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন করিনি, মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে করেছি; যদি পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুরই হয়েছে। ব্যাধ বললে, অন্যের বশবর্তী হলেও তুমি এই পাপকার্যের কারণ, সেজন্য বধযোগ্য। সর্প বললে, কেবল আমিই কারণ নই, বহু কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য।

সর্প ও ব্যাধ যখন এইরূপ বাদানুবাদ করছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আমি কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমাকে প্রেরণ করেছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই কালের অধীন, অতএব তুমি আমার ওপর দোষারোপ করতে পারো না। সর্প বললে, আপনাকে আমি দোষী বা নির্দোষ বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংশন করেছি—এই কথাই বলেছি; দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মুক্তি দাও। ব্যাধ বললে, তুমি

যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই বালকের বিনাশের কারণ, তোমাদের ধিক।

এমন সময় স্বয়ং কাল আবির্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কর্মফলেই বিনষ্ট হয়েছে। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে ইচ্ছানুসারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইরূপ আত্মকৃত কর্মের ফল পায়। এই শিশু নিজেই তার বিনাশের কারণ।

গৌতমী বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজে কর্মফলে পুত্রহীনা হয়েছি। অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমিও সর্পকে মুক্তি দাও। গৌতমী এইরূপ বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দিলে, গৌতমীও শোকশূন্য হলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুর্যোধনের কর্মের জন্য তাঁদের মরণ হয়নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ করো।

আজ আমি বুঝতে পারি, আমাদের সব কাজ নিয়তি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি সাপ লেজ থেকে নিজেকেই খেয়ে চলেছে। তার এই আত্মভক্ষণের, নিরাকরণের যেন শেষ নেই। আমি শুধু এক অদৃশ্যের আজ্ঞা পালন করছি। মনের জোর বলে যদি কিছু থাকে, তা কি কোনও কাজে আসে? এক গল্প থেকে আরেক গল্পের দিকে আমরা ঝরা পাতার মতো ভেসে যাই।

এরই মাঝে তবসুমের ফোন আসে।—কী ব্যাপার, জনাব? আপনার খুসবুটুকুও যে আর পাওয়া যায় না।

—এই—। কিছু না বলতে পেরে আমি হাসি।

—মান্টোর উপন্যাস কি এভাবেই পড়ে থাকবে?

—কেন?

—আপনার তো আর অনুবাদ করার গরজই নেই দেখছি।

—না—না—। আবার শুরু করতে হবে।

—কী হয়েছে আপনার?

—কিছু না।

তবসুমের হাসি আমার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—এই এক আপনার 'কিছু না'। মাঝে মাঝে কী যে 'কিছু না'-তে পেয়ে বসে আপনাকে। 'কিছু না'-টা কী বলুন তো?

—একটা সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে থাকা।

—মানে? এখনই তবসুমের চোখ দু'টো নেচে উঠল, আমি দেখতে পাই। আর এই নেচে ওঠায় সঙ্গত করছে তার দুই চোখে আঁকা সুরমার রেখাবিন্যাস।

—সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে আছেন তো আছেনই। তারপর কখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করল অক্ষর, ছবি।

—সেই অক্ষর কবে ফুটবে?

—আপনি বাশোর কবিতা পড়েছেন?

—কে বাশো?

—সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানি হাইকু কবি। বাশো লিখেছিলেন, বুনো হাঁসের মতো আমরা মেঘের ভেতরে হারিয়ে যাব।

—আপনার সঙ্গে আমি তাল রাখতে পারব না জনাব। এই অনুবাদ শেষ হবে না, আমি বুঝতেই পারছি।

—কেন?

—আপনি এখন সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে আছেন। কবে যে অক্ষর ফুটবে, ছবি দেখা দেবে, কে জানে!

—গালিবের সেই গজলটা একবার বলবেন?

—কোনটা?

—ওই যে—হুঁ গরমী-এ-নিশাত-এ—

—হুঁ গরমী-এ-নিশাত-এ তসব্বুর-সে নগ্‌মা সংজ
ম্যায় অন্দলীব্‌-এ গুল্‌শন্‌-এ না-আফ্‌রীদ হু।
তা গানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা বুলবুলের বাগান কবে রচিত হবে?

—সে যেদিন ডাকবে।

—কে?

—এবার শীতের মাঝেই যে বসন্তের হাওয়া নিয়ে এল।

তবসুম হাসে।—কী ব্যাপার জনাব? কারোর প্রেমে পড়লেন নাকি?

—আ নিকলতা হ্যয় কভু হঁসতা, তো হ্যয় বাগ্‌ ও বহার
উসকী আমদমেঁ হ্যয় সারী ফস্‌লেঁ আনে কী তরহ্‌।

—ও বাবা। মীর-এ ডুবে আছেন নাকি?

—উর্দু গজলে মীর সবচেয়ে সেনসুয়াস, আপনার মনে হয় না? গালিবে মেধার দ্যুতি, আর মীর যেন রক্তমাখা হৃদয়টাকে হাতে তুলে দেন। গালিব কোথাও নিজেকে আড়াল করেন। ঘোমটার আড়ালের সৌন্দর্যই তাঁকে টানে।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আড়াল করার শিল্পটা গালিবের কাছেই শিখতে হয়। মীরের বুকে আপনি হাত রাখতে পারেন, ছুরিও বসিয়ে দিতে পারেন। গালিব অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা আয়না। সে শুধু প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে। কী অদ্ভুত দেখুন, এই আয়না। সব কিছুর ওপর মানুষ তার ছাপ ফেলে রেখে যেতে পারে। কিন্তু আয়নার সামনে আপনি যতক্ষণ, ততক্ষণই, তারপর আপনি হারিয়ে

যাবেন। গালিব সেইরকম একটা আয়না। আয়নার সামনে থেকে সরে গেলেই আপনি আর কোথাও নেই।

—আমি ভাবিনি তবসুম।

—কী? তবসুমের কণ্ঠস্বরে একটি পাখি উড়ে যায়।

—গালিবকে আপনার মতো করে তো আমি ভাবিনি।

—আপনি তো আপনার মতোই ভাববেন।

—না তবসুম। আমি এই ধরনের ইন্ডিভিজুয়ালিটিতে আর বিশ্বাস করি না। ধর সুফী গল্পে, জেন গল্পে, এস্কিমোদের গল্পে যে-ভাবনা রয়ে গেছে, আমরা সেভাবে ভাবব না কেন? আমরা ব্যাসদেবের মতো কেন ভাবতে পারব না? কেন মীরাবাঈ-এর মতো ভাবত পারব না? আমাদের যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, 'সব ছাপিয়ে যাওয়ার পর আর সংজ্ঞা থাকে না।'

—আপনার কী হয়েছে? তবসুমের কথা শান্ত হাওয়ার মতো আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এইরকম হাওয়া এক সময় মিনিয়েচার পেন্টিং-এ সাইপ্রেস গাছের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেত।

—কেন?

—আপনি কি কোনও ব্যাপারে ডিস্টার্বড?

—না। অনেক নতুন-পুরনো মানুষেরা রোজ এসে আমাকে ঘিরে ফেলছে তবসুম। আমি তাদের কথা শুনতে চাই। কিন্তু আমার হাতে সময় বড় কম।

—মানে?

—বাদ দিন। আমরা আবার কাল থেকে কাজ শুরু করব।

—এড়িয়ে যাবেন না প্লিজ। আপনার হাতে সময় বড় কম—এর মানে কী?

—তা হলে একটা কবিতা শোনাই আপনাকে।

—কার?

—সেই বুড়ো নাবিকের। শুনুন—

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়<br>
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি<br>
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,<br>
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,<br>
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে<br>
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে<br>
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে<br>
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,<br>
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, খেয়ানৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।

দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনাল রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

—আপনি কি ক্লান্ত?

—না। আমি খুব আনন্দে আছি তবসুম। নিজেকে হারিয়ে ফেলার আনন্দ। এই যে উপন্যাসটা অনুবাদ করতে করতে আমি একটা খণ্ডহরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। কত ভাঙা চুড়ির টুকরো, কত টুটাফাটা মসলিন, কিতাবের ছেঁড়া পাতা, শুকিয়ে যাওয়া আতরের ভেতরে ডুবে যাচ্ছি। উপন্যাস লেখা তো এভাবে হারিয়ে যাওয়ার জন্যই।

সেই আয়নার ভিতরে আমরা—আমি ও তবসুম—সাদাত হাসান মান্টোর পাণ্ডুলিপির সামনে বসে আছি। এই পাণ্ডুলিপি আমাদের এক গভীর সমস্যায় ফেলেছে। মান্টোর পাণ্ডুলিপিতে গালিব ও ফলক আরার কাহিনী ছয় নম্বর অধ্যায়ে। সাত নম্বর অধ্যায় মান্টো লেখেননি। কয়েকটি পয়েন্ট লিখে মান্টো লিখেছেন, 'পরে লেখা যাবে। এই অধ্যায় লেখার কোনও আগ্রহ নেই এখন।' সত্যিই মান্টোকে বোঝা যায় না। যেন পাঠক নয়, নিজে পড়বেন বলেই লিখে যাচ্ছেন। এরপরেই মান্টো চলে গেছেন আট নম্বর অধ্যায়ে, যেখানে মির্জা গালিব দিল্লি এসে পৌঁছচ্ছেন। কিন্তু সাত নম্বর অধ্যায়টি আর কখনও লেখেননি মান্টো। তা হলে আমরা কী করব?

—সাত নম্বরটা কেন লেখেননি বলুন তো? তবসুম পাণ্ডুলিপির ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে।

—হয়তো তখন লেখার মন ছিল না। প্রচুর হুইস্কি গিলে বেসামাল ছিলেন। কিন্তু পয়েন্টগুলো কী নোট করেছিলেন?

—মির্জার বিয়ে নিয়ে।

—পড়ুন শুনি।

—লিখেছেন, নবাব ইলাহি বক্স খানের মেয়ে উমরাও বেগমের সঙ্গে বিয়ে হল

১৮১০-এ। গালিবের বয়স তখন তেরো, আর উমরাও-এর এগারো। ইলাহি বক্স হচ্ছেন ঝিরকা ও লোহারুর নবাব আহমদ বক্স খানের ভাই।

—তারপর?

—ইলাহি বক্সও গজল লিখতেন। তাঁর তখল্লুশ ছিল মারুফ। দিল্লির অভিজাতদের একজন তিনি।

—তারপর?

—মির্জা এই নিকাহ মেনে নিতে পারেননি। আবার সেই বড়লোকের বাড়িতে বন্দি হওয়া। মির্জা তো নিজেই বলেছেন, আমার পায়ে শেকল পরানো হল। জস্ দওয়াম্ অওর পাওঁ কী বেড়ি। মান্টোসাব লিখেছেন, এইসব বিয়ে-ফিয়ে নিয়ে একটা অধ্যায় লেখার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু জমিয়ে তো লেখা যেত। অভিজাত মুসলিম পরিবারের বিয়ে। হাতি, ঘোড়া, পাল্কি, রোশনচৌকি, নাচা-গানা, বাঈ-শরাব। আর মান্টোসাব কিছুই লিখলেন না?

—আর কিছু লিখেছেন?

—না। ...ওঁ হ্যাঁ, একটা গল্প লেখা আছে।

—গল্প?

—শ্বশুর মারুফকে নিয়ে।

—বলুন, শুনি।

—বেশ মজার গল্প। মারুফসাব একদিন মির্জাকে তাঁর বংশলতিকা নকল করে দিতে বললেন। মির্জা নকল করে দিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথমজনের পর তৃতীয়জন, তারপর পঞ্চম—এইভাবে। দ্বিতীয়, চতুর্থ পুরুষদের বাদ দিয়ে গেলেন। মারুফসাব তো নকল দেখে রেগে কাঁই। এ কী করেছ তুমি মিঞা? মির্জা শান্ত গলায় বললেন, 'বংশলতিকা তো একটা মই ছাড়া কিছু নয়। এই মই বেয়েই তো আল্লার কাছে পৌঁছতে হয়। মাঝে মাঝে দু'একটা ধাপ বাদ গেলে ক্ষতি কী? আপনাকে একটু কষ্ট করে উঠতে হবে, এই আর কী!'

—তারপর?

—মারুফসাব রেগে বংশলতিকার নকলটা ছিঁড়ে ফেললেন। মির্জাও তখন মুচকি হাসছেন।

—মান্টোসাব আর কিছু লেখেননি?

—না।

—পাগল। চ্যাপ্টারটা লিখতেই পারতেন।

—কেন?

—নবাবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। কত স্কোপ ছিল বলুন তো? বাঙালি নভেলিস্টরা পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। চার পাতা জুড়ে উমরাও বেগমের সৌন্দর্যের বর্ণনা। তারপর

দশ পাতা বিয়ের ডেসক্রিপশন। ইতিহাস থেকে ডিটেল খুঁজে খুঁজে এনে একেবারে ট্রু টু দ্য লাইফ বর্ণনা। ভাবা যায়? পাঠককে গেলানোর মশলামুড়ি। মান্টোসাব এটাই লিখলেন না। প্রথম দেখার প্রেম থাকত—বড় বড় ডায়লগ লিখতে পারতেন, যাতে—

—আপনি বিশ্বাস করেন?

—কী?

—এইভাবে লেখা?

—তবসুম—

সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তার দৃষ্টিপথে হাজার সারস উড়ে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আয়নায় তবসুমের প্রতিচ্ছবি দেখি।

—উপন্যাস কেন লেখা হয় তবসুম?

—কেন?

—অন্ধকারের ভেতরে অনেক কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

—কাদের কণ্ঠস্বর?

—যাদের আমরা চিনি না।

—তার মানে, নভেলিস্ট তার চরিত্রদের চেনে না?

—না।

—মান্টোসাব তা হলে কেন মির্জাকে নিয়ে লিখেছিলেন?

—মির্জাকে চিনতেন না বলে।

—উপন্যাস লেখার পর চিনতে পারবেন?

—না।

—তা হলে মান্টোসাবের উপন্যাস কোথায় পৌঁছবে?

—কোথাও না।

—আর মির্জা?

—তিনিও থাকবেন না। একটা ছায়া পড়ে থাকবে।

—কার?

—অনেকের। যারা আর কেউ নেই। তবসুম, আমি এই জন্য আর উপন্যাস লিখতে পারি না। অনেক কঠিন জিনিস আমি সহ্য করতে পারি। একটা ছায়া পড়ে আছে, আমি তাকে বইতে পারি না। চলুন, পরের চ্যাপ্টার থেকে শুরু করা যাক।

—আজ থাক। চলুন, আজ একটু কফি খেয়ে আসা যাক।

আমি সেই আয়নায় তবসুমকে দেখি। কফি খেতে যাওয়ার কথা বলে সে কেমন নাচের ছন্দে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ডানার মতো মেলে দেয়।—কফি ভালবাসেন তো?

—হুঁ।

—আপনাকে আজ একটা স্পেশাল কফি খাওয়াব।

—মির্জাকে ছেড়ে কফি খেতে যাওয়াটা কি ঠিক? একটু সুরাপান করলেই কি ওনার প্রতি সম্মান জানানো হত না? আমি হেসে বলি।

—সে তো আমার সঙ্গে হওয়ার নয়, জনাব।

আমি এমন কফি শপে কখনও আসিনি। এ শহরে নতুন গজিয়ে ওঠা মুশায়েরা যেন। তবে এখানে হাফিজসাব বলতে পারবেন না,

সুবহস্ত সাকিয়া কদহ
পুর শরাব কুন
দোরে ফলক দিরেগ
নদাবদ শিতাবকুন।
(চেয়ে দেখো, সাকি, রাত্রি পোহায়
দাও মদিরায় ভরে এ পেয়ালা
ঊর্ধ্বে সমানে দে দৌড় দে দৌড়
তাড়াতাড়ি করো, বয়ে যায় বেলা)

এখানে বসা যায়, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হওয়া যায়। কফিশপ জুড়ে হাল্কা ভেসে বেড়ায় জোন বেজ বা কখনও কৈলাস খের; কখনও বেজে ওঠে এক 'ফেরারি মন'-এর গান। তবসুম যে কফির অর্ডার দেয় তার নাম ব্ল্যাক কফি উইথ হানি। কাচের দীর্ঘ পাত্রে সেই গভীর বাদামি তরল আসে। একটু চুমুক দিতেই আমার মুখের ভিতর যেন কোমল এক পাখির উড়াল। তার ডানায় ক্যারামেলের সৌরভ।

—কেমন? তবসুম চোখ নাচিয়ে বলে।

—য়ে ন হী হমারি কিসমৎ কে বিসাল-এ-য়ার হোতা
অগর অওর জীতে রহ্‌তে য়হী ইন্তজার হোতা।

—আই ব্বাস। কফির টেস্ট এইরকম না কি?

—আপনি লক্ষ করেছেন তবসুম—

—কী?

—কফি যত ফুরিয়ে আসছে, সুধাসাগর যেন ফুলেফেঁপে উঠছে।

—তাই?

—হুঁ।

—মির্জার কেমন লাগত এই কফি?

—গালিব মিঞা হয়তো লিখতেন—

গালিব ছুটি শরাব পর অব্ ভি কভি কভি
পীতা হুঁ রোজ-এ-অবর ব শব্-এ-মাহতাব মে।

কিন্তু আজ আমাকে এই অমৃতের স্বাদের কাছে কেন নিয়ে এলেন তবসুম?

তবসুম অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'কাল থেকে আমরা সত্যি সত্যিই দোজখে ঢুকব জনাব।'

—তাই?

—পরের চ্যাপ্টারে গালিব দিল্লিতে আসছেন। সে এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। মান্টোসাব কী করে লিখলেন? দিল্লিতে এসে মির্জার প্রথম কথাবার্তা হল মৃতদের সঙ্গে। মৃতেরা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পড়তে পড়তে আমি কেঁদে ফেলেছি। বড় নিষ্ঠুর মান্টোসাব।

আমি মুখের ভিতর ক্যারামেলের স্বাদ নিয়ে খেলতে থাকি।

শিকবহ্-এ আব্‌লহ্ অভী সে মীর?
হ্যায় পেয়ারে হুনূজ় দিল্লী দূর।।
(ফোসকা পড়ার কান্না এখন থেকেই মীর?
বন্ধু, দিল্লি এখনও যে অনেক দূর।।)

মান্টোভাই, শাহজাহানাবাদে আমি ঢুকেছিলুম বদনসিব আত্মাদের বলা কথা শুনতে শুনতে। সবার মুখে মুখে তো দিল্লিই, কিন্তু শাহজাহানাবাদ নামটা উচ্চারণ করতে আমার ভাল লাগত; এক একটা নামে কেমন খুশবু জড়িয়ে থাকে না? জাহাঙ্গিরী আতরের মতো খুশবু। নাম শোনেননি বুঝি? এসব আর ক'জনই বা জানে, বলুন? জাঁহাপনা জাহাঙ্গির দাবি করতেন, তাঁর রাজত্বেই আতরের জন্ম। এসব হচ্ছে রাজা-বাদশাদের খেয়াল। তবে সেই আতর কে বানিয়েছিল জানেন? বেগম নূরজাহানের মা অসমত বেগম। জাহাঙ্গিরের খুব আফসোস ছিল যে তাঁর ওয়ালিদ জাঁহাপনা আকবর এই জাহাঙ্গিরী আতরের সুবাস নিয়ে কবরে যেতে পারেননি। জাঁহাপনা আকবর। মান্টোসাব, তিনি যেন জন্নতের খাস দরওয়াজা। কত দূর সত্যি জানি না, দিল্লির খাস আদমিদের কাছেই শুনেছি, অসমত বেগম গোলাপজল বানানোর সময় জলের ওপর যে ফেনা তৈরি হত, তার ওপর ঢালা হত গরম গোলাপ জল; এরপর সেই ফেনা একটু একটু করে জমানো হত আতরদানে; আর এভাবেই জন্ম জাহাঙ্গিরী আতরের। এই আতরের এক ফোঁটা হাতে লাগালে নাকি হাজারো

মানুষের মজলিসে জেগে উঠত গুলবাগ। এমন সে সুগন্ধ, যার টানে নাকি হারিয়ে যাওয়া আত্মারাও ফিরে আসত।

আমিও যেন এক হারানো আত্মার মতো দিল্লি এসেছিলুম। নাকি একটা খোয়াবের মতো, কি মনে হয় আপনাদের? আমার জীবনটা কী, বলুন? একটা খোয়াবই, তবু আমি তো গায়েগতরে একটা মানুষই ছিলুম। না কী? আমি আল্লার খোয়াব—বদখোয়াব। কিন্তু আল্লা কেন এই বদখোয়াব দেখেছিলেন জানেন? তিনি জানতেন, আমি এই দুনিয়াতে সেই কবিতা নিয়ে আসব, তার ভেতর দিয়ে একের পর এক আয়নামহল পেরিয়ে যাবেন আপনারা। আর দেখবেন, কীভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে আপনাদের হকিকত। আমার অস্তিত্ব ধুলোর মতো আয়নামহলের মেঝেতে ছড়িয়ে থাকবে। সেই ধুলো, যা দিয়ে আল্লা প্রথম মানুষ তৈরি করেছিলেন।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এসে গেল। আচ্ছা মান্টোভাই, আমি তো আপনাদের শাহজাহানাবাদে আসার কথা বলছিলুম? হ্যাঁ, তাই তো বলছিলুম, না হলে আর খুশবুর কথা আসবে কেন? শব্দের জগৎ বড় মজার জানেন তো? এই যে বলেছিলুম না, যে, বদনসিব আত্মাদের বলা কথা শুনতে শুনতে আমি শাহজাহানাবাদে এসেছিলুম, তাইতেই তো এসে গেল খুশবুর কথা। আত্মারা হল গিয়ে এক-একটা খুশবু। কিন্তু এই খুশবু তো আপনি কোনও মুঘল জাঁহাপনার খুশবুখানায় পাবেন না। এ হল গিয়ে আল্লার তৈরি খুশবু। প্রতিটি আত্মাকে খোদাতালা নতুন নতুন খুশবু দেন। কোনও কোনও খুশবু এই দুনিয়ার তৈরি আতরের সঙ্গে মিলে যায়। তাই সেই খুশবু এই দুনিয়াতেও থাকে, আবার জন্নতেও থাকে। কী হল বলুন তো মান্টোভাই, শাহজাহানাবাদে আসার কথা বলতে গিয়ে কেন বার বার আগ্রার দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে এই কবরে? মীরসাব তো কবেই বলে গেছেন :

বসীয়ৎ মীরনে মুঝকো য়হী কী
কে্হ সব কুছ হোনা তু, আশিক নহ্ হোনা।।

প্রেমের কথা যখন উঠলই, আর মীরসাবই যখন বলে গেছেন, আর যা কিছু হতে চাও হও, কিন্তু প্রেমিক কিছুতেই নয়, মীরসাবের দিবানা হওয়ার কথাটাই না হয় বলে নিই। হয়তো ভুলে যাব, আর কখনও বলাই হবে না, তাই গোস্তাকি মাফ করবেন, আমি মীরসাবের যন্ত্রণার কথাটা এই ফুরসতে বলে নিতে চাই। দোজখের আত্মবন্ধুরা আমার, এভাবেই চলুক না আমাদের কথাবার্তা; এগিয়ে-পিছিয়ে-হারিয়ে গিয়ে, যেন কোনও ঢেউয়ের পর আর এক ঢেউ আসছে, বুঝতেই পারা যায় না। কী হল, আপনারা সবাই উঠে বসলেন কেন? কেমন এক অন্ধকার ছায়া নেমে এসেছে আপনাদের মুখে। কী হয়েছে, মান্টোভাই? আমি কি কোনও ভুল করলুম? একের পর এক ভুল করতে করতেই তো কেটে গেল আমার জীবন। উমরাও বেগম একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'মির্জাসাব, আপ কওন হ্যায়?'

—মতলব?

—আপনি কে?

আমি হা হা করে হেসে উঠেছিলুম।—নোক্তা, বেগম, ম্যায় তো এক নোক্তা হুঁ।

—নোক্তা?

নোক্তা—বিন্দু—কখন, কোথায় বসবে, কখন কোনদিকে সেই বিন্দু থেকে রেখা টানা হবে, তা কে জানে বলুন, মান্টোভাই? কিন্তু আপনারা এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন সবাই? কী ভুল করেছি আমি? আচ্ছা, আমাকে একটু থামতে দিন, ভেবে দেখি, আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারব, কোথায় আমার ভুল, একটু সময় দিন...

হ্যাঁ, শাহজাহানাবাদে আসার কথাই আমাকে আগে বলে নিতে হবে। ওরা সবাই আমার সঙ্গে কথা বলে গেল এখনই, সেই আত্মারা, দিল্লিতে আসবার দিন ওরাই তো আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। ওরা বলল, বুরবাক, আমাদের কথা আগে না বললে, তোমার কথা কেউ শুনবে না।

—কেন?

—মাটির গভীরের কথাই তো মানুষ আগে শুনতে চায়। আর আমরা সেই গভীরে—

—তোমরা কোথায় শুয়ে আছ?

—দিল্লির মাটির নীচে। আমাদের কথা আগে বলো। এই শহরটা তো আমাদের রক্তমাংসের ভিতের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। মীরসাবের কথা কে না জানে? আমরা তো বেখবর, আমাদের কথা তুমি না বললে, কে বলবে? শাহজাহানাবাদে তুমি যেদিন এলে, সেদিন কারা কথা বলেছিল তোমার সঙ্গে? কে চিনত তোমাকে আসাদ? আমরাই তো কথা বলেছিলাম।

আমি এখন তাদের কথা বলছি, আপনারা দিমাক জাগিয়ে রেখে শুনুন। এ এক শহর আফশোসের কিস্‌সা—দুঃখে তার জন্ম, দুঃখেই তার মৃত্যু। সেই মৃত্যু আমি দেখেছি, মান্টোভাই, সেসব কথা আমি বুঁদ বুঁদ বলে যাব। বলে যেতেই হবে। এই শহরই তো আমার শরীর। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, চাঁদনি চক ছিল আমার মেরুদণ্ড, কিলা-ই-মুয়াল্লা আমার এই বেঢপ মাথাটা, আর দিল্‌? সে তো জামা মসজিদ, এটুকু তো বোঝেন? কিলা-ই-মুয়াল্লার মুখ পশ্চিমে, মক্কার দিকে। চাঁদনি চক পশ্চিমে, আবার জামা মসজিদের মুখও পশ্চিমে। শহরের দরজাগুলো হল বিশ্বরূপ। চারদিকের দরজাগুলো তো আসলে জন্নতের চার দরওয়াজা। জামা মসজিদের সামনে বসেই আমি প্রথম খাজা মইনুদ্দিন চিস্‌তির কিস্‌সা শুনেছিলুম। খাজা কী বলেছিলেন জানেন? 'আয়নায় কার মুখ? আমার আত্মার পটে কোন সৌন্দর্য এসে ধরা দিল? এই

মহাবিশ্বকে কে সাজিয়েছে। প্রতিটি অণুতে প্রতিবিম্বিত কে? প্রতিটি বালুকণাকে আলোয় ভরিয়ে দেয় কে? আমি তো মাংস দেখি, মজ্জার মধ্যে লুকিয়ে আছে কে? আত্মার শান্তির গান গায় কে? সে নিজেকেই দেখে নিজেকেই ভালবাসে। কে সে? কে সে?' তিনি গরিব নওয়াজ। ভুখা মানুষের বন্ধু।

শাহজাহানাবাদে যেদিন এলুম, তারাই এসে আমার সঙ্গে কথা বলল, যাদের কথা ইতিহাসে লেখা হয় না, মান্টোভাই। শাহজাহানাবাদ গড়ার জন্য তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। তা হলে কিস্‌সাটা একটু গোড়া থেকেই বলি। তবে কোনটা গোড়া, আর কোনটা আগা, তা আমি আজও বুঝতে পারি না। আমি সেই বুড়ো গাছটা, জানেন তো, হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে, যার গায়ে কেউ কুঠার দিয়েও আঘাত করে না, আসলে গাছটা যে কারুর কোনও কাজে আসে না। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। মনে হয়, আমার মাথাটাই শিকড়, আকাশ ফুঁড়ে কোথায় চলে গেছে, না না, জন্নতের দিকে তো নয়ই, আর আমার পা ডুবে আছে নরকের আগুনে। তবু আল্লাকে তো আমি বলেছিলুম :

> অব জ়ফা-সে ভী হৈঁ মহরূম, আল্লাহ আল্লাহ;
> ইসঁ কদর্ দুশমন্-এ অর্বাব-এ বফা হো জানা।।
> (এখন নিষ্ঠুরতা থেকেও বঞ্চিত আমি—হায় ঈশ্বর
> একনিষ্ঠ প্রেমিকের সঙ্গে এতখানি শত্রুতা।)

যে কথা হচ্ছিল। আপনারা তো জানেন, শাহজাহানাবাদের আগে মুঘলদের রাজধানী ছিল আকবরাবাদে, মানে আগ্রায়। জাঁহাপনা আকবর আগ্রায় এসেছিলেন ১৫৫৮ সালে। এসব ইতিহাসের কথা শুনতে কি আপনাদের ভাল লাগবে? সেজন্য তো ইতিহাসের কত কিতাব রয়েছে। সম্রাট বাহাদুর শাহ আমাকে তো মুঘলদের ইতিহাস লেখবার বরাত দিয়েছিলেন; প্রথম খণ্ডের পর আমি আর লিখতে পারিনি। আমি কিস্‌সা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি মান্টোভাই, ইতিহাস কি আমাকে জন্নতের পথ দেখাতে পারবে? বরং ১৮৫৭ থেকে ইতিহাসের জাহান্নমের আগুনে পুড়ে পুড়েই আমরা শেষ হয়ে গেলুম।

তবু আগ্রা নিয়ে দু'একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। তার পথের ধুলোয় ধুলোয় মিশে আছে আমার প্রথম জীবনের প্রেম। যমুনার স্রোত আমার সঙ্গে কথা বলত। আমি ঘুরে বেড়াতুম চহরবাগে, মোতি মহলে। জাফর খানের সমাধিসৌধের পাশেই ছিল বুলন্দবাগ; সে এক আশ্চর্য বাগান। সত্যি বলতে কী মান্টোভাই, আগ্রা ছিল আসলে বাগানের শহর। আর কত যে সরাই ছিল। তাজমহলের পাশের সরাইয়ের নাম ছিল তাজ-ই-মোকাম আমাদের আড্ডাবাজির ঠেক। বলতে পারেন তাজ-ই-মোকাম ছিল আমাদের কিস্‌সাবাগ। একজন এই গল্প বলছে তো আরেকজন অন্য গল্প; আর আকাশ জুড়ে পতঙ্গবাজির মতো হাসির হল্লা। মীর সওদার কিস্‌সাটা আমি ওখানেই

প্রথম শুনেছিলাম। সওদাকে আমি কখনও বড় কবি মনে করিনি, তবে কসীদা লেখায় তাঁর আবদারির কথা স্বীকার করতেই হয়। বড় মজার একটা কথা বলতেন সওদা, এসব লোকমুখেই শোনা, আমি তো তাঁকে দেখিনি, তিনি নাকি বলতেন, 'আমি বাগানের সুন্দর ফুল নই ঠিকই, তবে কারুর পথের কাঁটাও নই।' কিস্‌সাটাই বলা যাক। মীর হাসানের ওয়ালিদ মীর জাহিদকে নিয়েই মজার কসীদাটা লিখেছিলেন সওদা। মীর জাহিদ খাবার পেলে আর কিছু চাইতেন না। জগৎ-সংসারে সব কিছুর মধ্যেই তিনি কিছু না কিছু খাবার খুঁজে পেতেন। সওদার কসীদাটা শুনলে আপনি হেসে গড়িয়ে পড়বেন মান্টোভাই। মীর জাহিদ একদিন হাঁ করে তাঁর বেগমের আঙ্গিয়াঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আরে, আঙ্গিয়াঁ, আঙ্গিয়াঁ বোঝেন তো? যা দিয়ে মেয়েরা বুক দু'টোকে ঢাকে। বেগম তো অবাক, এ কী বেশরম কি বাত, মরদ এভাবে আঙ্গিয়াঁর দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

বেগম লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোই গলদ কিয়া জনাব?'

—নেহি।

—তো আপ কিঁউ—

—দেখ রহি হুঁ বেগম।

—কেয়া।

—আঙ্গিয়াঁকা অন্দর কেয়া হ্যায় বেগম?

—কেয়া হ্যায় জি?

মীর জাহিদ লাফিয়ে পড়ে বেগমের দুই বুক চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রোটি হ্যায়, বেগম, রোটি হ্যায়, য্যায়সে মখমল।'

—ইয়া আল্লা। বলে তো বেগমের মূর্ছা যাবার অবস্থা। আবার এক-একদিন বেগমের পেটিকোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বলতেন, 'ইয়ে কেয়া হ্যায় বেগম? ইতনা নরম, ফির ভি ইতনা গরম। এ তো তাওয়ায় ভেজে আনা রোটি বেগম। কেন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছ? দাও—দাও—বেগম, এ রোটির স্বাদই আলাদা।' হাঃ হাঃ হাঃ—ভেবে দেখুন মান্টোভাই, সরাইখানায় বসে কী চলত? দিনে কত লোক আসছে, যাচ্ছে—চেনা-অচেনা—কত বিদেশি—আপনি জানেন, সেই আকবরাবাদে তখন যত লোক ছিল, তত লোক লন্ডনেও ছিল না। এই ছিল আকবরাবাদ, রঙিন সুতোয় বোনা একটা তসবির, তাই বা বলি কেন, সে যেন ছিল এক তসবিরমহল, আর সেখানে খোদার কলম যেন আমাদের এঁকে দিয়ে গিয়েছিল। হাফিজ সাবের সেই শের মনে পড়ে যায়, মান্টোভাই :

রোযে বস্‌লে দোস্ত দারাঁ য়াদবাদ
য়াদ বাদ আঁ রোযগারাঁ য়াদবাদ।
(আজও মনে পড়ে সেইসব দিন!

এসেছি যে একে অন্যের কাছে
বন্ধুত্বের টানে বাঁধা প'ড়ে—
সেসব দিন কি আজও মনে আছে?)

১৬৩৭ সালে জাঁহাপনা শাহজাহান দিল্লি চলে গেলেন। আগ্রার তসবিরমহলও ভেঙে পড়ল। মীরসাব যেমন লিখেছিলেন :

বু-এ গুল যা নবা বুলবুল কী :
উম্র, অফ্‌সোস কেয়া শিতাব গয়া।।
(গোলাপ ফুলের সৌরভ, বুলবুলের করুণ গান
এবং আমার জীবন, হায় কী দ্রুত শেষ হয়ে গেল।)

এবার শুরু হল শাহজাহানাবাদ তৈরির কাজ। আগ্রা আর লাহোরের মধ্যে কোনও জায়গায় রাজধানীর জন্য জায়গা দেখতে বলেছিলেন জাঁহাপনা শাহজাহান। যমুনা নদীর পারে ঠিক করা হল সেই জায়গা। শহরের কুণ্ডলিনী তৈরি করা হয়েছিল জানেন তো? জ্যোতিষীরা দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন। ১৬৩৯-এর ১২মে'র মধ্যে শুরু হয়ে গেল কাজকর্ম। এই শুরুর আগের যে শুরু, সে কিস্‌সাটাই আমি আপনাদের বলতে চলেছি, মান্টোভাই। একটা শহর কীভাবে মৃতের স্তূপের ওপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, সেই মৃতরা, যাদের আত্মারা আমাকে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দিল্লিতে এসে আমি সেদিন কিলা-ই-মুয়াল্লার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না; কিলা-ই-মুয়াল্লাকে একটা বিরাট প্রেতের মতো মনে হয়েছিল আমার। আর আমি অনুভব করছিলুম কারা যেন আমার চারপাশে ঘিরে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাদের নিশ্বাসে পচা মাংসের গন্ধ।

—আসাদ। কে যেন আমাকে ডাকল।

আমি চারপাশে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। সবে তো দিল্লি এসেছি, কেই-বা আমাকে চিনবে?

—কে আপনি? আমি ভয়ে ভয়ে বললুম।

—কুতুব।

—আপনাকে তো আমি চিনি না। আপনি কোথায়? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—আমাদের দেখা যায় না আসাদ।

—কেন?

—ওরা আমাদের মুছে ফেলেছে।

—কারা?

—শাহজাহানাবাদ যারা তৈরি করেছে। ওরা বেছে বেছে আমাদের ধরে এনেছিল।

—তারপর?

—সবাইকে মেরে কবর দিয়েছিল। সেই মাটির ওপরই তো এই শাহজাহানাবাদ দাঁড়িয়ে আছে।

—কেন তোমাকে মারা হয়েছিল?

—আমি ওদের সামান্য জমিটুকু দিতে চাইনি। তাই আমাকে খাল্লাস করে দিল। বলল, জাঁহাপনার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। আমাকে ওরা দাগী আসামী বানিয়ে দিল। অন্ধকার কারাগারে আটকে রাখল দিনের পর দিন।

—আসাদ ভাই—

—তুমি কে?

—আমি ইউসুফ।

—তুমি কী করেছিলে?

—শুধু তাকে দেখেছিলাম।

—কাকে?

—তার নামও আমি জানি না। হাভেলির বারান্দায় সে দাঁড়িয়েছিল। শুধু বোরখার ভেতর দিয়ে তার চোখ দু'টো দেখেছিলাম। আসাদ ভাই, কেমন সেই চোখ জান? যেন দু'টো বুলবুল। আমি সেই বুলবুল দেখতে রোজ হাভেলির সামনে যেতাম। কিন্তু আর কখনও দেখিনি। তবু ওরা আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ধরে নিয়ে গেল, একটা অন্ধকূপে ঢুকিয়ে দিল। তারপর একদিন—

—তুমিও কবরে চলে গেলে ইউসুফ?

—জি।

—কেউ কিছু বলল না?

—কে কী বলবে? মহব্বত হারাম, মহব্বত দোজখ। কে কী বলবে আসাদ ভাই? আমাদের জীবনে মহব্বত কোথায়?

—আর আমি শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম।

—তুমি কে?

—হাসান। কেন ঘুরে বেড়াতাম আসাদ?

—কেন?

—ধুলো খুঁজব বলে।

—ধুলো? কেন? কার ধুলো।

—সেই ধুলো দিয়েই তো আদমকে বানিয়েছিলেন আল্লা। বলো, কাউকে না কাউকে তো সেই ধুলো খুঁজতেই হবে।

—তাই ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেল?

—বলল, ধুলো খুঁজিস? ধুলো দিয়ে আদম বানাবি? আল্লা হবি? মৌলবিরা আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে দিল। শুধু পাথর ছুড়ে ছুড়ে আমাকে মেরে ফেলল। আসাদ ভাই,

আমি ওদের কিছু বলিনি। সিনা চিতিয়ে দাঁড়িয়েছি। মার তোরা, কত মারবি মার, আমার চোখ খুবলে নে, মাংস কেটে কেটে নিয়ে যা। জন্নতেও তো আমি ধুলোই খুঁজব। তখন তোরা আমার কী করবি? আমি ওদের চিৎকার করে বলেছিস মার, কত পাথর ছুড়ে মারবি, আমি আল হাল্লাজ। আল হাল্লাজকেও তো ওরা পাথর ছুঁড়েই মেরেছিল, না? আল হাল্লাজই তো বলেছিল, আমিই আল্লা। আমিই আল্লা। আমি তো শুধু ধুলো দিয়ে আদম বানাতে চেয়েছিলাম আসাদ ভাই। শুধু এই জন্য আমি মুনাফেক?

মান্টোভাই, সেদিন সারা রাত আমি সেই আত্মাদের কথা শুনেছি, যাদের কোনও না কোনওভাবে অপরাধী বানানো হয়েছিল, তারপর হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছিল। আর সেই কবরের মাটির ওপর গাঁথা হয়েছিল শাহজাহানাবাদের ভিত। আমি দিল্লি এসেছিলুম অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে, বড় শায়ের হব, মুশায়েরার পর মুশায়েরায় আমার গজল শুনে রইস আদমিরা 'কেয়া বাত' 'কেয়া বাত', 'মারহাব্বা' 'মারহাব্বা' বলে উঠবেন। কিন্তু এ-কোন ভটকতা হুয়া আত্মাদের শহরে এসে আমি পৌঁছলুম? সারা রাত ধরে আমি তাদের জীবনের কথা শুনেছি। তারা কেউ মুজরিম ছিল না, কিন্তু অপরাধীর ছাপ্পা মেরে দেওয়া হয়েছিল তাদের শরীরে। কেননা একটা শহর তৈরির জন্য এইরকম অপরাধীদের দরকার, যাদের বিনা কারণে হত্যা করে কবর দেওয়া হবে। সাদিক মিঞার আত্মা আমাকে বলেছিল, 'আপনি গজল লিখবেন আসাদ সাব?'

—আমি তো আর কিছু পারি না মিঞা।

—আমাদের মতো আত্মাদের কথা লিখবেন না?

—লিখব।

—তা হলে আপনার গজল কেউ বুঝবে না আসাদ সাব। কুতুব হেসেছিল।

—কেন?

—শুধু তো মৃত্যুর গন্ধ পাবে সবাই।

—তারপর কী হবে জানেন? সাদিক মিঞা হাসতে হাসতে বলে।

—কী?

—আপনি একটা বেওয়ারিশ কুকুরের মতো মরবেন।

আত্মারা তো ঠিকই বলেছিল, মান্টোভাই। তবু রাস্তার কুকুর হলেও, একসময় দেখতে তো আমি সুন্দরই ছিলুম। কেউ কেউ আমাকে আদরও করত। মুঘলজান, মুনিরাবাইরাও আমাকে ভালবাসত। তারপর একদিন দেখলুম, লোমগুলো উঠতে শুরু করেছে, সারা শরীরে পোকা কিলবিল করছে। সব লোমও একদিন উঠে গেল, ঝলসানো চামড়ার নীচে কয়েকটা হাড়। দিবানখানায় বসে আমি সেই হাড় ক'খানার দিকে তাকিয়ে থাকতুম, তারপর ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তুম। আর খোয়াবে

দেখতুম, দিল্লি ভেঙে পড়ছে, বালি ঝরছে, শুধু বালি; মরুভূমির ভেতরে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। কত পুরনো আত্মাদের হাত ধরে আমি দিল্লি এসে পৌঁছেছিলুম ভাবুন, মান্টোভাই।

খরাবী দিলকী ইস হদ্ হ্যায় কেহ্ য়হ্ সমঝা নহীঁ জাতা,
কেহ্ আবাদী ভী য়াঁ থী য়া-কেহ্ বীরানহ্ মুদ্দৎ কা।।
(হৃদয় আমার এমন উজাড় হয়েছে যে বোঝাই যায় না—
এখানে কোনও দিন বসতি ছিল, না কি যুগ যুগ ধরে উজাড় হয়েই আছে।।)

মির্জাসাব, ভাইজানেরা, গোস্তাকি মাফ করবেন, বদনসিব মান্টোর কথা এবার আপনারা একটু শুনুন। পেটের ভেতরে কথারা গলগল করে উঠছে, বাঁধ মানতে চাইছে না, আমি কথা বলতে শুরু করলে ইসমত শুধু হাসত আর মুখের ভেতরে বরফ নিয়ে নাড়াচাড়া করত, বরফ খেতে কী যে ভালবাসত ইসমত, আর আমি কথা বলে যেতাম, পাগলের মতো বলে যেতাম, শফিয়া বেগম মাঝে মাঝে এসে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসত। আমি জানি, ওরা আমার কথা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারত না, মুখে তো সব সময় খিস্তি, কথার আগে-পিছে 'শালা' ছাড়া বলতেই পারতাম না; কী করব বলুন, মির্জাসাবের মতোই তো পথে পথে, চায়ের দোকানে, কফিখানায় কেটে গেছে আমার জীবন; আম্মিজান ছাড়া কে ছিল আমার, যে আমার দিকে ফিরে তাকাবে?

বাবার কথা তেমন কিছু বলার নেই, মির্জাসাব। রইস আদমি, লুধিয়ানার সমরালায় সরকারি অফিসার, দু-দু'টো বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ছোট বিবির ছেলে আমি। আমার দিকে কোনওদিন ফিরেও তাকাননি। মায়ের সঙ্গেই ছিল আমার সব খুনসুটি, আমি তাকে ডাকতাম, 'বিবিজান'। আর আমার নিজের বোন ইকবাল। মির্জাসাব, বাবা যেন একটা জিনের ছায়া, যে-ছায়াটা সারা জীবন আমাকে ছেড়ে যায়নি। অনেক পরে আমি কাফ্‌কার 'জাজমেন্ট' গল্পটা পড়ে চমকে উঠেছিলাম। সেই গল্পেও এক বাবা, দৈত্যের মতো এক বাবা, যার জন্য ছেলে জানলা দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

মির্জাসাব, আমার প্রত্যেকটা গল্পে ওইরকম কেউ না কেউ একটা দৈত্যের মতো বাবা হয়ে ফিরে এসেছে, আর তাকে আমি হত্যা করতে চেয়েছি।

আমার বাবা মৌলবি গুলাম হাসান তাঁর বড় বিবির তিন ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন, বিদেশে পাঠালেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর এই মান্টোকে ছেড়ে দিলেন রাস্তায়—যাও শালা, ঘুরে বেড়াও, বেওয়ারিশ কুকুরের মতো, লোকের ফেলে দেওয়া মাংসের হাড্ডি খুঁজে খাও। মহম্মদ হাসান, সঈদ হাসান, সালিম হাসান—তাঁর বড় বিবির তিন ছেলে ইংল্যান্ডে মির্জাসাব, আর আমি সমরালার রাস্তায়, কী করছি? বাঁদরের নাচ দেখছি, আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার খেলা দেখছি। ম্যাট্রিক অবধি পড়াশুনো করে ছেড়ে দিলাম। কে দেবে পড়ার খরচ? মৌলবি গুলাম হাসান তাঁর তিন ছেলেকে ইংল্যান্ডে রইস আদমি বানাবেন না? মির্জাসাব আমি আর কী করি, একদিন শরাবখানায় ঢুকে পড়লাম। পুলিশ আমাকে মারতে মারতে জেলখানায় নিয়ে গেল। ক'দিন পরে খালাসও পেয়ে গেলাম, কীভাবে কে জানে। তারপর প্রায়ই শরাবখানায় যেতে শুরু করলাম। বিবিজানের বাক্স থেকে পয়সা চুরি করা এভাবেই শুরু হল। শরাবের পর ঘুম, ঘুমের ভেতরে খোয়াব, আর সেই খোয়াবে কে এসে দাঁড়াত জানেন? মৌলবি গুলাম হাসান, শালা শুয়ার কা বাচ্চা, আমি ওর দিকে পাথর ছুড়তাম, গু ছুড়তাম, কিচর ছুড়তাম, লোকটা তবু হা হা করে হাসত, এত বেশরম আদমি। খবিশ, জানেন মির্জাসাব, ওই লোকটা আমার জীবনের অপদেবতা ছাড়া কিছু না। আমার দিকে কীভাবে তাকিয়ে থাকত জানেন? যেন আমি একটা পোকা, নর্দমা থেকে উঠে এসে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। আম্মিজানকে কী বলত জানেন, 'এই লাফাঙ্গাটাকে এত ভালবাসো কেন তুমি বিবি, ওকে তো আসলে দায়েরে পাঠানো উচিত।'

দায়ের, হ্যাঁ দায়েরেই তো আমার সারা জীবন কেটে গেল মির্জাসাব। শুধু গল্প লেখার জন্যই তো কতবার দায়েরে গিয়ে দাঁড়াতে হল আমাকে। ছোটবেলা থেকে আগুনের ফণা এসে ঘিরে ধরল আমাকে। মীরসাবের সেই শেরের কথা মনে আছে মির্জাসাব?

> দিলকে তঈঁ আতশ-এ হিজরাঁ-সে বচায়া নহ্ গয়া
> ঘর জলা সামনে পর হমসে বুঝায়া নহ্ গয়া।।
> (হৃদয়টাকে বিরহের দাহ থেকে বাঁচানো গেল না;
> দেখতে দেখতে ঘর পুড়ে গেল তবু আগুন নিভাতে পারলাম না।।)

তেমনই এক আগুনের ভেতরে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ছেলেবেলায়। মির্জাসাব, সেই দিন থেকে আমি আগুনের বাসিন্দা হলাম। নাকি আগ কা দরিয়া বলবেন? যাই বলুন না কেন, পুড়তে পুড়তে তেতাল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল। শফিয়া বেগম বলত, 'এইভাবে নিজেকে পুড়িয়ে কী পেলেন মান্টোসাব?'

—কিস্‌সা, বেগম।

—কাদের কিস্‌সা?

—ওই যে ওরা—ওরা—বড় রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ না? ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে মিশে দাঁড়িয়ে আছে।

—কারা?

—মান্টোর আত্মারা।

আগুনের গল্পটা আগে বলে নিই মির্জাসাব। ভাইজানেরা, জেনে রাখুন, এই সেই মান্টো, সাদাত হাসান কবেই মরে গেছে, কিন্তু মান্টো আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। একদম সাচ বাত। এক বুঁদ ঝুটা নেহি। মান্টো ঝুটা জানে না, ঝুটা জানত না, তাই ওরা তাকে বারবার কোর্টে টেনে নিয়ে গেছে, সাহিত্যের বড় বড় বান্দারা বলেছে, মান্টো আবার লিখতে পারল কবে, আর কমিউনিস্টরাও তো ছেড়ে কথা বলেনি, শালা মান্টো, শুয়ারকা বাচ্চা, সাহিত্যের নামে কিচর ছড়িয়ে যাচ্ছে। বন্ধু বলে যারা আমার পরিচয় দিয়েছে, তারাই আমাকে নিয়ে হেসেছে, বলেছে আমি সিনিক, প্রতিক্রিয়াশীল। আমি নাকি মরা মানুষের পকেট থেকেও সিগারেট বার করে নিয়ে ধরাই। ছোটবেলায় যে-আগুনের ওপর আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই আগুন ছাড়া আর কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না আমার, মির্জাসাব। কবেই তো আপনি একটা শের-এ লিখেছিলেন :

গম-এ হস্তী-কা, অসদ, কিস-সে হো জুজ় মর্গ্ ইলাজ,
শমা হর রঙ্গ-মে জল্‌তী হৈ সহর হোনে তক।।
(মৃত্যু ছাড়া জীবনযন্ত্রণার আর কী ওষুধ আছে আসাদ,
প্রদীপকে তো সবরকমের জ্বলা জ্বলতেই হবে ভোর হওয়া পর্যন্ত।।)

ধরা যাক, ১৯১৮-তে যদি আমি জন্মে থাকি, যদি অবশ্য মৌলবি গুলাম হাসান তা স্বীকার করেন, তা হলে তখন আমি দশ কী বারো বছরের একটা কুত্তা। আপনারা জানেন না, সেবার লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাসে চোখে কালো কাপড় বেঁধে গাড়ি চালিয়ে হল্লা মাচিয়ে দিয়েছিলেন মাস্টার খুদা বক্স। সে কী হইচই তখন। শালা, আমরা যেন দুনিয়াদারি পেয়ে গেছি। তা, কী হল জানেন, সেবারই এক কাণ্ড ঘটল, যেন খোদাই খবর পাঠালেন আমার কাছে। মির্জাসাব, আপনি তো জানেন, এক একটা ঘটনা কীভাবে জীবনটা পূর্ণিমার রাতের সমুদ্রের মতো বদলে দেয়। যেমন সেই বেগম ফলক আরা। আমি জানি, আপনি কখনও আর তাঁর কথা বলবেন না; ইশ্‌ক কী তা তো আপনি তাঁর কাছেই শিখেছিলেন। হাফিজসাব তো আপনার জন্যই লিখেছিলেন :

চ কু হলে বীনশে মা খাকে আস্তানে শুশস্ত্
কুজা রবমে বফর্মা অযী জনাব কুজা
(আমরা যে মিলেছিলাম একদা সে সুখস্মৃতির হল অবসান
কী করে, আপনি মিলাল সে সব মোহিনী মায়া, সেই অভিমান!)

হ্যাঁ, কাউকে কাউকে কবর দিতে হয়, হৃদয়ের একেবারে গভীরের দরগায়, সে তো পীরস্থান, এই শরীরের ভিতরের জন্নত, যেখানে আমিও কবর দিয়েছিলাম ইসমতকে—ইসমত চুঘতাই—বরফ চিবোতে কী যে ভালবাসত। বাসনার সেই দরগায় বেগম নেই; নেই তো নেই; তাতে আমি কী করতে পারি, মির্জাসাব, কে আমার জন্নত আর জাহান্নমে থাকবে আর থাকবে না, তা তো আমরা ঠিক করতে পারি না, মির্জাসাব, ঠিক করে দেন তিনি, আল-ফতাহ। কথাটা আপনি মানেন তো?

এই মিশকিনকে মাফ করুন ভাইসব, মান্টো তার কিস্‌সা থেকে বারে বারেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। এটাই আমার স্বভাব ছিল। যদি আমার কিস্‌সাগুলো আপনারা পড়তেন, তা হলে বুঝতে পারতেন, মান্টো এই আছে তো, এই নেই, একটা কোফর আত্মার মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। না পালিয়ে তো উপায় ছিল না। সাদাত হাসান কখনও মান্টোর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত না। সাদাত হাসানের কত ঠাটঠমক, কত আভিজাত্য, এইরকম পোশাক চাই, ওইরকম লাহোরি জুতো না হলে তার চলবে না, আনারকলি বাজারে কারনাল বুট শপ থেকে অন্তত দশ থেকে বারো জোড়া চপ্পল কিনতেই হবে; কত তার খুশখেয়াল। আর মান্টো তার কান ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলত, শালা শুয়ারকা বাচ্চা, নবাবি মারাচ্ছ, যা লিখছ, তার নিয়তি জান? কালো কাপড়ে মুখ বেঁধে অন্ধকূপে ফেলে দেবে ওরা তোমাকে। সারা হিন্দুস্তান ম ম করবে তোমার লেখার বদবুতে। শালা, শুয়ার কাহিকা, 'ঠাণ্ডা গোস্ত' লেখো, এত বড় কাফের তুমি? কী বলে ওরা, শুনেছ? শুধু নারী-পুরুষের মাংসের গল্প লিখেছ, রেড লাইট এরিয়া ছাড়া আর কী আছে তোমার লেখায়! হাত তুলে দিলাম মির্জাসাব, না কিছু নেই, হত্যা আছে, ধর্ষণ আছে, মৃতের সঙ্গে সঙ্গম আছে, খিস্তির পর খিস্তি আছে—আর এই সব ছবির পেছনে লুকিয়ে আছে কয়েকটা বছর—রক্তে ভেসে যাওয়া বছর—১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮—আছে নো ম্যানস ল্যান্ড, দেশের ভেতরে এক ভূখণ্ড, যেখানে টোবা টেক সিং মারা গেছিল। টোবা টেক সিং-এর নাম আপনারা শোনেননি। শুনবেনই বা কোথা থেকে? সে তো একটা উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না!

না, না, ঘাবড়াবেন না ভাইজানেরা, আগুনের কিস্‌সাটা এবার শুরু হবে। টোবা টেক সিংকে নিয়ে গ্যাঁজাল পাড়তে বসব না আমি। তবে কি জানেন, এই মান্টোকে তো অনেকে নানাভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছে—এই শুয়োরের বাচ্চাটা আসলে কে—পাগল, না ম্যানিয়াক, মানসিক রোগী, না ফরিস্তা—মানুষের এই সবটা বোঝার ইচ্ছের ওপর আমার হিসি করে দিতে ইচ্ছে করত, কী করে বুঝবি রে শালা, তুই কি আমার মতো করে কখনও সূর্যাস্ত দেখেছিস, তা হলে কী করে বুঝবি, আমি কেন প্রথমেই মেয়েদের পায়ের দিকে তাকাতাম, তাই বোঝার চেষ্টা ছাড়, মান্টোকে যদি কোথাও খুঁজতেই হয়, তা হলে ওর কিস্‌সাগুলো পড়—ওই যে লোক আর মেয়েমানুষগুলোকে দেখছিস, রাস্তার, চাওলের, রেন্ডিপট্টির, বম্বের স্টুডিওর—

ওই—ওই ওদের মধ্যে মান্টোকে খুঁজে পেলেও পেতে পারিস। ওরা বলত, এইসব কিস্‌সা না কিচর? আরে ভাই, যে-সময়টায় বেঁচে আছি, তাকে যদি বুঝতে না পারিস, তা হলে আমার আফসানাগুলো পড়, আর আমার কিস্‌সাগুলো যদি সহ্য করতে না পারিস, তা হলে বুঝবি, এই সময়টাকেই সহ্য করা যায় না। কিন্তু এসব বলে লাভ কী? ওরা তো মান্টোর গায়ে গনগনে আগুনের শিক দিয়ে দাগা দিয়ে দিয়েছে, ও আবার লেখক নাকি, ও তো পর্নোগ্রাফার, মানুষের জীবনের নোংরা দিকগুলো নিয়েই ওর কারবার। অথচ যখনই আমি কোনও গল্প শুরু করেছি, ৭৮৬ সংখ্যা, বিসমিল্লার নাম লিখতে ভুলিনি। ভাইজানেরা, এসবই আমার জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ইনাম।

মাস্টার খুদা বক্সের কথাটা মনে আছে তো আপনাদের? সেই যে চোখে কালো কাপড় বেঁধে গাড়ি চালিয়ে পিকাডিলি সার্কাসে নতুন সার্কাসের খেল দেখিয়েছিলেন। খুদা বক্সের পর অমৃতসরে আল্লারাখা নামে একজন এসে হাজির হলেন, তিনি নাকি খুদা বক্সের গুরু। রাস্তার ওপর গর্ত খুঁড়ে তিনি তাতে কয়লা জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর সেই গনগনে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতেন। আল্লারাখাসাবের জাদু দেখতে তো দিনের পর দিন ভিড় বাড়তে লাগল। কত কথা, কত কিস্‌সা ছড়িয়ে পড়ল তাঁকে নিয়ে। আমি চুপচাপ বসে লোকটাকে দেখে যেতাম। জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে কীভাবে হেঁটে যায় একজন মানুষ? হাঁটার পর তিনি পা তুলে দেখাতেন, একটাও ফোস্কা পড়েনি। বিবিজানের কাছে আল হাল্লাজের গল্প শুনেছিলাম আমি। একবার হাল্লাজ অনেককে নিয়ে মরুভূমি পেরিয়ে মক্কায় যাচ্ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে খিদেয় যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা হাল্লাজকে বলল, এখানে একটু খেজুর পাওয়া যাবে না পীরসাব?

হাল্লাজ হেসে বললেন, 'খেজুর খাবে?'

—জি, বহুৎ ভুখ। আর পা চলে না।

—দাঁড়াও। হাল্লাজ মরুভূমির হাওয়ায় হাত ঘোরাতেই দেখা গেল তাঁর হাতে খেজুরভরা এক পাত্র।

আবার চলা শুরু, আবার খিদের জ্বালায় মরুভূমির ওপর বসে পড়া। সে এক সময় ছিল ভাইজানেরা, তাই না মির্জাসাব, যখন জীবন মানেই ছিল মরুভূমির পর মরুভূমি পেরিয়ে যাওয়া। আর রাতগুলো কেটে যেত মরুভূমির আকাশের তারাদের সঙ্গী হয়ে। সে পথ পীর, সাধক, হজরতের। কত, কতদিন আগে আমরা সে পথ থেকে সরে গিয়ে এই দোজখের দিকে চলে এসেছি, আমাদের হল্লাগুল্লায়, নরকে, পচা মাংসের গন্ধে।

খিদে মেটাতে এবার ওরা হালুয়া খেতে চাইল।

হাল্লাজ হেসে বললেন, 'শুধু হালুয়া খেলেই পেট ভরবে, না আর কিছু চাই?'

—না হুজুর। ওটুকু পেলেই আবার আমরা যেতে পারব।

—তা বটে। খাঁচাটুকু না থাকলে দীন্‌-এর পথে যাবেই বা কী করে? বলে আবার তিনি হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে হালুয়া হাজির করলেন। তার সুবাসে ভরে গেল মরুভূমি। হালুয়া খাওয়ার পর একজন বলল, 'এমন হালুয়া তো বাগদাদ ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না পীরসাব।'

হাল্লাজ হেসে বলেছিলেন, 'বাগদাদ আর মরুভূমি, সবই খোদার কাছে এক জায়গা।'

—আর খেজুর কোথা থেকে পেলেন?

হাল্লাজ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, যেন একটা গাছ। বললেন, 'এবার আমাকে ধরে ঝাঁকাও।'

—কেন পীরসাব?

—দেখোই না। হাল্লাজ হাসলেন।

সবাই হাল্লাজকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল; হাল্লাজ যেন খেজুর গাছ হয়ে গেলেন, ঝরে পড়তে লাগল পাকা খেজুর। গাঢ় বাদামি খেজুর সূর্যের আলোয় মণির মতো ঝকঝক করতে লাগল।

আল্লারাখাসাবের জাদু দেখতে দেখতে আমি মনসুর হাল্লাজের এই গল্পটার কথাই ভাবছিলাম। মির্জাসাব, এ তো তা হলে নিছক জাদু, হাত সাফাইয়ের খেল নয়। একজন মানুষ যদি খেজুর গাছ হয়ে যেতে পারে, তবে জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়েই বা হাঁটতে পারবে না কেন? তা হলে কত কুয়ত নিয়ে একজন মানুষ এই দুনিয়ায় আসে? কিন্তু সেই ক্ষমতার কতটুকুই বা প্রকাশ পায়? কতটুকু আমরা দেখতে পাই? কেন দেখতে পাই না, মির্জাসাব? মীরসাবের সেই শেরটা আপনার মনে আছে?

বা রে দুনিয়ামেঁ রহো গমজ়দহ্ য়া শাদ রহো
অ্যায়শা কুছ করকে চলো যাঁ কেহ্ বহুত য়াদ রহো।।
(মানুষের মধ্যেই থাকো, দুঃখও পাবে আবার সুখও পাবে
এমন কিছু করে যাও যেন সহজে তোমায় লোকে ভুলতে না পারে।।)

দুনিয়ামেঁ রহো। বুঝতে চেয়ো না ভাইজানেরা। দুনিয়ামেঁ রহো, য্যায়সা এক কিতাব। তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শুধু সব লিখে নিয়ে যেও।

তারপর কী হল, বলি, আপনাদের মুখগুলো বেজার হয়ে উঠছে, বুঝতে পারছি। সেদিন হঠাৎ আল্লারাখাসাব বললেন, 'তোমরা খোদাকে বিশ্বাস করো?'

—জি হুজুর। ভিড়ের ভেতর আওয়াজ উঠল।

—আর আমাকে?

—হুজুর নবি। সবাই বলে ওঠে।

আল্লারাখাসাব হা হা করে হেসে উঠলেন।—নবি? নবিকে দেখেছ? নবি কে জান?

—হুজুর, বলুন।

—তা হলে একটা কিস্‌সা বলি শোনো। আবু সঈদ আবুল-খয়রের কথা শুনেছ কখনও? খোরাসানের সুফি সাধক। সে সব বারোশো-তেরোশো বছর আগের কথা। তখন দুনিয়াটা কেমন ছিল জান?

—কেমন হুজুর?

—কতরকম হাওয়া বইত। আর সেই হাওয়া গায়ে লাগিয়ে এক একজন এক-একরকম পাগল হয়ে যেত। বলতে বলতে হেসে উঠলেন আল্লারাখাসাব।—তা পীর আবু সঈদ একদিন তাঁর এক শিষ্য দরবেশকে নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে চলেছেন। সেই বনে থাকত বিষাক্ত সব সাপেরা। হঠাৎ একটা সাপ এগিয়ে এসে আবু সঈদের পা পেঁচিয়ে ধরল। শিষ্য তো ভয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে। শিষ্যের অবস্থা দেখে আবু সঈদ বললেন, 'ভয় পেও না। এই সাপটা আমাকে সেজদা জানাতে এসেছে। ও আমাকে কামড়াবে না। তুমি কি চাও, ও তোমাকেও সেজদা জানাক?'

—নিশ্চয়ই। দরবেশের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—নিজেকে যতক্ষণ না ভুলে যেতে পারবে, ও কখনও তোমাকে সেজদা জানাবে না। ইনি হচ্ছেন একজন নবি ভাইসব। তাঁর নিজের বলে আর কিছু নেই। শুধু আল্লার কথা জানাবেন বলেই এই দুনিয়ায় এসেছিলেন। নাও, এবার পরীক্ষা দাও।

কীসের পরীক্ষা? কী পরীক্ষা চান আল্লারাখাসাব? ভিড়ের সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

—আল্লাকে বিশ্বাস করো বলেছ। আমাকেও করো। তা হলে যার বিশ্বাস আছে, এগিয়ে এসো, আমার সঙ্গে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটো।

আল্লারাখাসাবের কথা শুনে ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে। কেউ চুপি চুপি সরে যায়, কেউ আগুনের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে পালায়। আর তখন, আমি আর বসে থাকতে পারলাম না মির্জাসাব, এগিয়ে গেলাম আল্লারাখাসাবের দিকে। জুতো-মোজা খুলে কুর্তা গুটিয়ে নিলাম।

আল্লারাখাসাব অবাক হয় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে হাঁটবি বেটা?'

—জি।

—আয় তা হলে। তিনি আমার হাত ধরে টানলেন।—কলমা বল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহম্মাদুর রসুলাল্লাহ্।

—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ।

কলমা বলতে বলতে মনে হল, শরীরটা যেন হাওয়ার মতো হালকা হয়ে গেছে। আমি আল্লারাখাসাবের হাত ধরে আগুনের বৃত্তের মধ্যে ঢুকলাম, মির্জাসাব। তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, মির্জাসাব, সেই আমি নিজেকে প্রথম খুঁজে পেলাম। আমার বাবার চোখরাঙানির বাইরে, আমার উচ্চশিক্ষিত

বৈমাত্রেয় ভাইদের অবজ্ঞার বাইরে, আমার নিজের পথে, আল্লারাখাসাবের পেছনে পেছনে, আগুনের বৃত্তের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে। না, আমার পায়ে ফোস্কা পড়েনি, মির্জাসাব।

সত্যি বলতে কী, লাওয়ারিশের মতো কেটে যেত দিনগুলো। স্কুলের পড়াশোনা করতে তো একদম ভাল লাগত না। স্কুলে পড়ার সময়েই সাহিত্য আমার মজ্জায় যেন মিশে গিয়েছিল। আগা জাফর কাশ্মীরির নাটক করার জন্য একটা দল তৈরি করেছিলাম আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে। একদিন বাবা এসে হারমোনিয়াম, তবলা—সব ভেঙে দিলেন। বললেন, এসব করা যাবে না। আর ততই আমার রোখ চেপে গেল। পড়ার বই ফেলে রেখে নানারকম আফসানা পড়তাম; বড়দের জন্য লেখা, আমার বয়সে সেসব বই কেউ পড়ে না। স্কুলে বদ ছেলে হিসেবেই নাম পেয়ে গেলাম 'টমি'। তিনবারের চেষ্টায় থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলাম, আর মজার কী জানেন, আমি ফেল করেছিলাম উর্দুতে। হা-হা, ভাবুন মির্জাসাব, উর্দুতে আমি ফেল করেছিলাম।

সে এক দিন গেছে ভাইজানেরা। পড়াশুনো তো ডকে উঠল; আমি ভিড়ে গেলাম জুয়াখেলার আড্ডায়। কর্তা জামাল সিং-এ ছিল দেনু আর ফজলুর জুয়ার ঠেক। সেখানে ফ্লাশ খেলতাম আমি। প্রথমে নবিশ থাকলেও, ঘাঁতঘোঁত সহজেই বুঝে নিলাম, আমার দিন-রাত কেটে যেতে লাগল জুয়ার ঠেকে। কতদিন যে এভাবে চলেছিল, কে জানে। একদিন খুব বোর হয়ে গেলাম জানেন। নিজেকে নিয়ে সব সময় বাজি ধরা খুব বিরক্তিকর লাগল। আমি তা হলে কেউ নই? শুধু এমন একটা মাল, যাকে নিয়ে বাজি ধরা যায়? ঠিক করলাম, বেশ, টলো মান্টো, এবার তা হলে অন্য পথে যাওয়া যাক। জীবনে পথ তো আর একটা নয়। এবার না হয় অন্য পথেই হেঁটে দ্যাখো। কিন্তু কী করব? জুয়ার ঠেক ছেড়ে কোথায় যাব? রাস্তাই আমাকে জায়গা দিল, এ-পথ থেকে সে-পথ, এ-গলি থেকে ও-গলি, আমি খোয়াবের ঘোরে ঘুরে বেড়াই, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, ওদের সঙ্গে বসে থাকতাম, আদর করতাম, ওরা আমার গা চেটে দিত। কবরস্থানগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি, ফকিরদের পাশে বসে কত গল্প শুনেছি, মির্জাসাব, সে-সব গল্প হারিয়ে গেছে, আমি লিখতে পারিনি।

এর আগেই ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগে সেই হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। তখন আমার বয়স সবে সাত। কিন্তু আমি দেখেছিলাম, সারা পাঞ্জাব জেগে উঠেছে, অমৃতসরের পথে পথে মিছিল, স্লোগান। ভগৎ সিং ছিলেন আমার আদর্শ। আমার পড়ার টেবিলে ভগৎ সিংয়ের একটা ছবি ছিল। পথে পথে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের একটা গাছের তলায় বসে মনে হয়েছিল, পৃথিবীটাকে এমনভাবে তছনছ করে দেওয়া যায় না, যাতে ওই টমিগুলো আমাদের ওপর আর নির্বিচারে গুলি চালাতে না পারে? জানেন মির্জাসাব, বেশ কয়েকবার বোমা তৈরির

কথাও ভেবেছিলাম। শালা অমৃতসর উড়িয়ে দেব, সাদা শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে দেশ ছাড়া করবই। বালা, আশিক, ফকির হুসেন, ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ, জ্ঞানী অরুর সিংদের এইসব কথা বলতাম। ওরা হো হো করে হাসত। সব দোস্ত আমার। ওদের কথা, মৌজ করো, মস্তি করো, গুলি মারো অমৃতসরের। আজিজের হোটেলে বসে আমরা গাঁজা খেতাম। আজিজের কাবাবের সঙ্গে জমে যেতে গাঁজার দম। আশিক ছবি তুলত, ফকির লিখত কবিতা, জ্ঞানী অরুর সিং ছিল দাঁতের ডাক্তার। ক্যাপ্টেন যে কে, তা আর মনে নেই। গাঁজায় দম মেরে রফিক গজনবির স্টাইলে গান ধরত আশিক। আর আনোয়ার, ছবি আঁকত, সেই গান শুনে শুধু 'বাঃ, বাঃ' করে যেত। আজিজের অন্ধকার হোটেলে আনোয়ার মাঝে মাঝে নিজেও গেয়ে উঠত, 'এ ইশক্ কহিঁ লে চল।' আখতার শেরানির কবিতাকে ও গান বানিয়ে নিয়েছিল। আজিজের হোটেল এখন কোন কবরে কে জানে?

মুহব্বৎ সে হ্যয় ইন্তজাম-এ জহাঁ  
মুহব্বৎসে গর্দীশমেঁ হ্যয় আসমাঁ॥  
(এই পৃথিবীর যত আয়োজন সবই তো প্রেমের জন্য।  
প্রেমের আকর্ষণেই আকাশ চক্রাকারে ঘুরছে॥)

ইয়া আল্লা, কী জীবনটাই না আপনার শুরু হয়েছিল, মান্টোভাই। খোদা আপনার নসিবে দোজখে যাওয়ার সব ব্যবস্থা একেবারে পাকা করেই রেখেছিলেন। যেমন আমার বেলাও খেয়াল ছিল তাঁর; আরে, এ বেটা জন্নতে গিয়ে করবে কী? সত্যিই তো, কী করতাম বলুন, না হয় একটা হুরি-পরি দেওয়া হত আমাকে, কিন্তু সেই একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কতদিন থাকা যায় বলুন? জন্নতের শান্তি মরেও সইত না আমার। সবই খোদার কলমে লেখা। আমার ব্যর্থতার কথা বলবার ভাষা সারা জীবনেও তো খুঁজে পাইনি আমি। এত যে ফারসি-উর্দু গজল লিখলুম, তার পরেও মনে হয়, না মান্টোভাই, সে-ক্ষতকে আমি ছুঁতে পারিনি, তার যন্ত্রণা ফুটে ওঠেনি আমার গজলের ভাষায়। তবে, মাঝেই মাঝেই আমার মনে হত, যন্ত্রণা ছাড়া কি সত্যিই

কোনও সৌন্দর্য তৈরি হয়েছে এই দুনিয়ায়? ধরুন না কেন, সাইপ্রেস গাছের ডাল-পালা ছেঁটে ছেঁটেই না তাকে জামাল করে তোলা হয়। সেই খুবসুরতির জন্য কত যন্ত্রণাই না সইতে হয় সাইপ্রেসকে। তারপর ধরুন গিয়ে দারু। তা তো আপনি আঙুরদের কষ্ট না দিয়ে পাবেন না। কলম তৈরির জন্য কঞ্চিকে ঠিক ঠিক ভাবে কেটেকুটে নিতে হবে। তারপর ধরুন, আপনি খৎ লিখবেন। সে জন্য কাগজকে কাটতে হবে মাপ মতন, তার বুকে কালি দিয়ে আঁচড় বসাতে হবে। এক-একটা আঁচড়ই তো এক একটা ক্ষত, আর তার ফলে কী তৈরি হল? আশিকের কাছে আপনার মনের রূপরহস্যের কথা। তা, আমি দেখলুম, সবই তো হচ্ছে এইভাবে; যন্ত্রণা ছাড়া তো সুন্দরের জন্ম দিতেই পারি না আমরা। খোদাও কি তা পারেন? তাঁর দুনিয়ায় এত যে ভাঙাগড়ার খেলা, এ সবই তো নতুন নতুন খুবসুরতির জন্ম দেওয়ার জন্যই। এই আমার কথাই ধরুন। এক মুঠো ধুলো দিয়ে তো তিনি তৈরি করেছিলেন আমাকে; তারপর আকাশে তুলে ধরলেন, সেখানে রইলুমও কিছুকাল; কিন্তু হঠাৎ একদিন দুনিয়ার বুকে ছুঁড়ে দিলেন, আমি এসে পড়লুম এখানে, আর এমন ভাবেই পড়লুম যে তার দাগ রয়ে গেল এই পৃথিবীর বুকে; পৃথিবী ধারণ করল সেই ক্ষত, যার নাম মির্জা গালিব; কিন্তু সেই ক্ষতের সৌন্দর্যকেই বা কে অস্বীকার করবে, মান্টোভাই! এভাবেই চলেছে দুনিয়াদারি, তাই না?

দেখুন, দেখুন, আমাদের সব ভাইজানেরা আবার শুয়ে পড়তে শুরু করেছেন। কী হল—কী হল আপনাদের? দু'টো বুরবাকের এই সব কথাবার্তা বড় জালেম মনে হচ্ছে তাই না? ঠিক হ্যায়, আজ তবে অন্য কিছু হোক, কী বলেন মান্টোভাই? জীবন—তা আমার হোক, হজরতের হোক, কী যুবরাজ সেলিমের হোক—জীবন এমনিতে খুব ম্যাড়মেড়ে, তাকে বইবার জন্য ধোপার গাধা হয়ে যেতে হয়, টানছিই, বোঝা টেনেই চলেছি। তাকে সইয়ে নেবার জন্য মাঝে মাঝে হিকায়ৎ-এর কাছে ফিরতে হয় আমাদের; কিস্‌সা নয়, হিকায়ৎ; কিস্‌সা তো আমাদের জীবনের; আর হিকায়ৎ যেন আয়নায় ফুটে ওঠা অন্য এক দুনিয়ার ছবি। আমার কথা বলার সময় তো পড়েই রইল, আমরা তো কেউই আর কবর ছেড়ে পালাচ্ছি না, কিন্তু হিকায়ৎ-এর কথা যখন এল, তাই-ই না হয় বলা যাক। হিকায়ৎ এই ভেসে ওঠে, আবার হারিয়ে যায়।

এই হিকায়ৎ-এর নাম 'শির-উল-বয়ান'। হ্যাঁ, একেবারে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো গপ্পো। দেখলেন মান্টোভাই, সবাই আবার উঠে বসতে শুরু করেছেন। মসনবিটা লিখেছিলেন মীর হাসান। সওদা যাঁকে নিয়ে মজা করতেন, সেই মীর জাহিকের ছেলে মীর হাসান। আমার জন্মেরও সত্তর বছর আগে পয়দা হয়েছিলেন। তবে দিল্লি ছেড়ে ফৈজাবাদে চলে গিয়েছিলেন; যাবার অবশ্য ইচ্ছে ছিল না তাঁর, আশিক ছিল কিনা দিল্লিতে; কিন্তু কী আর করবেন, পেটের ধান্দা আর প্রেম, ও-দু'টো তো আবার হাত ধরাধরি করে চলে না। শুনেছি, ফৈজাবাদেও খুব একটা ভাল জীবন

কাটেনি হাসানসাবের, কষ্টেসৃষ্টে দিন চলত। তবে কিনা মসনবি লেখায় একেবারে মাস্তান লোক ছিলেন। 'শির-উল-বয়ান' এতটাই বিখ্যাত হয়েছিল যে ওটার নাম হয়ে গিয়েছিল মীর হাসানের মসনবি। এই মসনবি কিন্তু আসলে একটা হিকায়ৎ, আকাশে-বাতাসে- লোকের মুখে মুখে ভেসে বেড়াত বলে শুনেছি। ভাবুন, সেই হিকায়ৎ-ই হয়ে গেল মীর হাসানের মসনবি।

মালিক শাহ নামে এক নবাব ছিলেন। কোথায়? তা বলতে পারব না। ধরে নিন না কেন, হয়তো কোনও আয়নার মধ্যে ছিল তাঁর এক অপরূপ নগরী। কেমন দেখতে ছিল সেই নগরী? ভাষা দিয়ে নাকি তা প্রকাশ করা যায় না। ভোরের আজানের কথা ভাবুন, সেইরকম সুন্দর। ঝকঝকে সব রাস্তা, দুধের মতো সাদা সব বাড়ি, আর মাঝে মাঝে নানারকম ফুলের বাগিচা, আর বাগিচা মানেই তো কতরকম পাখি আর তাদের গান। সেই নগরীতে নাকি এমন সব বাজার ছিল, যেখানে ঢুকলে আপনার আর বেরোতেই ইচ্ছে করবে না, যেন বাজার নয়, কোনও শিসমহলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি। এমন যে-নগরী, সেখানে নবাবের দুর্গটি কেমন হবে কল্পনা করে নিন। হ্যাঁ, ভাইসব, একটু কল্পনা করে নিতে হবে, হিকায়ৎ-এর এমনটাই দস্তুর।

নবাবের মনে বড় দুঃখ, তাঁর কোনও ছেলে নেই। এন্তেকাল এলে কাকে সিংহাসনে বসিয়ে যাবেন? একদিন সব উজিরদের ডেকে বললেন, 'এইবার আমাকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে।'

—কেন, জাঁহাপনা? সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

—এত ধনসম্পদ নিয়ে আমি কী করব বলুন? কার জন্য রেখে যাব? এত দিন মন দিয়ে রাজত্ব করেছি, খোদার পথের দিকে তাকানোর ফুরসত হল না আমার। আর নয়। নবাবি ছেড়ে দিয়ে আমি এখন তাঁর পথেই যেতে চাই।

উজির-এ-আজম বললেন, 'এ আপনি ভুল ভাবছেন নবাব। খোদা তো আপনাকে রাজত্ব চালানোরই দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনার জন্য এটাই তো খোদার পথ। এই দায়িত্ব আপনি না সামলালে, কেয়ামতের দিনে কী জবাব দেবেন, হুজুর?'

—কিন্তু আমার পর কে এই রাজ্যপাট দেখবে?

—কে বলেছে আপনার ছেলে হবে না? ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠাচ্ছি। ওনারা এসে গণনা করে দেখুন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

উজির-এ আজমের কথা মেনে নিলেন নবাব। এলেন ব্রাহ্মণেরা, জ্যোতিষীরা, শুরু হল নবাবের ভাগ্যগণনার কাজ। শেষে সবাই একবাক্যে রায় দিলেন, নবাবের বেগম ছেলে পয়দা করবেনই করবেন। বিধির এই লিখন কেউ খণ্ডাতে পারবে না। সওদা সেখানে থাকলে হয়তো মজা করে বলতেন, বিধির লিখন কোথায় লুকোনো আছে, একবার দেখাতে পারেন? পাজামার তলায়? ব্রাহ্মণেরা জানালেন, চাঁদের মতোই সুন্দর ছেলে আসবে বেগমের কোলে। কিন্তু একটা কথা আছে। কী? না, বারো

বছর পর্যন্ত ছেলেকে একেবারে আগলে রাখতে হবে। বারো বছরের মধ্যে এমন কোনও ফাঁড়া আছে, যাতে নবাব ছেলেকে হারাতে পারেন।

—কী বলছেন আপনারা? নবাবের মুখ তো কালো হয়ে গেল।

—না, না, আমরা নবাবজাদার মৃত্যুর কথা বলছি না। তবে কিনা, কোনও ভাবে হারিয়েও যেতে পারেন। তাই সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে হুজুর।

—আপনাদের কথা মতোই ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কী করতে হবে?

—বারো বছর প্রাসাদের বাইরে যাওয়া চলবে না। এমনকী ছাদেও নয়।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, কোনও পরি নবাবজাদার প্রেমে পড়বেন।

—আর?

—নবাবজাদা প্রেমে পড়বেন অন্য এক সুন্দরীর।

ভাবুন একবার মান্টোভাই, ছেলের জন্মই হল না, তার আগেই শুরু হয়ে গেল আশনাই নিয়ে কথাবার্তা। কী ভাইজানেরা, মজা জমেছে? এবার দেখুন না, মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো আরও কত কাণ্ড ঘটবে। আশনাই-এর কথা দিয়ে যার শুরু, সেই খেলা কি সহজে থামবার? তো বছর ঘোরবার আগেই নবাবের এক বেগম ছেলে পয়দা করলেন। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল সারা নগরী। হাফিজসাবের সেই শেরটা শুনুন :

শিগুফ্তা শুদ গুলে হম্‌রা
ব গশ্‌ৎ বুলবুল মস্ত
সদা এ সর খুশি ঐ
আশিকানে বাদা পরস্ত।
(বাগানে ফুটেছে রক্তগোলাপ,
মাতোয়ারা হল বুলবুল সব;
হে সুরাপ্রেমিক কোথায় তোমরা
তোলো চারিদিকে আনন্দরব।)

আর সেই ছেলের নাম কী রাখা হল জানেন? বেনজির। প্রজাদের অকাতরে ধনসম্পদ বিলোলেন নবাব। ছ'দিন ধরে সারা নগরী জুড়ে চলল নাচা-গানা-খানাপিনা-মৌজ-মস্তি। এমনকী, নবাব আনন্দে অনেক ক্রীতদাসকে মুক্ত করেও দিলেন। এই-ই হচ্ছে নবাবি। জাঁহাপনা জাফরের সময় আর নবাবি কোথায়? ও তো ভিখিরির একবেলার পোলাও খাওয়া।

নবাবজাদার জন্য বাগান-ঘেরা নতুন প্রাসাদ তৈরি হল। অতুলনীয় সে প্রাসাদ, বাগানে সাইপ্রেস ও অন্যান্য গাছ, পাখিদের গানে গানে মশগুল। কত যে দাসদাসী ঘিরে থাকত বেনজিরকে। কেন না নবাবজাদাকে চোখের আড়াল করা চলবে না।

কয়েক বছরের মধ্যে লেখাপড়া, ঘোড়ায় চড়া, তীর-ধনুক চালানো, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, বন্দুকবাজিও শিখে ফেলল বেনজির। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, তার মনটি ছিল বড় ভাল, দাসদাসীরা যেন তার ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন। নবাবজাদার নামটি সার্থক কি না বলুন, ভাইসব? সে যেন সত্যিই হাফিজসাবের বলা সেই রক্তগোলাপ, যে সৌরভ ছড়াতেই এই দুনিয়াতে এসেছে।

বেনজিরের বারো বছরের জন্মদিনে নবাব মালিক শাহ ঘোষণা করলেন, আজ নবাবজাদা শহর পরিক্রমায় বেরোবেন। সুন্দরী দাসীরা সুগন্ধী তেল মাখিয়ে বেনজিরকে স্নান করাল, তারপর এমন ভাবে তাকে সাজিয়ে তুলল, যেন উস্তাদ বিহ্‌জাদের তুলি দিয়ে আঁকা ছবি। বেনজির প্রাসাদ থেকে বেরোতেই তার মাথায় মুক্তাবৃষ্টি শুরু হল আর তারপর সেই মুক্তো কে কতটা হাতিয়ে নিতে পারে, তাই নিয়ে চলল মারামারি, কাজিয়া। নগরীর সব হাভেলি, দোকান সাজানো হয়েছিল মসলিনের নকশাদার কাপড় দিয়ে। আর লাগানো হয়েছিল বড় বড় আয়না, সূর্যের আলো যার ওপর পড়ে সাত রং ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। তেমনই শোভাযাত্রার ছবিও ফুটে উঠবে আয়নায়। সত্যিই, নবাবজাদার প্রথম শহর-পরিক্রমা সবার মনে সোনার জলে আঁকা ছবির মতোই রয়ে গেল।

কিন্তু হিসেবে একটা ভুল হয়েছিল, যা নবাব এবং কারোরই খেয়াল ছিল না। বিপদের বারো বছর শেষ হতে তখনও এক রাত বাকি। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোর জোয়ার লেগেছে, আর এদিকে সারা দিনের হৈহল্লার পর বেনজিরেরও বেশ ঘুম পেয়েছে। এমন পূর্ণিমার রাতে প্রাসাদের ছাদে ঘুমোবার সাধ হল তার। ইনশাল্লাহ, এই হচ্ছে নিয়তির লিখন, মান্টোভাই। কখন যে আপনার কোন সাধ হবে, কিছুই জানেন না আপনি, আর তা যে আপনাকে কোন খুমারে নিয়ে যাবে কে জানে! তো ছাদেই নবাবজাদার বিছানা তৈরি হল, চাঁদের নরম আলো আর ফুলের খুশবুর আদরে ঘুমিয়েও পড়ল বেনজির। নজর রাখার জন্য নবাবজাদাকে ঘিরে বসেছিল অনেক দাসদাসী। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে ভেসে এল ঠাণ্ডা হাওয়া আর সেই হাওয়ার ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু চাঁদ আকাশ থেকে দেখছিল, বেনজিরের জীবনে কী ঘটতে চলেছে।

ওই ঠাণ্ডা হাওয়া কে নিয়ে এসেছিল জানেন, ভাইজানেরা? এক পরি। সে তখন রাতের আকাশে উড়ন্ত সিংহাসনে চড়ে ঘুরতে বেড়িয়েছিল। এই পরির কথাটা একটু বলে নিতে দিন, মান্টোভাই। এখানে অনেকেই আছেন, যাঁরা আমার আসার বহুদিন পরে কবরে এসেছেন, তাঁরা পরি বলতে বোঝেন ফিনফিনে ডানা লাগানো সুন্দরী। ওসব হচ্ছে গোরাদের কল্পনা। ফারসিতে আমরা পরি কাকে বলি জানেন? এক অনৈসর্গিক আত্মা, সুন্দরী নারী সেজে সে পুরুষের জীবনে হাজির হয়। কেন জানেন? প্রেমের ছলনায় ভুলিয়ে সেই পরি পুরুষকে আসলে বন্দি করে রাখতে চায়। নিজের

মর্জি মতো চালায়, তার হুকুম অমান্য করা মানেই মৃত্যু। মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রেম তো এভাবেই আসে আমাদের জীবনে, এক-একটা প্রেম মানে এক-একটা মৃত্যু; মান্টোভাই, মনে হয় না, আমরা যেন অনাদি, অনন্তকাল ধরে এক-একজন পরির হাতেই বন্দি হয়ে আছি? যাক, এইসব বখোয়াস বাদ দিন।

পরির নাম ছিল মাহরুখ। আকাশ থেকে বেনজিরের রূপ দেখে তার চোখ তো কপালে উঠল। এমন সুন্দর পুরুষ দুনিয়ায় আছে নাকি? কিন্তু আছে তো, দেখাই যাচ্ছে। তা হলে? আরে, একে তো আমার চাই, একে না বন্দি করতে পারলে আমি কেমন পরি? মাহরুখ ছাদে এসে নামল; তার মনে হল, পূর্ণিমার চাঁদের আলো নয়, বেনজিরের রূপের আলোতেই এমন মায়াবি হয়ে আছে আজকের রাত। ঘুমন্ত বেনজিরের ঠোঁটে সে ঠোঁট ঠেকাল। তারপর? উড়িয়ে নিয়ে চলল তার পরিস্তানে।

ঘুম ভেঙে দাসদাসীরা দেখল, নবাবজাদা উধাও। কোথায় সে? সারা প্রাসাদ, বাগান খুঁজেও পাওয়া গেল না। নবাব ও বেগমরা তো এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। শুধু কি তাই? গাছপালা-ফুল-পাখি-ঝরনা, সবাই কাঁদতে লাগল। আহা এমন সাধের নবাবজাদা কোথায় হারিয়ে গেলেন? কে নিয়ে গেল তাকে? সারা দেশ খুঁজেও বেনজিরের হদিশ পাওয়া গেল না, বুঝতেই পারছেন।

পরি মাহরুখের দেশে বন্দি হয়ে রইল বেনজির। বছরের পর বছর কেটে গেল, তবু সে তার শহরের কথা ভুলতে পারল না। মাহরুখ সব কিছু দিয়ে তাকে ভোলানোর চেষ্টা করেও কিছু হল না। তখন একদিন সে বেনজিরকে এসে বলল, 'তুমি আমার কাছে বন্দি, তা তো জানো?'

—জানি।

—তা হলে আমার কথা মেনে চলো।

—আমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

—তা হবে না। তবু তোমাকে সব সময় এমন মনমরা দেখলে আমারও খুব কষ্ট হয় গো বেনজির। আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

—তা হলে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো। বেনজির মাহরুখের হাত চেপে ধরে।

মাহরুখ হেসে ওঠে।—বন্দির আর ফেরবার উপায় থাকে না বেনজির। তবে কিনা একটা ব্যবস্থা হতে পারে। রোজ সন্ধেবেলা আমি যখন আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন তুমিও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসতে পারো। আমি তোমাকে একটা জাদুঘোড়া দিতে পারি। সেই ঘোড়ায় চেপে ঘণ্টা তিনেক তুমি ঘুরে ফিরে এলে, তাতে মন ভাল থাকবে। যেখানে যেতে চাও, জাদুঘোড়া তোমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে লিখে দিতে হবে, যেখানেই যাও, তোমার দিল তুমি আর কাউকে দেবে না। আর এমনটা যদি ঘটে, তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাবে তুমি। মনে রেখো, আশ্‌নাই আমাদের যাই হোক, তুমি আমার বন্দি।

বেনজির মেনে নিল মাহরুখের কথা। না মেনে উপায়ই বা কী? পরির দেওয়া শাস্তি জানেন না তো ভাইজানেরা, সে দোজখের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এক রাতে জাদুঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে নীচে একটা সুন্দর বাগান দেখতে পেল বেনজির। আর সেই বাগানের ভেতরে চাঁদের আলোয় ঝকমক করছিল অপূর্ব এক প্রাসাদ। বেনজির বাগানে নেমে গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে থাকল, কেউ কোথাও আছে কি না। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝরনার পাশে কয়েকজন সুন্দরীকে দেখতে পেল সে। আর কী দেখল জানেন? যেন নক্ষত্রদের একেবারে মাঝখানে ভরা আলোর চাঁদ। সে আর এক নবাব মাসুদ শাহর নবাবজাদি বদর-ই-মুনির। মসলিনের পোশাকের ভেতর থেকে তার রূপ ফুটে উঠছিল যেন বাতিদানে জ্বলা মোমবাতির মতো। বেনজির আর চোখ ফেরাতে পারে না। তখন মনে পড়ল, পরি মাহরুখের কথা। তোমার দিল্ কাউকে দেবে না বেনজির। কিন্তু বেনজির কী করে? দিল্ তো সে দিয়েই ফেলেছে প্রথম দেখাতেই। আমাদের জীবনে এমনটাই ঘটত ভাইজানেরা। চোখে চোখ পড়ল তো আশনাই-এর আগুন জ্বলে উঠল। কেন জানেন? আসলে তো বন্দির মতোই জীবন কাটত আমাদের। সেই জীবনে মহব্বত আর নিকাহ্-এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না। মহব্বত মানেই তো গুনাহ্। মেয়েদের জায়গা জেনানামহলে, ভাই-বেরাদর ছাড়া কারও দিকে তাকানো যাবে না। আর পুরুষ তো কোনও নারীকে দেখতে পেত না। তাই একবার কোনও জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে তাকালেই হয়ে গেল। মহব্বত, গুনাহ্। ও সব যেন না হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি পারো বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? পুরুষকে যেতে হয়েছে কোঠাবাড়িতে, আর বেগমরা গোপনে গোপনে আশনাই চালিয়ে গেছে। প্রবৃত্তি, মান্টোভাই, প্রবৃত্তি—কে ঠেকাতে পারে? মীরসাবকে কেউ ঠেকাতে পেরেছিল? পারেনি বলেই তাঁকে পাগল বানিয়ে ছাড়া হয়েছিল। সমাজ তো এটাই পারে মান্টোভাই, যখনই তোমাকে মেনে নিতে পারবে না, তোমার গায়ে পাগলের ছাপ্পা মেরে দেবে। তখন তুমি সব তমদ্দুনের বাইরে। বোবা, কালা, ভাষাহীন।

হ্যাঁ, তারপর কী হল, বলি। সেদিনই বদর-ই-মুনিরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল বেনজিরের। মীরসাবের সেই শেরটা মনে পড়ছে,

গরমিয়াঁ মুত্তসিল রহেঁ বাহম
নে তসাহিল হো, নে তগাফিল হো॥
(এসো আমরা পরস্পরে আসক্ত থাকি চিরদিন
না যেন আগ্রহ হারাই, না আসে উদাসীনতা॥)

বদর-ই-মুনির তো বেনজিরের রূপ দেখে মূর্ছা গেল। তখন উজিরের মেয়ে, তার বন্ধুনী, নাজম-উন-নিসা, সে-ও অসামান্য সুন্দরী, গোলাপজল ছিটিয়ে নবাবজাদির

জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়ে নবাবজাদি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'কে আমার বাগানে এসে এইভাবে ঢুকল?' আসলে ওই কথার ভেতরে তো তখন অন্য এক আগুন জ্বলছে। প্রথম প্রেমে তো এইরকমই হয়, না কি? চলল মান-অভিমানের পালা। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা। তারপর বেনজির তার সব কথা—পরি মাহরুখের কাছে বন্দি হওয়ার কথাও বলল নবাবজাদিকে। তখন বদর-ই-মুনির কী বলল জানেন? বলল, 'আমি তোমাকে কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারব না। তুমি পরির কাছেই থাকো গিয়ে, এখানে আর এসো না।' বেনজির নবাবজাদির পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাহরুখ আমাকে ভালবাসে কি না, তা আমি জানতেও চাই না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। কিন্তু এবার আমাকে ফিরে যেতেই হবে। যদি ছাড়া পাই, তবে কাল আবার এই সময়ে আসব। আমার দিল্ আমি তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি, শুধু এই শরীরটা ফিরে যাবে মাহরুখের বন্দিশালায়।'

পরদিন বেনজিরের আসার জন্য সব কিছু ঠিকমতো প্রস্তুত হল। বদর-ই-মুনির এমনভাবে সাজল, যেন সেদিনই তার নিকাহ্। ফুলে-ফুলে, আতরের গন্ধে ভরে উঠল ঘর। পানপাত্র, সুরা, খাবার—সব প্রস্তুত। বিছানায় মাথার কাছে রাখা হল ফারসি কবি জুহুরি আর নাজিরির কবিতার কিতাব। বেনজিরও যথাসময়ে এল। খানিক কথাবার্তার পর দু'জনে বিছানায় গেল, পান করতে করতে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। এ সব কথা তো বলে শেষ করা যায় না। ঘর থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, বেনজির তখন আরও ঝকঝক করছে, আর বদর-ই-মুনির লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময় এগিয়ে এল, বেনজিরকেও ফিরে যেতে হল। এভাবেই চলতে লাগল দিনের পর দিন।

কিন্তু সুখের দিন তো বেশিদিন সয় না মানুষের জীবনে। পরি মাহরুখ সব কথা জেনে গেল, একদিন নিজের চোখে সব দেখেও এল। সেদিন বেনজির ফিরতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মাহরুখ, তার মুখ থেকে আগুন বের হতে লাগল, 'শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও বিশ্বাসঘাতক।' এক জিনকে ডেকে মাহরুখ বলল, 'মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে একে শুকনো কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও, কুয়োর মুখ ঢেকে দিও পাথর দিয়ে।' দিনে একবার জিন তাকে সামান্য খাবার দিয়ে আসত। অন্ধকার, শুকনো কুয়োয় বেনজিরের আর এক বন্দিজীবন শুরু হল। আর এদিকে বদর-ই-মুনির দিনের পর দিন বেনজিরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে যেন পাপড়ি-ঝরা ফুল এক। সে ফুলের দিকে কি তাকানো যায়? দিনের পর দিন তার কেটে যায় না ঘুমিয়ে। তারপর একদিন ঘুম এল আর সেই ঘুমের ভেতরে স্বপ্নে সে দেখতে পেল মরুভূমির মধ্যের কুয়োটাকে। কুয়োর ভিতর থেকে ভেসে আসছে বেনজিরের ডাক। ঘুম ভেঙে গেল তার। বন্ধুনী নাজম-উন-নিসা স্বপ্নের কথা শুনে বলল, 'আর কেঁদো না তুমি। আমি মরুভূমিতে গিয়ে বেনজিরকে নিয়ে আসব। আমি বেঁচে থাকলে বেনজিরকে তুমি পাবেই।' সাধুর বেশে, হাতে বীণা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নাজম-উন-নিসা।

একদিন পূর্ণিমার রাতে মরুভূমিতে বসে বীণা বাজাচ্ছিল সে। তার বীণা শুনে পশু-পাখিরা ঘুম ভুলে গেল, গাছের মাথায় হাওয়া খেলতে লাগল, আর চাঁদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ঠিক তখনই সেই পথ দিয়ে উড়ন্ত সিংহাসনে চড়ে যাচ্ছিল জিন রাজপুত্র ফিরোজ শাহ। সে নীচে নেমে এসে নাজমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, বুঝতে পারল, সাধুর বেশে এ আসলে এক রূপসী। ফিরোজ শাহ তার পরিচয় জানতে চাইল। নাজম ফিরোজের মুগ্ধতা বুঝতে পেরে বলল, 'আল্লার দিকে মন ফেরান, না হলে ফিরে যান।' ফিরোজ বলল, 'হ্যাঁ, ফিরে যাব, শুধু একবার আপনার বাজনা শুনতে চাই।' নাজমের বীণা শুনতে শুনতে ভোর হয়ে গেল আর ফিরোজ শাহ, অমন এক মরদ, হাউ হাউ করে কাঁদছে। মেয়েরা কী না পারে, মান্টোভাই! এরপর কী হল জানেন? উড়ন্ত সিংহাসনে চড়িয়ে ফিরোজ শাহ নাজমকে তার বাবার দরবারে নিয়ে গেল। জিনরাজার অনুরোধে বীণাও বাজাতে হল নাজমকে। তার বাজনা শুনে কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। আর ফিরোজ শাহ? সে বুঝল, এ নারীকে ছাড়া আমার জীবন বাতিল হয়ে যাবে। নাজম জিনরাজার প্রাসাদেই থেকে গেল আর ফিরোজকে নিয়ে বেশ খেলতেও লাগল। এই ফিরোজের প্রতি সে গদগদ, পরক্ষণেই ঠাণ্ডা। একদিন ফিরোজ তার পায়ে পড়ে গেল, 'কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ? তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।' নাজম দেখল, এই তো সুযোগ, সে হেসে বলল, 'আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোনো, কাজটা করতে পারলে তোমারও লাভ হতে পারে।' নাজম তখন সব কথা খুলে বলল।

—আমি কী করব, বলো।

—তুমি তো জিন। মাহরুখ কোথায় বেনজিরকে বন্দি করে রেখেছে, তা তুমি ইচ্ছে করলেই জানতে পারো। তুমি সাহায্য করলে বেনজিরও বাঁচবে, তুমিও যা চাও, তাই পাবে।

ফিরোজ শাহের নির্দেশে জিনেরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ল বেনজিরের খোঁজে। কিছুদিন পর এক জিন খোঁজ নিয়ে ফিরল। ফিরোজ শাহ কড়া ভাষায় মাহরুখকে খৎ লিখে পাঠাল, বেনজিরকে মুক্তি না দিলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তাকে। আর শপথ করতে হবে, কখনও কোনও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে তৈরি করবে না সে। মাহরুখ তার দোষ স্বীকার করে অনুরোধ জানাল, তার বাবাকে যেন কিছু না জানানো হয়। এভাবেই শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল বেনজির।

এরপর একদিন উড়ন্ত সিংহাসনে চড়ে ফিরোজ শাহ, বেনজির আর নাজম-উন-নিসা চলল বদর-ই-মুনিরের কাছে। বেনজির ফিরে এসেছে শুনে তো নবাবজাদি অজ্ঞানই হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে নাজম-উন-নিসা তাকে বলল, 'বেনজিরকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য একজনকে বন্দি করে নিয়ে এলাম আমি। দেখি, এবার কীভাবে তাকে ফেরত পাঠানো যায়।' এরপর? সারা রাত

ধরে চলল দু'জোড়া কপোত-কপোতীর বকমবকম। কথা যেন শেষই হতে চায় না। কথা যে কত বড় ফাঁদ, তা যদি মানুষ বুঝত, মান্টোভাই!

বদর-ই-মুনিরের ওয়ালিদ মাসুদ শাহকে এরপর চিঠি লিখে নিজের পরিচয় জানাল বেনজির, নিকাহর প্রস্তাবও পেশ করল। নবাব তা সানন্দে মেনে নিলেন। মাসুদ শাহর নগরী আনন্দে মেতে উঠল। একদিন ধুমধাম করে বেনজির ও বদর-ই-মুনিরের বিয়েও হয়ে গেল। কেমন হয়েছিল সেই বিয়ে? ভাইজানেরা, কতদিন কবরে শুয়ে আছি, সে-ভাষা ভুলিয়া গেছি। এরপর বেনজিরের অনুরোধে নাজম-উন-নিসার বাবাও ফিরোজ শাহর সঙ্গে বিয়েতে মত দিলেন। উড়ন্ত সিংহাসনে চড়ে ফিরোজ শাহ তার বিবিকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল। বেনজিরও তার বিবিকে নিয়ে নিজের শহরে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করল।

কেমন লাগল ভাইজানেরা, আমাদের দু'জনের বদনসিবি কিস্‌সার মাঝখানে মধুর মিলনের এই গল্পটা? কিন্তু মসনবিটা লিখে মীর হাসান কী পেলেন? কিচ্ছু না। শুধু এতদিন পর, এই কবরের অন্ধকারে, আমি আপনাদের এই হিকায়ৎটা শোনাতে পারলুম। কবির নসিবে এ ছাড়া আর কী জোটে, বলুন?
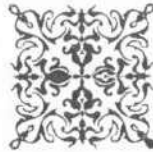
হর কদম দূরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝ-সে,
মেরী রফ্‌তার-সে ভাগে হই বয়াবাঁ মুঝ সে।
(প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্যের সুদূরতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,
আমার চলাকে পিছনে ফেলে জনশূন্য বনভূমি এগিয়ে চলে আরও জোরে।।)

কেয়াবাত মির্জাসাব, একেবারে নরক গুলজার করে দিলেন। কিন্তু বেনজির ও বদর-ই-মুনিরদের গল্পরা সব কোথায় হারিয়ে গেল বলুন তো? দেখছেন, আমাদের ভাইজানেরা কেমন সব চনমনে হয়ে উঠেছেন, যেন আজিজের হোটেলে আমাদের টেবিলে প্লেটে প্লেটে শাহি কাবাব এল, এবারই তো জমবে মজা, কাবাবে-গাঁজায়-রঙ্গরসিকতায়। সেই সময় আমাদের ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ যেন কোন একটা মেয়ের পেছনে পড়ে গিয়েছিল, ভাল কথা, কিন্তু একটা মেয়ের জন্য সবসময় দিবানা

ভাব করে বসে থাকার কোনও মানে আছে, মির্জাসাব? ক্যাপ্টেনের সব সময় ভয়, মেয়েটা যদি অন্য কারও সঙ্গে ভেগে যায়। আরে যায় তো যাবে, দুনিয়ায় মাগি কি কম আছে? মাফ করবেন মির্জাসাব, কখন যে মুখ ফসকে কোন শব্দ বেরিয়ে যায়। এই রকম বেফাঁস শব্দ বেরিয়ে পড়লেই, ইসমত সামনে থাকলে, চোখ বড় বড় করে তাকাত, ইসমতই ছিল সেই মেয়ে, যে আমার পাঞ্জাবি ঝাঁকিয়ে বলতে পারত, 'আরে শালা, মাগি কাকে বলছিস রে? তুই কোন মাগির পেট থেকে পড়েছিস?' এ সব অবশ্য কখনও বলেনি। ইসমতের আখলাকির তো তুলনা ছিল না, শুধু ওই চোখ বড় বড় করে তাকানো, তাতেই যা বোঝার বুঝে নাও। যাকগে, ইসমতের কথা বাদ দিন, এরা আবার সবাই আজিজের জাহান্নামের কিস্‌সা শোনার জন্য চুলবুল করছে দেখতে পাচ্ছেন তো?

তো, একদিন আমাদের ক্যাপ্টেন ঝড়ে-ভাঙা লতার মতো টেবিলে এলিয়ে পড়ে আছে, কয়েক দিন ধরে নাকি মেয়েটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কত চাঙ্গা করার চেষ্টা করি, তবু সে শালা কেন্নোর মতো গুটিয়ে পড়ে থাকে, হাসি-মস্করা-খিস্তি কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না। এ কোন মজনু রে বাবা, অথচ নাম দ্যাখো, ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ। অনেক চেষ্টার পর কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'সাদাতভাই, মেয়েরা কেমন হয় গো?'

—মানে?

—ওরা কি ভালবাসতে জানে?

—তার আমি কী জানি? আমার মেজাজ চড়ে গেল।

—আরে ইয়ার বলোই না—। আশিক আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'তোমার সেই বেড়ালের গপ্পোটা ক্যাপ্টেনকে বলে দাও। তা হলে আর সারা জীবন একটা মেয়ের পিছনেই ল্যাং ল্যাং করবে না।'

আশিকের কথায় আমাদের টেবিলে হাসির হল্লা উঠল। ক্যাপ্টেন ছলোছলো চোখে বলল, 'আমি তো মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করেছি। বেড়ালের কথা আসছে কোথা থেকে?'

—মান্টোর কাছেই শোনা। আশিক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মারে। মানে, বলো, তাড়াতাড়ি বলো। শালা ক্যাপ্টেনের আশনাই-এর ঝাড়ে বাঁশ যাক। আশিক ছিল সবার পেছনে লাগতে ওস্তাদ।

ক্যাপ্টেনের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'দ্যাখো ক্যাপ্টেন, আল্লার কসম খেয়ে বলছি, বেড়াল আর মেয়েদের আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

—কেন? বেড়াল তো বেড়াল আর মেয়ে তো মেয়েই। না-বোঝার কী আছে এতে?

—আমাদের বাড়িতে একটা বেড়াল ছিল, বুঝলে। বছরে একবার করে সে যে কী কান্না জুড়ে দিত, কী বলব ভাই। বেড়ালের কান্না শুনেছ তো? মনে হয় যেন পৃথিবীটাই কারবালা হয়ে গেছে। তার কান্না শুনে কোথা থেকে হাজির হত এক হুলো। তারপর দু'জনের ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যেত।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বেড়াল এরপর চারটে বাচ্চার মা হয়ে যেত। এত কান্না, মারামারির নিট ফল ওই চারটে বাচ্চা।

—তুমি শালা একটা হারামির বাচ্চা। বলতে বলতে ক্যাপ্টেন আবার টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ল। আজিজের হোটেল তখন হাসি-সিটিতে ফেটে পড়ছে।

কিন্তু মির্জাসাব, যতই এই সব টিকরমবাজি করি না কেন, আমার আর ভাল লাগছিল না। জুয়া খেলতে খেলতে যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আজিজের হোটেলের সকাল-সন্ধেগুলোও আমাকে আর কিছু দিতে পারছিল না। কী মনে হত জানেন? আমার তো আসলে অন্য কিছু করার কথা। কিন্তু কী করব? আমি বুঝতে পারতাম না মির্জাসাব। একদিন হঠাৎই ঘড়ির পেন্ডুলামটা উল্টো দিকে ঘুরে গেল। জীবন হয়তো এভাবে না চাইতেই আমাদের অনেক কিছু দেয়, যদি অবশ্য নেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে।

আজিজের হোটেলেই আমার নসিব অন্য দিকে মোড় নিল, ভাইজানেরা। আলাপ হল বারি আলিগ ও আতা মহম্মদ চিহাতির সঙ্গে। আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন এঁরা। মাঝে মাঝে আজিজের ওখানে চা খেতে আসতেন। আবদুল রহমান সাহেব তখন 'মাসাওয়াৎ' নামে একটা কাগজ শুরু করেছেন, বারিসাহেব সেই কাগজেই কাজ করেন। একদিন আজিজের হোটেলে বারি আলিগ সাবের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলাম। আরও অনেকেই ছিল। হঠাৎ কী প্রসঙ্গে যেন মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কথা উঠল। মৃত্যুদণ্ড ঠিক, না ভুল? একজন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কি কারও আছে? আমি বারিসাবকে অনুরোধ করলাম, স্যর, আপনি এ-ব্যাপারে আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি আপনাকে খুন করি, তা হলে কেন আমাকে হত্যা করা যাবে না? অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বোঝালেন, হত্যার বদলে হত্যা কোনও পথ হতে পারে না। শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কোনও নৈতিক ভিত্তি নেই। আর এই সব কথার মধ্যেই এসে পড়ল ভিক্টর উগোর 'দ্য লাস্ট ডে'জ অফ দ্য কনডেমড' বইয়ের কথা। ভিক্টর উগোর নাম আপনার শোনার কথা নয়, মির্জাসাব। ফ্রান্সের একজন সেরা কবি, ঔপন্যাসিক ছিলেন ভিক্টর উগো। আমি তো চমকে উঠলাম। আরে, বইটা তো আমার বাড়িতে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বারিসাবকে বললাম, 'বইটা আমার কাছে আছে। আপনি কি আর একবার পড়তে চান?'

বারিসাব অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী দেখছিলেন, কে জানে! তারপর বললেন, 'কাল বইটা নিয়ে আমার অফিসে এসো।'

সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি, মির্জাসাব। কেমন গর্ব হচ্ছিল। উগোর যে-বইয়ের কথা বারিসাব বলেছেন, বইটা আমার কাছেই আছে আর কাল আমি বইটা ওনাকে দিতে পারব। আচ্ছা, বই তো না হয় দেব, কিন্তু তারপর কী কথা বলব অমন মানুষের সঙ্গে? তিনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন? ভাবতে ভাবতে আমাদের দু'জনের কত সংলাপই যে তৈরি করে ফেললাম। গল্পও তো এভাবেই আমার ভেতরে জন্ম নিত, মির্জাসাব। এক একটা মুখ ভেসে উঠত, আর তাদের কথাগুলো আমি বুনে যেতাম। কথা বলতে বলতেই চরিত্রগুলো আমার সামনে ফুটে উঠত।

বারিসাব আমাকে একেবারে আপন করে নিলেন। আমি রোজ পত্রিকার অফিসে যাতায়াত শুরু করলাম। তাঁর কথায়, পাণ্ডিত্যে, রসবোধে আমি একেবার মজে গেলাম। বারিসাবের কথা পরে আমি 'গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে' বইতে লিখেছিলাম। অমন একটা মানুষকে তো সারা জীবনেও ভোলা যায় না। একই সঙ্গে বড্ড ভীরুও ছিলেন মানুষটা। কিন্তু তাঁর কথা আর হাসির সামনে একবার পড়লে, জমে যেতে হত। আমার ভেতরের অস্থিরতা বুঝতে পারতেন বারিসাব। আমাকে উর্দু সাহিত্য পড়তে বললেন। তাঁরই কথায় আমি গোর্কি, গোগোল, পুশকিন, চেকভ, অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা পড়তে শুরু করলাম। এঁরা সব দুনিয়ার বড় বড় লেখক। মির্জাসাব, এঁদের লেখা পড়তে পড়তেই আমি যেন আমার সামনের পথটাকে দেখতে পেলাম—আমিও লিখব, লেখাই আমার একমাত্র কাজ হতে পারে। এরপর বারিসাব কী করলেন জানেন? আমাকে দিয়ে উগোর 'দ্য লাস্ট ডে'জ অফ দ্য কনডেমড' উর্দুতে অনুবাদ করালেন। দু'সপ্তাহ টানা লেগে থাকলাম, এক ফোঁটা মদ ছুঁইনি। তারপর লাহোরের উর্দু বুকস্টল থেকে আমার অনুবাদের বইও বেরিয়ে গেল—আসির কিয়ে শরগুজস্‌ত্। আমায় আর দেখে কে? শালা, ফালতু নাকি? এই দ্যাখ, দ্যাখ শালারা, সাদাত হাসান মান্টোর নামে ছাপা বই।

'মাসাওয়াৎ'-এ আমি নিয়মিত সিনেমার রিভিউ লিখতে শুরু করলাম। বারিসাবের মতে, ওই রিভিউ লেখার মধ্যে দিয়েই নাকি গল্পলেখক মান্টোর জন্ম। মির্জাসাব, আমি তখন একসঙ্গে অনেক কাজ করতে চাইছিলাম। হাসান আব্বাসের সঙ্গে মিলে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটক 'ভেরা' অনুবাদ করে ফেললাম। এক বোতল মদ নিয়ে গেলাম আখতার শেরানির কাছে। সারা রাত ধরে শেরানিসাব মদ খেলেন আর আমার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করলেন। সেই সময় অনেক রাশিয়ান গল্পও অনুবাদ করেছিলাম 'হুমায়ুন' আর 'আলমগীর' পত্রিকায়।

একদিন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল 'মাসাওয়াৎ'। বারিসাব লাহোরের একটা কাগজে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। এর মধ্যে আরও কত কিছুই না ঘটেছিল। আমি, আবু সয়ীদ

কোরেশি, আব্বাস, আশিক বারিসাবকে নিয়ে অমৃতসরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের দলটার নাম দিয়েছিলাম 'ফ্রি থিংকার গ্রুপ'। আমরা যা খুশি তা-ই করতে পারি, ভাবতেও পারি। বিপ্লব করার কথাও ভেবেছিলাম। আমি আর আব্বাস ম্যাপ দেখে সড়ক পথে রাশিয়াতে যাওয়ার প্ল্যানও করেছিলাম। কিন্তু বারিসাব লাহোর চলে যাওয়ার পর, আমি তো আবার বেকার। লেখাতেও আর মন বসাতে পারি না। এক এক সময় মনে হয়, দূর শালা, জুয়ার ঠেকেই চলে যাই, সময়টা তো কেটে যাবে। কিন্তু জুয়া খেলার আগ্রহ আর তখন আমার ছিল না মির্জাসাব।

খবর এল, বারিসাব 'খুল্‌ক্‌' নামে নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেছেন। আমি আর হাসান আব্বাস গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে জুতে গেলাম। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বেরোল বারিসাবের প্রবন্ধ 'ফ্রম হেগেল টু মার্ক্স।'.... কী হল? আপনারা সবাই এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? চোখ দেখে মনে হচ্ছে, ঘুম পেয়েছে আপনাদের সকলের? মির্জাসাব, আপনারও? মাফ কিজিয়ে ভাইজানেরা, আমার বলার কথা কিস্‌সা, আর আমি কখন যে ইতিহাসের খপ্পরে পড়ে গেছি, বুঝতেও পারিনি। এখন আমারই হাসি পাচ্ছে। শালা, এ যেন আত্মজীবনী লিখতে বসেছি আমি। এই জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে গালাগালি দিতে হয়, শালা শুয়ার কাঁহি কা, কবরে এসেছ তুমি আত্মজীবনী মারাতে! কিন্তু একটা কথা বলে নিতে দিন। 'খুল্‌ক্‌'-এর ওই সংখ্যাতেই কিন্তু আমার প্রথম গল্প 'তামাশা' বেরিয়েছিল। গল্পটা নেহাতই কাঁচা ভেবে নিজের নাম দিইনি। সেই গল্পের বিষয় ছিল একটা সাত বছরের ছেলের চোখে দেখা ১৯১৯-এর মার্শাল আইনের দিনগুলো। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯১৯-এ আমার বয়সও ছিল সাত। আমার আফসানার ভেতরে এভাবেই আমি বারবার মিলেমিশে গেছি।

আচ্ছা, আমাদের মদের আড্ডার কিছু কিস্‌সা না হয় বলা যাক। দেখুন, দেখুন, মির্জাসাব, সবার চোখ কেমন চক চক করে উঠেছে। লাভ কী ভাই? এই কবরে দারু কোথায় মিলবে? গোরু যেমন জাবর কাটে, নেশা-ভাঙের দিনগুলো নিয়েই জাবর কাটুন, তাতে একটু নেশাও হতে পারে। বারিসাব বলতেন, আব্বাস আর আমার মতো মাতাল নাকি হয় না। সত্যি বলতে কী, খারাপ কথার জন্য মাফ করবেন, যাকে বলে পোঁদ উল্টে খাওয়া, আমি আর আব্বাস সেভাবেই মদ খেতাম। মদের ছিপি সবসময় খুলত আবু সয়ীদ কোরেশি। তারপর আর দেখে কে? আর বারিসাব? এমনিতেই তো সব সময় কথা বলেন, এক গ্লাস পেটে পড়লেই যেন ফোয়ারা ছুটত কথার। আমি আর আব্বাস তো হারামি, মনে মনে বলতাম, বলুন, যত খুশি কথা বলুন হজুর, কিন্তু আমরা তো মাল মেরে ফাঁক করে দিই। বারিসাবের তো বক্তৃতা দিতে পারলেই নেশা হত। কিন্তু সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার সাহস তাঁর ছিল না। সব আমাদের সামনে, মাল টানতে টানতে।

তবে মজার মানুষ তো, বারিসাব না থাকলে ঠেক যেন জমত না। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমি জানলার পাশে বসে আছি। বারিসাব হেসে বললেন, 'কী, মিঞা, হাল কেমন?'

—পানি কোথায়, যে হাল কেমন বুঝব?

তিনি দু'চোখে দুষ্টু হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও এখুনি আসছি।' কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। কাপড়ে জড়ানো মদের বোতল। আমি কিছু বলার আগেই ছিপি খোলা হয়ে গেছে। ততক্ষণে আব্বাসও হাজির। সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। আব্বাস বাইরের কুয়ো থেকে লোটায় জল নিয়ে এল। তারপর আসর জমজমাট। একসময় বারিসাবকে খেপানোর জন্য আব্বাস বলল, 'এ-বাড়িতে সবাই আপনাকে সম্মান করে। আপনি নামাজি মানুষ বলে বিবিজানও আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি হঠাৎ এসে পড়লে কী হবে?

বারিসাব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তা হলে জানলা দিয়ে পালিয়ে যাব, আর কোনও দিন তাঁকে মুখ দেখাব না।'

বারিসাবের যে ভীরুতার কথা বলেছিলাম, তা এইরকম। আর এই ভীরুতার জন্যই বারিসাবের মতো মানুষ যা করতে পারতেন, তার কিছুই তিনি করেননি। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে চাকরি নেবার পর তো আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দেখা হয়ে যেত। তিনি যেন আমাদের চিনতেই পারতেন না। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে জোহরাচকে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সমঝোতা করতে করতে একটা মানুষ কতটা ভেঙে পড়তে পারে, তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম। আমার সত্যিই দুঃখ হয়েছিল। এই সে-ই বারিসাব, যাঁর হাত ধরে মান্টোর নতুন জন্ম হয়েছিল?

ভাইজানেরা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। বারিসাব সম্পর্কে 'গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে'-তে আমি স্পষ্টই লিখেছিলাম, সমাজসংস্কারক হওয়ার খুবই সাধ ছিল বারিসাবের। ইচ্ছে ছিল, গোটা দেশ এক ডাকে তাঁকে চিনবে। তিনি হবেন জাতির বরেণ্য পথিকৃৎ। সব সময় ভাবতেন, এমন কিছু করবেন, যাতে আগামী প্রজন্ম তাঁকে মনে রাখবে। কিন্তু সেজন্য যে তাকৎ-এর প্রয়োজন হয় তা ছিল না বারিসাবের। তিনি শুধু দু'চার পেগ খেয়ে হিরামান্ডির মেয়েদের সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যেতেন। তারপর ফিরে এসে অজু করে নামাজ পড়তেন। আমার সত্যিই দুঃখ হয় মির্জাসাব, মানুষ নিজের পিঠের চামড়া বাঁচাতে এতটাই নীচে নামতে পারে? কবরের কোথাও তো বারিসাবও শুয়ে আছেন, হয়তো আমার কথা শুনছেনও, কিন্তু এখানে তো পালিয়ে যাওয়ার জন্য জানলা নেই। পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও জানলা খোলা থাকে না, তাই না, মির্জাসাব? এই জীবনের দাম সুদে-আসলে মিটিয়ে যেতে হবে

এখানেই। মাফ করবেন ভাইজানেরা, আবার কয়েকটা বড় বড় কথা বলে ফেললাম। কথা কী জানেন, বারিসাবকে যে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণাও করতে পারলাম না, শুধু অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই। আমার কী মনে হয় জানেন, যে অনুকম্পা পায়, তার চেয়েও খারাপ মানুষ, যে অনুকম্পা করে।

না, আর এই সব নৌটঙ্কিবাজি নয়, তার চেয়ে হিরামান্ডি নিয়ে কথা বলা ভাল। দেশভাগের আগে লাহোরকে কী বলা হত জানেন তো? প্রাচ্যের প্যারিস। আর হিরামান্ডি হচ্ছে তার জান। অনেকে বলত টিব্বি।

টিব্বি মেঁ চল কে জলবা-ই-পরওয়ার দিগর দেখ
আরে য়ে দেখ্‌নে কি চিজ হ্যয় ইসে বার বার দেখ

দেওয়ালে ঘেরা পুরনো লাহোরের রোশনির আর এক নাম হিরামান্ডি। এখানেই তো আমি সুলতানা, সৌগন্ধী, কান্তাদের খুঁজে পেয়েছিলাম ভাইজানেরা। হিরামান্ডি মানে যদি ভাবেন, শুধু কতগুলো মেয়ের মাংসের স্তূপ তা হলে ভুল করবেন। একসময় হিরামান্ডির তবায়েফদের কাছে আদাব আর তহজিব শিখতে আসত নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজাদের ছেলেরা। তবায়েফরাই তো শেখাতে জানত আদব-কায়দা। নাচে-গানে-কটাক্ষে গুফ্‌তগু-তে। মির্জা রুশোয়ার 'উমরাও জান' যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। আর আমাদের মির্জাসাব তো সবই জানেন। কত মশহুর তবায়েফের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে মির্জাসাবের। তবায়েফদের কোঠা তো শুধু মস্তি লোটার জায়গা নয়, সেই মেহফিলে যেতে হলে তার তরিকাও শিখতে হবে। যার তার গায়ে কেউ হাত দিতে পারত নাকি? আশনাই-এর ব্যাপার ছিল। দিল্‌-এ রং ধরাতে পারলে, তবেই না তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার কথা ওঠে। না হলে ঠুংরি, দাদরা, গজল শোনো, কথক দেখো, তারপর টাকা ফেলে ঘরে ফিরে যাও।

হ্যাঁ, আপনি হিরামান্ডির কোনও কোঠার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে দালাল আছে, ফুলওয়ালা আছে। দালালের সঙ্গে কথা বলে তবেই না আপনি কোঠায় পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু কোঠায় যাওয়ার আগে ফুলওয়ালার কাছ থেকে মালা কিনে কবজিতে জড়িয়ে নিতে হবে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে আপনি রংমহলে এসে পৌঁছলেন। ঝাড়বাতির আলো, দেওয়ালে দেওয়ালে আয়না, খানদানি সব ছবি, ফুল আর আতরের সুবাসে আপনার মন এক নিমেষেই যেন একটা বাগান হয়ে গেল, আর গাছে গাছে ডেকে উঠল কোকিলেরা। মেঝেতে কার্পেটের ওপর পাতলা সাদা চাদর পাতা আছে, তাকিয়াও মজুত, আপনি ঠেস দিয়ে বসুন। বাইজি এসে বসবেন একেবারে মাঝখানে। তাঁর পিছনে সারেঙ্গি, বীণা, তবলার শিল্পীরা। ওই যে, বয়স্ক মহিলাটিকে একটু দূরে বসে আছে দেখছেন, তিনি এই কোঠির মালকিন। একসময় নিজেও

তবায়েফ ছিলেন, এখন সব দেখভাল করেন। নতুন নতুন তবায়েফদের রেওয়াজ করিয়ে খুবসুরত করে তোলেন। মালকিনের পাশেই রাখা আছে সোনালি ও রুপোলি তবক-দেওয়া পানের খিলি-ভরা রুপোর খাসদান। শ্বেতপাথরের জলচৌকির ওপর সোনার কাজ করা গোলাপপাশ। একটা পাত্রে দেখবেন জাফরানমেশানো কুচো সুপুরি, মশলা, জর্দা। মালকিন প্রথমে সবার সঙ্গে বাতচিত করবেন, বুঝে নেবেন কোন মেহমানের তরিকা কেমন। এরপর এক তরুণী সারা ঘর ঘুরে ঘুরে সবার হাতে পানের খিলি তুলে দেবে। তখন কী করতে হবে আপনাকে? অন্তত একটা রুপোর মুদ্রা তার হাতে দিতেই হবে। এবার বাইজি এলেন সিল্কের সালোয়ার-কুর্তা পরে, কুর্তার বুকে সোনা বা রুপোর জরির কাজ করা বাহারি নকশা। মুখ ঢাকা আছে হালকা ওড়নায়, যেন একখণ্ড কুয়াশা ছড়িয়ে রেখেছেন মুখের ওপর। গয়নাগুলো ঝলসাচ্ছে আলোয়।

বাইজি এবার গান ধরবেন। প্রত্যেক মেহমানের জন্য আলাদা আলাদা গান, গাইতে গাইতে আপনার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারবেন, মৃদু হাসবেন। গান শেষ হলে আপনি তাকে কাছে ডাকুন, টাকার তোড়া তুলে দিন তার হাতে। এবার অন্য মেহমানের দিকে তিনি নজর ফেরাবেন। গানের সঙ্গে নাচও দেখার ইচ্ছে হতে পারে আপনার। তখন ঘুঙুরের মুখে বোল ফুটবে। গান-বাজনা-নাচের ছন্দের সঙ্গে মিলেমিশে আওয়াজ উঠছে, 'ওয়া ওয়া', 'বহুৎ খুব', 'মারহাব্বা', মারহাব্বা'। ব্রিটিশরা আসার পর হিরামান্ডির পুরনো জৌলুস চলে গেলেও সূর্যাস্তের আভাটুকু লেগেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে হিরামান্ডি যেন মাংসের কারাগার হয়ে উঠল। কারা আসত তখন? নতুন গজিয়ে-ওঠা ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, যুদ্ধের বাজারে ফোকটে পয়সা করা লোচ্চারা, যারা তরিকা শব্দটার মানেই জানে না। এই দুই হিরামান্ডিই আমি দেখেছি ভাইজানেরা। কোঠার বাইজিদের কল-গার্ল হয়ে যেতে দেখেছি, যারা টাকা হাতে পেলেই যে-কোনও হোটেলের বিছানায় আপনার সঙ্গে গিয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু আমার কাছে তো হিরামান্ডি মানে সোনার জলে মিনে করা একটা ছবি।

মাংস নয়, মহব্বত-এর জন্যই এখানে আমি মানুষকে ফতুর হয়ে যেতে দেখেছি। তার নাম আমি বলব না; সে ছিল পাঞ্জাবের এক জমিদার। হিরামান্ডির জোহরাজানের প্রেমে পড়েছিল সে। প্রায়ই সে হিরামান্ডিতে এসে জোহরাজানের সঙ্গে থাকত। লোকে বলত, জোহরাজানের যৌবন নাকি তার হাতেই তৈরি। মানেটা বুঝতে পারছেন তো ভাইজানেরা? হঠাৎ একদিন জমিদারের শখ হল, সে গাড়ি কিনবে, আর গাড়িতে চড়িয়ে জোহরাকে নিয়ে লাহোরের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। জমিদার হলে কী হবে, টাকাপয়সা বেশি জমাতে পারেনি; জোহরার পরিবারের পিছনেও দেদার টাকা খরচ করেছিল সে। কিন্তু গাড়ি যে কিনতেই হবে। শেষে একটা গাড়ির কোম্পানির কাছ থেকে ধারে গাড়ি কিনে ফেলল সে। খেতির ফসল বিক্রি করে ছ'মাস অন্তর টাকা দিয়ে

ধার শোধের কড়ার করেছিল, তাতে তিন বছরেই সব টাকা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। গাড়ির কোম্পানি দু'বার সময় মতো টাকা পেল। কিন্তু তারপর থেকে আর জমিদারের পাত্তা নেই। সে যে কোথায় গেছে, কেউ জানে না। শুধু জানা গেল, জমিজিরেত বেচে জোহরাজানকে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে। গাড়িটা দেশের বাড়িতেই রাখা ছিল, তাই কোম্পানি গাড়িটা অন্তত ফেরত পেল।

এরপর বছর দশেক কেটে গেছে। সেই গাড়ির কোম্পানির ম্যানেজার তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে হিরামাণ্ডিতে এসেছেন রঙিন সন্ধ্যা কাটাবেন বলে। একটা কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সেই পালিয়ে যাওয়া জমিদারকে দেখতে পেলেন; তার চেহারা তখন একেবারে ভেঙে গেছে, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি।

—জোহরাজানের গান শুনবেন হুজুর? জমিদার এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল।

—আপনার এ কী অবস্থা হয়েছে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

—সব নসিবের লিখন হুজুর। জোহরাকে নিয়ে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কত চেষ্টা করলাম, যাতে ওকে ফিলিমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

—তারপর?

—কিছু হল না। আমার যেটুকু টাকাপয়সা ছিল, তাও উড়ে গেল। ফিলিমে ওরা কিছুতেই জোহরাকে জায়গা দিল না।

—তাই আবার ফিরে এলেন?

—কী করব বলুন? জোহরার জীবনটা তো চালাতে হবে। আমিই বা ওকে ছেড়ে যাব কী করে? তাই এখন ওর জন্য খদ্দের ধরে আনার কাজটা আমাকেই করতে হয় হুজুর।

হিরামাণ্ডিতে যেমন অনেক রোশনাই, তেমনি এভাবে অন্ধকারও আসে মানুষের জীবনে। ভাইজানেরা, এই অন্ধকারের ভিতরেও আমি একটা জোনাকি জ্বলতে দেখেছি। মহব্বতের জোনাকি। ফতুর হয়ে গিয়েও লোকটা জোহরাজানকে ছেড়ে যায়নি। আশিক্ থেকে দালাল হয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রেম মরেনি।

বারিসাবের মতো মানুষেরা হিরামাণ্ডিতে ওসব দেখতে পাননি। আর আমি হিরামাণ্ডি যেতাম মাংসের ভেতরে লুকনো রত্ন খুঁজতে, এইরকম জোনাকির আলো দেখতে। আল্লার কসম, মান্টো কখনও ওদের সঙ্গে শোওয়ার কথা ভাবেনি। সত্যিই কি? নাকি এটাও মিথ্যে বললাম?

দিলকী বিরানীকা কেয়া মজকুর হ্যয়
য়হ্ নগর সও মর্‌তবা লুটা গয়া।।
(আমার উজাড় হৃদয়ের কথা কী আর বলব,
এই নগরীটি বার বার লুণ্ঠিত হয়েছে।।)

মান্টোভাই, আমার মতোই এই শহরটা, দিল্লি, কতবার ভেঙে পড়েছে, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার ও দিল্লির নিয়তি যেন একই কলম দিয়ে লিখেছিলেন খোদা। তবে আমি যখন এসে দিল্লি পৌঁছলুম, তখন কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছে, কিন্তু তা তো আসলে শ্মশানের শান্তি, দিল্লির রওনক তো কবেই হারিয়ে গেছে। সেসব কথা আপনারা ইতিহাস বইতে পড়েছেন; কীভাবে ফারসি, আফগান, মারাঠাদের একের পর এক আক্রমণ আর দরবারের ভেতরকার খেয়োখেয়িতেই দিল্লি একটা খণ্ডহর হয়ে গেছে। মীর, সওদার মতো কবিরা এক সময় দিল্লি ছেড়ে লখনউ চলে গিয়েছিলেন জানেনই তো। কেন চলে যেতে হয়েছিল তাঁদের? তবে মীরসাবের একটা শের বলি :

অ. খরাবহ্ হুয়া জহান্-এ আবাদ
বরনহ্ হরেক কদমপে যাঁ ঘর-থা।।
(আজ উজাড় হয়ে গেল যেখানে জমজমাট নগর ছিল,
নইলে এখানে তো প্রতি পদেই বাড়ি ছিল।।)

আমার সামনেও দিল্লি আবার এভাবে উজাড় হয়ে গেছে, মনে হত যেন কারবালায় দাঁড়িয়ে আছি, তবু এই শহরটা ছেড়ে যেতে পারিনি আমি; কিন্তু অনেকবার তো ভেবেছি, কে পৌঁছে আমাকে এই শহরে, এ তো এক কারাগারের মতোই এসেছে আমার জীবনে, তবু আলবিদা বলতে পারিনি। কেন জানেন? ওই যে বলেছি, খোদা আমার আর দিল্লির নিয়তি একই কলমে লিখেছিলেন। তাকে ফেলে যাব কোথায়? জীবনে যা পেয়েছি আর পাইনি, তার হিসেবনিকেশ তো শহরটার আত্মায় খোদাই হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলবে, পাগলামি, কিন্তু ওই জুনুন ছাড়া আমি বাঁচতাম কী করে বলুন তো? দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, তো কী? আমি মনে মনে বলেছি, চালাও, আরও গোলি চালাও, দেখি কত রক্ত তোমরা দেখতে চাও, কতখানি ঘিলু বের করে আনতে চাও,কত অপমানিত করতে চাও করো, কিন্তু তোমরা তো আমার

ভেতরের খুশবুটুকুকে ছুঁতে পারবে না, সেই ভাষাকে তো ছুঁতে পারবে না, যা সাজিয়ে সাজিয়ে আমি গজল লিখি। একদিন আমার পাপের কথাও থাকবে না, তোমাদের গোলি চালানোর কথাও ভুলে যাবে সবাই, বেঁচে থাকবে কিছু শব্দ আর ছন্দ, যার নাম মির্জা গালিব। যাকগে, এ সব বাদ দিন, লোকে হাসবে, বলবে, নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে কবিদের জুড়ি নেই। যখন কলকাতায় গিয়েছিলুম, তখন কার মুখে যেন শুনেছিলুম 'একই সঙ্গে সরস্বতী আর লক্ষ্মীর সঙ্গে ঘর করা যায় না।' আমিও লক্ষ্মীর সঙ্গে ঘর করতে পারিনি। সরস্বতীর প্রেমে পড়েছিলুম যে। ইয়া আল্লা! কী যে বলি আমি! গোস্তাকি মাফ করবেন, আসলে হিন্দুদের আর কোনও দেবীর হাতে তো বীণা দেখিনি আমি। মুনিরাবাইয়ের প্রেমে পড়েছিলুম গানের জন্যই। উমরাও বেগম তো আমার কানের কাছে সবসময় কোরান আর হাদিসের বাণী শুনিয়ে যেত। পবিত্র ফুল আপনি কল্পনা করতে পারেন মান্টোভাই, যার ওপর একটাও মৌমাছি এসে বসেনি? ফুল যে-সুধা তার ভেতরে জমিয়ে রেখেছে, মৌমাছি এসে সেই সুধা যদি না পান করে, তবে সেই সুধার সার্থকতা কোথায়? আমার শ্বশুর, নবাব ইলাহি বখশ্‌ খানও এ সব কথা শুনলে রেগে যেতেন। তিনিও শের লিখতেন, তাঁর তখল্লুশ ছিল মারুফ, জানেনই তো। হাসি পায় কী জন্য জানেন? মারুফের একটা শের আপনি এখন খুঁজে দেখুন তো, পান না কি কোথাও? কিন্তু ইতিহাসে লেখা আছে, তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। কুর্নিশ জানাই এমন ধর্মপ্রাণকে। কবি মারুফের কথা আল্লা তাঁর কোনও কিতাবেই লেখেননি। কেন জানেন? আল্লা তো কবিতা বোঝেন। তাঁর পয়গম্বর হজরতের ক'টা বিবি? আর কোরান? সে তো কবিতার ছন্দেই আল্লার কাছ থেকে পেয়েছিলেন হজরত। মান্টোভাই, কোরান আমার কাছে এক আশ্চর্য কবিতা, সেই কবিতায় জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-নিয়তি, গোটা বিশ্বসংসার এক খেলায় মেতে উঠেছে, যেমন আপনি বেদ-উপনিষদ, গীতা, জেন্দ আবেস্তায় পাবেন; আমার গজলে সেই খেলার ভেতরে ঢুকতে গিয়েই তো ফৌত হয়ে গেলুম। জওকসাব, মোমিনসাবের মতো কি লিখতে পারতুম না আমি? কিন্তু আমি জীবনটাকে বাজি ধরেছিলুম; আমার শাগির্দ হরগোপাল তফ্‌তাকে একবার লিখেওছিলুম, শোনো, গজল মানে সুন্দর সুন্দর শব্দ নয়, ছন্দ নয়, হৃদয় থেকে রক্ত না ঝরলে গজল লেখা যায় না। এক একটা শব্দ কত রক্তে ভেজা, আমি একা একা বসে অনুভব করেছি, মান্টোভাই।

কথায় কথায় অনেক দূর চলে এসেছি। কবরের বন্ধুরা, যাঁরা আমার কথা শুনছেন, মাফ করবেন। আসলে কী জানেন, আমার জীবনের ব্যর্থতা খেই-হারানো এইসব কথার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। আমাকে যারা অভিযুক্ত করেছে, তাদেরও ঠিকঠাক উত্তর আমি দিতে পারিনি; আসলে আমি তো সব ভুলে যেতুম। আমার কাছে প্রত্যেকটা দিন ছিল নতুন—একটাই দিনের জীবন—পরের দিনের কথা আমি তো জানি না। আমি আপনাদের কাছে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছি, আমি অনেক পাপ করেছি—শরিয়তে

যেহেতু তাকে পাপ বলা হয়, তবে কি না পাপ-পুণ্যের বিচার তো এই দুনিয়ায় হওয়ার নয়, সে হবে কেয়ামতের দিনে, আল্লার দরবারে—কিন্তু কারুর জন্য আমার মনে প্রতিহিংসা আসেনি। কেন জানেন? আপনারা হাসবেন হয়তো, তবু বলি, ভাগ্যিস কবিতার সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলুম আমি, ভাগ্যিস আমি দিল্লিতে আমার নিজের হাভেলি বানানোর কথা ভাবিনি, ভাগ্যিস আমাকে একের পর এক মুশায়েরায় অপমান করা হয়েছে, ভাগ্যিস আমি পেনশনের টাকা আদায়ের জন্য ছুটে ছুটেও তা পাইনি, ভাগ্যিস আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে নবাব-মহারাজাদের দান-খয়রাতের ওপর, ভাগ্যিস আমাকে মনে করানো হয়েছে, গালিব, তোর বাবার কোনও বাড়ি ছিল না, তোরও কোনও বাড়ি নেই, ভাগ্যিস আমি এতিমের মতো জন্মেছি, এতিমের মতো জীবন কাটিয়েছি, এতিমের মতো মরেছি, ভাগ্যিস আমি জুয়াখেলার জন্য জেলখানায় জীবন কাটিয়েছি—আর ততই চিনেছি মানুষদের—আসলে তো তারা সব ছায়াপুতুল—জানেই না জীবন তাদের কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও জানতুম না। কিন্তু তারা অজ্ঞানের মতোই বিশ্বাস করেছে, তারা মক্কার পথে চলেছে। আমি সে-পথে কোনওদিন যেতে চাইনি, মান্টোভাই। সেই শেরটা আপনার মনে আছে?

হুঁ মৈ-ভী তমাশাই-এ নৈরঙ্গ্-এ-তমন্না,
মৎলব নহীঁ কুছ ইস-সে কেহ্ মৎলব-হী বর আয়ে।।
(বাসনার নিত্য নব রঙের দর্শক আমি,
আমার বাসনা কোনওদিন পূর্ণ হবে কিনা, অবান্তর সে-কথা।।)

মাফ করবেন, সেই একই নিজের ভেতরের অন্ধকারের কথা বলে চলেছি আমি। না, এবার একটু রংদার কথায় আসা যাক। গভীর নির্জন পথের কথা বেশিক্ষণ কেউই শুনতে পারে না। আমিও পারতুম না; মশকরা না করলে এই এক জন্মেরই হাল্কা জীবনটাকে কেউ বইতে পারে? এত হাল্কা—দু'দিন পর কেউ কারুর থাকবে না—তাই বইতে পারা যায় না। কেউ কি বিশ্বাস করবে মান্টোভাই, মৃত গোলাপের সামান্য একটি পাপড়ির ভার আমি বইতে পারতুম না। এ সব শুনে কী বলবে লোকে? ওই বজ্জাতটা সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারত খুব, কী দিয়েছে নিজের বিবিকে, এতগুলো বাচ্চা পয়দা হওয়ার পরেও পনেরো মাসের বেশি বাঁচেনি কেন তারা, কী করেছে ওই বুরবাকটা তার বাচ্চাদের জন্য? আমি তাদের জন্য একটা গল্প বলি। আপনারা রাবেয়ার নাম জানেন? বস্‌রার সুফি সাধিকা রাবেয়ার কথাই বলছি, একেবারে ভিখিরির ঘরে জন্ম হয়েছিল তাঁর, বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ক্রীতদাসী হিসাবে তাঁকে বাঁচতে হয়েছিল অনেকটা জীবন। তাঁর একটা কিস্‌সা লিখেছিলেন আতরসাব 'তদ্‌খিরাৎ-আল-আওলিয়া'-তে। সে এক মজার কিস্‌সা।

রাবেয়াকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

—অন্য দুনিয়া থেকে। রাবেয়া হেসে বললেন।

—আর কোথায় যাচ্ছেন?

—আর এক অন্য দুনিয়ায়।

—তা হলে এই দুনিয়ায় কী করছিলেন?

—একটু খেলতে এসেছিলাম, ভাইজান।

এই কিস্‌সাটা বললুম বলে ভাববেন না যে আমিও একজন সুফি সাধক ছিলুম। সে ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি তো সারা জীবন আয়নার সামনে বসে থাকা এক মানুষ, সে শুধু প্রতিবিম্বই দেখে চলেছে। আমি কী করে সাধক হব বলুন? আমি তা দাবিও করিনি কখনও। কিন্তু যাঁরা জীবনে সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে করে গেছে, যাতে এতটুকুও দাগ না লাগে, তারা যখন বলেছে, আমরাই তো দীনের পথে চলেছি, তখন আমাকে একটু মুচকি হাসতে হয়েছে। তা হলে আল্লা কেন ধুলো দিয়ে আদমকে বানালেন? কেন তাকে পাপের পথে ঠেলে দিলেন? আল্লা যদি নিজের ভেতরেই থাকতেন, তা হলে নিজেকে দেখতেন কীভাবে? আদমের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখলেন তিনি। পাপের পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখলেন কোথায় তার পুণ্য। না, না, আমি আমার সাফাই গাইছি না। মহাভারতের অনেক কিস্‌সা তো আমি শুনেছি। সেখানে সবচেয়ে পুণ্যের অধিকার কার? একমাত্র যুধিষ্ঠিরের, তাঁর সারা জীবন তো শুধু নানা পাপেরই গল্প। পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে আর কেউ এত পাপ করেননি। তবু ধর্মরাজ কুকুর হয়ে তাঁরই সঙ্গী হলেন। কেন? এর উত্তর আমিও জানি না, মান্টোভাই। আরেকজনের কথা বলি। বেশ্যা পিঙ্গলার নাম শুনেছেন? 'উদ্ধবগীতা'-য় পিঙ্গলার কথা আছে। আমি জামা মসজিদের এক দস্তানগোরের কাছেই কিস্‌সাটা শুনেছিলুম। 'উদ্ধবগীতা'-য় দত্তাত্রেয় অবধূত রাজর্ষি যদুকে তাঁর চব্বিশজন গুরুর কথা বলেছেন। পিঙ্গলা তাদেরই একজন। অবধূত এক সন্ধ্যায় পিঙ্গলাকে দেখেছিলেন, নিজের বাড়ির সামনে প্রেমিকের সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকতে। সন্ধ্যা থেকে রাত গড়িয়ে গেল, কেউ এল না। পিঙ্গলা ভাবছিল, আজ কেউই এল না? ভগবানকে না ডেকেই আমার এই অবস্থা। নিরাশ হতে হতে সে নিরুদ্বেগ হয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। পিঙ্গলা অবধূতকে কী শেখাল? আশা ত্যাগ করলেই শান্তি। ভেবে দেখুন, একজন বেশ্যাও গুরু হতে পারে।

কিন্তু আমার শ্বশুর মারুফসাব দুনিয়ার সব কিছুর উত্তর জানতেন। দিল্লিতে এসে আমি আর উমরাও বেগম তো তাঁর হাভেলিতেই উঠেছিলুম, ছিলুমও বেশ কিছুদিন, কিন্তু লোকটাকে সহ্য করা যেত না। সব কিছু নিক্তি দিয়ে, পাই পাই করে মাপতেন। ওভাবে মানুষকে মাপা যায় নাকি? আমিও তাই তাঁর সঙ্গে মজা করতুম। এইসব মানুষ, যারা নিজেদের পবিত্র মনে করে, যারা কথায় কথায় বলে দেবে, কোন্ পথ আপনার জীবনের জন্য ঠিক, তাদের নিয়ে মজা করা ছাড়া আর কী করা যায়? যত মজা করবেন, দেখবেন, ততই তাদের তসবির ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। এইসব পবিত্র

মানুষরা, আমি দেখেছি, একটা জিনিসই জানে, কীভাবে, কতভাবে অন্যদের অপমান করা যায়। আমার ওয়ালিদের ঘরবাড়ি না থাকতে পারে, তুর্কি রক্ত তো আমার শরীরে, আমি সেই অপমান সহ্য করব? তাই আমার হাতের তাস ছিল মজা, ওই শালা মারুফসাবকে নিয়ে এমন মজা করো যাতে তাঁর মূর্তিটা ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়।

আমি ছোটবেলা থেকে রাস্তার কুত্তাদের খুব ভালবাসতুম, মান্টোভাই। আকবরাবাদের পথের কুকুররা আমার পায়ে পায়ে ঘুরত, আমি ওদের আদর করতুম, তাদের সঙ্গে কথা বলতুম। রাস্তার কুকুররা যেমন বন্ধু হয়, তেমন আর কেউ হতে পারে না, এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তারাও আমার গা ঘেঁষে বসত, আমার শরীরের গন্ধ শুঁকত, আর এমনভাবে তাকিয়ে থাকত, ওরা সত্যিই অনেক কথা বলতে চাইত, আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু কুকুরদের ভাষা তো আমি জানি না, আল্লা দয়া করে যদি সেই ক্ষমতাটুকু দিতেন, তা হলে জীবনটা দিনে দিনে পাথর হয়ে উঠত না। আর মারুফসাব কুকুরদের একেবারে পছন্দ করতেন না। একদিন বললেন, 'মিঞা, হাভেলিতে থাকো, রাস্তার কুকুরের সঙ্গে তোমার এত ভাব-ভালবাসা কেন?'

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, শালা কুত্তা কাহিকা। বলতে তো পারিনি। যাঁর বাড়িতে থাকি-খাই তাঁকে তো এ-কথা বলা যায় না। কিন্তু সেজন্য তো আমি তাঁর ক্রীতদাসও হয়ে যাইনি। আমি তাই মজা করতে শুরু করলুম।

—ওরা আপনার তো কোনও ক্ষতি করেনি।

—এত নোংরা জানোয়ার আর আছে নাকি! ছায়া মাড়ালেও গোসল করতে হয়। তুমি তা করো?

—না।

—তওবা, তওবা, কোরানের একটা কথাও তুমি মানো না?

—মানি তো।

—তা হলে কুকুরদের সঙ্গে এত মাখামাখি কিসের?

আমি হেসে ফেললুম।—আমিও তো এক কুকুর, মারুফসাব।

—মানে?

—আমার ওয়ালিদের কোনও হাভেলি নেই। দাদার বাড়িতে আমি বড় হয়েছি, তারপর আপনার মেয়েকে নিকে করে আপনার বাড়িতে এসেই উঠেছি। তা হলে আমাকে কুকুর বলবেন না কেন? আমার তো পথেই থাকার কথা ছিল।

—মিঞা, তোমার জুবান বড় বেশি। যার খাও, তারই মাথায় হাগতে চাও। মারুফসাব রাগে গরগর করতে লাগলেন।

—কুত্তার জুবানের মতোই জি।

—মিঞা, মুখ সামলাও।

—ভাঁদোর কুকুর দেখেছেন মারুফসাব? রাস্তায় কী করে? এইরকম ভাঁদোর কুকুর

মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে, হাজারবার গোসল করলেও সে সাফসুরত হয় না।

—কী বলতে চাও তুমি?

—আগে তো নিজেকে সাফসুরত করুন।

কোরান-হাদিসের এত এত বয়াৎ যার মুখে মুখে ফেরে, সে তা হলে ঘরে বিবি থাকতেও কোঠায় যায় কেন, মান্টোভাই? তার কি কোনও অধিকার আছে অন্যের সাফসুরতি নিয়ে কথা বলার?

আমি খুব সাচ্চা আদমি, এই দাবি কখনও করিনি। সত্যি বলতে কী, আমি দিল্লি এসেছিলুম লোভে পড়েই। মারুফসাবের খানদান পরিবার, দরবারের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে, ভেবেছিলুম শায়র হিসাবে দরবারে জায়গা পেয়ে যাব আমি, নিজের মর্জিমাফিক জীবন চলবে, সুরা আর নারীর প্রতি তখন তো আমার খুব টান ছিল। বেগমের সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক ছিল না আমার। সে থাকে জায়নামাজ-কোরান-হাদিস নিয়ে; দিনে দিনে তা আরও বেড়েছে, আর এক সময় তো নিজের খাওয়ার বাসনকোসনও আলাদা করে নিয়েছিল। কেন? আমি দারু খাই, গজল লিখি; তার কোরানে তো এ সব হারাম ছিল। দায়িত্ব তার খুবই ছিল, আমার কোথায় সুবিধে-অসুবিধে সব দিকে নজর রাখত, কিন্তু তাকে তো আর মহব্বত বলে না। জানি না, হয়তো সেটাই ছিল উমরাও বেগমের ভালবাসা। তবে কী জানেন, বয়স যত বেড়েছে, ভালবাসা শব্দটাকে আমি ততই অবিশ্বাস করেছি। সত্যি কি অবিশ্বাস করেছি? কিন্তু এটুকু জানি, দিনে দিনে আমার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। কেন? হয়তো আমার ভেতরেই ভালবাসা ছিল না, আমি কাউকে ভালবাসতে পারিনি। আজ কবরে শুয়ে মনে হয়, আমি ভালবাসার কাঙাল ছিলুম, নিজে কাউকে ভালবাসিনি। আমি তো মীরসাব নই, শুধু ভালবাসার জন্য কী অত্যাচারই না সহ্য করেছিলেন তিনি। লায়লা-মজনুর গল্প তো আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু মীরসাবের সেই দিনগুলোর কথা ক'জনই বা জানে? ইশ্‌কে দিবানা কাকে বলে, মীরসাব তা জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মীরসাবের কথাই বলছি; জানি, একজনের জীবনের ঘ্যানঘ্যানানি বেশিক্ষণ শোনা যায় না। নিজের কথা এত যে ফলাও করে বলে চলেছি, আমি জানি, এক কথায় আমার জীবনের গল্পটা যদি বলতে হয়, তবে শুধু একটা জিজ্ঞাসাচিহ্নই কাগজের ওপর বসিয়ে দিতে হবে। তার চেয়ে মীরসাবের সেই দিনগুলোতে ফিরে যাই, চলুন।

ক্ষতবিক্ষত এক শহর, তাঁর হৃদয়, মীরসাবের। সেই শহরের কথা তিনি 'মুআমলাত-এ ইশক্' মসনবিতে লিখে গেছেন। আমার তো মনে হয়, ভালবাসা নিয়ে যে-সব মসনবি মীরসাব লিখে গেছেন, 'মুআমলাত'-ই সেরা; এ যেন শিশমহলে

একটা আর্তনাদ পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কীসের আর্তনাদ জানেন? চাঁদ দেখার জন্য। সেই যে ছোটবেলায় নানি সন্ধেবেলা তার মুখ ধুইয়ে দেওয়ার সময় বলতেন, 'উপর মে তাকাও বেটা, দেখো, চাঁদ কো দেখো', তখন থেকেই চাঁদ তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, আর তারপর তো চন্দ্রাহতই হতে হয়েছিল। চাঁদের শরীরে তিনি তাঁর আশিক্‌কে দেখতে পেতে৲, এভাবে দেখতে দেখতেই একদিন পাগল হয়ে গেলেন। কে তাঁর আশিক্?

তাঁর নাম আমি জানি না, মান্টোভাই। আমরা যে-সমাজে বেঁচেছিলুম, সেখানে তো মসনবি-দস্তান ছাড়া মেয়েদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কী দরকার তাদের নামের? মোল্লারা তো তাদের বোরখা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, সে যে একা একজন মানুষ, সেই পরিচয়টাই মুছে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমরা তাঁর একটা নাম তো দিতেই পারি। কী নাম দিই বলুন তো? মেহর নিগার, কেমন হয়? ভারি সুন্দর নয় নামটা? তো এই মেহর নিগারের প্রেমে পড়েছিলেন মীরসাব, তখন তাঁর আঠারোর মতো বয়স। বিবাহিত মেহর বেগম মীরসাবের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়ই ছিলেন, তবে পারিবারিক সম্পর্ক থাকার দরুন পর্দা মেনে চলতে হত না, মীরসাবের সঙ্গে তিনি সহজভাবেই মেলামেশা করতেন। এই বেগমের চলাফেলা, আদবকায়দা নিয়ে পরিবারের সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। মীরসাব সেই সব কথা শুনতে শুনতেই একদিন প্রেমে পড়ে গেলেন মেহর বেগমের। মীরসাব তাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেন, কিন্তু কথা বলতে পারতেন না। কী বলবেন? যখন অনেক কথা নিজের ভেতরে জমে যায়, তখন আর কথা বলা যায়, মান্টোভাই? ধীরে ধীরে একদিন আড়াল ভেঙে গেল, মীরসাব তাঁকে স্পর্শও করলেন। 'মুআমলাত'-এ মীরসাব নিজেই লিখে গেছেন, আমি তার সৌন্দর্যের কথা বলতে পারব না, যেন আমার কামনার ছাঁচেই তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর হাঁটাচলায়, চোখ তুলে তাকানোয়, গ্রীবার ভঙ্গিতে গজলের ছন্দকে আবিষ্কার করতেন মীরসাব। একদিন কী হল জানেন? মেহর বেগম তখন পান খাচ্ছিলেন, ঠোঁট দু'টি সূর্যোদয়ের আকাশের মতো রাঙা, আর সেই ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মীরসাব নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বেগমের অধরের সুরা চাইলেন তিনি। প্রথমে হেসে নারাজ ভাব দেখালেও, বেগমও শেষ পর্যন্ত মীরসাবের অধরের সুরা পান করলেন। তারপর কী হতে পারে, ভাবুন। বেগমের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করার ইচ্ছে, আর বেগমও তা চাইছিলেন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর মেহর বেগম একদিন বললেন, 'এই ভালবাসার কোনও পরিণতি নেই মীর। এভাবে বেশিদিন চলা যায় না।'

মেহর বেগম নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর মীরসাব যেন এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। প্রতিটি রাত কল্পনায় মেহর বেগমের সঙ্গে কেটে যায়, কিন্তু দিনের বেলা অসহ্য হয়ে উঠল তাঁর কাছে। বছরের পর বছর আর কেউ কাউকে দেখেননি। এই অবস্থায় কী হয় মানুষের? চারপাশের জগৎটাই তো মিথ্যে হয়ে যায়,

তার কোনও অস্তিত্বই থাকে না। ব্যাপারটা জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয়-বন্ধুরা মীরসাবের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, তাঁকে পাগল বলতে শুরু করেছে। আপনি তো জানেনই মান্টোভাই, হাতি গর্তে পড়লে পিঁপড়েও লাথি মারে, মীরসাবের দশা তখন সেইরকম। তারপর মেহর বেগমই একদিন তাঁর কাছে এলেন গোপনে। বললেন, 'আমাদের দূরে সরে যেতেই হবে মীর। এমন ভালবাসায় সবাইকে একদিন এই বিচ্ছেদের মুখোমুখি হতে হয়। আমি যতদিন বাঁচব, তুমিও আমার হৃদয়ে থেকে যাবে।' বিচ্ছেদ এবার সম্পূর্ণ হল। রইল শুধু স্মৃতি, স্মৃতির ভার। মীরসাব পাগল হয়ে গেলেন। 'খোয়াব-ও-খেয়াল-এ-মীর'-এ সেই পাগলামোর দিনগুলোর কথাই লিখে গেছেন মীরসাব। চাঁদের দিকে তাকাতে তিনি ভয় পেতেন, তবু চোখ চলে যেত, আর চাঁদের শরীরে মেহর বেগমকেই দেখতে পেতেন। বিশ্বাস করুন, তাঁর চোখ থেকে ঘুম চলে গিয়েছিল, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েছিলেন, যেদিকেই তাকান, শুধু মেহর নিগার। ছবির পর ছবির চক্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।

তাঁকে সারানোর জন্য কত হাকিম এলেন, কত ঝাড়ফুঁক চলল, কিন্তু কে বুঝবে বলুন মীরসাবের যখন চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে অবস্থা, সেই চাঁদই তখন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। অনেক চেষ্টা করেও যখন সারানো গেল না, তখন কী করা হল জানেন? মীরসাবকে একটা ছোট কুঠুরিতে আটকে রাখা হল, হ্যাঁ শুনুন বলছি, কবরের চেয়েও ছোট সেই কুঠুরি। দিনে একবার খেতে দেওয়া হত তাঁকে। সুস্থতা বলতে কী বোঝে আসলে মানুষ? খাও, হাগো, খাও, হাগো, আর তুমি যা বিশ্বাস করো না, সেই কথাগুলো বলে যাও। তারপর কী হল জানেন? সবাই ঠিক করল, লোকটার শরীর থেকে বদ রক্ত বার করে দিতে হবে। রক্ত বেরোতে বেরোতে মীরসাব অচৈতন্য হয়ে গেলেন। তাতে কী? বদ রক্ত তো বার করতে হবে। মীরসাব পরে একটা শের-এ লিখেছিলেন, ক্রীতদাস হও, জেলে পচে মরো, কিন্তু ভালবাসার খপ্পরে পড়ো না। প্রেমে একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল, তারপর তো পড়ে আছে শুধু ছাই।

মীরসাব সেই আগুনের ছোঁয়া পেয়েছিলেন, আর আমি শুধু ছাইটুকু গায়ে মাখতে পেরেছিলুম। মীরসাবের মতো করে কাউকে ভালবাসতে পারিনি আমি। কেন জানেন? হয় খোদা আমার ভেতরে ভালবাসা দেননি, নইলে এতিমের মতো জীবন কাটাতে কাটাতে আমি ভালবাসার মানেই ভুলে গেছি; শুধু শব্দদের ভালবেসেছি, শব্দ কীভাবে মানুষকে ছোঁয় আমি বুঝতে পারিনি।

জীবন শুরুর দিনগুলোতে উমরাও বেগম একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কথা বলেন না কেন, মির্জাসাব?'

—কী কথা?

—আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না আপনার?

—করে তো, কিন্তু—

—কী?

—তুমি আমার থেকে অনেক দূরে বেগম।

—কত দূরে?

আমি আঙুল তুলে আকাশের একটা নক্ষত্রকে দেখিয়েছিলুম।

নগ্‌মহ্ হৈ, মহ্‌ব্-এ সাজ্ রহ্; নশহ হৈ, বেনিয়াজ রহ্
রিন্দ্-এ তমাম্-এ নাজ্ রহ্; খলক্-কো পার্‌সা সমঝ।।
(সুর আছে, ভেসে যাও সুরের স্রোতে; সুধা আছে, ভুলে যাও সব কিছু।
রূপসীর প্রেমে পাগল হয়ে যাও, সাধুতা থাক অন্যদের জন্য।।)

মির্জাসাব, আরে ও মির্জাসাব, এই দ্যাখো, বুড়ো আবার ঘুমিয়ে কাদা। এত বছর কবরে শুয়ে থেকেও ঘুমের কমতি নেই। নাকি মাঝে মাঝে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকেন? এ-বুড়োকে চেনা দায়, ভাইজানেরা। ওঁর গজলের মতোই বাইরের রূপে ভুললে ভেতরে কী মাল আছে বুঝতে পারবেন না। মোমিন, জওকরা যখন চাঁদ-ফুল-পাখি-নারী নিয়ে একই কথা লিখে যাচ্ছেন, নয়তো বাদশাহের প্রশস্তিগাথা লিখছেন, তখন মির্জাসাব এসে গজলের মরাস্রোতে ঢেউ খেলালেন। কীভাবে একজন শিল্পী এত বড় কাজ করতে পারে? যখন নিজের জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়েই কেউ শিল্পের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখে, তখনই এইরকম হতে পারে। এইসব মানুষ খুব আনপ্রেডিক্টেবল্, জানেন তো, মানে ধরাছোঁয়ার বাইরে; আমাদের প্রত্যেকটা দিনের যে রুটিন, সেই গজ ফিতে দিয়ে মির্জাসাবের মতো মানুষকে মাপতে যাওয়া ভুল। এক এক সময় মনে হবে, লোকটা একটা শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়, হয়তো তা-ই, শয়তানই, এমন এক শয়তান যে তার নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। মির্জাসাবের একটা মজার গল্প মনে পড়ল। রঙ্গরসিকতায় তো ওঁর জুড়ি কেউ ছিল না সে-সময়ে, কিন্তু ব্যঙ্গের চাবুকটা বেশির ভাগ সময় তিনি নিজের পিঠেই মারতেন। না, না ভাইজানেরা, বিরক্ত হবেন না, গল্পটা বলছি। ভাববেন না যে আমি মির্জাসাবের হয়ে সাফাই গাইছি। আমি কে যে তাঁর হয়ে সাফাই গাইব? আর মির্জাসাবের জীবনও

তো এখন আর কিস্‌সা ছাড়া আর কিছুই না। শুধু বেঁচে আছে তাঁর গজল; আমরা ভুল করি ভাইজানেরা, জীবনে একজন শিল্পীকে হারিয়ে দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু শিল্পীর সত্যিকারের জীবন শুরু হয় তো তাঁর মৃত্যুর পরে, তখন ইব্রাহিম জওকের মতো মানুষ শত চেষ্টা করেও সেই জীবনকে মলিন করে দিতে পারে না।

এবার কিস্‌সাটা শুনুন। মির্জাসাব যে-কামরায় সারাদিন থাকতেন, সেটা ছিল বাড়ির দরজার ছাদের ওপর। তার একদিকে ছোট একটা অন্ধকার কুঠুরি। দরজাটা ছিল খুবই ছোট, একেবারে কুঁজো হয়ে ঢুকতে হত। সেই ঘরে সতরঞ্চির ওপর মির্জাসাব গরমের সময় বেলা দশটা থেকে তিনটে-চারটে পর্যন্ত বসে থাকতেন। কোনওদিন একা, কোনওদিন সঙ্গী পেলে চৌসর খেলে দুপুরটা কাটিয়ে দিতেন। তখন রমজান মাস চলছিল। একদিন মৌলানা আর্জুদা এসে হাজির দুপুরে। মির্জাসাবের খুবই পেয়ারের মানুষ ছিলেন তিনি। তো সেদিন মির্জাসাব এক বন্ধুর সঙ্গে বসে চৌসর খেলছিলেন। রমজান মাসে চৌসর খেলা? মৌলানার চোখে এ তো গুনাহ্‌। তিনি বললেন, 'হাদিসে পড়েছিলাম, রমজান মাসে শয়তান বন্দি থাকে। এরপর আর হাদিসের কথা মানা যাবে না।'

—কেন?

—আপনি চৌসর খেলছেন,তা হলে আর হাদিসের কথা মানি কী করে বলুন?

—হাদিসে কত বড় সত্য লেখা আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? মির্জাসাব মিটিমিটি হাসেন।

—মানে?

—হাদিসের কথাই তো ঠিক। এই যে কুঠুরিটা, এখানেই তো শয়তান বন্দি হয়ে আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? কী, মিঞা কী বলেন? খেলার সঙ্গীকে শেষ প্রশ্নটা করে হা হা করে হেসে উঠলেন মির্জাসাব।

—আপনি নিজেকে শয়তান বলছেন?

—তা ছাড়া কী? আমার মতো একটা শয়তান না থাকলে আপনি মুফতি হতেন কী করে?

—মানে?

—সহজ কথাটাও বোঝেন না? শয়তান আছে বলেই না শরিয়তের এত নিয়মকানুন দরকার হয়ে। আর্জুদাসাব আমি তো কতবার বলেছি, আমি অর্ধেক মুসলমান। মদ খাই, কিন্তু শুয়োর খাই না।

মির্জাসাব যেমন বলেছেন, আমিও কতকটা সেইরকম বলতে পারেন। আমি কতখানি মুসলমান, তা নিয়ে এক বন্ধু একবার প্রশ্ন করেছিল। আমি বলেছিলাম, 'ইসলামিয়া কলেজ আর ডিএভি কলেজের মধ্যে ম্যাচে ইসলামিয়া গোল দিলে আমি লাফিয়ে উঠব। আমি এতদূর পর্যন্ত মুসলমান। তার বেশি নয়।'

আর একটা কিস্‌সা বলি, শুনুন ভাইজানেরা। এ তাঁর বুড়ো বয়সের কথা। তখন দিল্লিতে মহামারী লেগেছে, মানে কলেরা আর কী। মীর মেহদি হুসেন মজরুহ একদিন চিঠি লিখলেন, 'হজরত, শহর থেকে মহামারী পালিয়েছে নাকি এখনও মজুদ?' মির্জাসাব উত্তরে লিখেছিলেন, 'এ কেমন মহামারী, আমি তো বুঝতে পারি না। যে মহামারী দু'টো সত্তর বছরের বুড়ো-বুড়িকে মারতে পারে না, তার আসার কী দরকার ছিল বলুন তো?'

এই মির্জাসাবকে বোঝা আমার-আপনার কম্মো নয়। কিন্তু একটা মানুষ আর একটা মানুষকে পুরোপুরি বুঝতে চায়। গলদটা সেখানেই। যেখানে একজন মানুষ নিজেকেই নিজে চিনে উঠতে পারে না—হিমশৈলের চূড়াটুকুই সে মাত্র দেখতে পায়—সেখানে অন্য মানুষের তাকে পুরোপুরি বুঝতে চাওয়াটা হাস্যকর নয়, বলুন? আমাদের কথা বাদ দিন, ফরিদউদ্দিন আতরের মতো সুফি সাধকও বুঝতে পারেননি ওমর খৈয়ামকে। কেন জানেন? খৈয়ামসাব বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান নেই। দার্শনিক ইবন সিনার মতো খৈয়ামসাবের মনে হয়েছিল, আল্লা হয়তো সুরভিকে বুঝতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি ফুলের আলাদা আলাদা সৌরভ তাঁর কাছে পৌঁছয় না। ইবন সিনা বলতেন, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা কেউ নেই, আল্লার মতোই অনাদি অনন্তকাল ধরে সে আছে। আর খৈয়ামসাব একটা রুবাইতে লিখেছিলেন, এই বিশ্বে যখন আমার থাকার মতো জায়গা নেই, তখন মদ আর আশিককে ছেড়ে থাকা ভুল; এ-পৃথিবী তৈরি হয়েছে, না অনন্তকাল ধরে আছে, এই ভাবনা আর কতদিন? আমার চলে যাওয়ার পর তো এ সব প্রশ্নেরই কোনও মানে নেই। আতরসাব তাই কেয়ামতের দিনে খৈয়ামসাবকে যেভাবে কল্পনা করেছেন, সেখানে আল্লার দরবারে তাঁর মতো শয়তানের কোনও জায়গা নেই। কেন নেই? খৈয়ামসাবের এক রেন্ডি একজন শেখকে প্রশ্ন করেছিল। কী সাহস ভাবুন। শেখ ওই রেন্ডিকে বলেছিল, 'তুমি মাতাল, সব সময় ছলাকলায় মেতে আছো।' সেই রেন্ডি উত্তরে বলেছিল, 'আপনি যা বললেন, আমি তা-ই, কিন্তু আপনি নিজেকে যা মনে করেন, আপনি কি তাই?'

তাঁর মৃত্যুর পরের কথা খৈয়ামসাবই বলে গিয়েছিলেন। নিজামিসাব শিষ্য হয়েছিলেন খৈয়ামসাবের। খৈয়ামসাবকে শেষ তিনি দেখেন বল্‌খের ক্রীতদাস বাজারের রাস্তায় এক দোস্তের বাড়িতে। অনেকে সেখানে হাজির ছিল খৈয়ামসাবের কথা শোনার জন্য। খৈয়ামসাব নাকি বলেছিলেন, 'আমার কবর এমন জায়গায় হবে, যেখানে বছরে দু'বার গাছ থেকে ফুল ঝরবে।' নিজামিসাব কথাটা বিশ্বাস করতে পারেননি। খৈয়ামসাবের মৃত্যুর চার বছর পর, নিশাপুরে গিয়ে নিজামিসাব তাঁর গুরুর কবর দেখতে গেলেন। ফুলে-ফুলে ঢাকা সেই কবর দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন নিজামিসাব।

মাফ করবেন ভাইজানেরা, কথায়-কথায় অনেক দূর চলে এসেছি। আসলে কী

জানেন, মির্জাসাবের যে কিস্‌সাটা আপনাদের বলছি, তা তো শুধুই ওনার কিস্‌সা নয়। খোদা তো ধুলো থেকেই আমাদের তৈরি করেছেন। তা হলে ভাবুন, কত পুরনো, কত দূর দেশের ধুলো আর তাদের স্মৃতি রয়ে গেছে আমাদের ভেতরে। ভাবলে খুব মজা লাগে আমার, অনন্তকাল ধরে আমরা কোথাও না কোথাও আছি, ধুলোর ভেতরে লুকিয়ে।

[ অনুবাদকের কথা : এখানে এসে মান্টোসাব হঠাৎই থেমে গেছেন। কিস্‌সা আবার শুরু হওয়ার আগে মান্টোসাব একটা পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন, তা তুলে ধরছি। ওই অংশটা বাদ দিলেও অসুবিধা ছিল না। তবে আমরা যত দূর সম্ভব মূলানুগ থাকতে চাই। ফলে মান্টোসাবের এই বয়ানকেও উপন্যাসের অংশ মনে না করার কোনও কারণ দেখছি না। এই কিস্‌সার বাইরে ভেতরে মান্টোসাব যেটুকু লিখেছেন, তা হুবহু লিখছি :]

'মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগছে, লেখাটা কি সত্যিই গালিবের জীবন নিয়ে উপন্যাস হচ্ছে? আগে আমার এত ধন্দ ছিল না। কিন্তু লাহোরে আসার পর থেকে মদ খাওয়ার মাত্রা এত বেড়ে গেছে—সংসার চালানোর জন্যও এত ইতরামি করতে হচ্ছে—সংসারের দিকে কতটুকুই বা নজর আমার—নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যই ইতরামি বলা যায়—আমি অনেকদিন হল খেই হারিয়ে ফেলছি। মির্জা গালিবকে নিয়ে সিনেমার জন্য যে গল্পটা লিখেছিলাম, ওটা একটা ফ্রড, গোটা সিনেমার জগৎটাই ফ্রড, ওরা চেয়েছিল মির্জার অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে একটা গল্প। লিখে দিয়েছিলাম। সিনেমার গল্প, স্ক্রিপ্ট তো আমি লিখতাম শুধু টাকার জন্য। কিন্তু আমার উপন্যাসের গালিব তো গোগোলের 'ওভারকোট' গল্পের সেই লোকটার মতো, আমি যেন তাঁকে ধরতে পারছি না। তাই বেগমকে ডেকে এ-পর্যন্ত শোনালাম। লাহোরে আসার পর থেকে আমার লেখা শোনানোর লোক নেই। শফিয়া বেগমকেই শাস্তিটুকু পেতে হল।

—কী মনে হয় তোমার শফিয়া? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমি লেখার কী বুঝি বলুন? শফিয়া হাসে, 'ইসমত থাকলে বুঝতে পারত।'

—ইসমত তো নেই। তুমিই বলো।

—গুনাহ্‌ মাফ করবেন মান্টোসাব।

—বলো।

—মির্জাসাবের ওপর আপনি নিজেকে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

—তাই মনে হয় তোমার?

—জি।

বেগমকে আমি আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে শুধু বারবার বলেছে, 'আমি লেখার কী বুঝি বলুন? ইসমত থাকলে—।' ইসমত, ইসমত, ইসমত।

বারবার একই নাম। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি মরতে বসেছি জানে তবু চিঠি লিখলেও উত্তর দেয় না। পাকিস্তানে আসার জন্য ও আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল, আমি বুঝি। কিন্তু ইসমত তো ইসমতই। 'লিহাফ্'-এর মতো গল্প আর কে লিখতে পারবে? একেবারে হইহই পড়ে গিয়েছিল। মোল্লা থেকে শুরু করে প্রগতিশীল সবাই ইসমতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সমকাম নিয়ে গল্প? তাও আবার মেয়েদের মধ্যে। ইসমত সত্যিই একটা কাণ্ড করেছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি মির্জাসাবকে ডেকে এনে সামনে বসালাম।

—কেয়া মিঞা? আপ কেয়া মাঙতে হ্যায়? মির্জাসাব হাসতে শুরু করলেন।

—আপনাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছি। একটু শুনবেন? যদি বলেন, কিছু হচ্ছে না, আমি সালাম জানিয়ে সরে যাব।

—পড়ো শুনি। নিজের কিস্সা কে আর না শুনতে চায়?

পড়া শেষ হবার পর মির্জাসাব ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী মনে হল আপনার?'

মির্জাসাব পায়চারি করতে করতেই একটা শের বলতে লাগলেন,

> গরদিশ-এ সাগব্-এ জল্বহ্-এ রঙ্গীন তুঝ-সে
> আইনহ্দারী-এ এক দীদহ্-এ হৈরাঁ মুঝ-সে।।
> (সুরাপাত্রের গায়ে নানা বর্ণের চিত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও তুমি;
> বিস্ময়ে উদ্ভ্রান্ত চোখের আয়নায় আমি তা ধরে রাখি।।)

তারপর বললেন, 'লেখো, মান্টোভাই। জীবনে কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না, লেখায় তুমি আমাকে ছোঁবে সে আশা বৃথা। তবু লেখো। লেখাই তো দীন্-এর পথ।'

আমার জন্যও তবে দীন-এর পথ আছে? এত পাপের পরেও?'

মান্টোসাবের লেখা এই অংশটা পড়ে আমার বেশ মজাই লাগে। তবসুমকে জানাই, মির্জা গালিবকে নিয়ে উপন্যাস তো লেখা হল না আমার, তবে মান্টোসাবকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে হচ্ছে।

—কেন জনাব? তবসুম হেসে জিজ্ঞেস করে।

—এত বড় শয়তান আমি দেখিনি। শয়তানকে এক্সপ্লোর করার আনন্দই আলাদা।

—আপনি নিজেকে কী ভাবেন?

—কী?

—বলুন না।

—জানলে কোনও সমস্যা ছিল না। মান্টোসাব যেমন কথায় কথায় বলতেন, 'ফ্রড', 'ফ্রড', আমিও একটা ফ্রড। লেখা আমার 'ফ্রড'-এর বিজনেস বলতে পারেন।]

মির্জাসাবের কথাতেই ফিরে আসা যাক। শ্বশুর মারুফসাবের বাড়িতে বেশিদিন

থাকলেন না মির্জাসাব। একে তো শ্বশুরকে সহ্য করতে পারতেন না, তার ওপর দিল্লিতে এসে নিজেকে কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছেন। হ্যাঁ, এই স্বভাবটা ওনার পুরো মাত্রায় ছিল, ওই যে বলেছি, কখনও ভুলতে পারতেন না, তিনি তুর্কি সৈনিকদের বংশধর। আমিরি মেজাজ দেখানোটা ওনার রক্তের মধ্যেই ছিল। তাই শ্বশুরবাড়িতে থাকা সহ্য হল না। চাঁদনি চকের কাছে হাবাশ খান কা ফটক। তার পাশে সব্বান খানের হাভেলি ভাড়া নিলেন। এবার নিজের মর্জিমতো স্বাধীন জীবনযাপন। উমরাও বে গম পড়ে রইলেন জেনানামহলে, তাঁর কোরান-হাদিস-তসবি নিয়ে।

একটা কথা বলতেই হবে ভাইজানেরা, বেগমের দিকে কোনওদিন ফিরে তাকাননি মির্জাসাব। গজল-সুরা-মুশায়েরা-তবায়েফ-রঙ্গরসিকতা নিয়েই সবসময় মশগুল থাকতেন। এমনকী হয়নি যে উমরাও বেগম শৌহরের সঙ্গে কখনও কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁর কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন? নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন। কিন্তু মির্জাসাবের অবহেলা, নিষ্ঠুরতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। বেগমের সঙ্গে তিনি শুয়েছেন, সাত-সাতটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যারা কেউ এক-দেড় বছরের বেশি বাঁচেনি, কিন্তু নিজের রইসি জীবনে তিনি বুঁদ হয়ে থেকেছেন। আমি বুঝতে পারি, উমরাও বেগম কেন দিনে দিনে কোরানের ভেতরেই নিজের জীবনকে আটকে ফেলছিলেন, কেন শেষ পর্যন্ত নিজের খাওয়ার বর্তন পর্যন্ত আলাদা করে নিয়েছিলেন। এক একটা সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু তাঁকে ঠেলে দিচ্ছিল নিজের ভেতরের অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারে। মির্জাসাব বেগমের দিকে তাকাতে চাননি। বরং বেগমকে নিয়ে মজা করেছেন। কেমন জানেন? একবার বাড়ি বদল করার জন্য মির্জাসাব উঠে-পড়ে লাগলেন, নিজে নতুন বাড়ি দেখেও এলেন। উমরাও বেগম জিজ্ঞেস করলেন, 'হাভেলি কেমন লাগল মির্জাসাব?'

—দিবানখানা তো বেশ ভালোই। তবে জেনানামহল আমি দেখিনি।

—কেন?

—আমি দেখে কী করব? সে তো তোমার মসজিদ, তুমিই একবার দেখে এসো। মির্জাসাব হাসতে হাসতে বললেন।

—মসজিদ?

—তা ছাড়া কী? জেনানামহলকে তো তুমি মসজিদ বানিয়েই ছেড়েছ। যাও, আর কথা বাড়িও না, একবার দেখে এসো।

স্বামীর কথা মেনে নিয়ে উমরাও বেগম বাড়ি দেখে এলেন। মির্জাসাব জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলে? পছন্দ হয়েছে তোমার?'

—জি। ফির—

—ফির কেয়া?

—সবাই বলে, ওই হাভেলিতে জিন আছে।

—জিন? কারা বলে?

—হাভেলির আশপাশে যারা থাকে।

—তাঁরা তো তোমাকে দেখেছেন?

—জি।

মির্জাসাব হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়লেন।—আরে বেগম, দুনিয়াতে তোমার চেয়েও জবরদস্ত জিন আছে নাকি?

এ-কথা নিজের স্বামীর মুখে শোনার পর কোনও মেয়ের আর কিছু বলবার থাকে? উমরাও বেগম কান্না চাপতে চাপতে জেনানামহলে ফিরে গেলেন। ভাইজানেরা, এই মির্জাসাবকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। শফিয়া বেগমকে আমিও স্বামী হিসাবে যা-যা দেবার দিতে পারিনি, নিজের খেয়ালখুশিতে চলেছি, কিন্তু ওভাবে কখনও তাকে অপমান করিনি। মির্জাসাব খুব সহজে যে কাউকে অপমান করতে পারতেন, অন্তত তাঁর যৌবনের দিনগুলোতে। অপমান করলে তোমাকেও তো অপমান পেতে হবে। কিন্তু অপমান তিনি হজম করতে পারতেন না। আমি এত সব কথা বলছি বলে মির্জাসাবকে আপনারা কিচরে নামিয়ে আনবেন না। সাদা-কালো ছবি হয়, জীবনটা তো সেরকম নয়, সেখানে নানারকম ছায়া থাকে। আর মির্জাসাবের জীবনটা ছিল আমাদের দৈনন্দিনের জীবনের চেয়ে অনেক বড়, ইংরেজিতে বলে না, লার্জার দ্যান লাইফ? আপনারা তাঁর জীবন নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন, প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

দিল্লিতে শায়র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য কম অপমান তো মির্জাসাবকেও হজম করতে হয়নি। একের পর এক মুশায়েরায় তাঁর গজলকে, তাঁকে অপমান করা হয়েছে। কেন? তাঁর লেখা সমঝদার তখনও জন্মায়নি; বেঁটেখাটো কবিরা তখন কী করে? প্রতিভার গায়ে কাদা ছিটোয়, ঠাট্টা-মশকরা করে, তাঁর কবিতার গায়ে দুর্বোধ্যতার লেবেল সেঁটে দেয়। একটা মুশায়েরার কিস্‌সা বলি আপনাদের। দিল্লির বিখ্যাত কবিরা, রইস আদমিরা এসেছেন। একের পর এক কবিরা তাঁদের গজল পড়ছেন। 'কেয়া বাত, কেয়া বাত' আওয়াজ উঠছে, হাততালি পড়ছে, মির্জাসাব বুঝতে পারছেন, সব লেখা অন্তঃসারহীন, শুধু অলঙ্কারে ঠাসা, অনেক গয়না-পরা মেয়ের সৌন্দর্য যেমন হারিয়ে যায়। মির্জাসাবের যখন গজল পড়ার পালা এল, হাকিম আগা জান আইশ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'এত বড় শায়র গজল পড়ার আগে আমি কিছু বলতে চাই। আমাকে আপনারা অনুমতি দিন।'

মুশায়েরায় হুল্লোড় উঠল, 'বোলিয়ে জি, বোলিয়ে জি।'

—আপ লোগ আরজ কিয়া হ্যায়?

—এরশাদ, এরশাদ।

হাকিম আগা জান পড়তে শুরু করলেন,

সে কাব্য অর্থহীন, যা বোঝেন শুধু কাব
আনন্দ তো তবেই যদি অন্যে পায় সে ছবি।
মীরকে বুঝি, মির্জাকেও, কিন্তু গালিব যা লেখেন
ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন, তিনিই জানেন কে বোঝেন!

হাসির হুল্লোড় উঠল মুশায়েরায়। এরপরে একজন কবি কি তাঁর কবিতা পড়তে পারেন, ভাইজানেরা?

আর একবার কী হয়েছিল, বলি। রামপুরের মৌলবি আব্দুল কাদির এসে বললেন, 'মির্জাসাব, আপনার একটা উর্দু শের কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যদি বুঝিয়ে বলেন।'

—কোন শেরটা জানাব?

—ওই যে আপনি লিখেছেন :

গোলাপের গন্ধ তুমি
নিয়ে নাও মহিষের ডিম থেকে
আরও কিছু খুশবু আছে তাতে,
নিয়ে নাও মহিষের ডিম থেকে।

—কাদিরসাব এ তো আমার লেখা শের নয়।

—কিন্তু আপনার দিবান-এই তো পড়েছি। আপনি একবার খুলে দেখবেন নাকি?

মির্জাসাব বুঝতে পারলেন, এ আসলে তাঁর লেখা নিয়ে হাসিঠাট্টা করার নখরা। কিন্তু বন্ধু ফজল-ই-হকের সমালোচনা তো তিনি মেনে নিয়েছিলেন। একজন শিল্পীকে আক্রমণ করে তো আমরা তাঁকে বদলাতে পারি না। বন্ধুর মতো পাশে এসে যদি বলি, বিষয়টা নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা যদি আপনার থাকে, তবে শিল্পী তা মেনে নেন। ফজল্-ই-হকের সমালোচনা থেকে নিজের কাব্যভাষাকে বদলে নিচ্ছিলেন মির্জাসাব। কেননা বন্ধুর সমালোচনা তো মশকরা নয়, তা আসলে পিঠে হাত রাখা। আর ফজল্-ই-হকও বুঝতেন কাব্যভাষার অন্ধিসন্ধির কথা। কিন্তু এমন কেউ, যে তা বোঝে না, তার কি মির্জাসাবের লেখার সমালোচনা করার অধিকার আছে? পদার্থবিদ্যা-রসায়নবিদ্যা নিয়ে কথা বলার জন্য তো আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কবিতার বেলায় আপনি যা খুশি বলে পার পেয়ে যাবেন, তা তো হতে পারে না। কাব্যভাষা কীভাবে জন্মায়, তার ইতিহাস তার বিবর্তন না জেনেই কথা বলার অধিকার জন্মায় আপনার? যেহেতু কবির হাতে শুধু একটা কলম থাকে, আর বৈজ্ঞানিককে ঘিরে আছে যন্ত্রের পর যন্ত্র, সেজন্য কি কবির সম্বন্ধে এত সহজে কথা বলা যায়? এত অপমান সহ্য করার পর মির্জাসাব তাই একটা শের-এ লিখেছিলেন,

থী খবর গর্ম কে গালিব মে উড়েঙ্গে মুর্জে
দেখনে হম্ ভি গয়ে পেহ্ তামাশা না হুয়া।
(ছিল জোর খবর যে গালিবকে ছিন্নভিন্ন করা হবে

দেখতে আমিও গিয়েছিলাম কিন্তু তামাশাই হল না।)

অনেক আশা নিয়ে দিল্লিতে এসেছিলেন মির্জাসাব। কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন, আশা করে কোনও ফল ফলবে না। দিল্লি দরবারেও তাঁর জায়গা হয়নি। দিবানখানায় বসে তিনি একা নেশাগ্রস্ত, কাঁদতে কাঁদতে বিড়বিড় করেন,

নহী গর সর ও বর্গ্‌-এ অদ্‌রাক-এ মানে,
তমাশা-এ নৈরঙ্গঁ-এ সুরৎ সলামৎ।।
(অর্থ বুঝবার যোগ্যতা যদি নাও হয় কোনোদিন
তবু রূপের বর্ণবৈচিত্র্য দেখার শক্তিটুকু বেঁচে থাক।।)

মুহব্বৎনে জুলমৎসে কাঢ়া হ্যায় নূর
মুহব্বৎ নহ্‌ হোতী নহ্‌ হোতা জুহূর।।
(প্রেমই তমসার মধ্যে রচনা করেছে জ্যো ত,
প্রেম না থাকলে প্রকাশ সম্ভব হত না।)

মান্টোভাই, আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, আমি ঘুমোইনি, চোখ বুজে শুয়েছিলুম, আসলে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ১৮৫৭-র পর থেকে আমার আর জেগে থাকতে ইচ্ছে করত না, সত্যি বলতে কী, খোদার কাছে তখন থেকে আমার শুধু একটাই প্রার্থনা ছিল, আর-রশিদ, আমাকে এবার কবরের পথটা দেখিয়ে দিন। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব হারিয়ে আমাকে তবু আরও বারোটা বছর বেঁচে থাকতে হল। তা তো হবেই। আমার জীবনে কীই বা আর ঠিকমতো হয়েছে! তাই আস্তে আস্তে নিজেকে আমি বাইরে থেকে দেখতে শিখেছি, নিজের দুর্দশা দেখেই আনন্দ পেয়েছি। হয়তো হাসবেন, তবু বলি, আমি একসময় নিজেকে শত্রুর চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেছিলুম। কিসমতের এক-একটা চাবুকের ঘা আমার গায়ে এসে পড়েছে, আর আমি চিৎকার করে নিজেকেই বলেছি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কুত্তা গালিবটা আবার মার খেয়েছে। কত গর্ব ছিল না তোমার গালিব? তোমার মতো শায়র আর নেই, ফারসিতে তোমার সমকক্ষ কে আছে? এখন দ্যাখো, তোমার নামের পাশে কী লেখা আছে! কী? তুমি শালা দোজখের বাসিন্দা।' নিজেকে গালাগালি করতে করতে কেঁদে ফেলতুম। তারপর একসময় চোখ

থেকে আর জলও বেরোত না, চোখের ভেতরটা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করত। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতুম, আল্লা, আর পানি নয়, এবার আমার দু'চোখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ুক, আমি দু'হাতে রক্ত মেখে, সারা মুখে রক্ত লেপ্টে এবার এতিমের মতো মরে যেতে চাই। কিন্তু আল্লা আমাকে পৃথিবীতেই দোজখ দেখিয়ে কবরে পাঠাবেন। কেন জানেন? আমার একটাই গুনাহ্। এই নশ্বর জীবনটাকে তো খোদা একেবারে মুছে দিতে চান, আমি সেই জীবনের কয়েকটা মুহূর্তকে অনন্তের স্বাদ দিতে চেয়েছিলুম—আমার গজলে। খোদা তার জন্য শাস্তি দেবেন না? দেবেনই তো। কে হে তুমি মির্জা গালিব, খোদার দুনিয়ার পাশে শুধু শব্দ দিয়ে আর একটা দুনিয়া তৈরি করতে চাও? বেওকুফ! তুমি কবিতা লেখো, কিস্‌সা বানাও, তসবির আঁকো, সুর বাঁধো—তুমি বেওকুফ ছাড়া কী! কিন্তু আপনি কী করবেন, মান্টোভাই? শব্দকে যে আমি ভালবাসি, শব্দ ছেনে ছেনে রং বার করি, শব্দের গভীরে ঢুকে সুর শুনতে পাই, অন্ধকারকেও দেখতে পাই—এসব যে আমি পারি, তা তো আল্লারই দান। তবু তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন? আমি অনেক পরে এই শাস্তির অর্থ বুঝেছিলুম। যাকে দেখা যায় না, তাকে তুমি দেখেছ; যা শোনা যায় না, তা তুমি শুনেছ; যাকে অনুভব করা যায় না, তাকে তুমি অনুভব করেছ; এজন্য তো তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে। অনন্তের স্বাদ পাওয়ার জন্যই নরক-জীবন দেখতে হবে তোমাকে। আল হাল্লাজকে যেমন শাস্তি পেতে হয়েছিল। একটা নতুন দুনিয়া গড়তে চাও তুমি, আর তার ভার বহন করবে না, তা কখনও হয়?

কিন্তু দিল্লিতে আসার পর প্রথম দশ-বারো বছর এসব কিছুই ভাবিনি. একটু আগে আপনি বলছিলেন না যে দিবানখানায় বসে আমি কাঁদতুম, ওটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। না, মান্টোভাই, আমি তখনও কাঁদতে শিখিনি। হতাশ হয়েছি, বিরক্ত হতুম, একাও লাগত খুব মাঝে মাঝে, কিন্তু তখনও আমার চোখে মেঘ দেখা দেয়নি। মাটি ভিজবে, বাষ্প তৈরি হবে, আকাশে উঠবে, তারপর তো মেঘের দেখা; সেজন্য তো সময় লাগে। আর তখন তো আমি তরতাজা যুবক। আমার দিকে সবাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকত। কেন জানেন? আমার গায়ের রং ছিল জুঁইফুলের মতো সাদা। এই যে ঝুঁকে পড়া, চামড়া কুঁকড়ে-যাওয়া গালিবকে দেখছেন, একে দেখে সেই গালিবের আন্দাজ পাবেন না আপনারা। লম্বা, পেটানো চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল, নিজেই চুলে আঙুল চালিয়ে মখমলের স্পর্শ টের পেতুম। পর্দার আড়াল থেকে কত যে বেগম আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, তা আমি বুঝতে পারতুম, মান্টোভাই। আর তাকাবেই বা না কেন? দিল্লিতে ক'টা লোক ছিল আমার মতো? সবাই তো একইরকম পোশাক পরত, তাদের বড় বড় চুল আর মুখ ভরা দাড়ি। সব ভেড়ার পাল, বুঝলেন তো! তাই মির্জা গালিব যখন রাস্তা দিয়ে পালকি চেপে যেত, তার দিকে লোকজন তাকিয়ে থাকবে না, তা কি হতে পারে? পাজামার ওপর মিহি কাপড়ের কুর্তা, আর সেই কুর্তার বুকের ওপর জামদানি কাজ, কত ফুলের বাহার, কত

নকশা, মাথায় লম্বা কলাহ্‌ পপাখ টুপি। আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা, সব কিছুতেই তা ফুটিয়ে তুলতুম। এসব শিখেছিলুম 'মির্জানামা' থেকে। সে এক কিতাব ছিল ভাইজানেরা, ঠিকঠাক মির্জা হওয়ার আদব-কায়দা সেখানে লেখা ছিল। মির্জা কি যে কেউ হতে পারে? তার তরিকা আছে না? পোশাকে-ব্যবহারেই বোঝা যাবে, কে মির্জা, আর কে নয়। নিজের সমান মানুষ ছাড়া মির্জা কখনও যার-তার সঙ্গে কথাই বলবে না। আম আদমির চেয়ে সে আলাদা, তা বোঝানোর জন্য মির্জা হেঁটে কোথাও যাবে না, সবসময় যেতে হবে পালকিতে চড়ে। বাজারে গিয়ে কিছু পছন্দ হলে, দাম যা-ই হোক, মির্জা কিনে নেবে; অন্যদের মতো দরাদরি করবে না। আর কী করতে হবে? হাভেলিতে রইস আদমিদের ডেকে মেহফিল বসাতে হবে। একটা কথা শুনে রাখুন। সবাই যে তামাক খাবে, তা হতে হবে সুগন্ধী আর হাশিস মেশানো। শরাবে মেশাতে হবে মুক্তাচূর্ণ। মির্জা হতে হলে আপনাকে সাদির 'গুলিস্তান' আর 'বুস্তান' স্মৃতি থেকে বলতে জানতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, আপনি যখন কথা বলবেন, তাতে যেন ব্যাকরণের ভুল না থাকে। মাঝে মাঝে গজলের বয়েৎ বলতে হবে। ফুলের মধ্যে তার প্রিয় হবে নার্সিসাস। আর ফলের মধ্যে নারঙ্গ। তার কাছে আগ্রার কেল্লাই দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা; আর পারস্যের সবচেয়ে ভাল শহর ইস্পাহান। মাথায় যারা বড় পাগড়ি বাঁধে, মির্জা তাদের সবসময় ঘৃণা করবে।

বুড়ো হওয়ার পর সেই মির্জা গালিবের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেত খুব। আসলে কী জানেন, মানুষ যখন কোনও স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকে, তখন সে এভাবেই সবার থেকে নিজেকে অন্যরকম মনে করে, তারপর স্বপ্নভঙ্গের সময় শুরু হলে সে আস্তে আস্তে মাটিতে পা রাখতে শেখে, বুঝতে পারে, অন্যরকম হতে চাওয়াটা আসলে যৌবনের ঔদ্ধত্য; সত্যি তো এই যে, প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা আলাদা, কেউ কারোর সঙ্গে মেলে না, সবাই অন্যরকম। এই সত্যি বোঝবার জন্য, জীবনের পথে অনেক কারবালা পেরিয়ে আসতে হয়, মান্টোভাই।

না, না, বিরক্ত হবেন না ভাইজানেরা, জুঁইফুলের মতো সাদা যে-গালিবের কিস্‌সা আপনারা শুনতে চাইছেন, তা আমি আপনাদের শোনাব। কিন্তু মনে রাখবেন, জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে যখন নিজের জীবনটাকে দেখা হয়, তখন সেই গল্পটা তো সোজা পথে চলে না, নানা কথার ডালপালা এসে তাকে ঘিরে ধরে; একটা শেষ হওয়া জীবনকে আমি ফিরে দেখছি, সেই জীবনের সামনে নতুন আর কোনও পথ খুলে যাবে না, তাই আমার অনেক কথা মনে হবে, যদি এমনটা না হয়ে অমন হত, তা হলে কেমন হত, আমি কোনও কথাকেই এখন আর ফেলে দিতে পারব না।

মান্টোভাই, আপনি ঠিকই বলেছেন, মারুফসাবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমি ডানা মেলার সুযোগ পেলুম। ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটা লোক গজল লিখতে চায়, আবার জ্ঞানও দিতে চায়, এসব মানুষকে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। এদের জীবনটা ফিতের মতো, আর সেই ফিতের মাপে অন্যের জীবনকেও

ছেঁটেকেটে নিতে চায় তারা। কিন্তু আমি একটা এতিম, ওয়ালিদকে কখনও দেখিনি, আমার কাছে তো জীবনের কোনও মাপজোক ছিল না। সব্বান খানের হাভেলি ভাড়া নিয়ে আমি নিজের মতো করে বাঁচার স্বাদ পেলুম। মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, কোঠায় যাওয়া থেকে এখানে কে বাধা দেবে আমাকে? এক একদিন রাতে বেগমের সঙ্গে শুয়েছি, যন্ত্রের মতো যা করার করে গেছি, তার বেশি বেগমও কিছু চাইত না, তার কাছে দু'টো শরীরের মিলনের অর্থ, বাচ্চা পয়দা হোক। তো পয়দা হয়েছে. তারপর এক-দেড় বছরের মধ্যে তারা মরেও গেছে। কী করে বাঁচবে বলুন? এসব তো ভালবাসার পয়দা নয়। তবে এও ঠিক, আমিও তো ওদের বাঁচা-মরার দিকে নজর দিইনি। ওরা কেউ কেউ বেঁচে থাকলে বেগমের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয়তো এমন ঠাণ্ডা হয়ে যেত না। আর আমি তো তখন অন্যরকম হওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে আছি। এ এমন এক নেশা মান্টোভাই, যখন আপনি মানুষকে মানুষ বলেই মনে করবেন না, হাসিঠাট্টায় সব কথা বরবাদ করে দিতে চাইবেন। আমার সে ক্ষমতাও ছিল। তা হলে একটা গপ্পো বলি শুনন। এক মোল্লা একদিন আমার সামনে শরাব খাওয়া নিয়ে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে যাচ্ছিল। মদ হারাম, তাই তোমাকে দোজখে যেতেই হবে। অনেকক্ষণ শোনার পর আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, বললুম, 'শরাবে এত কী খারাপ আছে মিঞা?'

—শরাবি তা বোঝে না।

—কে বোঝে!

—খোদা এসবের হিসাব রাখেন।

—কী হিসাব রাখেন?

—শরাবির প্রার্থনা কখনও কবুল হয় না।

আমার ভেতরে জমা হওয়া হাসি একেবারে ফেটে পড়ল। বললুম, 'মিঞা, আমার কাছে শরাব আছে, সে সব ভুলিয়ে দিতে পারে, কীসের জন্য আর প্রার্থনা করব তা হলে?'

শরাবির প্রার্থনা সত্যিই কবুল হয় না, আজ আমি বুঝি, মান্টোভাই। শরাবির মাথাটা এমন একটা জায়গায় আটকে থাকে, সে অন্য কিছু আর দেখতে পায় না, তবু আমি মদ ছাড়তে পারিনি; নেশা এমন একটা বদ্ধ জগৎ তৈরি করে দেয়, যা ছেড়ে আর বেরিয়ে আসা যায় না, সেখানেই শুধু ঘুরপাক খেতে হয়, আর ওই ঘূর্ণির মধ্যে আপনি দিনের পর দিন আরও একা হয়ে যেতে থাকেন।

সত্যি বলতে কী, শাহজাহানাবাদে তো আমি অনেক আশা নিয়ে এসেছিলুম, শায়র হিসাবে আমার নামও ছড়াচ্ছিল, তবু মুশায়েরার পর মুশায়েরায় আমাকে অপমান করার লোকেরও কমতি ছিল না। জওক, মোমিনদের মতো ধরাবাঁধা বুলির গজল আমি লিখতে চাইনি। এক একটা শব্দ ছিল আমার কাছে স্ফটিকের মতো, হৃদয়ের আলো পড়লে শব্দ থেকে রামধনুর জন্ম হয়। কালে মহলের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে, আকবরাবাদের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি শব্দদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অশ্রুনির্ঝর

শুনতে পেতুম, মান্টোভাই। শব্দদের ভেতরে কারা কাঁদত জানেন? আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষে হারিয়ে যাওয়া আত্মারা। গজল লিখতে লিখতে আমি তাদের হতাশ্বাস শুনতে পেতুম। রোজ যারা মুশায়েরা মাতায়, তারা কেন বুঝতে চাইবে আমাকে? তাদের কাজ তো একটাই, ওই শালা গালিবকে হঠাও, ওকে অপমান করো, ও যেন কিছুতেই দরবারে জায়গা না পায়। শালা, কাউকে মানে না, কাউকে বুজুর্গ মনে করে না। হ্যাঁ, করি না তো, আমি জানি, আমির খসরুর পর একমাত্র আমিই, আমিই ফারসিতে গজলের মান রাখতে পারি। ফারসিতে যার গজল লেখার দম নেই, তাকে আমি কবি বলি না, মান্টোভাই। এসব কথা বলার মতো কোনও মানুষ ছিল না আমার জীবনে। আমি একা একা, নিজেকে শুনিয়ে বলে যেতুম আমার কথাগুলো।

এইরকম সময়েই সে এসেছিল আমার জীবনে, ভাইজানেরা। প্রথমে আমি শুধু তার চোখ দু'টো দেখেছিলুম। আর দেখামাত্রই মীরসাবের সেই শেরটা মাথার ভেতর গুনগুন করে উঠেছিল :

জীমেঁ কেয়া কেয়া হ্যায় অপনে অয় হম্‌দম।
পর সুখন তা বলব নহী আতা।।
(মনের মধ্য কত কী আছে, হে দরদী বন্ধু,
কিন্তু কোনা কথা ঠোঁট পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।।)

সেদিন প্রচুর শরাব খেয়েছিলুম। কোঠা থেকে বেরিয়ে আর হাভেলিতে ফিরতে পারিনি। কোঠার বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কে যেন একসময় আমাকে ঘুমের অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছিল। আমি দেখেছিলুম শুধু দু'টো চোখ, সুরমার রেখা আর চিকন জল।

—মির্জাসাব।

শীতের রাতের হাওয়ার মতো এক কণ্ঠস্বর আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। আমি শুধু চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে ছিলুম আর সেই চোখের ভেতরে কত যে পাখিরা উড়ছিল, যেন ভোর হয়ে গেছে, আমার জীবনে দেখা প্রথম ভোর, দু'টো চোখের ভেতরে। যেন শিল্পী বিহ্‌জাদের তুলি হাওয়ার শরীরে চোখ দু'টো এঁকে দিয়ে গেছে।

—মির্জাসাব—

—কওন হো তুম?

—ঘর কিউঁ নেহি লওটা?

—ঘর? আমি হেসে ফেললুম।—কাহাঁ হ্যায়?

—হাবাস খান কা ফটক মে।

—ওখানে তো আমার ঘর নেই।

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'চলুন, আপনাকে হাভেলিতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

—কিঁউ?

—আপনি এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকবেন না, মির্জাসাব।

—কেন মিঞা?

—আপ বেনজির শায়র হ্যায় জি।

—বেনজির?

—সচ্।

—বেনজির?

—জি মির্জাসাব।

—ফির বোলো—

—বেনজির হ্যায় আপ।

আমি তার হাত চেপে ধরলুম। কী উত্তাপ, কী উত্তাপ! আমি তার হাতে মুখ রাখলুম। তার হাতের মাংস চুষতে লাগলুম। গভীর কৃষ্ণবর্ণ সে। আর এত কালো বলেই অন্ধকারে এমন উজ্জ্বল।

—ছোড় দিজিয়ে জনাব।

কিন্তু আমি তার অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলুম। তাকে বুকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে স্বস্তি হচ্ছিল না। সে-ও ধরা দিয়েছিল, কোনওরকম বাধা না দিয়ে। মান্টোভাই, এই প্রথম একজন মেয়ের শরীরে আমি ভেজা মাটির গন্ধ পেলুম। বৃষ্টি হওয়ার পর গাছের গোড়া থেকে যেমন গন্ধ বেরোয়, ঠিক সেইরকম গন্ধ। এ তো কোঠার তবায়েফের শরীরের আতরের খুশবু নয়, এ সেই ভেজা আদিম পৃথিবীর অন্ধকার গন্ধ।

মান্টোভাই, আমি ওই গন্ধেই মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলুম। সে কোনও কোঠার মশহুর তবায়েফ ছিল না। সামান্যই এক ডোমনি। ডোমনি কাকে বলে জানেন তো? ডোমনিরা লোকের বাড়িতে শাদিতে-উৎসবে নাচা-গানা করে টাকা রোজগার করে, তা বাদে, পুরুষের সঙ্গে বিছানাতেও যায়; তবে কোনও রইস মির্জা ডোমনিকে ছুঁয়েও দেখবে না। ডোমনিদের ভাবসাব, কথাবার্তাও ছিল একেবারে নর্দমার মতো। কিন্তু মুনিরা—মুনিরাবাই সবার চেয়ে আলাদা ছিল।

সেইদিনের পর থেকে মুনিরাবাইয়ের ঘরেই আমার আশ্রয় মিলল। সে আমারই গজল শুধু গাইত। গাইতে গাইতে কৃষ্ণবর্ণ মুনিরাবাইয়ের মুখে লাল মেঘের আলো ছড়িয়ে পড়ত।

—মুনিরা—

—জি।

—আমার গজল তুমি কোথায় শুনলে?

মুনিরাবাই হেসে বলত, 'জি, আশমানসে আয়া।'

—আশমানসে?

—জি।

—কোথায় সেই আকাশ, তারা?

—জি, ইধর। মুনিরা হাসত, নিজের বুকে হাত রেখে বলত, 'সিনা মে হ্যায় জনাব।'

বুকের ভেতরে আকাশ আর সেই আকাশ থেকে ভেসে আসছে আমার গজল, এভাবে তো কখনও কেউ বলেনি আমাকে। শুধু মুনিরাবাই বলতে পারত। আমার গজলের সঙ্গে তো তার দেনাপাওনার সম্পর্ক ছিল না। আমিও তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছি। সে আমার শরীরের আড়ালে নগ্ন হয়েছে। সজল, কালো একখণ্ড মেঘকে যেন আমি জড়িয়ে আছি। মান্টোভাই বেগম ফলক আরা ছিলেন আমার জীবনের একটি রৌদ্রালোকিত দিন, আর মুনিরা যেন ঘনঘোর বর্ষা, একটানা বৃষ্টি পড়েই চলেছে, কত যে নতুন পাতা গজাচ্ছে আমার শরীরে; বিশ্বাস করুন, মুনিরার সামনে বসে থাকতে থাকতে একসময় শুধু তার চোখ দু'টোই দেখতে পেতুম আমি, হরিণের মতো দুরন্ত, আবার মাঝে মাঝেই কেমন স্থির হয়ে যেত। সেই স্থির দৃষ্টিতে আমি দেখতে পেতুম ভয়, হরিণ যেমন দৌড়তে দৌড়তে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

চারপাশে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল, মান্টোভাই। তুমি মির্জা গালিব, ঠিক হ্যায়, কোঠায় তুমি যেতে পারো, তবায়েফের সঙ্গেও রাত কাটাতে পারো, কিন্তু একটা ডোমনির ঘরে গিয়ে তুমি থাকবে? নিজের জমিন ভুলে যাচ্ছো তুমি? মান্টোভাই কাকে বলে নিজের জমিন? একের পর এক মুশায়েরায় অপমানিত হয়ে আমি তো তার কাছে গিয়েই দাঁড়াতে পারতুম। সে কিছুই বলত না, শুধু আমার গজল গাইত :

দিল-এ নাদাঁ তুঝে হুয়া কেয়া হ্যায়?<br>
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া কেয়া হ্যায়?

যেখানে আশ্রয়, সেখানেই তো মুক্তি। তাই আমাকে নিয়ে যতই নোংরা কথার ফোয়ারা উঠুক, আমি পাত্তা দিইনি। আম আদমি আমার দিকে ঢিল ছুঁড়বে বলে আমি লেজ গুটিয়ে পালাব? তেমন বান্দা আমি কোনওদিনই ছিলাম না। পূর্বপুরুষদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে যাইনি ঠিকই, কিন্তু আমার জীবনটা তো একটা যুদ্ধক্ষেত্রই হয়ে উঠেছিল আর সেই লড়াইটা আমাকে একা একা লড়তে হয়েছে। গুলি মারো লোকের কথার। বিছানায় মুনিরাকে পেলে তো আমি সব অপমান ভুলে যেতে পারতুম, মুনিরা ভুলিয়ে দিতে পারত, আর আমিও ওকে দিনে দিনে আঁকড়ে ধরেছি, ওর গলায় আমার একটার পর একটা গজল শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, মুশায়েরায় আমাকে যতই অপমান করা হোক, একজন মানুষ তো তার কণ্ঠস্বরে আমার গজলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মুনিরাকে আমি একেবারে একার মতো করে পেতে চেয়েছি, ওকে বাইরে গান গাইতে যেতে দিতুম না, ওর ঘরে কাউকে আসতেও দিতুম না। ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব আমিই

নিয়েছিলুম। সঙ্গতি তো আমার তেমন ছিল না। মাসে ৬২ টাকা ৫০ পয়সা ব্রিটিশের দেওয়া পেনশন। এই টাকাতেই সংসার চালাও, তারপর মদ-জুয়া আছে, তার ওপর ওর দায়িত্ব। তবে কিনা আমার মাসি মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিতেন, লোহারু থেকে আহমদ বক্স খানও টাকা পাঠাতেন অবরেসবরে, আম্মিজানও কখনও কখনও টাকা পাঠাতেন আগ্রা থেকে। কিন্তু নবাবি মেজাজ আমার, ওই টাকাতে কুলিয়ে উঠতে পারতুম না। তাই ধার করো। তখন অবশ্য মথুরা দাস, দরবারি মল, খুবচাঁদের মতো মানুষরা ছিল, ধার চাইলে কখনও না বলেনি। সব মিলিয়ে দিনগুলো মৌজ-মস্তিতেই কেটে যাচ্ছিল। আর মুনিরাকে ঘিরে জন্ম নিচ্ছিল কত যে গজল।

জান তুম পর নিসার করতা হুঁ
ম্যায় নহীঁ জানতা দুয়া কেয়া হ্যায়।

কিন্তু একদিন মুনিরার বাড়িতে কিছু লোক হামলা চালাল, ওকে মারধোর করল, জিনিসপত্র ভাঙচুর করল। কেন জানেন? আমাকে যেন ওর ঘরে ঢুকতে না দেয়। তবু আমি গেলুম, আমার রোখ চেপে গিয়েছিল। মুনিরা আমার দু'হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলেছিল, 'মির্জাসাব আপ চলে যাইয়ে। উও লোগ দেখেঙ্গে তো—'

—কী করবে? আমাকে মারবে?

—আপনার বদনাম হোক, আমি চাই না, জি।

—তুমিও চাও না, আমি আর আসি?

সে আমার মুখ তার বুকের নিরালায় টেনে নিয়ে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে, 'আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, আপ মেরি জান, মির্জাসাব। ফির ভি—'

মান্টোভাই, ওকে ছাড়া আমিও তো বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারতুম না। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে উড়ে যায়, আমিও সেভাবেই মুনিরার কাছে গিয়েছিলুম। ওই সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে তো আমার জীবন অসম্পূর্ণ। আমার মনের ভাবটা কেমন ছিল জানেন? এই বুঝি ওকে কেউ আমার কাছ থেকে চুরি করে নেবে। ওকে নিয়ে বাগানেও বেড়াতে যেতুম না আমি, মনে হত, নার্সিসাসও ওকে দেখলে নিজের রূপ ভুলে ওর কাছেই ছুটে আসবে। মুনিরাবাইয়ের যত গভীরে আমি ঢুকেছি, ততই মনে হয়েছে, ওকে সম্পূর্ণ করে পাইনি।

ইয়ে না থি হামারি কিসমত কে বিশাল-ই-ইয়ার হোতা
অগর আউর জিতে রহতে য়েহি ইন্তেজার হোতা।

এরকমই মনে হত আমার। ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন আমার কিসমতে নেই। যদি আরও বাঁচি, তা হলে ওকে পাব না, অপেক্ষাতেই কেটে যাবে সারা জীবন। মান্টোভাই, জীবনে একবারই, এমনভাবে ভালবাসতে পেরেছিলুম আমি। কবিদের মধ্যে ফিরদৌসি, পীরদের মধ্যে হাসান বাসরি আর প্রেমিকদের মধ্যে মজনু—জগতের তিন নূর। মজনুর মতো ভালবাসতে না পারলে তাকে আমি মহব্বত বলি না। আমি

ভেবেছি, কিন্তু মজনুর মতো ভালবাসতে পারিনি, মান্টোভাই। সে বড় কঠিন পথ। নিজেকে ভুলে যাওয়ার সাধনা ক'জন করতে পারে? আমিও পারিনি।

প্রথমে খুবই অভিমান হয়েছিল, তাই মুনিরাবাইয়ের কাছে যাওয়া-আসা কমিয়ে দিলুম। আস্তে আস্তে একদিন অভিমান মুছে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেও মুছে যেতে থাকল। মোঘল রক্ত বড় নিষ্ঠুর, মান্টোভাই, আমার শরীরেও তো সেই রক্ত ছিল। এই রক্ত কী করে জানেন? যাকে ভালবাসে, তাকেই হত্যা করে। মুনিরাকে আমিই হত্যা করেছিলুম। ওকে ভুলে আমি তো আবার জীবনের নতুন পথে মেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু মুনিরা তো নিজেকে বন্দি করে রেখেছিল আমার ভেতরে, তার সামনে তো নতুন কোনও পথ খুলে যায়নি। আওরত এরকমই, একবার যাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, শুকিয়ে মরে গেলেও সেই খাঁচাতেই নিজেকে আটকে রাখে। একসময় ভাবতুম, ওদের জগৎটা বড় ছোট। কিন্তু কাউকে ভালবেসে যে মরেও যেতে পারে, সে তো আসলে এক সাধনার পথে চলেছে, নিজেকে পেরিয়ে গিয়ে অন্যের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার সাধনা। মান্টোভাই, পুরুষকে এই সাধনার জীবন আল্লা দেননি। আমরা পতঙ্গের মতো, আর ওরা দীপশিখা, নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আলোর জন্ম দেয়। মীরাবাইয়ের পদে আপনি এই মহব্বতকেই দেখতে পাবেন মান্টোভাই। গিরিধারী বিনা মীরার জগৎ অন্ধকার। ক্যায়সে জিউঁ রে মাঈঁ, হরি বিন ক্যায়সে জিউঁ রে।

একদিন খবর পেলুম, মুনিরাবাই মরে গেছে। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেখুদি মহব্বতও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু ওর চোখ দু'টো তো আমাকে ছেড়ে গেল না। ময়ূরের পেখমে আঁকা সেই চোখ বার বার আমার কাছে ফিরে এসেছে, মৃত্যুশয্যায় শুয়েও দেখেছি, ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মওত যখন এসে আমার হাত ধরেছে, সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলুম, মুনিরাকে আমি মজনুর মতোই ভালবাসতে চেয়েছি, নইলে এন্তেকালের সময় সে এসে আমাকে দেখা দিত না।

মুদ্দত হুই হ্যায় ইয়ার কো মেহমান কিয়ে হুয়ে  
জোশ-এ-কাদা সে বজম্ চিরাঘন কিয়ে হুয়ে

করতা হুঁ জমা ফির জিগর-এ-লখত্ লখত্ কো  
আরসা হুয়ে হ্যায় দাওয়াত-এ-মিজগান কিয়ে হুয়ে

ফির ভাজ-এ-ইহতিয়াৎ সে রুকনে লগা হ্যায় দম্  
বরষোঁ হুয়ে হ্যাঁয় চাক গরেবন কিয়ে হুয়ে

মাঙ্গে হ্যায় ফির কিসি কো লব-এ-বাম পর হাবাস  
জুলফ-এ-শিয়ারুখ পে পড়েশান কিয়ে হুয়ে

এক নওবাহার-এ-নাজ কো তাকে হ্যায় ফির নিগাহ্
চেরা ফারোগ-এ ম্যায় সে গুলিস্তান কিয়ে হুয়ে

জী ঢুণ্ডতা হ্যায়ফির ওহি ফুরসৎ কে রাত দিন
বয়ঠে রহেঁ তসভুর-এ-জানা কিয়ে হুয়ে

মুনিরাবাই চলে গেল। মলিন দিনগুলি আরও মলিনতর হল, মান্টোভাই। বেগম ফলক আরা ছিলেন আমার জীবনের আশমানে একটা বিদ্যুৎরেখা, আর মুনিরাবাই সেই নক্ষত্র, যে-নক্ষত্রের মৃত্যুর পরেও কোটি বছর ধরে তার আলো আমাদের আঙিনাকে ছুঁয়ে যায়।

রাতের পর রাত আমি তার মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মীরসাবের শের বলে গেছি :

সরসরী তুম জহানসে গুজরে
বরনহ্ হর জা জহন-এ দীগর থা।।

মুনিরাবাই, মেরি জান, হেলাফেলা করে তুমি জগৎ থেকে চলে গেলে, তুমি দেখলে না, এখানে প্রত্যেক জায়গায় নতুন এক জগৎ ছিল।

আগোশ-এ গুল কুশাদহ্ বরায়ে বিদা হৈ;
অয় অন্দলীব চল্ কেহ্ চলে দিন বহার-কে।।
(গোলাপের কলিগুলি পাপড়ি মেলেছে বিদায় জানাবার জন্য;
হে বুলবুল, চলো এবার, চলে যাচ্ছে বসন্তের দিন।।)

আচ্ছা মির্জাসাব, কখনও ভেবে দেখেছেন, ক'টা গালিব একসঙ্গে আপনার ভেতরে লুকিয়ে ছিল? আপনি তাদের কতজনকে চিনতেন? হয়তো কাউকে সারা জীবনে চিনতেও পারেননি, তাই না? আপনার মতো মানুষকে নিয়ে এই সমাজ খুব বিপদে পড়ে যায়। সে বুঝে উঠতেই পারে না, কে আসল মির্জা গালিব। এই যেমন ধরুন, মির্জা হাতিম আলি সাব মিহ্‌রকে লেখা আপনার চিঠিটা। মনে পড়ে, ১৮৬০-এ লেখা সেই চিঠির কথা? মির্জা মিহ্‌র-এর প্রেমিকা মারা গেছেন, চিঠিতে আপনাকে

বিচ্ছেদের দুঃখ জানিয়েছিলেন। আপনি তার উত্তরে লিখলেন, আমার বয়স এখন পাঁয়ষট্টি, দুনিয়াটাকে আমি পঞ্চাশ বছর ধরে বেশ ভালই জরিপ করেছি। কম বয়সে একজন দরবেশ আমাকে বলেছিলেন, নিজেকে কখনও কষ্ট দিও না। খাও, পিও, মজা করো, তবে একটা কথা মনে রেখো, তুমি চিনির বাটির চারপাশে উড়তে থাকা মাছি, কখনও মৌমাছির মতো একই ফুলে আটকে থেকো না। আর কী লিখেছিলেন মনে আছে, মির্জাসাব? লিখেছিলেন, মৃতের জন্য সে-ই শোক করতে পারে, যে নিজে মরবে না। আপনি কাঁদবেন কেন? বরং আজাদি উপভোগ করুন, শোক ভুলে যান। আর সম্পর্কের বন্ধনকেই যদি ভালবাসেন, তা হলে মুন্নাজানও যা, চুন্নাজানও তা-ই। মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, আমাকে বেহস্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে এক হুরিকেও আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, আর তার সঙ্গে অনন্তকাল আমাকে থাকতে হবে। ভাবলেই আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। জীবন তো তা হলে এক বোঝা হয়ে উঠবে মিঞা। বেহস্তের সেই এক ঘর, এক গাছপালা, আর আমি অনন্তকাল ধরে একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, তাকে প্রেমের কথা বলে যাচ্ছি। মনটাকে অন্য কোথাও জুতে দিন মিঞা। নতুন নতুন বাহার-এ আপনার জীবনে নতুন নতুন পরি আসুক। সারা জীবন একটা কিছুতে আটকে থাকার মতো বালখিল্য আর কিছু হয় না। একজনের বেদনা নিয়ে আপনি কেন মজা করতেন মির্জাসাব? না, না, এভাবে আমার দিকে তাকাবেন না, কী ভেবেছিলেন নিজেকে, সবাই আপনার খেলার পুতুল? মির্জা মিহ্‌রকে লেখা আর একটা চিঠির কথাও আপনি বলতে চাইছেন তো? হ্যাঁ, সে-চিঠিও আমি পড়েছি। আপনি সেখানে স্বীকার করেছিলেন, পরোক্ষভাবে মুনিরাবাইয়ের মৃত্যুর কারণ আপনিই। আপনার সেই চিঠি থেকে একটা ছবি আমার সামনে ফুটে ওঠে। ভাঙাচোরা একটা মানুষ, আপনি, মির্জা মিহ্‌রের হাত ধরে বলছেন :

—মিঞা, আমাদের হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাদের আল্লা মুক্তি দিন। আর আমরা যারা বিচ্ছেদ সহ্য করেছি, আমাদের যেন তিনি করুণা করেন। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে মুনিরাবাই আমার জীবনে এসেছিল। তারপর আমি আর ও-পথে যাইনি, কিন্তু তার চাউনি, তার লাবণ্য আমি আজও ভুলতে পারি না। সেই শোক আমি সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারব না। মিঞা, যৌবনের ভালবাসার আগুন যদি এখনও আপনার মধ্যে বেঁচে থাকে, সেই ভালবাসা এখন আল্লার পায়ে রাখুন। খোদাই শেষ কথা, আর সবই মরীচিকা।

এই যে দু'টো চিঠি, যা একই সময়ে আপনি লিখেছিলেন, এর মধ্যে কে আসল মির্জা গালিব? কোনটা মুখ, আর কোনটা মুখোশ, মির্জাসাব? আপনাকে আমি ভালবাসি, আপনার ছন্নছাড়া জীবনের দিকে তাকিয়ে আমার দু'চোখে জলের পর্দা দুলে ওঠে, কিন্তু মুখ আর মুখোশের এই দ্বন্দ্বকে আমি মানতে পারি না। আমি সত্যিই খুব সোজাসাপটা মানুষ, আপনার গোলকধাঁধায় আমি হারিয়ে যাই। আপনাকে শয়তান

বলেও খারিজ করে দিতে পারি না, অথচ এক এক সময় আপনি শয়তানেরও অধম। আপনি এই মুহূর্তে যাকে ভালবাসেন, পরের মুহূর্তেই তাকে নিয়ে মজা করতে পারেন। একেই বোধহয় বাদশাহি চাল বলে। এ কী, এ কী, আপনি শুয়ে পড়ছেন কেন আবার? আমার কথাগুলো সহ্য হচ্ছে না, তাই না? আমি জানি মির্জাসাব, নিজের বিরুদ্ধে একটা কথাও আপনি সহ্য করতে পারতেন না, আমির খসরুর পরেই আপনি, মাঝখানে আর কেউ নেই, এ কথাটা কখনও ভুলতে পারেন না, না? আমিও বিশ্বাস করি মির্জাসাব, আমির খসরুর পরে একমাত্র আপনিই লিখতে পারেন এমন শের :

> বেতলব দেঁ তো মজা উস-মেঁ সিবা মিলতা হৈ;
> বোহ্ গদা জিস-কো নহ্, হো খূ-এ সবাল, আচ্ছা হৈ।।
> (না-চাইতেই যদি দেন তিনি তো তার স্বাদই আলাদা;
> সেই ভিখারি-শ্রেষ্ঠ, হাত পাতার অভ্যেস হয়নি যার।।)

কিন্তু বারবার কেন এত নানারকম মুখোশ পরেন আপনি? কার ভয়ে? কার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে?

—মান্টোভাই—

—জি, মির্জাসাব।

—আপনি আমাকে নিয়ে কিস্‌সা লিখছেন বলে আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করতে পারেন না।

—কিন্তু আমি আপনাকে বুঝতে চাই।

—সে চেষ্টা করবেন না। মারুফসাবের বাড়ি থেকে আমি কেন বেরিয়ে এসেছিলুম জানেন। সেখানে তো সুখেই ছিলুম। কিন্তু প্রতি পদে তিনি আমাকে বুঝতে চাইতেন, মাপতে চাইতেন। কী অধিকার আছে আপনার আমাকে পুরোপুরি বুঝতে চাওয়ার?

—মানুষ তো মানুষকেই বুঝতেই চেয়েছে, মির্জাসাব।

—বখোয়াস বন্ধ করুন। মানুষ, মানুষ করে আপনাদের এত বড় বড় বুলি আমার সহ্য হয় না। বোঝার নাম করে আপনারা আসলে একজনকে সতরঞ্জের একটা খোপে আটকে রাখতে চান। কী বুঝবেন আমাকে? আপনি কোনওদিন আমার স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের ভেতরে ঢুকতে পারবেন? আপনি বুঝতে পারবেন, কেন আমি সারা রাত ঘুমের ভেতরে নিজের সঙ্গে কথা বলে যেতুম? আমি আমার কষ্টের কথা বলছি না। অপমানিত হতে হতে আমি আর অপমান গায়ে মাখতুম না। মানুষ সবচেয়ে আনন্দ পায় তার পাশের মানুষকে অপমান করতে পারলে। কী ঢং-এ করে জানেন? তোমাকে আমি খুব ভালবাসি, এই কথা বলতে বলতে। লিখে নিন, আমি কাউকে ভালবাসতুম না। তাই অপমান করে গেছি, ঠাট্টা-মশকরা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি বলে কাউকে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলিনি। এই দুনিয়াদারিটা আপনার চেয়ে অনেক বেশিদিন আমি দেখেছি। শুনুন মান্টোভাই, একজন মানুষ নিজেই বলি, নিজেই জল্লাদ—ভাবতে

পারেন? সে আমি—আমি—মির্জা গালিব। লিখতে গিয়ে কালি যেমন কাগজ ছেপে ছলকে যেতে পারে, তেমনি আমার নিয়তিপুঁথি, নির্বাসিতের রাতের চিত্রলিপি।

—মির্জাসাব—

—বলুন।

—আপনাকে আমি কাটাছেঁড়া করছি না।

—মান্টোভাই, কেউ বেশিক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেই অস্বস্তি হত। কেন জানেন? সবাই একটা আসল মির্জা গালিবকে খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু আমি তো একটা ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিলুম না।

—কার ছায়া মির্জাসাব?

—আমি তাঁকে সারা জীবনেও দেখতে পাইনি। ভোরের আজান শুনতে শুনতে মনে হত, তিনি আছেন, কোথাও আছেন, শুধু তাঁর ছায়া হয়ে আমি এই দুনিয়াতে পড়ে আছি।

—আমিও তাঁরই ছায়া মির্জাসাব।

—বহৎ খুব। এবার তা হলে আপনার ইশ্‌কের কিস্‌সা শোনান। তেমন কিছু ঝুলিতে আছে তো? কোন এক ইসমতের কথা বারবার বলেন। আমি একটু শুয়ে শুয়ে শুনি।

কুয়াশার পর্দা দুলছে, তার ওপারে যেন আমার একটা জীবন।

ইসমতের কথা পরে বলা যাবে, ভাইজানেরা। আজ যদি কবরে শুয়ে আমি স্বীকার করি, ইসমতকে আমি ভালবাসতাম, সেও কি বাসত না আমাকে, ওপরের দুনিয়ার লোকজন শুনতে পেলে খুব একচোট হাসবে। আসলে আমরা দু'জনেই তো ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম, চাপা দিতে চেয়েছিলাম, নইলে বন্ধুত্বটুকু বেঁচে থাকত না। ভালবাসা নিয়ে অনেক কথা বলেছি আমরা, কিন্তু আমি সবসময়েই এমন একটা ভাব করেছি যে মহব্বৎ আসলে একটা কথার কথা, ও শব্দটার কোনও মানেই নেই। একবার আমি ওকে বললাম, 'কী, মহব্বৎ বলতে তুমি কী বোঝ বলো তো?'

—আমি তো তোমার কাছে শুনতে চাই মান্টোভাই।

—আমি—আমি কেন—আর আমি তো কতবার বলেছি, ওসব ভালবাসা-টাসা আমি বুঝি না।

—সবসময় একগুঁয়েমি ক'রো না।

ইসমতের ধমকে আমি হেসে ফেলি।—তা হলে বলি শোন। আমি আমার সোনালি জরির এমব্রয়ডারি করা জুতো ভালবাসি, রফিক ওর পাঁচ নম্বর বিবিকে ভালবাসে। এই হচ্ছে মহব্বৎ।

—মান্টোভাই, তুমি নিজেকে কী মনে করো?

—কিছু না বহিনজি। আমি তো কতবার বলেছি, আমি একটা ফ্রড।

—আবার সেই কথা!

—এবার তুমি বলো, প্রেম কী?

—একজন যুবক আর যুবতীর মধ্যে যা জন্মায়।

—ওঃ তাই বলো। তা হলে আমিও প্রেমে পড়েছিলাম, বলা যায়।

—কীরকম? ইসমত বড় বড় চোখে তাকায়, যেন আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সেই কিস্‌সাটাই আপনাদের শোনাচ্ছি, মির্জাসাব। আমার জীবনে প্রথম রামধনু দেখা। তখন আমার বয়স হবে বাইশ-তেইশ। তিনবারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি-তে। আমার ফেল-মারা দোস্ত সয়ীদ কুরেশিও সঙ্গে ছিল। কিন্তু ইউনিভার্সিটির কঠোর নিয়মকানুনের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারতাম না। তবে ওখানকার শিক্ষক-ছাত্ররা অনেকেই আমাকে ভালবেসে ফেলছিল। মানিয়ে নিতে না পারার জন্য শরীরটাও খারাপ হতে লাগল। বেশ কয়েক বছর ধরেই বুকে ব্যথা হত, তার সঙ্গে জ্বর। অসুখটা এত বেড়ে গেল, এত ব্যথা হত যে দু'হাঁটু বুকের কাছে এনে আমি বসে থাকতাম। এইভাবে বসে থাকার অভ্যেস আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে গেল। ব্যথা ভুলতে দেশি মদ খেতে শুরু করলাম। কিন্তু নেশার সময়টুকু ছাড়া তো ব্যথা থেকে নিস্তার নেই। দিল্লিতে এলাম চিকিৎসা করাতে। এক্স-রে করে ধরা পড়ল, আমার টিবি মানে রুহ্ আফ হয়েছে। ইউনিভার্সিটি ছাড়তে হল। চিকিৎসা চালানোর মতো টাকাও নেই। দিদি ইকবাল বেগম এসে বাঁচাল। সব খরচ দিয়ে দিদি আমাকে পাঠাল বাতোত-এর এক হাসপাতালে। বানিয়ালের দিকে জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়েতে পাহাড়ের ওপর বাতোত এক আশ্চর্য দ্বীপ যেন। জীবনে সেই প্রথম ও শেষবার আমি দুনিয়ার সেরা সৌন্দর্য দেখেছি, ভাইজানেরা। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, পাইন চিনার-মজনুর অরণ্য কিছু দূরেই যেন হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়, হিমালয়ের তুষারঢাকা কত যে শৃঙ্গ। সারা জীবন ওইরকম একটা জায়গায় যদি থেকে যেতে পারতাম, যদি কখনও কিছু লিখতে না হত, এত অপমান-হিংসা-রক্তপাতের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যেতে না হত আমাকে। পাহাড়ি কোনও গ্রামে বেগুর সঙ্গেই যদি থেকে যেতে পারতাম আমি!

ওর নাম সত্যি সত্যিই কী ছিল, আমি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, বেগু বলেই ডাকতাম মনে হয়, কখনও ওয়াজির, কখনও বা বেগম বলেও ডেকেছি। পাহাড়দেশের মেয়ে সে, গায়ের রং ছিল একেবারে গোলাপের মতো, আর লজ্জা পেলে তার মুখ হয়ে যেত ভোরের সূর্যের মতো। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ছাগল চরিয়ে বেড়াত বেগু। মাঝে

মাঝেই কোনও ছাগল হারিয়ে গেলে মুখের কাছে দু'হাত এনে তাকে ডাকত বেগু আর তার ডাকের প্রতিধ্বনিতে পাহাড় যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠত।

এমন মেয়েকে এ-দুনিয়া সত্যিই একবারই পায়। সরু, লম্বা নাক। আর চোখ? অমন চোখ আমি খুব কম দেখেছি। বেগুর দু'চোখ যেন ধরে রেখেছিল পাহাড়ের গভীরতা। লম্বা, পুরু ভ্রূ। আমার সামনে দিয়ে যখন হেঁটে যেত, মনে হত, সূর্যের একটা রশ্মি এসে ওর চোখের পাতায় আটকে আছে। চওড়া কাঁধ, গোল গোল হাত। আর বুক দু'টোকে মনে হত পাহাড়ি মুরগির মতো। একটুও বানিয়ে বলছি না, ভাইজানেরা, এই সৌন্দর্য একমাত্র দেখা যায় পাহাড়ি মিনিয়েচার ছবিতে। তার রূপের কথা বলতে হলে ওইসব ছবিতে দেখা অভিসারিকা রাধার কথাই বলতে হবে। পাহাড়ি পথে তার হাঁটা, মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠা, নিজের মনে মুচকি হাসা, যেন কারোর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে পাকদণ্ডি পথ বেয়ে চলেছে। সে এক অভিসারযাত্রাই।

আমি যখন বেগমকে প্রথম দেখি, মনে হল, আমার ভেতরে এত দিন ধরে জমে থাকা অন্ধকারে বিদ্যুৎরেখা ঝলসে উঠল। বেশ কয়েকদিন গাছের আড়াল থেকে আমি ওকে দেখতাম। বেগম তার ছাগল-ভেড়াদের সুর করে ডাকত, যেন সে কোনও গানের কলি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর সেই ডাকের প্রতিধ্বনি আমার ভেতরে একটা সম্পূর্ণ গানের ঝরনার মতোই এসে ফেটে পড়ত। একদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলাম, আর সে ভয় পাওয়া হরিণীর মতো আমাকেই আঁকড়ে ধরল। আমার চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু এক ঝটকায় আমাকে ঠেলে দিয়ে বেগু পালাল। আর ওই চেষ্টা করিনি। কিন্তু ও একদিন নিজে থেকে এসেই আমার সঙ্গে কথা বলল। তারপর দিনের পর দিন বসে বসে আমরা যে কত গল্প করেছি। ভাইজানেরা, সেসব আমার পুরো মনে নেই। জানেন তো, মদ প্রথমে মাথাটাকে খায়, সব স্মৃতি আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকে, জীবনে যা ঘটেনি, তাকেও সত্যি বলে মনে হয়।

বেগমকে আমি আমার ভালবাসার কথা জানিয়েছিলাম। ও খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। তারপর ওড়নার খুঁট দাঁতে চিবোতে চিবোতে বলল, 'তুমি তো এই সরাইখানা থেকে চলে যাবে। তখনও ভালবাসবে আমাকে?'

—কোথায় সরাইখানা?

—এই সরাইখানা।

—এই পাহাড় সরাইখানা! আমি তার কথায় হেসে ফেলি।

—দাদি বলে—

—কী বলে?

বেগু আর কিছু বলেনি। আমি বুঝতাম, সব কথা বলার মতো ভাষা ওর নেই। কিন্তু

ও অনুভব করতে পারে। মির্জাসাব, অনেকদিন পর একটা গল্প শুনে বেগুর কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

মাফ করবেন ভাইজানেরা, কিস্‌সাটা এখানে আমাকে বলে নিতেই হবে। না হলে, কী করে আপনারা বুঝবেন, একটা সরাইখানাতেই আমাদের দু'জনের—বেগমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল?

ইব্রাহিম ইবন আদম একদিন দেওয়ান-ই-আম-এ বসে আছেন। রয়েছে তাঁর উজিরেরা, অন্য প্রজারা। এমন সময় লম্বা দাড়িওলা, ছেঁড়া আলখাল্লা পরা এক ফকির সোজা এসে সম্রাটের সিংহাসনের সামনে দাঁড়ালেন।

—কী চান আপনি? ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন।

—একটু দাঁড়াতে দিন। সবে তো এই সরাইখানায় এসে পৌঁছলাম।

—আপনি পাগল নাকি! ইব্রাহিম চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'এটা সরাইখানা নয়, আমার প্রাসাদ।'

—আপনার আগে এই প্রাসাদ কার ছিল? ফকির জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার ওয়ালিদের।

—তার আগে?

—তাঁর ওয়ালিদের।

—তার আগে?

—সে অনেক পুরুষের কথা।

—তাঁরা এখন কোথায়?

—এত দিন বেঁচে থাকবেন নাকি? সকলেই গোরে গেছেন।

—যেখানে মানুষ আসে আর যায়, সেটা সরাইখানা ছাড়া কি? কথাটা বলেই ফকির অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুর দাদি ঠিকই বলেছিল, একের পর এক সরাইখানা পেরিয়েই তো আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই।

বেগু একদিন বলল, 'তুমি আমার ওপর রাগ করে থাকবে না তো?

—কেন?

—ওই যে সেদিন—

—কী?

—তোমাকে চুমু খেতে দিইনি।

—আমি ভুলে গেছি বেগম।

—জানো, সবাই যে কেমন করে আমার সঙ্গে। এসে বলবে, তোর চোখ দু'টো কী সুন্দর, তোর ঠোঁট দেখলে চুমু না খেয়ে থাকা যায় না। আমি কী বলি বলো তো? আমার এসব শুনতে ভাল লাগে না। তোমাকেও আমি ওদের মতো ভেবেছিলাম।

—তা হলে আমি কী রকম?

বেগু গালে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'তুমি ওদের মতো না, তুমি শরিফ।'

একদিন দেখি বেগুর কুর্তার পকেট ভর্তি কী সব জিনিস। আমি বললুম, 'পকেট ভরে কী এত নিয়ে চলেছ?'

—বলব না। বেগু বেণী দুলিয়ে হাসল।

—বলবে না? দাঁড়াও। আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।—দেখাও, কী আছে। দেখাতেই হবে।

—ছোড় দিজিয়ে না—

—না, দেখাতেই হবে।

বেগু অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একের পর এক আশ্চর্য সব জিনিস বার করতে লাগল। চিনারের শুকনো পাতা, খালি দেশলাই বাক্স, কয়েকটা নুড়ি পাথর, খবরের কাগজ থেকে কাটা হলুদ হয়ে যাওয়া একটা ছবি, চুলের ফিতে। কিন্তু একটা জিনিস সে কিছুতেই দেখাবে না। হাতের মুঠোয় চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

—ওটা কী?

—না দেখাব না।

—ঠিক আছে। আমি হেসে ফেললাম।—এবার যাও।

বেগু অনেকটা চলে যাওয়ার পর ফিরে এল। আমি একটা গাছের নীচে বসেছিলাম। দূর থেকে হাতের জিনিসটা সে আমার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে দৌড় লাগাল। কী ছিল জানেন? একটা লজেন্স। আমি অবাক হয়ে গেলাম, কেন সে অমন লজ্জা পেয়েছিল লজেন্সটা দেখাতে, কেনই বা ফিরে এসে আমাকে দিয়ে চলে গিয়েছিল। মির্জাসাব, সেদিনই বেগমের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আর তাকে দেখিনি। দুয়েকদিনের মধ্যে আমিও বাতোতকে বিদায় জানিয়েছিলাম। লজেন্সটা আমার জামার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। বেগমের একমাত্র স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি আর কতদিন বাঁচে বলুন, একদিন ড্রয়ার খুলে দেখলাম, লজেন্সটাকে ঘিরে বেশ ভোজ জমে গেছে পিঁপড়েদের।

ইসমতকে একদিন বেগমের কথা বলেছিলাম। সব শুনে সে বলে উঠল, 'এটা একটা প্রেম হল, মান্টোভাই? তোমার কাছ থেকে আমি একটা দুর্দান্ত লাভ স্টোরি আশা করেছিলাম। হাস্যকর।'

—কেন, হাস্যকর কেন?

—একটা পচা, থার্ড ক্লাশ লাভ স্টোরি। একটা চিনির ড্যালা পকেটে নিয়ে ফিরে এসে ভাবলে, কী নায়কের মতো কাজই না করেছ। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

আমি চুপ করে গিয়েছিলাম।

—কী হল? কিছু তো বলো। ইসমত আমাকে খোঁচাতে লাগল।

—কী করতাম ইসমত? কী করলে তুমি খুশি হতে? বেগমের সঙ্গে শুয়ে ওর পেটে একটা অবৈধ বাচ্চা রেখে আসতাম, তাই তো? তা হলে লাভ স্টোরিটা জমত, না? হাতের পেশি ফুলিয়ে বলা যেত, আমার মতো পুরুষ দুনিয়ায় নেই। হাঃ হাঃ, আমাকে কি তুমি এইরকম দেখতে চেয়েছ ইসমত?

ইসমত আমার হাত চেপে ধরেছিল, তার দু'চোখে কুয়াশা।

তরীক-এ ইশক্ মেঁ হ্যয় রাহনুমা দিল
পয়ম্বর দিল হ্যয় কিবলহ্ দিল খুদা দিল।।
(প্রেমধর্মে পথপ্রদর্শক এই হৃদয়,
পয়গম্বর, হৃদয়, পথ হৃদয়, খুদাও হৃদয়।।)

মুনিরাবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আমার উর্দু গজলের প্রথম দিবান সংকলন করলুম, সেই সঙ্গে ঠিক করলুম, এখন থেকে ফারসিতেই লিখব, ফারসি ছাড়া গজলের রোশনাই তো খোলে না, কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, মান্টোভাই, শুরু হল আমাকে নিয়ে নসিবের খেলা। হৃদয়ের সঙ্গে আনন্দের যে সম্পর্ক ছিল, তা ভেঙে গেল, শুধু গোপনে, কোথায় যেন, টুপ টুপ ফোঁটায় রক্ত ঝরতে লাগল। খুশির সঙ্গে আমাদের যে-সম্পর্ক, তা তো খুব জোরদার, না মান্টোভাই? খুশি ছাড়া আমরা আর কী চাই জীবনে? আরও কত জোরালো শক্তি এসে এই স্বাভাবিক সম্পর্কটাকে ভেঙে দেয় ভাবুন। একদিন রাতে আমি আমার দিল্‌কে বললুম, হ্যাঁ হৃদয়কেই তো একমাত্র বলা যায়, সে-ই তো আমাদের এবাদত-গাহ্, আমি তাকে বললুম, 'আমাকে কথা বলার শক্তি দাও, আমি যেন জাঁহাপনার কাছে গিয়ে বলতে পারি, হুজুর, আমিই সব রহস্যের আয়না, আমাকে ঝকমকে করে তুলুন; কবিতা আমার ভেতর থেকে জন্ম নেয়। আমাকে একটু আরাম দিন।' হৃদয় আমাকে মুচকি হেসে বলল, 'বুরবাক কাহিঁকা, এসব কথা বলার সময় এখন পেরিয়ে গেছে। যদি কিছু বলারই থাকে, তবে শুধু এটুকুই বলো, আমি আহত, আমার ক্ষতের জন্য মলম দিন; আমি মৃত, আমাকে

আবার বাঁচিয়ে তুলুন।' আমি যেন কারও হাতে আঁকা, বিবর্ণ বুলবুল হয়ে গেলুম; শত গোলাপের গন্ধেও তো সেই বুলবুলের হৃদয় গান গেয়ে উঠবে না।

না, না, ভাইজানেরা, অমন মলিন মুখে শুয়ে পড়বেন না, দুই বদনসিব আত্মার কিস্‌সা যখন শুনতে শুরু করেছেন, তা শেষতক শোনার দায় তো আপনাদের নিতেই হবে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে আমাদের মহব্বতের কথা শুনতে শুনতে যে-খোঁয়াড়ির ভেতরে আপনারা ডুবে গেছেন, সে-খোঁয়াড়িটা এখনই ভেঙে দিতে চাই না। আর কথা দিচ্ছি, আমার এই অন্ধকারের কিস্‌সা যতদিন চলবে, মাঝে মাঝে আপনারা আলো-হাওয়া পাবেন ভাইজানেরা, আমি আপনাদের মাঝে মাঝে এমন সব কিস্‌সা-হিকায়ৎ শোনাব, এমন সব দস্তানগো'দের কাছে নিয়ে যাব যে এই জীবনটাকে ভারী পাথরের মতো মনে হবে না। হ্যাঁ, উঠে বসুন সবাই, মহব্বতের নানা কথা-কিস্‌সাই এখন আপনাদের শোনাতে চাই। সত্যি বলতে কী, জীবনে আমি যতই দোজখের গভীর থেকে গভীরে ঢুকেছি, ততই ইশ্‌ক-এর স্মৃতিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই যে জীবন আমাদের, এই যে পয়দা হওয়া, এও ইশ্‌ক ছাড়া কী? এ হল ইশ্‌ক-এ মজাজি, এই দুনিয়ার প্রেম। আর আমরা যতই মৃত্যুর দিকে এগোই, ইশ্‌ক-এ হকিকির পথ খুলে যায় আমাদের সামনে। ইশ্‌ক-এ-হকিকি তো খোদার জন্যই তুলে রাখতে হয়। তখন আপনার সামনে আর বেগম ফলক আরা নেই, মুনিরাবাই নেই, মান্টোভাইয়ের বেগু নেই, ইসমত নেই, আছেন শুধু তিনি, অল্‌হম্‌দুলিল্লা। কিন্তু ইশ্‌ক-এ হকিকি'র পথে ক'জন আর যেতে পারে বলুন? পেরেছিলেন মওলা রুমি। আমরা তো এক একটা পতঙ্গ, ইশ্‌ক-এ-মজাজির ফাঁদেই ঘুরপাক খাই। মজাটা খেয়াল করেছেন, মান্টোভাই? এই দুনিয়ার প্রেম হচ্ছে ইশ্‌ক-এ-মজাজি, যেন একটা ছবিকে ভালবাসা, প্রতীককে ভালবাসা; আর ইশক্-এ-হকিকি, যা শুধু আল্লার জন্য, তা-ই সত্যিকারের প্রেম। এর মানে কী দাঁড়ায়, বলুন? আমরা সব ছায়াপুতুল, ভালবাসার প্রতীকী অরণ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। ইশ্‌ক-এ-হকিকির পথে যদি নাও যেতে পারি, এই বা কম কী, মান্টোভাই? একটা ছবিকে ভালবাসতে পারাও কি কম কথা? এই দুনিয়াদারির জীবন তো ওইটুকুতেই ধন্য হয়ে যায়। ছবিকে ভালবেসে তো কেউ মৃত্যুকেও বেছে নেয়—সেই মৃত্যু কি ইশ্‌ক-এ-হকিকির পথের দিকে তাকিয়ে থাকে না?

তা হলে ভাইজানেরা, আমি না হয় মীরসাবের একটা মনসবির কথা বলি। ইশকের কথা বলতে গেলে মীরসাবের কথাই বারবার বলতে হবে আমাদের। ভালবাসায় আহত, নুয়ে পড়া মানুষ ছিল তাঁর কাছে খাঁচায় বন্দি বুলবুলের মতো, আর সেই বুলবুলের বিলাপ শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছিল, আসলে তিনিই ওই খাঁচায় বন্দি পাখি। মান্টোভাই, আপনি কি কখনও 'দরিয়া-এ-ইশক্' পড়েছেন? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন কেন? আরে, আমি তো জানি, আপনি পড়েননি। আমি তো দিল্লিতে কত কত লোককে দেখেছি, কলকাতায় দেখেছি, তাঁরা হিন্দুস্তানের লেখাজোখা পড়তই

না, গোরাদের লেখাই ছিল তাঁদের কাছে শেষ কথা। তা সাদা চামড়া আর ওঁদের তমদ্দুনের প্রতি আমারও একসময় খুব মোহ ছিল। তাঁদের বন্ধু বলেও ভাবতুম, কিন্তু ১৮৫৭ আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। তমদ্দুনের নামে ওঁরা যে এই দেশে একের পর এক কারবালা তৈরি করতে এসেছে, বুঝতে পারলুম।

না, না, উত্তেজিত হবেন না ভাইজানেরা, 'দরিয়া-এ-ইশ্‌ক'-এর কিস্‌সাটাই এবার আপনাদের শোনাব। এই কিস্‌সা শোনবার কথা নয় আপনাদের। যদি অন্য কোনও জন্মে যান, এই কিস্‌সার স্মৃতি নিয়ে যেতে পারবেন। যতই বদনসিব হই, আমার আবার এই দুনিয়ায় জন্মাতে ইচ্ছে করে। কেন জানেন? আমরা হলুম আসরাফ্‌-উল্‌-মখ্‌লাকাৎ, আল্লার তৈরি সেরা জীব, আদম; জিব্রাইলরাও আমাদের সামনে মাথা নুইয়েছিল, ইবলিশ তা করেনি বলে তাকে বেহস্ত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এক একটা আয়না, ভাইজানেরা, যার ভেতরে খোদা নিজেকে দেখতে পান। আর ইশক্‌ হচ্ছে আয়নার গভীরে লুকিয়ে থাকা সেই ছায়া, আপনারা কখনও তাকে দেখতে পাবেন না।

মাঝে দু-একটি কথা বলে নিতে দিন। ভাববেন না, বুড়োহাবড়া গালিব যা মনে আসছে, তা-ই বলছে। কিস্‌সা বলারও তো একটা তরিকা আছে। তরিকার প্রথম কথাটা হচ্ছে এই, যে-কিস্‌সার মধ্যে আপনি নেই, তা আপনি বলতে পারেন না। তো কীভাবে থাকেন আপনি একটা কিস্‌সার মধ্যে? আপনার বাগানের যে-গাছটার কথা আপনি মন দিয়ে বলেন, তা তো বলতে পারেন, গাছটাকে ভালবাসেন বলেই। এই ভালবাসার মধ্যেই আপনি থাকেন; আপনি মানে তো শুধু রক্তমাংসের একটা শরীর নয়, আপনার কত রহস্য, যা দিয়ে আপনি গাছটাকে ভালবাসেন। তাই এত কথা বলছি। মীরসাবের মনসবিগুলো আমি লিখিনি, কিন্তু পাঠক হিসাবে কোথাও তো আমি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, সেটাই তো থাকা; এভাবেই একজন কবিও তাঁর কবিতার মধ্যে থাকেন। বাজপাখিটা যখন ওড়ে আকাশে, তার ছায়া পড়ে মাটির বুকে; থাকাটা এইরকম, ছায়ার মতো; আমি নেই, কিন্তু আমি-ই আছি অন্য চেহারায়।

আশিকও সেভাবেই থাকে। সারাজীবন তো সে থাকে না, এমনকী পাশে পাশে থাকলেও সে আসলে পাশে থাকে না। শুধু তার একটা ছায়া থেকে যায়, যাকে আমরা সারাজীবন ভালবাসি। দীর্ঘদিন ধরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্তের মতো সেই ছায়া; নগ্ন বালিকার মতো, কোমল, যেন এই মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়বে।

'দরিয়া-এ-ইশক্‌' এমনই এক ঘুমিয়ে পড়ার কিস্‌সা। ভালবেসে, সেই ছেলেটি, এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি? কে জানে! মেয়েটাও তো জানেনি, ইশ্‌কের কাছেই একদিন ঘুমোতে যেতে হবে তাকে। ছেলেটি বড় সুন্দর ছিল, ভাইজানেরা। সাইপ্রেস গাছের মতো দীর্ঘ, হৃদয় তার মোমের চেয়ে কোমল, প্রত্যেক শিরা-ধমনীতে ভালবাসার স্রোত। এইরকম পুরুষ পৃথিবীতে মরার জন্যই জন্মায়। না-হলে তাদের জেলখানায়

বেগার খাটানো হয়, পাগলাগারদে পাঠিয়ে মারা হয়। মীরসাবকে মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখতুম আমি, সেই কুঠুরিতে, যেখানে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, কুকুরের মতো গুটি পাকিয়ে শুয়ে আছেন। একদিন তাঁর সামনে মেহর নিগার ফুটে উঠলেন।

—তুমি? মীরসাব অস্ফুটে বললেন।

—এইভাবে বেঁচে থাকবে?

—খোয়াব-এ-খেয়াল বেগম।

—শুধু আমার জন্য?

—না।

—তা হলে?

—মেহর নিগার। বেগম, একটা নাম আমাকে ভালবেসেছিল। আমি তার জন্যই এভাবে বেঁচে আছি।

—আর আমি?

—তুমি কেউ নও। তুমি তো ভয় পেয়েছিলে। সবাইকে সব কথা বলে দিয়েছিলে।

—আমাকে কেউ বাঁচতে দিত না, মীর। ওরা আমাকে গোরে পাঠিয়ে দিত।

—জানি।

—তুমি আমাকে নফরৎ কর?

—না। মেহর নিগারকে আমি এখনও দেখতে পাই। সে এখনও আমার দিলমঞ্জিলে বেঁচে আছে। যখন সে আমার জীবনে এসেছিল, সে তো অনেক পুরনো দিনের কথা।

—বলো, আমাকে ঘেন্না করো।

—না।

—কেন?

—তুমি আজ আর আমার জীবনে নেই, বেগম। একটা নাম পড়ে আছে। খোদার দেওয়া একটা নাম, আমি তাকেই ভালবাসি।

ভালবাসার নদীতে খোদার দেওয়া কত নাম যে এভাবে ভেসে যায়।

না, আমি আপনাদের ঠকাব না। সেই সুন্দর ছেলেটার কিস্‌সাতেই ফিরে আসছি, 'দরিয়া-এ-ইশক্'-এ ডুবে যার মৃত্যু হয়েছিল। তার নামও ছিল ইউসুফ। খোদা কী যে এক দিন আনলেন তার জীবনে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখ আটকে গেল এক মহলের জানলায়। কে ছিল সেই জানলায়? নিয়তি বলুন, আর আশিকই বলুন, তারই মুখ সে দেখতে পেল জানলায়। শিকারির মতো দু'টি চোখ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে, ইউসুফের মনে হল, মরার জন্যই সে ওই চোখের দিকে তাকিয়ে প্রেমে পড়ে গেল। ইউসুফ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। মেয়েটি তোয়াক্কাও করল না, ওড়নায় মুখ ঢেকে জানলা থেকে হারিয়ে গেল। কিন্তু ইউসুফ তো দিওয়ানা বেতাব। হাফিজসাব যেন তার মনের নাগাল পেয়েছিলেন!

দস্ত অয তলব ন দারম
তা কামে মন রব আয়দ
য়া জাঁ রসব ব জানাঁ
যা জাঁ যূ তন বর আয়দ।

বু কুশাএ তুরবতমরা
বাদ অয বফাৎ ব বনিগর
কয আতিশে দরনূম
দূদ অয কফন বর আয়দ।
(আকাঙ্ক্ষা থেকে সরাব না হাত
বাসনা আমার সিদ্ধ না হলে;
হয় পাবে প্রাণ বধূর নাগাল,
নয়ত যাবে সে দেহ ছেড়ে চলে।

মরলে আমার কবরটা খুঁড়ে,
দেখো তুমি, গেছে অন্তরে রয়ে
যেহেতু আগুন, কাফন আমার
রয়েছে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে।)

সেই দিন থেকে ইউসুফ পাথরের মূর্তির মতোই সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল জানলার দিকে তাকিয়ে, কখন আবার সেখানে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দেবে। রাস্তা দিয়ে লোকজন যায়, ইউসুফের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ভাবে এ ছোকরা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। কারোর কারোর কষ্টও হয়, ইউসুফকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে ভাই, কোন দুঃখে এমন পাথর হয়ে আছ? ইউসুফ কথা বলে না, শুধু জানলার দিকে আঙুল তুলে দেখায়। একদিন সবাই রহস্যটা বুঝতে পারল। আরে, এ ছেলে তো বিলকিসের জন্য দিওয়ানা হয়ে গেছে। বলতে ভুলেছি, ভাইজানেরা, মেয়েটির নাম ছিল বিলকিস। তো তার বাপ-ভায়েরা প্রথমে ভাবল, এ ছোকরাকে নিকেশ করে দিতে হবে; পরে মনে হল, খুনের দায়ে ধরা পড়লে তাদের মহলে কাক-চিলও এসে বসবে না। কী করল জানেন? রটিয়ে দিল, ইউসুফ পাগল। কেউ পাগল হয়ে গেছে, কথাটা রটিয়ে দেওয়ার জন্য তো কোনও দায় নিতে হয় না। একজন মানুষের জীবন নরক করে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় আর কী আছে? ও পাগল? বেশ, তা হলে এবার ওর গায়ে থুতু ফ্যালো, পাথর ছোঁড়ো, ওকে শেকল দিয়ে বাঁধো, কুঠুরিতে আটকে ফেলো। কিন্তু ইউসুফের গায়ে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়েও কিছু হল না, রক্তাক্ত হয়েও সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

হযার দুশ্‌মনম অর
মী কুনন্দ কস্‌দে হনাক
গরম তু দোস্তী অয
দুশ্‌মনাঁ ন দদারম বাক।

মরা উম্‌মীদে বিসালে-তু
যিন্দা মীদারদ
বগরনা হরদমম অয
হিজ্‌রতস্ত বীমে হলাক।
(আমার হাজারো দুশমন যদি
আঁটে মতলব আমাকে মারার,
আমি একটুও ভয় করব না
যদি কাছে থাকো, বন্ধু আমার।

মিলবেই সান্নিধ্য তোমার—
বাঁচায় আমাকে এই আশ্বাস;
তুমি কাছে নেই অহরহ তাই
দেখাচ্ছে ভয় সমূহবিনাশ।)

বিলকিসের বাপ-মা তখন ঠিক করল, নদীর ওপারের শহরে তার চাচার বাড়িতে বিলকিসকে রেখে আসাই ঠিক হবে। গোপনে পালকিতে চাপিয়ে বের করা হল বিলকিসকে, সঙ্গে তার পুরনো দাসী। ইউসুফ যেন আশিকের গন্ধ পেয়েছিল, সে পালকির সঙ্গে দৌড়তে লাগল, আর চিৎকার করছিল, 'রহম্ করো মেরি জান, একবার মুঝসে বাত করো।' বিলকিস কোনও কথা বলেনি, কিন্তু সেই দাসীর মন উথালপাথাল করে উঠেছিল। পালকি থেকে মুখ বার করে সে বলেছিল, 'আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো, আমার বেটির সঙ্গে তোমার দেখা হবেই।' পালকি নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল, বিলকিস নৌকোয় উঠে গেল, ইউসুফ নৌকোর দিকে তাকিয়ে ঘাটেই বসে রইল, নৌকো যখন মাঝদরিয়ায়, দাসী বিলকিসের একপাটি চটি নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে ইউসুফকে চেঁচিয়ে বলল, আমার বেটিকে সত্যিই ভালবাসলে চটিটা ফিরিয়ে এনে দাও। দাসী সত্যিই চেয়েছিল, ইউসুফ আর বিলকিসের যেন মিলন হয়, সে তো জানত না ইউসুফ সাঁতার জানে না। ইউসুফ কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার পর খাবি খেতে খেতে তলিয়ে গেল। বিলকিস নৌকোয় দাঁড়িয়ে ইউসুফের মৃত্যু দেখতে পেল। এ কে? বেহস্তের কোন ফুল? তাকে এত ভালবাসত? বিলকিস কোনও কথা বলতে

পারেনি, তার হয় তো মনে হয়েছিল, বাহার তো এসে গেছে, ফুলও ফুটেছে গাছে গাছে, তবু হে প্রিয় বাগান আমার, তাকে কেন এভাবে কেড়ে নিলে?

বাহার অওর বাগ। এই দু'টো শব্দ বলতে গেলে আমার গলা কেন এমন ধরে আসে, বলুন তো মান্টোভাই? শব্দ দু'টো যখন উচ্চারণ করি, মনে হয়, মুখের ভেতরে গোলাপের পাপড়ি পাখনা মেলছে। তবু এই দু'টি শব্দ মৃত্যুর কুয়াশায় ঢাকা কেন বলুন তো? ও বাহার, ও বাগ। বসন্ত আর বাগান কেন আমাকে বারবার মৃত্যুর কথাই বলে?

ভয় পাবেন না, ভাইজানেরা, কিস্‌সার কথা আমি ভুলিনি। শুধু বলতে বলতে এক একটা শব্দের জন্য এত কষ্ট হয়, মনে হয় তাদের জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তো যে-কথা বলছিলুম, ইউসুফ তো জলে ডুবে মারা গেল। বিলকিস কিছুদিন চাচার বাড়িতে থাকার পর তার বাপ-মা ভাবল, ছোঁড়াটা তো মরেইছে, এবার মেয়েকে ফিরিয়ে আনাই যায়। সেই নদীপথেই তো ফিরে আসা। বিলকিস নৌকোয় উঠে দাসীকে বলল, 'খানম, একবার এই নদীকে দেখতে দেবে? আমি তো এমন নদী কখনও দেখিনি।'

—দেখো না বেটি, মন ভরে দেখ। একবার নদীকে যদি দেখতে থাকো, তোমার দেখা আর ফুরোতে চাইবে না।

নদীর সম্পর্কে কত কথাই না জানতে চাইল বিলকিস, নদীর পাড়ে পাড়ে যত বসতি, সেখানে কারা থাকে, কেমন মানুষ তারা, কী করে—কথা যেন তার ফুরোতেই চায় না। শেষে সে জিজ্ঞেস করল, 'খানম, সে কোথায় ডুবেছিল বল তো, চিনতে পারো?'

—কেন বেটি?

—সেখানে কি খুব জল?

—মাঝদরিয়া যে।

—আমায় দেখাবে।

—কী দেখবে বেটি?

—মাঝদরিয়ায় কত জল।

—দেখাব বেটি। মাঝদরিয়ায় কত জল, কত স্রোত, অথচ কী যে শান্ত। খোদা জানেন, কেন এমন হয়!

বিলকিস আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলছিল, খানম তা শুনতে পায়নি। বিলকিস কী বলছিল জানেন?—সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়! এসব কথা মীরসাব যে কোথায় পেলেন, আর বিলকিসের মুখে বসিয়ে দিলেন, খোদাই জানেন। মান্টোভাই, আপনি কি শেরটা কোথাও শুনেছেন?

নৌকো মাঝদরিয়ায় পৌঁছলে খানম বিলকিসকে বাইরে ডেকে আনল।—ওই যে বেটি, ওই ওখানে ইউসুফ ডুবে গেছিল। বিলকিস কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, খানম কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে নদীর বুকে ঝাঁপ দিল। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে নদীর গভীর

থেকে তুলে আনা হল ইউসুফ-বিলকিসের মৃতদেহ। একে অন্যের হাত জড়িয়ে তারা জলের তলায় শুয়েছিল। জীবনে যা পায়নি, মৃত্যু তাদের সেই দান দিয়ে গেল। এরই নাম ইশ্‌ক-এ-মজাজি থেকে ইশ্‌ক-এ-হকিকি'র দিকে যাওয়া ভাইজানেরা।

আমাদের জীবনে ইউসুফের মতো শহাদৎ আসে না। কেন জানেন? সারা জীবন প্রতীকের অরণ্যে পথ হারিয়ে আমরা ঘুরপাক খাই। জীবনকে যে বাজি ধরতে পারে, একমাত্র সেই পৌঁছতে পারে ইশ্‌ক-এর কাছে। তার কোনও নাম নেই, সে অনাদি, অনন্ত এই বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য। আমরা কাকে সৌন্দর্য বলি? সুরা, বাহার, যৌবন, ইশ্‌ক। এরা বড় তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। যে গোলাপের রূপ আপনারা দেখেছেন, সে হয়তো কোনও সুন্দরীর কবরের মাটি ফুঁড়ে জন্মেছিল। সুন্দরীও একদিন কবরে গেছিল, গোলাপও একদিন ঝরে গেছে। যে বুলবুল গান গায়, তার গানে হয়তো কোনও মৃত শায়রের কবিতা লুকিয়ে থাকে, কিন্তু সেই বুলবুলও তো একদিন মরে যায়। এই দুনিয়া সৌন্দর্য বেশিদিন বাঁচে না ভাইজানেরা; গোলাপের গন্ধ, বুলবুলের গান আর আমাদের জীবন, কত তাড়াতাড়ি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আর যৌবন, এ জীবনের বাহার, আরও তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। শুধু খোদার দুনিয়াদারির সৌন্দর্যই অবিনশ্বর।

সে সৌন্দর্য পথের ধুলোয় দেখতে পাবেন, মান্টোভাই। এই ধুলো থেকেই আদমের জন্ম, আর ধুলোতেই সব মানুষ একদিন মিশে যায়। আমি একটা কথাই বুঝেছি, ভাইজানেরা, যদি খোদার পথেও আমরা না যেতে পারি, তো ঠিক হ্যায়, কিন্তু আতরের শিশিটাকে কষ্ট দিও না। কী মান্টোভাই, অমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন কেন? আরে, এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না? দিল্‌-এর কথাই তো বলছি। দিল্‌ একটা আতরের শিশি কি না, বলুন? মীরসাবকে কথাটা একজন পীর বলেছিলেন, 'বেটা, কারোর আতরের শিশিটা কখনও ভেঙে দিও না। সেখানেই তো খোদাতালার ঘর।' এই খাঁচার ভেতরে কতটুকু ছোট সে, তবু তারই মধ্যে মহাসাগর, তারই ভেতরে লুকিয়ে আছে মরুভূমি। এই কথা যে জানে, সেই তো বলতে পারে, কে তুমি নবাব, কে তুমি উজির, আমি কি পরোয়া করি, দ্যাখো, আমি কি ফকির নই?

আমি তো যমুনার জল থেকে উঠে আসা দরবেশবাবার হাত ধরেই একদিন চলে যেতে চেয়েছিলুম অজানার পথে। তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন না, বললেন, আয়নাটাকে বারবার মোছ, তোর জন্য অপেক্ষা করে আছে শব্দের কুহক, নিশিডাক। তারপর একদিন আয়নাটা ভেঙেই গেল, আমি কী দেখতে পেলুম জানেন? আরে, যে-ফকির হয়ে জন্মেছিলুম, আমি তো সেই ফকিরই আছি, মাঝখানে একটু মদ-মেয়েমানুষ-নবাবের দেওয়া খেতাব। এসব ঝরে যেতে আর ক'দিন সময় লাগল?

১৮৫৭-র বেশ কয়েক বছর পরের কথা। একজন ফকিরসাব এসে আমার দরজার সামনে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা চাইছিলেন। আমি চমকে উঠলুম। এ তো আমার

লেখা গজল। ফকিরসাব কোথায় পেলেন? আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গান কার লেখা?'

—এসব তো পথেই লেখা হয়, হুজুর।

আমি ফকির হতে পেরেছি কি না জানি। মান্টোভাই, আমার গান তো ফকিরির পথে চলে যেতে পেরেছে। ধূলায় ধূলায় যাঁর চরণ পাতা, সেই চরণের আলপনায় মাথা রাখতে পেরেছে। কবির কাছে এই তো তার রিজবানের বাগিচা।
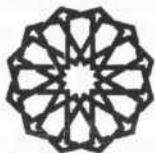
ফলক্-কো দেখ-কে করতা হূঁ য়াদ উস-কো, অসদ;
জফা-মেঁ উস-কে হৈ আন্দাজ কার্‌ফর্‌মাঁ-কা।।
(আকাশের দিকে তাকালে তার কথাই মনে আসে, আসাদ;
তার নিষ্ঠুরতায় আমি যে দেখেছি বিধাতার নিষ্ঠুরতার আদল।।)

রিজবানের বাগিচা। না, মির্জাসাব, স্বর্গের বাগানে ঢোকার অধিকার আমার ছিল না, এমনকী সেই বাগানের খুশবুটুকুও আমার কাছে এসে কোনওদিন পৌঁছয়নি। তবু আল্লার কাছে আমি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, এই কালো আত্মা, সাদাত হাসান মান্টোকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও, সুগন্ধ ছেড়ে সে কেবল বদবুর পেছনেই দৌড়য়। জ্বলন্ত সূর্যকে সে ঘৃণা করে আর ঢুকে পড়ে অন্ধকার গোলকধাঁধায়। যা কিছু ভদ্র-সভ্য, তার মুখে লাথি ঝেড়ে সে ল্যাংটো সত্যকে জড়িয়ে ধরে। তেতো ফল খেতেই ভালবাসে সে। বাড়ির বেগমদের প্রতি কোনও টান নেই, বেশ্যাদের নিয়ে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছতে চায়। সবাই যখন কাঁদে, সে হাসে; আর অন্যরা যখন হাসে, সে কাঁদে। নোংরায় যে মুখ কালো হয়ে গেছে তাকে ধুয়েমুছে, পুরনো মুখটা খুঁজে পেতে চায় মান্টো। খোদা, এই শয়তানকে, ভ্রষ্ট ফরিস্তাকে তুমি একবার বাঁচাও।

না, ভাইজানেরা, খোদা আমার ডাকে সাড়া দেননি। আমি তখন কী করি? কিস্‌সার পর কিস্‌সা জমা করতে লাগলাম জামার পকেটে। সবার কিস্‌সা মাথায় থাকে, আর আমার পকেটে। কেন জানেন? কিস্‌সা লেখার জন্য আগাম টাকা নিতাম যে। টাকা

যেমন পকেটে ঢোকে, কিস্‌সাও তেমনই পকেট থেকেই বেরোয়। লোকে ভাবত, জাদুকর। এত কিস্‌সা পায় কোথা থেকে? আরে ভাই, কিস্‌সার কী অভাব আছে? তোমার চোখে যদি ঠুলি না পরানো থাকে, তবে তুমি সব জায়গাতেই কিস্‌সা খুঁজে পাবে। তোমার হাতে যদি কোনও গজফিতে না থাকে, তা হলে সব মানুষের কিস্‌সাই তোমার কিস্‌সা। প্রগতিশীলেরা আর মোল্লারা এইজন্য আমাকে সহ্য করতে পারত না, ওদের হাতে তো গজফিতে থাকত, সেই মাপে মিললে গপ্পো লেখা যাবে, না হলে সে গপ্পোকে জীবন থেকে বাদ দাও। ওদের কীভাবে বোঝাব বলুন, মান্টো কখনও নিজেকে লেখক হিসেবে দেখাতে চায়নি। একটা ভেঙে-পড়া দেওয়াল, প্লাস্টার খসে পড়ছে, আর মাটিতে কত অজানা নকশা তৈরি হচ্ছে—আমি ওইরকম একটা দেওয়াল। গাড়ির পেছনে যে পাঁচ নম্বর চাকাটা আটকানো থাকে, কাজে লাগতে পারে, নাও পারে, আমি সেই চাকাটা। বিশ্বাস করুন, কখনও শান্তি পাইনি আমি, কোনও কিছু পেয়ে মনে হয়নি, এবার পূর্ণ হলাম। কী এক অভাববোধ, ভাইজানেরা, একটা কিছু আমার মধ্যে নেই, আমি অসম্পূর্ণ, সবসময় এমনটাই মনে হত। আমার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি ওপরে থাকত। সবসময় যেন এক ঘূর্ণিস্রোত আমার ভিতরে পাক খেয়ে চলেছে। আপনারা হয়তো হাসবেন, তবু আমার মনে হয়, যাদের শরীরের তাপমাত্রা সবসময় স্বাভাবিক থাকে, কবিতা-কিস্‌সা লেখা তো বাদ দিন, তারা একটা গাছ বা নদীকেও ভালবাসতে পারে না। আমি বলছি, ভাইজানেরা, শুনে রাখুন, পাগলামি ছাড়া, অস্বাভাবিকতা ছাড়া কোনও সৃষ্টি, ভালবাসার জন্ম হয় না, ভালবাসা মাপজোক করে হয় না; তুমি আমাকে এতটুকু দেবে তো, আমি তোমাকে এতটুকু দেব, এর নাম সংসার, ভালবাসা নয়, মজার কথা, এইরকম হিসেবনিকেশকে মানুষ ভালবাসা মনে করে। সত্যিকারের মহব্বৎ আমি দেখেছি হিরামান্ডিতে, ফরাস রোডে—সব লালবাতির মহল্লা—ভালবাসার জন্য ফতুর হয়ে যেতে পারে, খুন করতেও পারে। কিন্তু বাবুদের চোখে ওরা তো সব রেন্ডি, শরীর নিয়ে ব্যবসা করে, মহব্বতের ওরা কী জানে? না, না, মির্জাসাব, অমন অসহায় চোখে আপনি তাকিয়ে থাকবেন না, আমি তো জানি, আপনি, একমাত্র আপনিই, তবায়েফদের দিলমঞ্জিলে পৌঁছতে পেরেছিলেন। আমিও তো তাই দেখলাম, কোঠায় কোঠায় মাংস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আর মাংসের ভেতরের নূর—সৌগন্ধীদের দিল্—ইশ্‌কের জন্য নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বারিসাবের সঙ্গে লাহোরে কাজ করতে গিয়ে হিরামান্ডিতে আমার যাতায়াত শুরু। তখন থেকেই ওদের আমি দেখতে শুরু করেছিলাম, 'ঘর' শব্দটা যাদের কাছে সারা জীবন স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। ওরা সবাই আলাদা আলাদা, সকলের ভিন্ন ভিন্ন গল্প। টলস্টয় বলেছিলেন, সব সুখী পরিবার একরকম, দুঃখী পরিবারদের গল্পগুলো নানা রঙের। হিরামান্ডির ওই রংদার দুনিয়ায় ঢুকে পড়লে মনে হত, আমার হাতের ভেতরে

কতরকম হৃৎপিণ্ড যে ধকধক করছে, কেউ মালকোষ তো, কেউ বেহাগ, কেউ ভৈরবী, তো অন্যজন পূরবী; রাগ-রাগিণীর কতরকম যে খেলা। রাগের ভেতরেই অশ্রু, রক্ত, আর্তনাদ, ছুরি শানানোর শব্দ। বারিসাবের সঙ্গে তো যেতামই, তা বাদেও একা একা ঢুঁ মারতাম হিরামান্ডিতে। রেন্ডিরা তো আছেই, দালাল, ফুলওয়ালা, পানওয়ালাদের সঙ্গে গল্প করতাম, আমাকে দেখলেই ওরা হইহই করে উঠত, 'মান্টোভাই আ গিয়া, অব মজা জমেগা।' তা, ভাইজানেরা, আপনাদের দয়ায়, মজা জমাতে আমার জুড়ি ছিল না, মজা শেষ হওয়ার পর দেখতে পেতাম, মান্টোর ভিতরের ন্যাড়া জমিটা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে, একটাও ঘাস গজায়নি। আরে ভাই, আমি তো জানতামই, ওই নাবাল জমিতে কখনও ঘাস জন্মাবে না, যতদিন বেঁচে আছ, দেখে নাও, যা দেখছ কিছু তো লিখে রাখো, সেই লেখার ভেতরে মরূদ্যান তৈরি হলেও হতে পারে, তবে সব কাঁটাগাছে ভরা, এই যা।

হিরামান্ডিতে আমরা যেতাম একেবারে বাদশার মতো। একদিনের গল্প বলি। সেদিন আমি আর বারিসাব বলবন্ত গার্গীকে পাকড়াও করেছি। বলবন্ত নিপাট ভালমানুষ লেখক, তাই কোথায় যাচ্ছি, আগে তা বলিনি। একটা পেশোয়ারি টাঙ্গা ভাড়া নিলাম। বলবন্ত বারবার জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবে মান্টোভাই?'

বারিসাব মিটিমিটি হাসেন। আমি বলি, 'শুধু খবরের কাগজের অফিসে বসে থাকলে লেখক হওয়া যায় না বলবন্ত। চলো, আজ একটু পাপ করে আসি।'

—মতলব?

—বলবন্ত, মান্টোর কথাই না হয় আজ শোনো। দোজখে তো আর নিয়ে যেতে পারবে না। তার একটু ওপরেই থাকবে। বারিসাব হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

শাহি মসজিদের সামনে গিয়ে আমাদের টাঙ্গা থামল, পাশেই তো জ্যান্ত মাংসের বাজার। তখন সন্ধে হয়েছে; রাস্তায় রেন্ডি, দালাল, ফুলওয়ালা, কুলফিওয়ালাদের ভিড়, টিক্কা কাবাবের গন্ধে চারদিক ম ম করছে, হাওয়ায় ভাসছে সারেঙ্গির সুর, ঠুংরির দু'একটা কলি; বলবন্ত আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'কোথায় নিয়ে এলে, মান্টোভাই?'

—হিরামান্ডি। নাম শোনোনি?

সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ভয় পেলে নাকি?

—না। বলবন্ত ঢোঁক গিলে বলল, 'তুমি তো আছ।'

—ভরসা রাখো বন্ধু, মান্টোর ওপর ভরসা রাখো।

এদিকে দেখি, বারিসাব এক পাঠান দালালের সঙ্গে দরদাম শুরু করে দিয়েছেন। আশ্চর্য স্বভাব লোকটার। মস্তি করতে এসেও দরদাম করবেই। শালা আরামকেদারার বিপ্লবী তো, সব কিছু নিক্তি মেপে করবে। কমিউনিস্ট হারামিদের আমার এই জন্য

সহ্য হয় না, ফুর্তি মারার ইচ্ছে ষোলো আনা, লুকিয়ে-চুরিয়ে মজাও মারবে, কিন্তু সবসময় কপালে কাস্তে-হাতুড়ির তিলক এঁকে বসে আছে, আর সব কিছু নিয়ে দরদাম করবেই। ওদের হিসেবের বাইরে পা রাখলেই আপনি প্রতিক্রিয়াশীল। বিপ্লব মারাচ্ছে! কে তোদের ওপর দায় দিয়েছে রে সবাইকে সমান করার? সে শুধু সুফি সাধনাতেই সম্ভব, সে পথ ফকির-দরবেশের, কমিউনিজমে তার কোনও রাস্তা নেই। ক্ষমতা দখল যার লক্ষ্য, সবাইকে সমান দেখার সাধনার পথ তার জন্য নয়। মাফ করবেন ভাইজানেরা, আবার বখোয়াশি করে ফেলছি; আধুনিক মানুষ তো, একটা গল্পও সহজভাবে বলতে পারি না, জ্ঞান দেওয়ার ভূতটা সবসময় ঘাড়ে চেপে আছে।

বারিসাবকে বললাম, 'কত দিন বলেছি, দরদাম করতে হয় আপনি একা কোনও কোঠায় যান।'

—আরে, এ শুয়োরের বাচ্চারা—

—আপনি, আমি, কম শুয়োরের বাচ্চা? মনে থাকে না?

আমার এইরকম খিস্তি শুনলে বারিসাব একেবারে গুম মেরে যান। আমার কথা শুনে পাঠান দালাল চনমনে হয়ে বলে ওঠে, 'ওপর চলুন সাব। দারুণ লেড়কি আছে, একদম দম্‌পুখত্‌।'

ওই কোঠায় সেদিন আমরা প্রথম গেছি। দোতলার একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম, বছর পঁয়ত্রিশের এক পাঠান মহিলা বসে আছে, মালকিন আর কী। মোটাসোটা চেহারা, খোঁপায় মোটা জুঁইফুলের মালা জড়ানো, পান-রাঙানো ঠোঁট। বেশ দিলখোশই বলতে হবে।

—কী দেখছেন, মিঞা? সে কপট রাগের ভঙ্গিতে বলে।

আমিও তো কম বদমাইস না, খেলে দিলাম, মির্জাসাবের একটা বয়েৎ বলে উঠলাম।

ইশক্‌ মুঝকো নহীঁ, বহ্‌শত্‌ হী সহী
মেরী বহ্‌শত্‌, তেরী শোহরত হী সহী

—কেয়া বাত, কেয়া বাত। জব্বার—জব্বার মিঞা—

—জি, মালকিন। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে।

—মেহমান হাজির। গ্লাস লে আও।

গ্লাস আসে। জব্বার মিঞাকে আমি সোডা, টিক্কা কাবাব আনতে বলি। বলবন্ত আবার তখন গোস্ত খায় না, তার জন্য ওমলেট। দশ মিনিটের মধ্যেই জব্বার সব ব্যবস্থা করে ফেলে। জনি ওয়াকার সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন বারিসাব। তিনটে গ্লাসে হুইস্কি, সোডা ঢালা হল, সঙ্গে বরফ। আমি জানতাম, বলবন্ত খাবে না। একটা গ্লাস মালকিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে তার উরুতে চাপড় মেরে বললাম, 'পিজিয়ে, মেরি জান।'

ছুরির ফলার মতো তার দৃষ্টি আমাকে বিঁধল, আমার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে মালকিন বলল, 'মেরি জান কা মতলব জানতে হো জনাব?'

—জি।

—বাতাইয়ে।

—সুরৎ আঈনহ্‌মেঁ টুক দেখ তো কেয়া সুরৎ হ্যয়!

বদজবানী তুঝে উস মুঁহপে সজাবার নহীঁ।

—মীরসাব; হ্যায় না?

—জি, মেরি জান।

—বহ তো কল দের তলক দেখতা ইধর কো রহা

হমসে হী হাল-এ তবাহ্‌ অপনা দিখায়ে নহ্‌ গয়া।।

—মাশআল্লা। আমি ঝুঁকে পড়ে তার পায়ে চুম্বন করি।

—এ কী করছেন, মিঞা?

—মহব্বত থাকে পায়ে। আমি হেসে বলি।

—কিঁউ?

—দেখেননি, মীরার গিরিধরলাল কেমন শ্রীরাধার পদসেবা করেন? আমরা, মানুষেরা নামি ওপর থেকে, ওষ্ঠচুম্বন করতে করতে, আর মোহনজি শ্রীরাধার পদচুম্বন করতে করতে ওপরে ওঠেন। আমাদের প্রেম তাই একদিন হারিয়ে যায়, তাঁর প্রেম লীলা হয়ে ফুটে ওঠে।

—শোভানাল্লা, হিরামান্ডিমে এ কৌন ফরিস্তা আয়া আজ!

বারিসাব হা-হা করে হেসে ওঠেন।—দ্যাখো বলবন্ত, কাণ্ড দ্যাখো, হিরামান্ডিতে এসে ইবলিশ হয়ে গেল ফরিস্তা।

পঁয়ত্রিশ বছরের রেন্ডিটা তখন আমার হাত চেপে ধরেছে, তার দুই চোখে কুয়াশা, যেন আমিই মীরার গিরিধরলাল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'মাল কোথায়?'

সে কথা বলতে পারে না; তার চোখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস।

—মাল তো দিখাইয়ে। রাত এইসি গুজর জায়েগা? আমি এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে বলি।

মালকিন পাঠান দালালের দিকে তাকাতেই সে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে গোলাপি জর্জেট শাড়ি পরা একটা মেয়ে নিয়ে এল। আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। লক্ষ করলাম, বলবন্তও আড়চোখে মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা বেশ রোগা, মুখে বহুত রং মেখে এসেছে, চোখে গাঢ় কাজল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল, কিছু একটা বলতে হবে তো, তাই বলল, 'কোথা থেকে আসছেন?'

—তোমার আম্মিজানের গাঁও থেকে।

—জি? সে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

—তুমি কোত্থেকে এসেছো?

—জি—

এইসব মেয়ের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, শোওয়াও যায় না। আমি বাতিল করে দিলাম। পাঠান দালাল পরপর বেশ কয়েকজনকে নিয়ে এল, কাউকেই পছন্দ হল না আমার। বারিসাব এজন্য প্রতিবারই আমার ওপর রেগে যেতেন।—ব্যাপার কী মান্টো, বিছানায় গিয়ে তো শোবো, তার জন্য এত কথার কী আছে?

—আপনি যান না কাউকে নিয়ে।

কিন্তু আমি মত না দিলে বারিসাবও যে বিছানায় যাবেন না, তা আমি জানতাম।

এরপর যে-মেয়েটা এল, সে বেশ লম্বা, ঝকঝকে, তার মুখের হাসিটি উত্তেজকই বলা যায়। তবে তার দু'চোখ কালো কাচের চশমায় ঢাকা। নামাজ আদায়ের ভঙ্গিতে সে এসে আমাদের সামনে বসল। আমার বেশ পছন্দই হয়েছিল তাকে। এর আগে যাদের আনা হয়েছিল, তাদের সবাইকেই কিছু না কিছু প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিতে পারেনি, সব মাথামোটার দল। মনে হল, এ-মেয়েটা পারবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারবে?'

—জি বলুন।

—ভুরান নামে এক বাই ছিল। তার মেজাজ-মর্জি সবার থেকেই আলাদা। একদিন সে মির্জা মজহর জান-ই জন্‌নকে খত্‌ পাঠাল, 'আপনার জন্য আমি বেচায়েন হয়ে আছি। কিন্তু আপনি চারজনকে ভালবাসেন। আমি কখনও তেমন হতে পারি না। চারজনকে ভালবাসা মেয়েদের উচিত নয়।' বলো তো, মির্জাসাব কী উত্তর দিয়েছিলেন?

—বারোজনের বদলে চারজনকে যে ভালবাসে, সে অনেক বেশি ধার্মিক।

উত্তর শুনে আমি চমকে গেলাম।—কী করে জানলে?

মেয়েটি হেসে বলল, 'চারজনকে যে ভালবাসে, সে সুন্নি—চারজন খলিফাকে সে মান্য করে। আর বারোজনকে যে ভালোবাসে সে শিয়া—বারোজন ইমাম তাকে পথ দেখান।'

—এ কিস্‌সাটা জানলে কোত্থেকে?

মেয়েটি হাসে, উত্তর দেয় না। আমার তাকে পছন্দ হয়ে যায়। কথা বলতে পারব না, এমন কোনও রেন্ডির সঙ্গে সারা রাত কাটানো যায়? কিন্তু মেয়েটা সন্ধেবেলা চোখে কালো চশমা পরে আছে কেন? কথাটা জিজ্ঞেসও করলাম।

বেশ চোস্ত মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপনার খুবসুরতি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে জনাব।'

—কেয়া বাত। তোমার সঙ্গে শুলে তো বেহস্তে যাব মনে হচ্ছে, মেরি জান।

—আমি তবে আগে যাই। বারিসাব চেঁচিয়ে ওঠেন।—মান্টোভাই, তোমার আগে জন্নতে যাওয়ার সুযোগটুকু আমাকে দাও।

—দেবো, দেবো, আর আগে তো সত্যিটা দেখি। বলতে বলতে আমি মেয়েটির চোখ থেকে কালো চশমা টেনে খুলে নিই। ট্যারা, এক্কেবারে ট্যারা একটা মেয়ে। আমি চশমাটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'চশমা না পরে এলে, ট্যারা হলেও আমি তোমার সঙ্গে শুতে যেতে পারতাম। কিন্তু মিথ্যে আমি সহ্য করতে পারি না, মেরি জান। কাটো, এবার কেটে পড়ো দেখি। চালিয়াতি আমি বরদাস্ত করি না।'

সে মেয়েটিও চলে গেল। রাত প্রায় এগারোটা বাজতে চলেছে। আবার নানারকম ভাজাভুজি, কাবাব এল। পাঁচ পেগ খতম হয়ে গেছে। ছ' নম্বর গ্লাসে ঢালতে যাওয়ার সময় মালকিন আমার হাত চেপে ধরল, 'আর খাবেন না, জনাব।'

—কেন?

—মান্টোভাই, কথা শোনো। বলবন্ত বলল।—উনি তোমার ভালর জন্যই বলছেন।

—আমার ভালর জন্য? বলবন্ত তুমি এদের চেনো না। বাকি মালটা ও দালালের জন্য রাখতে চায়। আরে বাবা, দালালের জন্য চাই তো বলো, পুরো বোতল আনিয়ে দিচ্ছি। এসব হারামজাদিকে তুমি চেনো না।

আমি গ্লাসে চুমুক দিতেই মালকিন আবার আমার হাত চেপে ধরল।—আল্লা কসম, আর খাবেন না, জনাব। আপনার মতো মানুষ আমি আগে কাউকে দেখিনি।

—তাই? তোমার মতো খুবসুরতও এই দুনিয়াতে আর কেউ নেই। আমি তার পেটে হাত বোলাতে লাগলাম, সে একবারও বাধা দিল না। আমি তার গলায় চুমু খেতে খেতে বললাম, 'তুমি ক্লিওপেট্রা, তুমি হেলেন। তুমি জানো? জানো না। মান্টোর কাছে শুনে রাখো।'

আমি সে-রাতে কোঠাতেই থেকে গিয়েছিলাম। বারিসাব, বলবন্ত কখন চলে গিয়েছিল, কে জানে। মালকিন আমাকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল; নেশার ঘোরে আমি, তার কান্না একটা মরা নদীর মতো আঁকড়ে ধরছিল আমাকে। ভোরের দিকে যখন নেশা কাটল, দেখলাম, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি, আর তার চোখ দু'টো আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। কেন, কেন যে আমার কান্না পেল জানি না, আমি তার পেটে মুখ ডুবিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম। সে আমার মাথায় হাত রেখে বসে থাকল, একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমি তার কোঠাতেই স্নান করলাম। সে আমার জন্য চা-নাস্তা নিয়ে এল। সকালের আলোয় প্রথম আমি তাকে ভাল করে দেখলাম। বিবর্ণ, তবু বোঝা যায়, একসময় তার শরীর শ্বেতচন্দনের রঙে উদ্ভাসিত ছিল; চোখের নীচে কালি, কিন্তু

একসময় এই চোখ মরকতমণির মতোই উজ্জ্বল ছিল; তার শরীর, এখন অনেক ভাঙচুর, একসময় চিনারের মতোই সুঠাম ছিল।

—তোমার নাম কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—কান্তা।

—কবে এসেছিলে এখানে?

—মনে নেই।

—কী মনে আছে, তোমার কান্তা?

—কিছু না, জনাব।

—কাউকে মনে পড়ে না?

কান্তা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'খুশিয়াকে মনে পড়ে মাঝে মাঝে।'

—কে খুশিয়া?

—দালাল। আমার জন্য খদ্দের নিয়ে আসত।

—খুশিয়া মরে গেছে?

—জানি না।

—খুশিয়া কোথায় জানো না?

—না।

—তা হলে খুশিয়ার কথা বলো। আমি তার হাত ধরি।

—খুশিয়া আমাকে ভুল বুঝেছিল।

—কেন?

—খুশিয়ার সামনে আমি লজ্জা পাইনি। কেন পাবো, বলুন? ও তো খুশিয়া, আমার কোঠার খুশিয়া।

—কী করেছিল খুশিয়া?

—জনাব, এবার আপনি যান, সকালবেলা এ-মহল্লায় আপনাদের থাকতে নেই। আমিও তো একটু ঘুমোতে যাব।

—খুশিয়ার কথা একদিন বলবে?

—বলব। আপনি আসবেন। তবে একা। এত লোক নিয়ে নয়।

—কেন?

কান্তা হেসে ওঠে।—রেন্ডির আবার কথা কী? সে তো কাপড় তুলবে, আপনি যা করার করবেন। কেউ কেউ আসল নাম জিজ্ঞেস করে, কেন লাইনে এসেছি জানতে চায়। মাফ করবেন জনাব, এই কুত্তাগুলোর মুখে মুতে দিতে ইচ্ছে করে। মারাতে এসেছিস, মারা। আমাকে জানার কেন ইচ্ছে হয় তোর? ঘণ্টাখানেকের মামলা, গতর দ্যাখ্, যা করার কর, ফুটে যা। কিন্তু, আপনি আবার আসবেন তো? খুশিয়া যে কেন এমন করল, আমি আজও বুঝতে পারি না, জনাব।

সব্‌জ হোতী হী নহীঁ য়হ্‌, সরজমীঁ
তুখ্‌ম্‌-এ খ্বাহিশ দিলমেঁ তূ বোতা হ্যয় কেয়া।।
(এ বক্ষভূমি শস্যশ্যামলা হবে না কোনও দিন,
কেনই বা তাতে বাসনার বীজ বুনে যাচ্ছ?)

এক ভোরবেলা স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, কাল্লুকে ডাকার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। স্বপ্নটা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারিনি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক কাফেলা চলছে। নীল আলো ছড়িয়ে আছে মরুভূমিতে। উট আর মানুষগুলি সত্যিকারের নয়, যেন ছায়ার মিছিল চলেছে। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছে না। শুধু মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে ভেসে আসছে সমবেত আর্ত-চিৎকার, যেন কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, আর ওই চিৎকার যে মৃত্যুর সঙ্গে মোলাকাতের আর্তনাদ তা আমি বুঝতে পারছিলুম। আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল সবার সঙ্গে। বুঝতে পারছিলুম না তো, কাফেলার সঙ্গে আমি কোথায় চলেছি? কেনই বা জুড়ে গেছি এই দলের সঙ্গে? পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জনাব?'

লোকটা উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পর আবার একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতদূর যেতে হবে আমাদের?'

সে-ও কোনও কথা বলল না।

এরা কি কথা বলতে পারে না? না, আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তা হলে আমাকে তাদের দলে নিয়েছে কেন?

একটা কালো ছায়া যেন আমার বুকের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কয়েকজনের কাছে জল চাইলুম, তারা শুধু আমার মুখের দিকে তাকাল, কথা বলল না, জলও দিল না। ঠিক করলুম, এই দল ছেড়ে আমাকে পালিয়ে যেতেই হবে। উটের মুখ উল্টোপথে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে কিছুতেই কাফেলা থেকে আলাদা হবে না। শেষমেশ এক ঝটকায় সে আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিল। আমি বালির ওপর পড়ে গিয়ে দেখলুম, কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, ভাইজানেরা, কী বলব, উঠে দাঁড়ানোর

মতো শক্তি আমার ছিল না, মনে হচ্ছিল, মরুভূমি যেন আমাকে গ্রাস করে নিতে চাইছে। একসময় দেখলুম, একটা চাপ বাঁধা অন্ধকার আমার ওপর নেমে আসছে। হ্যাঁ, বিরাট ডানার এক পাখি, লম্বা গলায় শুধু কাঁটা আর কাঁটা, এমন পাখি তো আগে কখনও দেখিনি, কোথা থেকে এল এই পাখি, আমার দিকে সে ধেয়ে আসছে কেন? পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম, শরীর নাড়ানোর কোনও ক্ষমতাই আমার নেই। পাখিটা আমার বুকের ওপর এসে বসল, দুই ডানা ছড়ানো, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, দেখলুম, তার চোখ নেই, শুধু দু'টি কোটর, আর তারপর তার লম্বা ঠোঁট নেমে এল আমার বুকের ওপর, পাখিটা ঠোকরাতে শুরু করল, বুক ফুটো করে সে আমার শাঁস-রক্ত খেতে চায়, সে ঠুকরে যেতে লাগল, মাংস ছিঁড়তে থাকল...

তখনই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। সত্যি বলতে কী মান্টোভাই, জীবনে প্রথম আমি ভয় পেলুম। কী মানে এই স্বপ্নের? আমার কেয়ামতের দিন তা হলে এসে গেছে! এত যে খেতে ভালবাসি, সারাদিন কিছু খেতে পারলুম না, যতবারই খাবারের দিকে তাকাই খতরনাক পাখিটার লম্বা ঠোঁট দেখতে পাই। কাল্লু গিয়ে হয় তো জেনানামহলে জানিয়েছিল, তাই সন্ধেবেলা বেগম আমার কাছে এল।

—সারা দিন কিছু খাননি শুনলাম। তবিয়ৎ খারাপ?

—না, বেগম।

—তা হলে?

জানেনই, উমরাও বেগমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নটা আমি তাকে বলতে চাইছিলুম। বেগম হয়তো আমাকে সামান্য হলেও আশ্রয় দিতে পারবে। পুরুষেরা এক-একসময় কেমন অসহায় হয়ে যায়, মান্টোভাই, আল্লার হাত ধরার চেয়ে সে তখন নারীর কাছে মুখোমুখি বসিবার সামান্য একটু জায়গা খুঁজতে চায়।

—একটা বদখোয়াব দেখে সারাদিন ধরে শুধু উল্‌টি আসছে।

—কী দেখেছেন, আমাকে বলুন।

আমি বেগমকে স্বপ্নটা বললুম। শুনে তাঁর ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলল।—এ খোয়াব তো আপনারই দেখবার কথা মির্জাসাব।

—জি—

—উল্‌টি আসছিল বলে কিছু খাননি, শরাব তো পিয়া, না?

আমি কোনও কথা বললুম না।

—শরাব আর জুয়ার মধ্যে ডুবে আছেন, আর কোন খোয়াব দেখবেন আপনি? ভাল খোয়াব তো আপনার জন্য নয়, আপনি দেখতেও চান না।

আমি মনে মনে নিজের গালে চড় মারলুম। কেন বেগমকে খোয়াবের কথা বলতে

গেলুম? এবার তো আমাকে শুনতে হবে, আমি কতটা বেশরিয়তি, আর শরিয়ত যে মানে না, তার জীবনটাই তো একটা বদখোয়াব। এইরকম সময়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমি তো একটা কাজই করতে পারি, ঠাট্টামশকরা করা, ওইটুকুই তো আমার সম্বল। বেগমকে বললুম, 'হজরত মুসাকি বহ্‌ন, আমার জন্য তা হলে দোয়া করুন।'

—আপনার জন্য দোয়া? আপনি শরিয়ত মানেন না, রোজা রাখা তো দূর, নমাজও পড়েন না, আপনার জন্য কী দোয়া করব বলুন। আল্লাই জানেন, আপনার কী হবে—

আমি হেসে বললুম, 'আমার হশর তোমার চেয়ে খারাপ হবে না বেগম। ভালই হবে।'

—কী করে বুঝলেন?

—আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

—কী দেখছেন?

—হশরে তোমার সঙ্গে থাকবে মাথা মুড়োনো ধার্মিক লোকেরা, তাদের নীল পোশাক, কোমরে দাঁতন, হাতে বদনা, সব গোমড়ামুখো মানুষ।

—তাই? বেগমও হেসে ফেলে।—আর আপনার সঙ্গে কারা থাকবেন?

—তাঁরা সব দুর্ধর্ষ, অত্যাচারী বাদশা। ফরাউন, নিমরোদ। তাঁদের কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। আমি গোঁফে তা দিতে দিতে বুক ফুলিয়ে তাঁদের সঙ্গে হেঁটে যাব। আর আমার দু'পাশে ফরিস্তারা আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবেন।

—বেশ তো, সেভাবেই যাবেন। বেগম উঠে দাঁড়ায়।—আমি যাই। রাতে একটু খেয়ে নেবেন। খালি পেটে শরাব ঠিক না।

—বেগম—

—বলুন।

—শরিয়ত কি এতই কঠোর, যে তা মানে না, তার কথা শোনাও হারাম? একটা কিস্‌সা শোনার সময় আছে তোমার হাতে?

—কার কিস্‌সা?

—শেখ আবু সয়ীদের। খোরাসানের সুফি সাধক। তো শেখকে একদিন তাঁর শিষ্যরা জিজ্ঞেস করল, এ-শহরে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন মানুষ কে? শেখ বললেন, কেন, লোকমান, ওর মতো সাফ মানুষ আর আছে নাকি? শাগির্দরা তো অবাক। লোকমান তো একটা পাগল, চুলে জটা, ছেঁড়া-নোংরা আলখাল্লা পরে থাকে, আর কথায়-কথায় মুখে খিস্তি। শেখ তখন বোঝালেন, 'পরিচ্ছন্ন মানুষ কাকে বলে জানো? যে কোনও কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে নেই। তাই লোকমানের মতো পরিচ্ছন্ন আর কে আছে?'

—আপনি নিজেকে এমনই সাফসুরতি মনে করেন?

—না, বেগম। তোমার শরিয়ত মানায় যে সাফসুরতি নেই, সেটুকুই আমি বুঝি।

সত্যি কথা যদি শুধু পাথরের মতো আঘাত করে, আমার কাছে তার কোনও মূল্য নেই। তার চেয়ে মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থাকা ভাল। আমরা তো কেউই জানি না, কেয়ামতের দিনে কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব!

বেগম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মহলসরায় চলে গেল।

তখন আমার ঊনত্রিশ বছর বয়স, মান্টোভাই। কত তাড়াতাড়ি খোয়াবের ভেতরে আমি কেয়ামতের দিনের ছবিটা দেখতে পেলুম। সে-বছরই আমার ভাই ইউসুফ মির্জা পুরো পাগল হয়ে গেল। আগের বছর শ্বশুর মারুফসাব মারা গেছেন। জীবনটা তো খুল্লমখুল্লাই কেটে যাচ্ছিল, পেনশনের সামান্য ক'টা টাকা, এরপর দানখয়রাতে, আর ধারদেনা করে। কিন্তু এবার একটা অন্ধগলির ভেতরে এসে দাঁড়ালুম আমি। মারুফসাব মারা যাওয়ায় আমার ভিতটাই টলে গেল। পাওনাদাররা টাকা শোধ দেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করল। যে-জীবনযাপনে আমি অভ্যস্ত তা তো আর বদলাতে পারব না, তা হলে একটা কাজই করার, কীভাবে, কোথা থেকে টাকা পাওয়া যায়? একটা কথাই নিজেকে বলতুম, রোজগার বাড়াতে হবে মির্জা গালিব, না হলে তুমি বাঁচবে কীভাবে, আর নিজের মতো করে বাঁচতে না পারলে, কী করে গজল লিখবে? উপোস করে কে কবে সৌন্দর্যের জন্ম দিতে পেরেছে দুনিয়ায়, মান্টোভাই?

গোরাদের কাছ থেকে যে-পেনশন পেতুম, এবার তার হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসতেই হল আমাকে। ভাববেন না, শুধু নিজের জন্য। ইউসুফ মির্জার পরিবার, চাকর-বাকর-দাসী, তাদের ছেলেমেয়েদেরও দেখতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, নিজের মৌতাতে থাকতুম ঠিকই, কিন্তু কাউকে তো জীবন থেকে ফেলে দেওয়ার কথা ভাবিনি। কী করে ভাবব, বলুন? ওরা চারপাশে আছে বলেই তো আমি আছি। একা একা আমার কী ক্ষমতা? দু'টো লাইন লেখার জন্যও অনেক মানুষের সঙ্গে থাকতে হয়, সে তো আপনি জানেন, মান্টোভাই।

কোনওদিন তো ভাবিনি টাকাপয়সার হিসেবের মধ্যে মাথা গুঁজতে হবে আমাকে। ভোগ করার জন্য টাকা তো লাগেই, টাকা কোত্থেকে আসবে, কীভাবে জোগাড় করব, এ সব ধান্দার কথার ভাবলেই আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ত। কিন্তু মানুষ কী না পারে বলুন? মেঘের সঙ্গে মেঘ হয়ে ভাসতে পারে, আবার একটা কেন্নোর মতো মাটিতে সেঁধিয়ে যেতেও পারে। ফলে ব্রিটিশের দেওয়া পেনশনের ব্যাপারটা এবার আমাকে খতিয়ে দেখতেই হল।

একটু খোলসা করেই বলতে হয় আপনাদের, নইলে বুঝবেন না। ব্রিটিশের দেওয়া পেনশনটা আমরা পেতুম লোহরু-ফিরোজপুরের নবাব আহমদ বক্স খানের কাছ

থেকে। ইনি আবার আমার শ্বশুর মারুফসাবের বড় ভাই। আমার চাচা নসরুল্লা বেগ খান তো মারাঠা বাহিনীতে কাজ করতেন। ১৮০৩-এ ব্রিটিশের কাছে মারাঠারা হেরে যাওয়ার পর চাচার হালও খারাপ হল। এদিকে আহমদসাবের বোন ছিলেন চাচার বেগম। চোস্ত মানুষ ছিলেন আহমদসাব। অলওয়ারের রাজার হয়ে লর্ড লেক আর ব্রিটিশের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন তিনিই। একইসঙ্গে রাজা ও ব্রিটিশকে খুশি করে লোহারু আর ফিরোজপুরের নবাবি পেয়েছিলেন। তো তিনি আমার চাচাকে ব্রিটিশের বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিলেন। ১৮০৬-এ চাচা মারা যাওয়ার পর, আহমদসাব ব্রিটিশদের বোঝালেন, নসরুল্লা বেগ খানের পরিবারের ভরণপোষণ দেখা তাঁদের দায়িত্ব। তবে কিনা ব্রিটিশের হয়ে দায়িত্বটা পালন করবেন তিনিই, শুধু নবাবির জন্য বছরে ২৫ হাজার টাকার পাওনাটা তাঁরা মকুব করে দিন। বদলে তিনি নসরুল্লা বেগ খানের পরিবারের খাওয়াপরা তো দেখবেনই, ব্রিটিশের জন্য পঞ্চাশ অশ্বারোহী বাহিনীও মজুত রাখবেন। পেনশনের ব্যাপার নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখলুম, চাচার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ধার্য হয়েছিল বছরে ১০ হাজার টাকা, কিন্তু আসলে দেওয়া হত পাঁচ হাজার টাকা। আমি পেতুম ৭৫০ টাকা। আমার ভাইয়ের জন্য কোনও বরাদ্দ ছিল না। এদিকে খাজা হাজি নামে একজন টাকা পেয়ে যাচ্ছে, যার সঙ্গে আমার চাচার কোনও সম্পর্ক ছিল না। এ এক বিরাট জট, মান্টোভাই, আপনি তো জানেনই টাকাপয়সার জট সহজে ছাড়ানো যায় না।

এ তো গেল একদিক, কিন্তু আরও এক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আহমদ বক্স খানের ছিল দুই বিবি। এক বিবির ছেলে শামসউদ্দিন, অন্য বিবির ছেলে আমিনউদ্দিন আর জিয়াউদ্দিন। আমিনউদ্দিনের সঙ্গে আমার খুবই দোস্তি ছিল। ১৮২২ সনে অলওয়ারের রাজা ও ব্রিটিশের মত নিয়ে আহমদসাব শামসউদ্দিনকে তাঁর নবাবির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন। এতে তো ছোট দুই ভাই খেপে গেল। তাদের মা খানদানি মুসলমান আর শামসউদ্দিনের মা সাধারণ মেওয়াতি, শামসউদ্দিন হবে কিনা উত্তরাধিকারী? আমিনভাই আমার বন্ধু, তাই আমিও পড়লাম মুসিবতে। শামসউদ্দিন আমাকে নিয়ে খেলতে শুরু করল। কখনও আমার বরাদ্দের টাকা কম পাঠায়, কখনও মাসের পর মাস পাঠায়ই না। মারুফসাব মারা যাওয়ার পর আমি তো একেবারে খাদে পড়ে গেলুম। এতগুলো লোকের দেখভাল করা, তার ওপর পাওনাদারদের চাপ। আহমদসাবকে কতবার চিঠি লিখেছি, ভেবেছি তিনি নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কোনও উত্তর নেই। একদিন ফিরোজপুরে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর তখন খুবই খারাপ অবস্থা। সারা শরীরে ঘা, কোনও মতে বিছানায় উঠে বসলেন। আমি সোজাসুজি তাঁকে বললুম, 'জনাব, হয় আপনি আপনার কথা রাখুন, আমরা যাতে ঠিকঠাক টাকা পয়সা পাই দেখুন, না হলে বলুন, আমি সরকারের দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করব।' তিনি আমার হাত চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বুঝতে পারলুম,

আহমদসাবের আর কিছু করার নেই, শামসউদ্দিনের কথা মেনেই চলতে হবে তাঁকে। ঠিক করলুম, শামসউদ্দিনের সঙ্গেই দেখা করব, বোঝাপড়াটা এবার শেষ করে নিতে হবে। আমার পথ এবারে আমাকেই দেখতে হবে। ১৮০৬-এর মে মাসে আহমদসাব আর ব্রিটিশের সঙ্গে চুক্তিতে বলা হয়েছে, নসরুল্লা বেগ খানের উত্তরাধিকারীদের বছরে ১০ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে। আর ওই বছরেই জুন মাসের চুক্তিতে ভাতা নামিয়ে আনা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকায়। তা কী করে হতে পারে? এটা নকল চুক্তি বই আর কিছু নয়। আমি শামসউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলুম। কথায়-ব্যবহারে সে বেশ খাতিরই করল আমাকে। আসল কথাটা পাড়তেই সে বলল, 'ওসব চুক্তির কথা আমি কিছু জানি না, মির্জা।'

—তাহলে আমি কী করব?

—সে তুমি যা ভাল বোঝো, করো।

—কিন্তু টাকাও তো তুমি ঠিক সময়ে পাঠাচ্ছ না।

—টাকা কি আসমান থেকে পড়ে?

—মতলব?

—টাকা হাতে এলে, তবেই না পাঠাব।

—কিন্তু আমি কীভাবে সংসার চালাই, বলো?

—আরে ইয়ার, তোমার আবার সংসার কী? শরাব, রেন্ডি, গজল—এই তো? তুমি বড় শায়র, আমরা তোমাকে সম্মান করি, এত টাকা-টাকা করো কেন? আরে এখানে থাকো ক'দিন, মস্তি করো।

—ইউসুফ মিঞার শরীর ভাল না। মাঝে মাঝেই ধুম জ্বর আসে, আবোল-তাবোল বকে।

—বদরক্ত বার করে দাও শরীর থেকে। ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি ঠিক সময়ে টাকা পাঠালেই আমরা একটু ভাল থাকতে পারি শামসভাই।

—দেখি। খোদা যা করেন।

ওই যে কথাটা, 'খোদা যা করেন', ওটা হচ্ছে আমার বুকে শামসউদ্দিনের শেষ লাথি। তখনই ঠিক করলুম, রাজধানী কলকাতায় যেতে হবে আমাকে, রাজার দরবারে নকল চুক্তিটাকে ফাঁসিয়ে দিতে হবে। নিজেকে বললুম, মির্জা, তুমি আকাশে-আকাশে ঘুরে বেড়াও, বেড়াতে বেড়াতে গজল লেখো, কিন্তু একবার এই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াও তো, নিজের পাওনাগণ্ডাটা বুঝে নাও, দেখি কত হিম্মৎ আছে তোমার, একইসঙ্গে আশমানে ওড়ো, আবার মাটিপৃথিবীর হিসেবটাও বুঝে নাও। তবে না তুমি কবি। মেহর নিগারকে ভালবাসার জন্য মীরসাব যদি এত অপমান, পাগল হওয়ার শাস্তি বহন করতে পারেন, তুমি এটুকু পারবে না? কতগুলো মানুষ শুধু দিনরাতের খাওয়ার জন্য তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; গজলের সৌন্দর্য আর ভালভাবে বাঁচার

খুবসুরতি তো আলাদা নয় মির্জা। দরবার করতে তাই আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে।

কিন্তু কী করে যাই বলুন, তো? হাতে কোনও টাকাপয়সা নেই; যাতায়াতের খরচা ছাড়াও, পরিবারের দিন গুজরানের কথাও ভাবতে হবে। শামসউদ্দিন কখন টাকা পাঠাবে, তার তো ঠিকঠিকানা নেই। তার ওপর ইউসুফ মিঞা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তার দিকে তাকানো যায় না। একা একা বসে কী যে বিড়বিড় করে বলে। বেশ কয়েকদিনের জন্য সে উধাও হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। এক একসময় মনে হত, ওকে পাগলাগারদে ভরে দিয়ে আসি। কিন্তু সেখানে তো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ইউসুফ বড় কোমল প্রাণের মানুষ ছিল, মান্টোভাই। তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে, তার ওপর চাবুক চালাবে, এ আমি ভাবতেও পারতুম না। পাগলদের মতো অসহায় আর কেউ নেই দুনিয়ায়, তাদের নিয়ে যে যা খুশি করতে পারে; কিন্তু মানুষের কি তা করার অধিকার আছে? যে মানুষটা যুক্তি দিয়ে সবসময় দুনিয়াকে বিচার করে, সে পাগল নয়? শুধু যুক্তি নিয়ে যে বাঁচে, সে নিজেই তো একটা পাগলাগারদ। মানুষকে কে বোঝাবে বলুন, পাগল আর স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ব্যবধানটা এক সুতোর মাত্র। কেউ তার আকাঙ্ক্ষা পিষে মারতে পারে, কেউ পারে না; যে পারে না, সে পাগল হয়ে যায় আর অন্যজন স্বাভাবিকের মতোই হাঁটে-চলে-কথা বলে, কিন্তু যা সে গোপন করেছে, তা একদিন ফুটেও বেরুতে পারে, এতে তার কোনও হাত নেই; তাই আমি মনে করতুম, সব মানুষই পাগল হওয়ার পথে এগিয়েই রয়েছে, তবু ক.ব সেই জিন ভর করবে, এটুকু কেউই বলতে পারে না।

ইউসুফকে একদিন ধরেবেঁধে বসালুম আমার সামনে। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, 'তোর কী কষ্ট, আমাকে বল্।'

সে শুধু হাসল, এমনভাবে, যেন আমার কথাই বোঝেনি।

—ইউসুফ—

—জি।

—কী ভাবিস তুই?

সে কোনও কথা বলল না। আমি কত প্রশ্ন করলুম, সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মান্টোভাই, আমি বুঝতে পারলুম, আমাদের যুক্তির যত জোরই থাক, পাগলের মনের ভেতরে আমরা ঢুকতে পারব না। তার ভাষা আর আমার ভাষা আলাদা; ও আমাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল।

তখন অন্য কিছু ভাবার সময় নেই আমার, কলকাতায় আমাকে যেতেই হবে। পেনশনের ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। জুনের চুক্তিটা যে জাল, তা আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। বেগমকে তাই সব বলতে গেলুম।

—আপনি কলকাতা যাবেন? সে তো বহু দূর শুনেছি।

—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। নয়তো একদিন না খেয়ে মরব আমরা।

—আপনি পারবেন, মির্জাসাব?

—পারতেই হবে বেগম।

উমরাও আমার হাতে হাত রেখে বলে, 'টাকাপয়সা নিয়ে কাজিয়া তো আপনার কাজ নয়, মির্জাসাব।'

—এখন তা-ই করতে হবে।

—আর আপনার গজল?

—গজল! সে কথা তুমি ভাবো নাকি, বেগম?

—না। গজলের ভেতরে আপনি ভাল থাকেন, এটুকু তো বুঝি।

সেদিন এক অন্য রূপ দেখলুম বেগমের, ভাইজানেরা। প্রথম সে আমার গজল নিয়ে কথা বলল।

আমি বললুম, 'কয়েকটা বছর তোমাকে সব দেখেশুনে রাখতে হবে, বেগম।'

—আপনি ভাববেন না। এত দূরের পথ যাবেন, টাকাপয়সা তো লাগবে, কোথায় পাবেন?

—ধার করব।

—আবার ধার?

—আমি জিতে ফিরব বেগম। সবার সব টাকা শোধ করে দেব।

—কেউ আর ধার দেবে আপনাকে?

—আলবৎ দেবে। কলকাতায় যাচ্ছি তো সব পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে, বেগম। অনেক দিন ধরে অনেক ঠকেছি। এবার আমাকে আর ঠকাতে পারবে না।

—আপনি তো ঠকতেই ভালবাসেন, মির্জাসাব। বেগম হেসে বলল।

—না, বেগম না, আর কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না। গজল লিখি বলে কি আমার পেট নেই?

কলকাতায় যাব শুনে মথুরা দাস, দরবারি মলরা আমার ওপর বাজি ধরল। আমিও তাদের বোঝাতে পারলুম যে এ মামলায় আমি জিতে ফিরবই। তখন সুদে-আসলে সব টাকা ফেরত পাবে তারা। বেশ মজাই পেলুম। খেলাটা তা হলে জমে উঠেছে। জিতে ফিরতেই হবে আমাকে। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হত, আমি যেন একটা শেয়ালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। চলো মিঞা, কলকাত্তা চলো, দেখো নসিব বদলায় কি না।

সব কহাঁ কুছ লাল্‌হ ও গুল-মেঁ নুমায়াঁ হো গয়ীঁ,
খাক-মেঁ কেয়া সূরতেঁ হোঁগী কেহ্ পিনহাঁ হো গয়ীঁ।।
(না, সব নয়, অতি অল্পই রূপ নিয়েছে লাল্‌হ ও গোলাপের রূপে;
কী রূপসীই ছিলেন যাঁরা এই মাটির তলায় চাপা পড়ে আছেন।।)

ভাইজানেরা, উঠে বসুন, এবার সেই রূপমতীদের কিস্‌সা আমি আপনাদের শোনাব, হীরামান্ডি, ফরাস রোড, জি বি রোডের কোঠিতে কোঠিতে যাদের রূপযৌবন পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে গেছে। বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কত সুন্দরী নায়িকা আমি দেখেছি, তারা কেউ আমার দেলকিতাবে একটু দাগ রাখতে পারেনি; আর পটের বিবি সাজা ঘরের বউদের তো সহ্য করতেই পারতাম না, সব একরকম, মুখে সবসময় প্রেমের বুলি, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা, সেখানে শুধু সোনা-গয়না-টাকাপয়সার হিসেব। আরে বাবা, প্রেম করার জন্য পাগলামি লাগে, হিসেব কষে প্রেম হয় না। কোঠির মেয়েরা, বিশ্বাস করুন, ওরা জানে, ইশ্‌ক কাকে বলে। কেন জানেন? শরীর বেচে খাবার জোগাড় করতে হয় তো, তাই বুঝতে পারে, কোন্‌টা প্রেম আর কোন্‌টা নৌটঙ্কিবাজি। ওদের দেখতে দেখতেই আমি বুঝেছিলাম, মেয়েদের ভেতরে কীভাবে জন্নত লুকিয়ে থাকে; সংসার-সমাজ-পর্দার ঘেরাটোপে এই মেয়েরাই ছারপোকার মতো হয়ে যায়। ভাববেন না, আমি ওদের খুব মহৎ বলতে চাইছি, মহত্ত্ব বলে কিছু নেই, ভাইজানেরা, আছে শুধু জীবনের টুকরো টুকরো সত্য, তাও একজনের সত্য অন্যের জীবনে কাজে আসে না, এটুকু মেনে নিতে পারলে আমাদের জীবন অনেক সহজ হত। ওরা সহজ হতে পেরেছিল। কেন জানেন? ওরা ভান করেনি; ওরা যা, সেভাবেই নিজেকে দেখাতে চেয়েছে।

একটা কিস্‌সা বলি শুনুন। শোনার পর আমি বেশ কয়েকদিন ভাল করে খেতে পারিনি। যেন কোনও সুড়ঙ্গে সরীসৃপদের সঙ্গে রয়েছি, মনে হয়েছিল। একদিন একটা লোক সন্ধেবেলা ক্যায়সার পার্কের বাইরের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। না, না, আমি নই, সব কিছুর সঙ্গে আমাকে মেলাতে যাবেন না। লোকটার নাম? ভুলে গেছি, তবে একটা নাম থাকলে সুবিধে হয়, তাই না? আচ্ছা, লোকটার নাম দেওয়া যাক সাজ্জাদ। তো সাজ্জাদ ওখানে অপেক্ষা করছিল এক বন্ধুর জন্য, আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল, বন্ধু আসার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। বন্ধুকে

মনে মনে খিস্তি করতে করতে সে ভাবছিল, সামনের হোটেলে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক। তখন কেউ যেন তাকে ডাকল, 'সাব—সাব—'।

সাজ্জাদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা দড়িপাকানো চেহারার লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরনে অনেকদিন না-কাচা, তেলচিটে দাগ ধরা পাজামা আর শার্ট। সাজ্জাদ বলল, 'আমাকে ডাকছিলে?'

—জি।

—কী চাই?

—কিছু না হুজুর। বলতে বলতে লোকটা তার দিকে এগিয়ে এল, সেই সঙ্গে বোটকা গন্ধ, সাজ্জাদের বমি পেয়ে গেল।—আপনার কিছু লাগবে জনাব?

—কী?

—জেনানা, হুজুর।

সাজ্জাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কোথায় তোমার জেনানা?'

বুঝতেই পারছেন, সাজ্জাদের তখন মেয়েছেলের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু সে নানা অঘটনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ভালবাসত। জীবনে তার একটাই রোগ ছিল, নতুন কিছু দেখে নাও, যে-পথ চেনো না, সেই পথেই পা বাড়াও।

—কাছেই হুজুর। ওই তো—রাস্তার ওপারে বাড়িটা দেখছেন—

—অত বড় বাড়িতে?

—জি হুজুর। লোকটা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসল।—আমি এগোচ্ছি। আপনি আমার পেছন পেছন আসুন।

সাজ্জাদ দালালকে অনুসরণ করে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাড়ি না বলে, খণ্ডহর বলাই ভাল। প্লাস্টার খসে গেছে, ইটের খাঁচা বেরিয়ে আছে, এখানে-ওখানে জংধরা লোহার পাইপ, আবর্জনা। বাড়ির ভেতরটা একেবারে অন্ধকার। দালালের পেছন পেছন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কিছুটা ওঠার পর দালাল তার দিকে ফিরে বলল, 'সাব একটু দাঁড়ান। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

সাজ্জাদ অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে দালালের দেখা নেই। সে মুখ তুলে দেখল, কিছুটা ওপরে আলো জ্বলছে। সাজ্জাদ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল। আলোর কাছাকাছি পৌঁছে সে দালালের গলা শুনতে পেল, 'শালি, উঠবি, কি উঠবি না?'

একটা মেয়ের গলা শোনা গেল।— বললাম তো না, আমাকে ঘুমোতে দাও।

—বলছি ওঠ্, কথা না শুনলে কিন্তু—

—কী করবে? মেরে ফ্যালো। আমি উঠতে পারব না। আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দাও।

—ওঠ...উঠো মেরি জান। জেদ করিস না, এমন জেদ করলে, আমরা খাব কী বল্ তো?

—আমার খাবারের দরকার নেই। না খেয়ে মরে যাব। একটু ঘুমোতে দাও আমাকে।

—তুই তা হলে উঠবি না, কুত্তি?

—বলছি তো—না—না—না—

—আস্তে কথা বল্। কেউ শুনতে পাবে। শোন্, উঠে পড়। কতক্ষণ বা লাগবে? তিরিশ-চল্লিশ টাকা পেয়ে যাবি।

মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলে।—তোমার পায়ে পড়ছি। কত দিন ঘুমোতে পারি না, আজকের দিনটা আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

—চোপ্। কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর ঘন্টাদুয়েক। তারপর এসে যত পারিস ঘুমোবি।

এরপর সব চুপচাপ। যে-ঘর থেকে কথা ভেসে আসছিল, সাজ্জাদ পা টিপে সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেজানো দরজায় সামান্য ফাঁকে সে চোখ রাখল। ছোট্ট ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। কয়েকটা বাসনপত্র ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। দালাল লোকটা মেয়েটার পাশে বসে তার পা টিপে দিচ্ছে। হাসতে হাসতে দালাল বলল, 'উঠে পড়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে তো ফিরে আসবি। তারপর যত পারিস ঘুমোস। আমি আর জ্বালাব না, মেরি জান।'

—মেরি জান? মেয়েটা হেসে উঠল।—শালা কুত্তা কাঁহি কা। বলেই এক ঝটকায় উঠে বসল।

সাজ্জাদ পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। তার ইচ্ছে করছিল, এই শহর, এই দুনিয়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে? কে এই মেয়ে? কেন মেয়েটার ওপর এমন নিষ্ঠুরতা? দালালের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক কী যে, ইচ্ছে না হলেও তার কথা মেনে নিতে হল? ঘরে উঁকি দিয়ে সে দেখেছে, ওইটুকু ছোট ঘরে কী তীব্র আলো! একশো ওয়াট তো হবেই। অন্ধকারে এসে দাঁড়ানোর পরেও সেই আলো যেন ওর চোখ ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিল। সাজ্জাদ ভাবছিল, অত আলোর ভেতরে কীভাবে ঘুমোতে পারে একজন মানুষ?

একটু পরেই সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। দু'টো ছায়া তার পাশে এসে দাঁড়াল। দালাল হেসে বলল, 'দেখে নিন, সাব।'

—দেখেছি।

—ঠিক হ্যায়, না?

—ঠিক হ্যায়।

—চালিশ রুপিয়া দেবেন।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাজ্জাদ নোটগুলো বার করে দালালের হাতে গুঁজে দিল।—গুনে নাও কত আছে?

—পঁচাশ হুজুর।

—পঞ্চাশই রাখো।

—সালাম, সাব।

সাজ্জাদ তখন ভাবছিল, হাতের কাছে যদি একটা বড় পাথর পাওয়া যেত, সেই পাথর দিয়ে দালালটার মাথা গুঁড়িয়ে দিত সে।

দালাল মিনমিন করে বলল, 'নিয়ে যান সাব। তবে বেশি কষ্ট দেবেন না।'

সাজ্জাদ কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সামনে একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটাকে নিয়ে সে টাঙ্গায় উঠে পড়ল। দালালের গলা আবার ভেসে এল, 'সালাম, সাব।' সাজ্জাদ ভাবছিল, হাতের কাছে বড় একটা পাথর পাওয়া গেল না কেন?

মেয়েটাকে নিয়ে একটা হোটেলের ঘরে এসে উঠল সাজ্জাদ। এই প্রথম সে মেয়েটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। চোখের পাতা ফোলা, সোজা তাকাতে পারছে না। মনে হচ্ছিল, মেয়েটা যেন একটা পুরনো ঝুঁকে পড়া বাড়ি, যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।

সাজ্জাদ বলল, 'মুখ তুলে একটু তাকাও।'

—কী চান?

—কিছু না। কয়েকটা কথা বলো।

মেয়েটার চোখ টকটকে লাল। ভাষাহীন চোখে সে তাকিয়ে থাকল সাজ্জাদের দিকে।

—তোমার নাম কী?

—কিছু না।

—কোথায় ঘর ছিল?

—আপনি কোথায় চান?

—এমনভাবে বলছ কেন?

মেয়েটা যেন এক ঝটকায় ঘুম ভেঙে উঠল।—আপনার যা করার করুন। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—কোথায়?

—যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন।

—তুমি এখনই চলে যেতে পারো।

—যা চান করুন। এত কথা বলছেন কেন, সাব?

—আমি তোমাকে বুঝতে চাই।

মেয়েটা ফুঁসে ওঠে।—বোঝাবুঝির দরকার নেই, সাব। আপনার কাজ আপনি করুন, তা হলে আমি চলে যেতে পারি।

সাজ্জাদ মেয়েটার পাশে এসে বসে তার মাথায় হাত রেখেছিল। মেয়েটা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দেয়।—তঙ্গ মত কিজিয়ে, সাব। অনেকদিন আমি ঘুমোইনি। যেদিন থেকে এখানে এসেছি, আমি ঘুমোতে পারিনি।

—এখানে ঘুমিয়ে পড়ো।

তার চোখ আরও লাল হয়ে ওঠে।—আমি এখানে ঘুমোতে আসিনি। এ তো আমার ঘর নয়।

—ওই বাড়িটা—ওটা কি তোমার ঘর?

—বখোয়াশ বনধ্ কিজিয়ে সাব। আমার কোনও ঘর নেই। আপনি আপনার কাজ সেরে নিন। না হলে আমাকে নিয়ে চলুন, ওই চুতিয়ার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নিন।

আর কোনও কথা হয়নি। সাজ্জাদ মেয়েটাকে সেই বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল।

না, না ভাইজানেরা, কিস্‌সা এখানেই শেষ নয়। কোনও কিস্‌সা কি এত সহজে শেষ হতে চায়? কিস্‌সারও তো একটা দাবি আছে, না কি? সে তো আর এতিম নয় যে, যেখানে-সেখানে তাকে ফেলে দিয়ে আসবেন।

পরদিন সন্ধেবেলা ক্যায়সার পার্কের কাছেই একটা হোটেলে বসে চা খেতে খেতে বন্ধুকে আগের দিনের ঘটনাটা বলছিল সাজ্জাদ। বন্ধুটি শুনে খুব আঘাত পেয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল 'কমবয়সী মেয়ে?'

—জানি না। মেয়েটাকে ঠিকঠাক দেখিওনি আমি। একটা কথাই বারবার মনে হয়, রাস্তা থেকে ভারী পাথর তুলে কেন দালালটার মাথা ভেঙে দিইনি।

সেদিন বন্ধুর সঙ্গেও বেশিক্ষণ থাকতে ভাল লাগছিল না সাজ্জাদের। আগের দিনের ঘটনা থেকে সে কিছুতেই বেরোতে পারছিল না। বন্ধু চলে যাওয়ার পর সে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল; চারদিকে চোখ চালিয়ে সেই দালালকে খুঁজছিল সাজ্জাদ। রাস্তার ওপারেই ঝুঁকে পড়া বাড়িটা। সাজ্জাদ বাড়িটাতে ঢুকে পড়ল। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একসময় প্রখর আলো ছড়ানো সেই ঘরের সামনেও পৌঁছে গেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ভেজানো দরজা ফাঁক করে ভেতরে তাকাল সাজ্জাদ। তীব্র আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল, দেখতে পেল, মেঝেতে একটা মেয়ে শুয়ে আছে। দোপাট্টায় মুখ ঢাকা তার। মেয়েটা কি মরে গেছে? সাজ্জাদ ঘরে ঢুকে পড়ল, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, সে ঘুমোচ্ছে। তারপরেই সে দেখতে পেল লোকটাকে, একটু দূরেই মেঝেতে পড়ে আছে, চাপ চাপ রক্তের ভেতরে। পাশেই পরে আছে রক্তমাখা একটা ইট। ভাঙা মাথা থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

এরপর আর কখনও সাজ্জাদকে ক্যায়সর পার্কের কাছে দেখা যায়নি। তারপর একদিন তাকে পাগলাগারদে ভর্তি করতে হয়েছিল। শেষমেশ তার কী হয়েছিল, আমি আর জানি না।

কোঠার মেয়েগুলো ভারী অদ্ভুত। সব কিছুর পরেও বেঁচে থাকাটা যেন ওদের কাছে নেশার মতো। সৌগন্ধীর কী ছিল জীবনে? মাধো দিনের পর দিন ওর সঙ্গে বেইমানি করে গেছে; যেদিন বুঝতে পেরেছে, মাধোকে লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দিয়েছে, কিন্তু নিজেকে খতম করতে যায়নি। কেনই বা করবে? কেউ তো তাকে একটা ফোঁটা ভালবাসা দেয়নি; নিজের জীবনকে সে নিজেই ভালবেসেছে।

কী বলছেন, ভাইজানেরা? খুশিয়ার কথা শুনতে চান? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথা তো বলা হয়নি। আমি ভাবছিলাম, সৌগন্ধীর গল্পটাই আপনাদের বলি। তো, ঠিক হ্যায়, খুশিয়ার কথাই হোক। খুশিয়ার জন্য আমারও কি কম আগ্রহ ছিল? কেন সে ভুল বুঝেছিল কান্তাকে? সেই কথা জানতেই একদিন একা-একা কান্তার কোঠায় গিয়েছিলাম।

—আরে, মান্টোসাব, আজ ইয়ারদোস্তরা সব কোথায়?

—তুমিই তো সেদিন আমাকে একা আসতে বলেছিলে।

কান্তা হেসে ওঠে।—একা আসতে বলেছিলাম? আমার কী আছে আর যে আপনাকে দিতে পারব?

—অনেক কিছু আছে কান্তা। কোমরের অমন ভাঁজ ক'জনের আছে?

কান্তা হা-হা করে হাসে।—ভাঁজ দেখতে এলেন বুঝি?

আমি তার পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলি, 'এই গোস্তের স্বাদই আলাদা।'

—বখোয়াশ বন্ধ করুন। কিছুই করতে পারেন না, শুধু মুখে কথার ফোয়ারা।

—কী করব কান্তা? ওই এক সেকেন্ডের কিস্‌সায় আমার মন ভরে না। আমি চাই অনেক বড় কিস্‌সা, অনেকদিন ধরে চলবে, আমার নাওয়া-খাওয়া-ঘুম কেড়ে নেবে।

—তা হলে এখানে আসেন কেন মান্টোসাব?

—কিস্‌সার খোঁজে। আজ তুমি আমাকে খুশিয়ার গল্পটা বলবে।

—খুশিয়া?

—সেজন্যই তো তুমি আমাকে একা আসতে বলেছিলে। মনে নেই? চলো, শরাব আনাও, খেতে খেতে খুশিয়ার গল্পটা শুনি।

আমরা কোঠার ছাদে গিয়ে বসলাম।

—খুশিয়া বড় ভাল ছিল। ও যে এমন পাগলামি করতে পারে, আমি ভাবতেই পারিনি, মান্টোসাব।

—কী করেছিল খুশিয়া?

—ওই তো আমার খদ্দের ধরে আনত। যা বলতাম, হাসিমুখে করত। আমি তখন সবে এ লাইনে এসেছি। একেক দিন আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকত,

মনে হত, আমার জন্য ও ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়। খুশিয়ার জন্য আমারও কষ্ট হত। এত সুন্দর ছেলে—কতই বা বয়স, সাতাশ-আঠাশ হবে—পেটের জন্য কোঠার দালালি করতে হয়। কী সুন্দর যে গল্প বলতে পারত খুশিয়া।

—কী গল্প বলত?

—ইউসুফ আর জুলেখার গল্প ও-ই আমাকে প্রথম শুনিয়েছিল।

—হুঁ। তারপর?

—জি?

—আগে বাড়ো, ভাই।

—একদিন বিকেলে আমার ঘরের দরজায় টোকা। আমি তখন চান করছি। চেঁচিয়ে বললাম, কে? খুশিয়া, আমি খুশিয়া। ও খুশিয়া, তা এইসময়ে হঠাৎ কেন? এখন তো খদ্দের আসে না। অমি জল গায়েই একটা ছোট তোয়ালে জড়িয়ে এসে দরজা খুললাম। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে খুশিয়ার চোখ দু'টো কেমন হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'কী হয়েছে খুশিয়া? আমি চান করছিলাম। না, না, তুমি ভেতরে এসে বসো। এলেই যখন একটু চা নিয়ে আসতে পারতে। রামুটা আজ সকালেই পালিয়ে গেছে।' খুশিয়া আমার দিকে তাকাতে পারছিল না, কিন্তু কোন দিকে তাকাবে তা-ও বুঝতে পারছিল না। ও এমনই সরল ছিল, মান্টোসাব। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, 'যাও, যাও, চান করো গিয়ে, এই অবস্থায় কেউ দরজা খোলে? আমি না হয় পরেই আসতাম।'

—তুমিও বেশ লজ্জা পেয়েছিলে, তাই না কান্তা?

—না। লজ্জা পাব কেন? ও তো আমাদের খুশিয়া। ওর কাছে আবার লজ্জা কী?

—খুশিয়া তোমাকে এভাবে আগে কখনও দেখেছিল?

—না। কিন্তু খুশিয়া তো আমার ঘরের লোক। ও তো আর খদ্দের নয়।

—তারপর?

—খুশিয়া কি পাগল হয়ে গেছিল, মান্টোসাব?

—কেন?

—ও চলে গেল। সন্ধে পেরিয়ে গেল, খুশিয়া এল না। আমার ঘরেও সেদিন খদ্দের নেই। হঠাৎ একসময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি, অচেনা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'যাবে? বাবু বাইরে গাড়িতে বসে আছেন?'

—এখানে নিয়ে এসো।

—বাবু কোঠায় আসবেন না।

—কেন?

—বলছি না, বাবু কোঠায় আসেন না। যেতে হলে চলো। কত চাও? আগাম দিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি গেলে? আমি কান্তাকে জিগ্যেস করি।

—কী করব বলুন?

—খুশিয়া নেই, খদ্দের নেই, আমাকে তো দিনের রোজগারটা করতেই হবে। কোঠায় যারা আসে না, তারা টাকাও বেশি দেয়। না গিয়ে কী করব? বড় রাস্তার সামনেই ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল। দালালটা আমাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়েই হাত বাড়িয়ে নিজের হিস্‌সা নিয়ে নিল। ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করল।

ট্যাক্সির ভেতরের অন্ধকারে প্রথমে তাকে খেয়াল করিনি। চোখ সয়ে যেতে খুশিয়াকে দেখতে পেলাম।—খুশিয়া তুম?

—টাকা পেয়েছ তো?

—খুশিয়া—

—চোপ্‌। টাকা পেয়েছ, যা বলব, তাই করবে।

—কী করেছিল খুশিয়া?

—কিচ্ছু না। অনেক দূর যাওয়ার পর, আমাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিল।

—আর তুমি?

—আমি তো রাস্তা চিনি না। একা একা দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর হলে ফিরে এসেছিলাম কোঠায়। মান্টোসাব, খুশিয়া আমার সঙ্গে কেন এমনটা করেছিল, বলতে পারেন?

আমি কান্তাকে সেদিন কিছু বলতে পারিনি। খুশিয়ার কথা আমি অনেকদিন ভেবেছি। প্রতিশোধ মানুষের এক আদিম প্রবৃত্তি। খুশিয়া প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। সে কোঠার দালাল হতে প রে, কিন্তু সে-ও তো একজন পুরুষ। খুশিয়াকে দালাল ভাবতে ভাবতে কান্তা এই সত্যটাই ভুলে গেছিল, তাই প্রায়-নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিল, 'আরে তুমি তো আমাদের খুশিয়া। তোমার কাছে আবার শরম কীসের?'

পৌরুষ এক ভয়ঙ্কর জিনিস, ভাইজানেরা, সে যখন জেগে ওঠে, এই দুনিয়াটাকেই ভেঙে-চুরে ফেলতে চায়। কেন জানেন? পৌরুষ একটা কাচের পুতুল, আছাড় মারলেই ভেঙে যায়। তাই সামান্য আঘাতেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভাববেন না, ওটা শুধু পুরুষের মধ্যেই থাকে; মেয়েরাও তাকে বহন করে। পৌরুষ কী জানেন? আমিই শেষ কথা, এর পরে আর কোনও কথা নেই।

আরে ভাই, শেষ কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? যে-দুনিয়ার কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, তাই আমরা বুঝতে পারি না—সেখানে তুমি শেষ কথা বলতে এসেছ? প্রগ্রেসিভ রাইটারদের তাই আমি সহ্য করতে পারতাম না। এরা জীবনের কিছুই দেখেনি, বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখে, তারপর এসে বলবে এটাই শেষ কথা। কোন পয়গম্বর তুমি যে তোমার কথাই জীবনের শেষ কথা বলে মেনে নেব আমি?

তা-কৈ য়েহ্ দশ্‌ত-গর্দী কব তক য়হ্ খস্তগী;
ইস্ জিন্দেগীসে কুছ তুমে হাসিল হ্যায়, মর কহীঁ।।
(এই মাঠে ঘাটে ঘোরা আর কত দিন, কত দিন এই ছন্নছাড়া দশা?
এমনভাবে বেঁচে থেকে কী হবে, মরলেই পারো।)

যুবক রোহিতকে দেবরাজ ইন্দ্র যা বলেছিলেন, সে কথাই আপনাদের বলছি, ভাইজানেরা, মন দিয়ে শুনুন। এ হচ্ছে জীবনটাকে নিয়ে একেবারে পথে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা; ক'জন মানুষই বা তা পারে? যদি কেউ একবার তা পারে, তবে তার চোখের সামনে থেকে সব পর্দা সরে যাবে, তখন বোঝা যায়, মান্টোভাই, কী লীলাখেলার মধ্যেই না আমরা এসেছি। হ্যাঁ, দেবরাজ ইন্দ্রের কথাই বলি। রোহিতকে তিনি বললেন, মনে রেখো, পথে যে বেরিয়ে পড়তে পারে না, তার জীবনে সুখ আসে না। মানুষের সমাজে বেশিদিন থাকলে ভাল মানুষও একদিন পাপী হয়ে যায়। তাই বলি, পথে গিয়ে দাঁড়াও, ভ্রমণের ভিতরে খুঁজে নাও জীবনকে। পথিকের দুই চরণ ফুলের মতো, তার আত্মাও দিনে দিনে বিকশিত হয়ে কত যে ফল ফলিয়ে তোলে। পথের ক্লান্তিই তার সব পাপকে সমূলে বিনাশ করে। তাই, ঘোরো, ঘুরে বেড়াও, রোহিত।

তিন বছরের মতো শাহজাহানাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলুম বলেই কত যে ফুল-ফলে ভরে উঠেছিল আমার জীবন। কষ্ট কিছু কম হয়নি, অপমানও অনেক হজম করেছি, শেষ পর্যন্ত পেনশনের টাকাও আদায় করতে পারিনি। তবু এই তিন বছর এক আজিব তসবিরখানায় ঘুরে বেড়িয়েছি। দিল্লিতে যখন ফিরে এলুম, তখন আমি এক অন্য মানুষ; কেন জানেন? তার আগে আমার দুর্ভাগ্যের জন্য নানা মানুষকে, এমনকী খোদার ওপরেও দোষ চাপিয়েছি। কিন্তু দেশে দেশে ঘুরে যে-গালিব দিল্লিতে ফিরে এল, সে বুঝে গিয়েছিল, জীবন তোমার কাছে যেভাবে আসবে, সেভাবেই তাকে গ্রহণ করো, যদি পোকার মতো মরতে হয়, তা-ও মরবে, নালিশ জানিয়ে বাড়তি কিছু পাবে না।

না, না, উতলা হবেন না ভাইজানেরা, এবার আমার ভ্রমণের কিস্‌সাই আপনাদের শোনাব। এক-একসময় ভেবেছিলাম, ওই দিনগুলোর কথা ফারসিতে লিখে রাখলে হয়। কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি। তার চেয়েও বড় কথা, দিল্লিতে ফিরে আসার পর সারা

জীবনের জন্য এমন সব জালে জড়িয়ে গেলুম যে, লিখতে বসার কথা ভাবলে হাত নড়তে চাইত না। কিন্তু আমি জানি, সেই দিনগুলোর কথা লিখে রাখতে পারলে ফারসি গদ্যে আমি নতুন এক দুনিয়া খুলে দিতে পারতুম। আসুন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে মির্জার ভ্রমণবৃত্তান্তটা আমিও একবার ফিরে চেখে দেখি।

১৮২৭-এর বসন্ত। মির্জা গালিব শাহজাহানাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল তার ভাগ্যের খোঁজে। তার পূর্বপুরুষরা বেরিয়ে পড়ত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে; ধুলোর ঝড় তুলে, তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে, সে তো বীর সৈনিকদের যাত্রা। আর মির্জা গালিব তো কলকাতা চলেছে, তার পেনশনের জন্য দরবার করতে। সঙ্গে দু-তিনজন চাকর বই আর কেউ নেই। কখনও ঘোড়ায়, কখনও গরুর গাড়িতে চেপে তার ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলা। রাতে কোনও সরাইখানায় থাকো, যদি তা না মেলে, তবে পথেই তাঁবু খাটিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। দিনের বেলা তবু একরকম, সামনে অনন্ত পথ, কিন্তু রাতগুলো তো একেবারে অন্ধকারে জমাট বাঁধা, পথের কোনও হদিশ নেই, চাকরবাকরের সঙ্গে কতক্ষণ আর কথা বলা যায়, তাই নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলো। মির্জার একা-একা কথা বলার অভ্যেসটা ওই সময় থেকেই জেঁকে বসতে শুরু করে। আর একা-একা কথা বলার মানে কী জানেন তো, ভাইজানেরা। কথার পর কথায় আপনি কেবল নিজেকেই ঠকিয়ে যাবেন, কত স্বপ্নের মিনার বানিয়ে তুলবেন, পরের মুহূর্তেই সে মিনার চুরচুর করে ভেঙে পড়বে।

কানপুরে পৌঁছে মির্জার শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছিল। এদিকে কানপুরে কোনও হাকিমের দেখা মেলে না। তা হলে তো লখনউ না গিয়ে উপায় নেই। এ-যাত্রায় লখনউ যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না মির্জার। তবে মির্জা কলকাতা যাচ্ছে শুনে লখনউয়ের বহু শরিফ আদমি জানিয়েছিলেন, পথে একবার আমাদের শহরটাও ঘুরে যান। লখনউ-এর প্রতি মির্জারও লোভ কম ছিল না। দিল্লি কবেই তার রোশনাই হারিয়ে ফেলেছে। মুঘল সংস্কৃতির যা-কিছু সব তখন লখনউতে। কবেই সওদা, মীরসাবের মতো কবিরা দিল্লি ছেড়ে লখনউ চলে গিয়েছেন। মির্জা ভেবে ঠিক করল, লখনউটা একবার ঘুরেই যাওয়া যাক। নবাবের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু ইনাম মিলবে, দু'একটা মুশায়েরায় গজল শুনিয়েও রোজগার হবে; পথের খরচ কিছুটা জোগাড় হয়ে যাবে। পাল্কি ভাড়া করা হল, সেই পাল্কিতে চেপে গঙ্গা পেরিয়ে লখনউ গিয়ে পৌঁছল মির্জা।

কী বলব, ভাইজানেরা, সেই লখনউকে বুঝিয়ে বলার মতো ভাষা আমার ঝুলিতে নেই। শুধু একটা কথাই বলতে পারি, এ-শহর যেন হিন্দুস্তানের বাগদাদ। আর রাতের লখনউ-এর কথা কী বলব? তাকে তো পরতে পরতে আদর করতে ইচ্ছে করে, প্রত্যেকটা রাত যেন নতুন নতুন সুরতের রাত, প্রত্যেকটা চুম্বনের পরেও যেমন আরও অনেক চুম্বন বাকি থেকে যায়, তেমনই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে থাকার রাত। সেই শহরের সেরা কবি তখন কে জানেন? নাসিখসাব। গজল ছাড়া কখনও কিছু

লেখেননি। আমার প্রথম দিকের গজলে নাসিখসাবের ছায়া খুঁজে পেলেও পেতে পারেন। নাসিখসাব তাঁর হাভেলিতে আমাকে দাওয়াত দিলেন। আমি তাঁকে বললুম, 'নবাবের কাছে একবার যাওয়া যাবে না নাসিখসাব?'

—আগের সে দিন আর নেই, মিঞা।

—মানে? নবাব আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

—এখন অনেক মই বেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে হয়।

—কীরকম?

—নবাবের উজির-এ আজম হচ্ছেন মোতামিদদৌলা আগা মীর। তাঁর পরের উজির সুভান আলি খান। সুভান আলিকে খুশি করে পৌঁছতে হবে আগা মীর সাবের কাছে। তিনি খুশ্ হলে তবে গিয়ে পৌঁছবেন নবাবের সামনে। এ তো আর নবাব আসফ্-উদ-দৌলার আমল নয়, তিনি সওদাসাবকে নিজে দরবারে ডেকে নিয়েছিলেন। বেগম শামসউন্নিসাও ছিলেন শায়রা। নবাবের এক গজলের উত্তরে বেগম কী লিখেছিলেন জানেন?

—শুনাইয়ে জনাব।

—খুশি দিল মে হম্ অপনে কম দেখতে হ্যাঁয়
অগর দেখতে হ্যাঁয় তো গম দেখতে হ্যাঁয়।
ন কত্‌রহ্ কোই খুন কা বাকী হ্যায় দিল মে
ন আঁখো কো হম্ অপনী নম্ দেখতে হ্যায়।

তু আয়ে ন আয়ে য়হাঁ হম্ তো হর শব্
পড়ে বাহ্ তা সুব্‌হদম দেখতে হ্যাঁয়।

—কেয়া বাত, কেয়া বাত। দিল্ কা এক টুকরা নিকল গয়া জনাব।

—মিঞা, আমাদের নবাব গাজি-উদ-দীন হায়দরের সময়ে দিল কা টুকরা নিকলতে নেহি।

—হায় আল্লা! তবু একবার চেষ্টা করে দেখুন। গরিবের কপালে যদি কিছু টাকা-পয়সা জোটে।

—জানি মিঞা, অনেক দূরের পথ যেতে হবে আপনাকে। চেষ্টা করে দেখি। আগে তো সুভান আলির কাছে যেতে হবে।

সুভান আলির সামনে তো পৌঁছতে পারলুম। তাড়াহুড়োয় তাঁর জন্য কসীদা লিখে নিয়ে যেতে পারিনি, স্তুতি করে একটুকরো গদ্য লিখতে পেরেছিলুম। কিন্তু কী জানেন, কসীদা লিখতে আমার ভাল লাগত না; তবু লিখতে তো হয়েছে। সত্যি বলতে কী, জীবনে অর্ধেকটা সময় নবাব-বাদশা আর তাঁদের উজিরদের স্তুতি করে কবিতা লিখেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মান্টোভাই। ওই গাধাগুলোর প্রশংসা করে কবিতা লেখার জন্য কি

একজন কবির জন্ম হয়? তবু কী করব বলুন, পেটের ধান্দায় কবিতাকে কিচরে নামাতে হয়েছে। এ তো কবির ধর্ম হতে পারে না। কবির ইমানের পথ থেকে যে সরে গিয়েছি, তা আমি জানি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করবেন। কসীদার শুরুটা আমি যেভাবে মনপ্রাণ দিয়ে লিখেছি, স্তুতির অংশে এসে কিন্তু দায়সারা কয়েকটা কথা বলেছি মাত্র। সুভান আলি আমার গদ্যটুকু পড়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। একে-ওকে নানা কথা বলতে লাগলেন। আমার দিকে আর ফিরেই তাকান না।

—জনাব।

—আর্জি কী আছে, মিঞা?

—নবাব বাহাদুরকে একবার সালাম জানাতে চাই।

—জানাইয়ে, ইয়ে তো নবাব বাহাদুরকাই দুনিয়া হ্যায়।

—একবার দরবারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন হুজুর।

—দেখি, কী করা যায়।

—তবে দু'টো কথা আছে, জনাব।

—আবার কী?

—আমি শাহজাহানাবাদের শায়র। দরবারে সেই মর্যাদাটুকু পাব আশা করি। বুজুর্গ আদমিরা কবিদের কীভাবে আপ্যায়ন করেন, সে তো আপনি জানেনই।

—দেখি—

—অওর—

—আরও কথা আছে নাকি?

—নবাব বাহাদুরকে কিন্তু কোনও নজরানা দিতে পারব না। ওটা মাফ করে দিতে হবে।

সুভান আলি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আয়েশ করে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'বাড়ি ফিরে যান মিঞা। নজরানা দেবেন না, আবার নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবেন, তা হয় নাকি? দরবারে আসার তরিকা জানেন না বুঝি?'

নবাব গাজি-উদ-দীন হায়দরের সঙ্গে দেখা হল না মির্জার। অনেক আশা ছিল, নবাবের সামনে একবার দাঁড়াতে পারলে, কিছু তো ইনাম মিলবেই। সুভান আলি সেই আশায় জল ঢেলে দিল। মির্জা তবু আরও কিছুদিন লখনউতে রয়ে গেল। লখনউয়ের মুশায়েরার রাতগুলো তো তাকে ফিরিয়ে দেয়নি, তার গজলের প্রশংসায় মেতে উঠেছে, সেইসব আলাপ-আলোচনায় মির্জা বুঝেছে, মরে যাওয়া দিল্লি তার কদর করতে না পারলেও, লখনউ-এর জান তার কবিতায় সাড়া দিয়েছে।

তারপর আবার বেরিয়ে পড়ো। বান্দা, ইলাহাবাদ হয়ে কাশীতে এসে পৌঁছলুম। বান্দার নবাব জুলফিকার আলি বাহাদুর পথখরচের জন্য কিছু সাহায্যও করলেন আমাকে। ইলাহাবাদকে আমি একদম সহ্য করতে পারিনি, মান্টোভাই। একেবারে

লাওয়ারিশ শহর, কোনও তমদ্দুন নেই। কাশীতে পৌঁছে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারলুম। এ এক আশ্চর্য আলোর শহর। মনে হল, এইরকম এক শহরেই আমি এতদিন পৌঁছতে চেয়েছি। সবাই বলে, বেনারস, বেনারস; আমার ঘেন্না হয়, ইংরেজরা বলে বলেই আমাদেরও বলতে হবে না কি? হয় বারাণসী বলো, নয়তো কাশী। কাশী নামেই তো এ শহরের আসল পরিচয়। নওরঙ্গাবাদে একটা হাভেলিতে ঘর ভাড়া নিয়ে আমি মাসখানেক কাশীতে ছিলুম। দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা ঘাটে বসে থাকতে থাকতে মনে হত, দেবাদিদেব মহেশ্বরের এই শহরেই যদি সারাজীবন থেকে যেতে পারতুম। তা হলে তো আর নবাব-বাদশার দয়ার ভিখারি হতে হত না, গজল লিখতাম না, শুধু কাশীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, তবায়েফদের গান শুনে, সকাল-সন্ধ্যায় পুজো-আরতি দেখতে দেখতে আর ঘাটে বসে গঙ্গাপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থেকে কেমন রাহীর জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত।

ভাইজানেরা, বিরক্ত হবেন না, কাশীর কথাটা একটু খোলসা করে বলতে হবে। জীবনে যে একবার কাশী দেখেনি, আমি মনে করি, তার এখনও জন্মই হয়নি। মান্টোভাই, আপনি কি কাশীতে গিয়েছেন কখনও? যাননি? তা হলে আবারও আপনার জন্ম হবে, কাশী একবার দেখে আসতেই হবে আপনাকে, তবেই না বুঝবেন এই দুনিয়াতে একদিন জন্ম হয়েছিল আপনার! কী বলছেন? আপনার আগের জীবনটা? না, না, ও তো একটা খোয়াব মান্টোভাই, শুনুন, আপনি এখনও জন্মাননি। কাশী দেখার পরেই না বুঝতে পারবেন জন্ম-মৃত্যুর অর্থ কী?

বলতে পারেন, কাশীই এই গোটা দুনিয়াটা। ভারতের সব তীর্থস্থান আর পবিত্র জল, সব মিলেই কাশী, আলোর শহর, ভাইজানেরা। দেবাদিদেব শিবের ঘরগেরস্থালি এখানেই। কাশী এমন এক আলো, যা আপনার চোখের সামনে সবকিছু ফুটিয়ে তোলে; না, না চমকদার কিছু দেখতে পাবেন, ভাববেন না; এই দুনিয়ায় যা রয়েছে সে সবই ওই আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাবেন আপনি। আবার দেখুন, কাশীতে যদি মৃত্যু হয়, তবেই এই জীবজন্ম থেকে মুক্তি পাব আমরা। কাশী-মাহাত্ম্যের কত কথাই যে শুনেছিলুম; আমি দোজখের কীট, সে-সব কথা কবেই ভুলে গিয়েছি। তবে হ্যাঁ, মণিকর্ণিকার জন্মের কিস্‌সাটা ভুলিনি, মান্টোভাই। যেদিন কোঠায় না যেতুম, বা কোঠায় গেলেও, সেখান থেকে বেরিয়ে রোজ আমি মণিকর্ণিকা ঘাটে গিয়ে বসতুম। মণিকর্ণিকা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধ্বংস এক হয়ে মিলে গিয়েছে। কেন জানেন? সময়ের একেবারে শুরুতে ভগবান বিষ্ণু এখানে তৈরি করেছিলেন পবিত্র কুণ্ড, আর এখানেই মহাশ্মশান, সময়ের শেষে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মণিকর্ণিকার জন্মের কথাটা শুনবেন নাকি, ভাইজানেরা? একমাত্র আমাদের দেশই বলতে পেরেছে, পুণ্যের কথা শুনলেও তোমার পাপ অনেকখানি লাঘব হবে।

সে একসময় ছিল, না, না, ভুল বলছি, তখনও তো সময়ের জন্ম হয়নি, শুধুই ছিল

অন্ধকার আর জলস্রোত। আকাশে সূর্য-চন্দ্র নেই; গ্রহ-নক্ষত্রই বা আসবে কোথা থেকে? দিন-রাত্রি বলে কিছু নেই। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ-আকার, কিছুই ছিল না। শুধু ছিলেন তিনি, অনাদি ব্রহ্ম, যাঁকে কোনও কিছু দিয়েই ধরাছোঁয়া যায় না। কিন্তু সেই অসীম নৈঃশব্দ্য, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কতদিন তিনি একা-একা থাকবেন? তাই তিনি সৃষ্টি করলেন একজন ঈশ্বরকে। তিনিই শিব। শিবেরই অংশ থেকে জন্ম নিলেন শক্তি, তিনিই প্রকৃতি ও মায়া। তাঁরা দু'জনে মিলে তৈরি করলেন পাঁচ ক্রোশের ভূখণ্ড কাশী। একদিন শিব ও শক্তি ভাবলেন, যদি আরেকজন কাউকে সৃষ্টি করা যায়, যে তৈরি করবে পৃথিবী, তার রক্ষণাবেক্ষণও করবে। তখনই জন্ম হল বিষ্ণুর। শিব ও শক্তি পৃথিবীর সবকিছু তৈরি করার জন্য বিষ্ণুকে নির্দেশ দিলেন।

বিষ্ণু তখন কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। সুদর্শন চক্র দিয়ে এক পদ্মকুণ্ড তৈরি করলেন, তাঁর শরীরের ঘামেই ভরে উঠল পুকুর, চক্রপুষ্করিণীর তীরে পাথরের মতো বসে থেকে তপস্যায় ডুবে গেলেন। দেখতে দেখতে চলে গেল পাঁচ লক্ষ বছর। হাঁ করে আছেন কেন, ভাইজানেরা? ওঁদের কাছে লক্ষ-কোটি বছর তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। এ এক অদ্ভুত মজা!

একদিন শিব ও শক্তি ওই পথে এসে বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন। তপস্যার প্রভাবে বিষ্ণু যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছেন। শিব তাঁকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন, বিষ্ণু বললেন, আর কিছু চাই না ভগবান, শুধু আপনার কাছাকাছি থাকতে চাই। বিষ্ণুর ভক্তি দেখে শিব এমন আনন্দে মাথা নাড়লেন যে তাঁর কানের অলঙ্কার—মণিকর্ণিকা গিয়ে পড়ল চক্রপুষ্করিণীর জলে। বিষ্ণুকে 'তথাস্তু' বলে শিব আরও বললেন, এখন থেকে এই চক্রপুষ্করিণীর নাম হবে মণিকর্ণিকা। কুণ্ডের পাশে ঘাটের নামও হয়ে গেল মণিকর্ণিকা। এই ঘাটের শ্মশানেই মানুষ তার পার্থিব শরীরটাকে তুলে দেয় মৃত্যুর হাতে, তারপর অন্য শরীর পেয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়। মান্টোভাই, মধ্যরাত অবধি আমি মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে থাকতুম, একের পর এক জ্বলন্ত চিতার লেলিহান শিখা দেখতুম, আর মনে হত, আবার যদি এক জন্ম পাই, তবে যেন আমার শরীর এমন চিতাতেই পোড়ানো হয়, আমি যেন অন্তরীক্ষে মিশে যেতে পারি। লোকের মুখে মুখে কত যে কিস্‌সা শুনেছি। একবার একজন বলেছিল, অন্য জায়গায় রাজা হওয়ার চেয়ে কাশীর রাস্তায় গাধা হয়ে ঘুরে বেড়ানো, আকাশে পাখি হয়ে ভেসে থাকা অনেক পুণ্যের।

না ভাইজানেরা, শুধু মৃত্যুর কথা আপনাদের শোনাতে বসিনি। মৃত্যুর অন্যপিঠে যা, আমাদের কাম, সে-কথা না বললে তো কাশীর বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হয় না। কাম তো শুধু নারীর শরীরে থাকে না, সংগীতে-নৃত্যে-হাওয়ার স্পর্শে-সৌরভে, সবকিছুতেই রয়ে গিয়েছে কাম; আমাদের কামনা-বাসনার কত যে কিস্‌সা। কাশীর তবায়েফদের কোনও তুলনা নেই, মান্টোভাই, সে সৌন্দর্য বলুন, আর ভালবাসার প্রকাশেই বলুন।

ভগবান বুদ্ধদেবের সময়ের একজন তবায়েফের কথা শুনেছিলুম। তিনি এক রাতে যে টাকা নিতেন, তা নাকি কাশীর রাজার একদিনের রাজস্বের সমান ছিল। মৃত্যুর পাশাপাশি, এ অন্য এক কাশী, তার শরীরে কামনার কত যে চন্দনপ্রলেপ। এই কাশী নিজেই যেন এক নারী। না হলে কাশী ছেড়ে গিয়ে ঋষি অগস্ত্যের ওই দশা কেন হবে বলুন? কাশী ছেড়ে অগস্ত্যকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হয়েছিল। গোদাবরীর তীরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেও কাশীর জন্য বিরহ তিনি সহ্য করতে পারেননি। উত্তর দিক থেকে ভেসে আসা হাওয়াকে জড়িয়ে ধরে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, বলো তো, আমার কাশী কেমন আছে? আমিও কাশীতে এসেই একজনের জন্য লিখেছিলুম,

ফির কুছ এক দিলকো বেকারারী হ্যায়,
সিনহ্ জুয়া-এ জখমকারী হ্যায়।।
(হৃদয় আবার অশান্ত
সে খুঁজছে কোনও আততায়ীকে।)

মাফ করবেন, মান্টোভাই, তার নাম আমার মনে নেই, কিন্তু গোরে যাওয়ার দিন তক্ সেই ছুরি আমার হৃদয়ে বিঁধে ছিল। তার কাছে কত কিস্‌সা শুনেছি; সত্যি বলতে কী, শোওয়ার জন্য নয়, তার সৌরভ আর কিস্‌সা শোনার জন্যই তার কাছে যেতুম আমি। তার কাছে 'কুট্টনীমত' কাব্যের কথা শুনেছিলুম। দামোদর গুপ্তের নাম শুনেছেন? কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের প্রধানমন্ত্রী তিনি, অনেক বয়সেই লিখেছিলেন 'কুট্টনীমত'। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এর পর যেসব কামশাস্ত্র পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই কাব্যের কাহিনি লেখা হয়েছে কাশীকে ঘিরেই। কেমন সে নগরী? ভাইজানেরা, মাফ করবেন, সে-নগরীর কথা আমাদের এই ঘেয়ো ভাষায় বলা সম্ভব নয়; মনে করুন দামোদর গুপ্ত আজ আমাদের মাঝে এসে বারাণসী ও তার বারাঙ্গনাদের রূপবর্ণনা করছেন। এবার কবি দামোদর গুপ্তের মুখেই শুনুন :

—অনুরাগে রঞ্জিতা নারীর বাঁকাচোখের চাহনিতে যে কামনা বাসা বাঁধে, রতির পদ্মমুখে যে কামনা ভ্রমরের মতো বারবার চুম্বনে আগ্রহী সেই কামনার অধীশ্বর মদনদেবের জয় হোক।

নিখিল বিশ্বের অলঙ্কারস্বরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত নগরী বারাণসী ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতদের সমাবেশে সমুজ্জ্বল। এই নগরীর মহিমা এমনই ঐতিহ্যমণ্ডিত যে সেখানকার মানুষ ঐশ্বর্যভোগে আসক্ত হলেও জটাজালে চন্দ্রশোভিত মহাদেবের সঙ্গলাভ তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। এই বারাণসী নগরীর বারবনিতাগণ বহু স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিতা থাকেন। তাঁরা ঐশ্বর্যশালিনী এবং সর্বদাই নাগর-পরিবেষ্টিত হয়ে সময় কাটান। তাঁদের দেহসৌষ্ঠব পশুপতির মতোই কোমল ও সুন্দর। সেখানকার আকাশচুম্বী দেবালয়গুলির শিখরে চিত্রিত পতাকাসমূহ বাতাসে আন্দোলিত হওয়ায় নভোদেশ পুষ্পিত উদ্যানের মতোই সুন্দর শোভমান। বনিতাদের ইতস্তত ভ্রমণে

ধরণীতল তাদেরই পদতলের রক্তরাগে রঞ্জিত। দেখে মনে হয়, ভূমিতল বুঝি স্থলপদ্মে ঢাকা। আকাশ-বাতাস মুখরিত তাদের ভূষণ-শিঞ্জনে, ফলে পাঠরত ছাত্রদের ঘটে পাঠস্খলন যা আচার্যগণ শোধন করতে অক্ষম।

দেবদেবী অধ্যুষিত স্বর্গের অমরাবতী নগরী যেমন নন্দন বনের সমারোহে শোভিত এবং বহু দেবসেনায় সেবিত, ঠিক সেইরূপ বারাণসী নগরীও বহু বিদগ্ধমানুষের অধ্যুষিত এবং প্রবহমান গঙ্গার সেবায় তুষ্ট হয়ে বিশ্বস্রষ্টার নির্মিত জগতের মাঝে আর এক অমরাবতীর মতোই বিরাজমান।

এবার মালতীর কথা বলছেন দামোদর গুপ্ত, মন দিয়ে শুনুন ভাইজানেরা, এ-কাব্য কবেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

—এই বারাণসীতেই বাস করত মালতী নামে এক বারবনিতা। কামদেবের ঈর্ষণীয় শরীরী শক্তির মতোই বারাঙ্গনাকুলের ঈর্ষাপ্রদ অলঙ্কারের নাম মালতী। গরুড়কে দেখে গর্তবাসী নাগিণীদের যেমন শোক জেগে ওঠে, তাকে দেখেও তেমনই বিলাসিনী বারাঙ্গনাদের হৃদয় ঈর্ষায় কাতর হয়। হিমালয়-কন্যা পার্বতী যেমন দেবেশ্বর মহাদেবের হৃদয় আকৃষ্ট করেছিলেন, মালতীও সেইরূপ ধনপতিদের হৃদয় আকর্ষণ করত। সমুদ্র মন্থনকালে শেষনাগের মন্থনরজ্জুতে মন্দার পর্বত যেমন আবদ্ধ হয়েছিল, ভোগীদের চোখও তেমনই সর্বদা মালতীর প্রতি আবদ্ধ থাকত। শিবের শূলের ওপর আসীন অন্ধকাসুরের দেহের মতোই মালতী ছিল গণিকাবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। সে ছিল স্মিতভাষী, লীলাময়ী, প্রেমাশ্রয়ী, পরিহাসপ্রিয়া ও বাকচাতুর্যে পারদর্শী। একদিন ছাদে বিচরণ করতে করতে মালতী একটি গান শুনতে পেল—

দূরে ফেলে দাও কামিনী তুমি  
রূপমহিমা আর মত্তযৌবন  
কৌশল করো যতনে এবার  
কামুকহৃদয় করিতে হরণ।

গান শুনে বিপুলজঘনা মালতীর মনে হল, 'যে ওই গান গাইছে, সে আমাকে বন্ধুর মতোই উপদেশ দিয়েছে। কামবিলাসী পুরুষগণ যার ঘরে দিন-রাত পড়ে থাকে, সংসারের সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞা সেই বিকরালার কাছেই এবার পরামর্শ নিতে হবে।'

বিকরালা কে জানেন, মান্টোভাই? সে এক বুড়ি বেশ্যা। দাঁত নেই, চামড়া ঝুলে পড়েছে, স্তন শুকিয়ে গেছে, মাথায় কয়েকটা মাত্র সাদা চুল। কিন্তু তাঁকে ঘিরে থাকে সব গণিকারা। কেন? কীভাবে যোগ্য পুরুষ বাছবে, কেমনভাবে তার মন হরণ করবে, সেই পরামর্শের আশায়। শুনে আমার মনে হত, জীবন্ত কামনা-বাসনারা সব মৃত্যুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একমাত্র মৃত্যুই যেন তাদের বলে দিতে পারে, কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। তাই মালতীর মতো বারাঙ্গনাকেও বিকরালার কাছে যেতে হল।

একদিকে কামনা-বাসনার কোঠি, অন্যদিকে মৃত্যুর মণিকর্ণিকা—একসঙ্গে শুধুমাত্র কাশীই ধারণ করতে পারে। ঋষি নারদের এক আশ্চর্য কিস্‌সা শুনেছিলুম। এ হল গিয়ে ভৈরবী-যাতনার কথা। যেন স্বপ্নের মধ্যে পেরিয়ে এলুম অনেক জীবন। কামনা-বাসনা-মৃত্যু, সব সেখানে একাকার। নারদের গল্পটা না বললে ভৈরবী-যাতনার কথা বুঝতে পারবেন না, ভাইজানেরা। ব্রহ্মা একদিন নারদকে গঙ্গায় ডুব দিতে বললেন। নারদ ডুব দিয়ে উঠতেই কী দেখা গেল জানেন? এক পরমাসুন্দরী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ে হল; ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিও হল, তারপর একদিন সেই কন্যার বাবা আর স্বামীর মধ্যে বাধল ঘোরতর যুদ্ধ, যুদ্ধে দু'জনেরই মৃত্যু হল, কন্যার অনেক সন্তানও মারা গেল। সহমৃতা হওয়ার জন্য স্বামীর চিতায় গিয়ে উঠল কন্যা। জ্বলে উঠল আগুন, কিন্তু আগুনের ভেতরে কী আশ্চর্য ঠাণ্ডা, যেন নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। নারদ দেখলেন, তিনি সবে ডুব দিয়ে উঠেছেন। এর মধ্যেই ঘটে গেল এতকিছু? এসবই কাশীমাহাত্ম্যের কথা, মান্টোভাই। দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে কী বলেছিলেন জানেন? কাশীতে থেকে আমি যে আনন্দ পাই, তা কোনও যোগীর হৃদয়েও পাওয়া যায় না, পার্বতী, এমনকী কৈলাস বা মন্দার পর্বতেও নয়। পার্বতী, এই বিশ্বে দুই অনন্তস্বরূপকেই আমি ভালবাসি। তুমি পার্বতী, গৌরী আমার, যে তুমি সব কলাবিদ্যা জানো, আর এই কাশী। কাশী ছাড়া আমার জন্য কোনও জায়গা নেই। কাশীতেই আনন্দ, কাশীতেই নির্বাসন। আমরা অনন্তকাল কাশীতেই থেকে যাব।

ওই আলোর শহর থেকে আমার একেবারেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমি তো বেরিয়েছি পেনশনের জন্য দরবার করতে, কলকাতায় যেতেই হবে আমাকে। না হলে খাব কী বলুন? শাহজাহানাবাদের হাভেলিতে কতগুলো মুখ তো আমার দিকে তাকিয়েই বসেছিল। তার ওপর পাওনাদাররা আছে। কাশীতে থেকে যেতে পারতুমই আমি। কিন্তু ওদিকে পাওনাদাররা তো আমার পরিবারকে পথে নামিয়ে ছাড়ত। উমরাও বেগমকে হয়তো আমি ভালবাসিনি, কিন্তু তার ইজ্জতকে তো রাস্তায় এনে দাঁড় করাতে পারি না। এদিকে কাশীতে কোঠার সেই সুন্দরীও আমাকে ছাড়বে না, বারবার বলে, মিঞা আপনি থেকে যান, আপনার সঙ্গেই আমার জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু কাশীতে টাকা কে দেবে আমাকে, মান্টোভাই? টাকা ফুরিয়ে গেলে মহব্বতও ফুরিয়ে যায়, সে আমি ভালভাবেই জানতুম। অত যে তার প্রেম, টাকা না থাকলে, সে-ও আমাকে লাথি মারতে একবার ভাববে না। শুধু একজন মানুষের স্মৃতি নিয়ে আমি কাশীকে বিদায় জানালুম। আজ বড় ঘুম পাচ্ছে ভাইজানেরা, পরে তাঁর কথা বলব, সন্ত কবিরসাবের কথা কি অত সহজে বলা যায়? কাশীর মতোই অনন্তকাল ধরে যেন তিনি বেঁচে আছেন। নইলে তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হওয়ার কথা নয়।

রও-মেঁ হৈ রখশ্‌-এ উমর, কহাঁ দেখিয়ে থমে,
ন হাথ বাগ পর হৈ, নহ্‌ পা হৈ রকাব-মেঁ।।
(জীবনের ঘোড়া ছুটে চলেছে, দ্যাখো কোথায় থামে;
না হাতে আছে লাগাম, না পা আছে রেকাবে।।)

আপনি চললেন কলকাতা, মির্জাসাব, আর আমাকে ডাকল বোম্বাই। একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছি অমৃতসরে। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের দেখাশোনার দায়িত্বও আমার ওপর বর্তাল। এদিকে রোজগারপাতি কিছু নেই। বিবিজানের জমানো টাকা ভেঙে চলতে লাগল; কিন্তু তাতে আর কতদিন চলবে? আমি কোনও ধান্দায় না ঢুকতে পারলে তো একদিন মা-বেটা দু'জনকেই না খেয়ে মরতে হবে। হঠাৎই নসিবে আলো এসে পড়ল। বোম্বাই থেকে নাজির লুধিয়ানভির ডাক এসে পৌঁছল। তাড়াতাড়ি বোম্বাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। বিবিজানকে বলতে সে তো কেঁদেকেটে একসা।—তুমি কী করে বোম্বাই যাবে বেটা? বোম্বাই তুমি চেনো? শুনেছি, কত বড় শহর। কে তোমার দেখভাল করবে?

হ্যাঁ, মাহিমে আমার দিদি ইকবাল বেগম ছিল বটে, কিন্তু তার বর আমাকে একদম দেখতে পারত না, কোনও দিন মাহিমে ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।

—বিবিজান, অমৃতসরে থেকে আমি কী করব বলো? এখানে কোনও কাজ আমার জুটবে না। বোম্বাইতে কিছু না কিছু হয়ে যাবে। আর নাজিরসাব যখন ডেকেছেন—

—বেটা তোমার দিদির কাছে শুনেছি, ওই শহরে কেউ কারও দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকায় না।

—ভালই তো। একবার চেষ্টা করে দেখি, বিবিজান।

তখন আমার বয়স চব্বিশ। খোদার কাছে বিবিজানকে রেখে আমি বোম্বাইয়ের ডাকেই সাড়া দিলাম। ভাইজানেরা, বোম্বাই না দেখলে আমি জানতেই পারতাম না, এই দুনিয়াতে মানুষ কতরকম ভাবে বেঁচে থাকে। বোম্বাইয়ের ওপর-মহল আর নীচের মহলের মতো তফাত আর কোনও শহরে নেই। ওপর মহলে টাকা উড়ছে, কত রোশনাই, গ্ল্যামার; আর নীচের মহলে তত খিদে, অন্ধকার, খুনখারাবি। কিন্তু এই দুই মহলের মধ্যে গোপন যোগাযোগও আছে। সেসব বড় আশ্চর্যের কিস্‌সা।

নাজির লুধিয়ানভি আমাকে কাজে জুতে দিলেন। তাঁর সাপ্তাহিক 'মুসাওয়ার' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে গেলাম আমি। মাইনে মাসে চল্লিশ টাকা। আমাকে আর পায়

কে! এ তো শালা হাতে চাঁদ পাওয়া। অফিসেরই একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম। কিন্তু বেশিদিন পোষাল না। অফিসের ঘরে থাকি বলে নাজিরসাব যখন-তখন এসে বিরক্ত করতেন। লোকটাকে বোঝাই কী করে, আমি তো শুধু কাগজে চাকরি করার জন্য জন্মাইনি। আমার পড়া আছে, লেখা আছে, সবচেয়ে বড় কথা একা-একা থাকতে ইচ্ছে করে আমার। তাই ঠিক করে ফেললাম, একটা বাসা ভাড়া নিতেই হবে।

রোজগার করি মাসে চল্লিশ টাকা। বোম্বাইতে তো এই টাকায় ভদ্র থাকার জায়গা পাওয়া যায় না। মাসে ন'টাকা ভাড়ায় একটা খোলিতে গিয়ে উঠলাম। খোলিই বটে! না দেখলে বুঝতে পারবেন না, ভাইজানেরা, সে কি মানুষের থাকার জায়গা, না ইঁদুরের গর্ত! একটা লজ্‌ঝড়ে দোতলা বাড়িতে চল্লিশটা খুপরি, সূর্যের আলো ঢোকে না, সব সময় স্যাঁতসেঁতে, দিনের বেলাতেও ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। মশা, ছারপোকা, ইঁদুর কী নেই সেখানে! মির্জাসাব, বোম্বাইয়ের ওই খোলিতেই আমি প্রথম দোজখ দেখেছি। খোলিতে আপনি মরে পড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ নিতে যাবে না। চল্লিশটা খোলিতে কত যে মেয়ে-মরদ-বালবাচ্চা ছিল কে জানে! আর সবার হাগা-মোতা-চানের জন্য দরজা ভাঙা দু'টো বাথরুম। সবাই জাগবার আগে আমি ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে বেরিয়ে পড়তাম। সারাদিন অফিসে কাটিয়ে অনেক রাতে ফিরতাম; সারা দিনের ক্লান্তি আর খোলির গরমে ভাজা ভাজা হতে হতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

খোলির দিনগুলোর কথা বলতে হলে মহম্মদ ভাইয়ের কিস্‌সাটাও আপনাদের শোনাতে হবে। বোম্বাইয়ে যত আজিব মানুষ আমি দেখেছি, মহম্মদ ভাই সবার চেয়ে আলাদা। আমার খোলিটা ছিল আরব গলিতে। একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। রেন্ডিপট্টির জন্য ফরাস রোড বিখ্যাত। ফরাস রোড থেকে একটু বাঁক নিলেই গিয়ে পৌঁছবেন সফেদ গলিতে। ওখানে অনেক কাফে আর রেস্তোরাঁ ছিল। পুরো জায়গা জুড়েই বেশ্যাদের কোঠি। ভারতবর্ষের সব জাত-ধর্মের বেশ্যা ওখানে পাবেন। সফেদ গলি ছাড়িয়ে ছিল একটা সিনেমা হল, প্লে-হাউস, সারাদিন সিনেমা চলত। একটা লোক সারাক্ষণ চেঁচিয়ে যেত, 'আইয়ে, আইয়ে, দো আনা মে ফার্স্ট ক্লাস শো।' যাদের সিনেমা দেখার ইচ্ছে থাকত না, তেমন লোকদেরও জোর করে হলে ঢুকিয়ে দিতে সে। আর এক মজার জিনিস ছিল। মালিশওয়ালা। যখন-তখন রাস্তায় বসে লোকজন মাথায় মালিশ করাচ্ছে। চোখ বুজে মালিশের আরাম নিতে নিতে কেউ কেউ গান গাইত। আমার বেশ মজাই লাগত। বাঁশের চিক লাগানো ছোট ছোট ঘরে বসে থাকত মেয়েগুলো। ওদের দাম? আট আনা থেকে আট টাকা। আট টাকা থেকে আটশ টাকা। এই বাজারে এসে আপনি সব দেখেশুনে, পছন্দের মতো তাজা গোস্ত কিনে নিন।

আরব গলিতে জনা পঁচিশেক আরব থাকত; মুক্তো কেনাবেচাই নাকি ছিল ওদের ব্যবসা। আর যারা এই গলিতে থাকত, তারা হয় পাঞ্জাবি, নয়তো রামপুরি। মহম্মদ

ভাই থাকত আমাদের আরব গলিতেই। কেউ কারও খোঁজ না রাখুক, শুনেছি, মহম্মদ ভাই নাকি মহল্লার সকলের খোঁজ রাখত। রামপুরের মানুষ, লাঠি খেলা, ছুরি চালানোয় একেবারে ওস্তাদ। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা লোককে কাবু করা তার কাছে জলভাত। তার ছুরি চালানোর হাত নিয়ে কত যে গল্প শুনেছি। এতই নিখুঁত ছিল তার হাত, যে মরছে, সে নাকি বুঝতেই পারত না। কিন্তু সবাই কসম খেয়ে একটা কথাই বলত, মেয়েছেলের দোষ মহম্মদ ভাইয়ের নেই। শুনেছি, গরিব, ভিখিরি মেয়েদের সে সাহায্য করত। তার শাগির্দরা গিয়ে রোজ তাদের পয়সা দিয়ে আসত। কী যে তার ধান্দা ছিল, তা আমি জানতাম না, শুনতাম, পোশাক-আশাকে বেশ ফিটফাট, খায়দায়ও ভাল, আর একটা ঝলমলে টাঙ্গায় চেপে দু'তিনজন শাগির্দ নিয়ে সে মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। তবে বেশির ভাগ সময় তার কাটে ইরানি কাফেতে বসে। তো, এই মহম্মদ ভাইকে অনেকদিন ধরেই দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে ফিরি, কিছুতেই তাকে দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তার সম্পর্কে একটা আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম আশিক হুসেনের কাছে। আমার পাশের খোলিতেই থাকত আশিক, সিনেমায় নাচ করত।

একদিন কথায় কথায় আশিক বলল, 'মহম্মদ ভাইয়ের তুলনা নেই, মান্টোসাব।'

—কেন? তোমার জন্য সে কিছু করেছে নাকি?

—সেবার আমার কলেরা হয়েছিল, খবর পেয়ে মহম্মদ ভাই এসে হাজির। তারপর কী হল, জানো? ফরাস রোডের যত ডাক্তার, দেখি, সবাই আমার খোলিতে হাজির। মহম্মদ ভাই শুধু বলল, আশিকের যদি কিছু হয়, আমি তোমাদের দেখে নেব। ডাক্তাররা তো তার কথা শুনে থরথর করে কাঁপছে।

—তারপর?

—দু'দিনেই ভাল হয়ে গেলাম। ফরিস্তা মান্টোসাব, ফরিস্তা ছাড়া আর কিছু নয় মহম্মদ ভাই।

আরও কত যে গল্প মহম্মদ ভাইকে নিয়ে। তার উরুর কাছে নাকি একটা ধারালো ছোরা বাঁধা থাকে। হাসতে হাসতে সে ওই ছোরা বার করে নানা খেলা দেখায়। এসব শুনতে শুনতে আমি তার চেহারাটা কল্পনা করতাম। লম্বা, পেশল শরীর, তাকালেই বুক হিম হয়ে যায়। তবু কিছুতেই নিজের চোখে মহম্মদ ভাইকে দেখা হয়ে উঠছিল না। মাঝে মাঝে ভাবতাম, একদিন ছুটি নিয়ে লোকটাকে দেখতেই হবে। কিন্তু পত্রিকায় চাকরির যে কত হ্যাপা। সম্পাদক থেকে বেয়ারাগিরি—সবই প্রায় আমাকে করতে হত।

হঠাৎ একদিন ধুম জ্বর এল আমার, বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই। আশিকও গিয়েছে দেশের বাড়িতে। দু'দিন একা একা খোলিতে পড়ে রইলাম। মাঝে মাঝে ইরানি হোটেলের ছেলেটা এসে খাবার দিয়ে যেত। বোম্বাইয়ে কে আমার খোঁজ

নেবে? আমিই বা ক'জনকে চিনি? নাজিরসাবও জানতেন না, আমি কোথায় থাকি। মরে গেলে কেউ খবর পর্যন্ত পেত না। আর বোম্বাই এমন জায়গা, কে মরল আর কে বাঁচল, কেউ খোঁজ রাখে না।

তিনদিনের দিন ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক উঠে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। ভাবলাম, হোটেলের ছোকরাটা বোধহয় এসেছে।—ভেতরে আয়।

দরজা খুলে দেখলাম, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই চোখে পড়ল তার পেল্লায় গোঁফ, দু'হাতে সে গোঁফ মোচড়াচ্ছে। আমার মনে হল, গোঁফটা না থাকলে লোকটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, এতই সাধারণ সে। চার-পাঁচজন লোক নিয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর নরম গলায় ডাকল, 'ভিমটোসাব—'

—ভিমটো নেহি, মান্টো।

—একই হ্যায় শালা। ভিমটোসাব, এ তো ভাল কথা নয়। তোমার বুখার হয়েছে, আমাকে জানাওনি কেন?

—আপনি কে?

সে তার সঙ্গীদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, 'মহম্মদ ভাই'।

আমি ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলাম।—মহম্মদ ভাই, মহম্মদ ভাই—দাদা?

—হ্যাঁ, ভিমটোসাব, আমি মহম্মদ, দাদা। হোটেলের ছোকরাটাই বলল, তোমার তবিয়ত খুব খারাপ। এ তো শালা ভাল কথা নয়। আমাকে খবর পাঠালে না? এমন হলে মহম্মদ ভাই শালার মেজাজ ঠিক থাকে না। এবার সে তার এক শাগির্দের দিকে তাকায়, 'এই—এই তোর নাম কী শালা? যা, ওই শালা ডাক্তারের কাছে যা। বলবি, মহম্মদ ভাই বলেছে, ডবল কুইক যেন চলে আসে। আর শালাকে সব যন্তরপাতি নিয়ে আসতে বলবি।'

আমি মহম্মদ ভাইকে দেখতে দেখতে তার সম্পর্কে শোনা গল্পগুলো ভাবছিলাম। কিন্তু যে মহম্মদ ভাইকে আমি কল্পনা করেছিলাম, এ তো সে নয়। শুধু তার গোঁফটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, একটা নরম মনের মানুষ শুধু বিরাট গোঁফ তৈরি করে মহল্লার দাদা হয়ে গেছে। আমার ঘরে কোনও চেয়ার ছিল না। তাই বিছানাতেই বসতে বললাম তাকে। মাছি ওড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে মহম্মদ ভাই বলল, 'এসব ভাবতে হবে না, ভিমটোসাব।'

দমচাপা খোলির মধ্যে পায়চারি করতে লাগল মহম্মদ ভাই। এক সময় দেখি, তার হাতে সেই বিখ্যাত ছোরা ঝকঝক করছে। মহম্মদ ভাই হাতের ওপর ছোরা ঘসছিল, আর লোমগুলো ঝরে পড়ছিল। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আমার জ্বর কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে। আমি আমতা-আমতা করে বললাম, 'মহম্মদ ভাই, ছোরাটা তো ভয়ানক ধারালো। আপনার হাত কেটে যেতে পারে।'

—ভিমটোসাব, ছোরাটা আমার দুশমনদের জন্য। আমার হাত কেন কাটবে? তারপর ছোরাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ছেলে কি বাবাকে মারতে পারে?'

ডাক্তার এসে পৌঁছল। সে এক ভারী মজার ব্যাপার, মির্জাসাব, আমার নাম হয়ে গেছে ভিমটো আর ডাক্তারের নাম পিন্টো।

ডাক্তার পিন্টো মিনমিন করে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

—সেটা শালা আমি বলব? ভিমটোসাবকে ভাল না করতে পারলে, শালা, তোমাকে দাম চোকাতে হবে।

ডাক্তার পিন্টো আমাকে সবরকম ভাবে দেখে মহম্মদ ভাইকে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই মহম্মদ ভাই। ম্যালেরিয়া। আমি একটা শট দিয়ে দিচ্ছি।'

—ডাক্তার, এসবের আমি কিছু বুঝি না। শট দিতে চাইলে, শালা, শট দাও, কিন্তু খারাপ কিছু হলে—

—সব ঠিক হয়ে যাবে মহম্মদ ভাই। তা হলে শটটা দিয়ে দিই। বলে ডাক্তার পিন্টো ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ আর ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল বের করল।

—দাঁড়াও ডাক্তার। মহম্মদ ভাই প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। ডাক্তার ভয় পেয়ে ব্যাগে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে ফেলল।

—এসব সুঁই দেওয়া-ফেওয়া, শালা, আমি দেখতে পারি না। বলতে বলতে মহম্মদ ভাই তার স্যাঙাৎদের নিয়ে খোলি থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার পিন্টো খুব সাবধানে কুইনাইন ইঞ্জেকশন দিল আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম, কত দিতে হবে?

—দশ টাকা।

ব্যাগ বার করে ডাক্তার পিন্টোর হাতে টাকা দিতেই মহম্মদ ভাই এসে ঢুকল।—শালা, এসব কী হচ্ছে?

ডাক্তার পিন্টো কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মহম্মদ ভাই, খোদা কসম, আমি কিছুই চাইনি।'

—শালা, টাকা চাইলে আমার ক ছে চাও। ভিমটোসাবকে এক্ষুনি টাকা ফেরত দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে মহম্মদ ভাই বলতে থাকে, 'আমার এলাকার ডাক্তার তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে ভিমটোসাব? শা‍ া, এ-কখনও হতে পারে? তাহলে আমার গোঁফই কেটে ফেলব। জেনে রাখো ভিমটোসাব, আমার মহল্লার সবাই তোমার চাকর।'

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে আপনি চেনেন মহম্মদ ভাই?'

—চিনি না? এখানে এমন কেউ আছে, যাকে শালা মহম্মদ ভাই চেনে না? শোনো

ইয়ার, মহম্মদ ভাই মহল্লার রাজা, সবার খোঁজ খবর রাখে। কত লোকজন জানো, আমার? তারা সবকিছু জানিয়ে দেয়। কে কখন আসছে, যাচ্ছে, কে কী করছে? তোমার সম্পর্কে সব জানি আমি।

—তাই?

—শালা, আমি ছাড়া কে জানবে? তুমি অমৃতসর থেকে এসেছে, তো? কাশ্মীরি, ঠিক কি না, শালা? তুমি একটা কাগজে কাজ করো। বাজারের বিসমিল্লা হোটেল তোমার কাছ থেকে দশ টাকা পায়, তাই তুমি ওই রাস্তা দিয়ে যাও না। ঠিক বলেছি? ভিন্ডিবাজারের পানওয়ালাটা তোমাকে দিনরাত খিস্তি করে। সিগ্রেটের জন্য শালা তোমার কাছে কুড়ি টাকা দশ আনা পায়।

আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, মাটির গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি। এই লোকটার চোখ সব জায়গায়?

—ভিমটোসাব, কোই ডর নেহি। তোমার সব ধার আমি মিটিয়ে দিয়েছি। তুমি আবার সব নতুন করে শুরু করো। লজ্জা পাচ্ছো কেন, ভিমটোসাব? লম্বা জীবনে কত কী ঘটে। আমি সব শালাকে বলে দিয়েছি, তোমার পিছনে যেন না লাগে। মহম্মদ ভাইয়ের কথার, শালা, নড়চড় হয় না।

ভাইজানেরা, মহম্মদ ভাই শুনতে পেয়েছিল কি না জানি না, আমি বিড় বিড় করে বলেছিলাম, 'খোদা, আপনাকে খুশ রাখুন।' মহম্মদ ভাই গোঁফ চুমড়োতে চুমড়োতে তার স্যাঙাতদের নিয়ে চলে গেল।

দু'সপ্তাহের মাথায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। মহম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠল। অনেক সময়ই সে আমার কথা চুপচাপ শুনে যেত। ভাই আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় ছিল। শুধু তার গোঁফটা ছিল আমার বয়সের চেয়ে অনেক বড়। পরে শুনেছিলাম, রোজ মাখন লাগিয়ে নাকি গোঁফের তরিবৎ করে মহম্মদ ভাই। আমি ভাবতাম, কে আসল মহম্মদ ভাই, তার গোঁফটা, না ধারালো ছোরাটা?

একদিন আরব গলির চিনা হোটেলের সামনে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় তাকে বললাম, 'মহম্মদ ভাই, এটা তো বন্দুক আর রিভলবারের যুগ। আপনি ছোরা নিয়ে ঘোরেন কেন?'

গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে মহম্মদ ভাই বলে, 'ভিমটোসাব, বন্দুকের মতো বিরক্তিকর জিনিস আর নেই, শালা। একটা বাচ্চাও বন্দুক চালাতে পারবে। ট্রিগার টেপো, হয়ে গেল। কিন্তু ছোরা...খোদা কসম...ছোরা চালানোর মজাই আলাদা। তুমি একবার কী যেন বলেছিলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর্ট, শোনো ভিমটোসাব, ছোরা চালানোটা একটা আর্ট। আর রিভলভার কী? খিলৌনা।' বলতে বলতে সে তার ঝকঝকে ছোরাটা বার করে।—দ্যাখো, একে দ্যাখো, শালা, কী ধার দ্যাখো। যখন চালাবে কোনও শব্দ হবে না। পেটে ঢুকিয়ে একটা মোচড়, সব শেষ। বন্দুক-ফন্দুক সব রাবিশ।

মহম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে যত মিশছিলাম, মনে হচ্ছিল, লোকটাকে সবাই এত ভয় পায় কেন? ইয়া বড় গোঁফটা ছাড়া তো ভাইয়ের মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। ভয় আসলে বাইরে থাকে না, ভাইজানেরা, ভয় লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের ভিতরের অন্ধকারে।

একদিন অফিস যাওয়ার পথে চিনা হোটেলের সামনে শুনলাম, মহম্মদ ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তা কী করে সম্ভব? পুলিশের সঙ্গে তো ভাইয়ের বেশ ভালই মাখামাখি ছিল। তা হলে? ঘটনাটা এইরকম : শিরিনবাই নামে আরব গলিতে এক বেশ্যা থাকত। তার একটা ছোট মেয়ে ছিল। ভাইকে গ্রেফতারের আগের দিন শিরিনবাই মহম্মদ ভাইয়ের পায়ে গিয়ে পড়েছিল। তার মেয়েকে নাকি কে ধর্ষণ করেছে।

—ভাই, আপনি মহল্লার দাদা, আর আমার মেয়েকে সেখানে বেইজ্জত করে গেল। আপনি বদলা নেবেন না?

ভাই নাকি শিরিনবাইকে প্রথমে অনেক খিস্তিখাস্তা করেছিল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'কী চাও, মাদারচোদের পেটটা ফাঁসিয়ে দেব? যাও শালী, কোঠায় যাও, যা করার আমি করব।'

আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ খতম। লোকটা খুন হয়ে গেল। তবু মহম্মদ ভাইকে পুলিশ কী করে ধরল? ভাই এসব কাজের কোনও সাক্ষী রাখে না, কেউ দেখলেও ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলতে আসবে না। দু'দিন লক আপে থাকার পর বেল পেল মহম্মদ ভাই। কিন্তু লক আপ থেকে বেরিয়ে আসা ভাই যেন অন্য মানুষ। চিনা হোটেলে যখন তার সঙ্গে দেখা হল, মনে হচ্ছিল, একটা ঝোড়ো কাক। আমি কিছু বলবার আগেই সে বলল, 'ভিমটোসাব, শালা মরতে এত সময় নিল। সব আমার দোষ। ঠিকঠাক ছোরা ঢোকাতে পারিনি।' কী আশ্চর্য, ভাবুন ভাইজানেরা, একটা মানুষকে মারার জন্য তার দুঃখ নেই, সে ভাবছে ছোরাটা ঠিকঠাক চালানো হয়নি।

কোর্টে হাজিরার দিন যতই এগিয়ে আসছিল, মহম্মদ ভাই ততই মুষড়ে পড়ছিল। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম, কোর্ট সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই, তাই এত ভয়। কোর্ট তো দূরের কথা, হাজতেই কখনও থাকতে হয়নি ভাইকে। একদিন সে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'ভিমটোসাব, কোর্টে যাওয়ার চেয়ে আমি মরে যাব, শালা। কোর্ট-ফোর্ট তো আমি কখনও দেখিনি।'

আরব গলির স্যাঙাতরা তাকে বোঝালো, ভয়ের কিছু নেই, কোনও সাক্ষী নেই, কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে যাবে না। তবে হ্যাঁ, তার পেল্লায় গোঁফ দেখে ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যরকম ধারণা হতে পারে। এমন যার গোঁফ, সে ক্রিমিনাল না হয়ে যায় না।

একদিন ইরানি হোটেলে আমরা বসে আছি। মহম্মদ ভাই ছোরাটা বার করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল। আমি বললাম, 'এ কী করছেন, মহম্মদ ভাই।'

—ভিমটোসাব, সব কিছু আমার সঙ্গে বেইমানি করছে। সবাই বলে, ম্যাজিস্ট্রেট আমার গোঁফ দেখলেই নাকি, শালা, জেলখানায় ভরে দেবে। আমি কী করব, বলো?

অনেক কথার পর শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, 'আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ তো কিছু নেই, তবে গোঁফ দেখলে ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হতেই পারে—।'

—তা হলে উড়িয়ে দেব? গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে মহম্মদ ভাই অসহায় চোখে আমার দিকে তাকায়।

—যদি মনে করেন।

—আমার মনে করায় কিছু আসে যায় না। শালা ম্যাজিস্ট্রেট কী ভাববে, সেটাই বড় কথা। তুমি কী বলো?

—তা হলে কেটেই ফেলুন।

পরদিন মহম্মদ ভাইকে দেখতে পেলাম, গোঁফহীন, আরও অসহায়।

কোর্টে মহম্মদ ভাইকে ভয়ঙ্কর গুণ্ডা বলে ঘোষণা করা হল। বলা হল, বোম্বাইয়ের বাইরে চলে যেতে হবে তাকে। হাতে মাত্র একদিন সময়। আমরা সবাই কোর্টে গিয়েছিলাম। মহম্মদ ভাই রায় শুনে চুপচাপ বেরিয়ে এল। মাঝে মাঝেই তার হাত নাকের নীচে চলে যাচ্ছিল।

সন্ধেবেলা ইরানি হোটেলে প্রায় জনাকুড়ি শাগির্দ নিয়ে চা খাচ্ছিল মহম্মদ ভাই। আমি তার মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। দেখলাম, তার দৃষ্টি এই হোটেল, মহল্লা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবছেন?'

মহম্মদ ভাই ফেটে পড়ল।—শালা যে মহম্মদ ভাইকে তুমি জানতে, সে মরে গেছে।

—কেন এত ভাবছেন? আপনাকে তো বাঁচতে হবে। বোম্বাইতে না হলে অন্য কোথাও।

—শোনো ভিমটোসাব, বাঁচা-মরা নিয়ে আমি ভাবি না। তোমাদের কথা শুনে, শালা বুরবাক আমি, গোঁফ কেটে ফেললাম। অন্য কোথাও গেলে আমি তো গোঁফটা নিয়েই যেতে পারতাম। এর চেয়ে ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে পারত।

মহম্মদ ভাইকে আর আমি দেখিনি। কতদিন ভেবেছি, গোঁফের জন্য কেন এত দরদ ছিল তার? গোঁফটাই কি আসলে মহম্মদ ভাই? আমি এখনও জানি না। দু'একদিন পর অমৃতসর থেকে বিবিজানের চিঠি পেলাম, বোম্বাইতে আসবে, আমার জন্য বড় মন কেমন করে তার। আমিও চিঠি লিখলাম, এসো, বিবিজান, বোম্বাইতে আমিও বড় একা, এত একা আমি কখনও থাকতে চাইনি।

সরাপা আরজু হোনেনে বন্দহ কর দিয়া হমকো
বগরনহ্ হম খুদা থে গর দিল বেমুদ্দোয়া হোতা।।
(আপাদমস্তক যাচনা বলেই আমি মানুষ মাত্র,
নইলে আমি তো ঈশ্বর হতাম, হৃদয় যদি বাসনারহিত হত।)

এক-একদিন মাঝরাতে মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে বসে থাকতুম। কাশী ছেড়ে আমার নড়তেই ইচ্ছে করছিল না। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার ভেতরের সব ক্ষোভ, বিক্ষিপ্ততা শান্ত হয়ে যেত; মনে হত, কলকাতায় গিয়ে কী হবে, কেন কয়েকটা টাকার জন্য এত পথ ছুটে মরছি আমি! মণিকর্ণিকার চিতার আগুন আমার সব কামনা-বাসনাকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল; আর সেই ছাইয়ের ওপর অদৃশ্য থেকে কারা যেন ছিটিয়ে দিচ্ছিল গঙ্গার পবিত্র জল। ভাবতুম, ইসলামের খোলসটাও ছুঁড়ে ফেলে দেব, কপালে তিলক কেটে, হাতে জপমালা নিয়ে গঙ্গার তীরে বসেই জীবনটা কাটিয়ে দেব, আমার অস্তিত্ব যেন একেবারে মুছে যায়, একবিন্দু জলের মতো যেন হারিয়ে যেতে পারি দেবী গঙ্গার স্রোতোধারায়। আপনি কি হাসছেন, মান্টোভাই? হাসবারই কথা; এত ভোগ-লালসায় ডুবে থাকা মির্জা গালিব বলে কী? বিশ্বাস করুন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে থেকে মন একেবারে সাদা পাতা হয়ে যেত, যেন এতদিন কোথাও কিছু ঘটেনি, আমার নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে। কিন্তু অভিশপ্ত শাহজাহানাবাদ আমাকে ছেড়ে দেবে কেন বলুন? আমি তার নুন খেয়েছি, তার হিসাব তো চুকিয়ে যেতেই হবে। কাশীর মতো আলোর শহর তো আমার মতো মুনাফেকের জন্য নয়।

যেদিন কাশী ছাড়লুম, তার আগের দিন সন্ধে থেকে মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে বসেছিলুম। সেদিন আর কোঠায় যাইনি; জানতুম, ওখানে গেলেই দিলরুবার টানে আটকে যাব, আরও কয়েকদিন কাশীতে থেকে যেতেই হবে আমাকে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, ভাইজানেরা, তখন আমার বসে থাকলে চলবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় পৌঁছতেই হবে। জানতুম, সে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, সারারাত আমার জন্য জেগে থাকবে; আমি কাশী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হয়তো মুনিরাবাইয়ের নিয়তিই তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কী হয়েছিল তার, কে জানে! হয়তো ভুলেই গিয়েছিল, আর আমিও তা-ই চেয়েছিলুম, সে যেন আমাকে ভুলে যায়। আমি দেবী গঙ্গাকে বলেছিলুম, আমার স্মৃতি যেন তোমার স্রোতে ধুয়েমুছে যায়;

কিন্তু মজা কী জানেন, আমি তো তার কথা ভুলতে পারছিলুম না; তার শরীরের স্মৃতি আমাকে আঁকড়ে ধরছিল, তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল কাশীর গলির পর গলি পেরিয়ে। আর আমি ভাবছিলুম রাবেয়া বল্‌খির কথা। মণিকর্ণিকার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল টাটকা রক্তের ধারা, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম।

রাবেয়ার কথা কি আপনি জানেন, মান্টোভাই? না জানারই কথা। মোল্লারা রাবেয়ার জীবনকে মুছে দিয়েছে। ইসলামি দুনিয়ার প্রথম মহিলা, প্রথম কবি, যে আত্মহত্যা করেছিল। কবিতা, প্রেম আর মৃত্যুর জটিল নকশা আঁকা হয়েছিল রাবেয়ার জীবনের জমিনে। বল্‌খের রাজকুমারী সে; গভীর অভিশাপ নিয়ে এ-দুনিয়ায় এসেছিল; নিজেকে সে নিরাশ্রয় ভেবেছিল এই পৃথিবীতে। ছোটবেলা থেকে কবিতা লেখার নেশায় মজেছিল রাবেয়া। কবিখ্যাতিও জুটেছিল। কিন্তু নিয়তি তার জন্য অন্য খেলা নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। আর তাই একদিন পরিচয় হল বখতাসের সঙ্গে। মামুলি এক ছেলে, রাবেয়ার ভাই হারেথের ক্রীতদাস। প্রথম দেখাতেই জ্বলে উঠল ইশ্‌কের আগুন। গোপনে দেখাসাক্ষাৎ শুরু হল তাদের, লেখা হতে লাগল একের পর এক কবিতা। বখতাস, বখতাস—রাবেয়ার কবিতায়-কবিতায় শুধু তারই রূপমাধুর্য। মীরাবাইয়ের গানে-গানে যেমন নীলাম্বর শ্যামরায়, তাঁর আশিক্‌ গিরিগোবর্ধনের লীলা।

হারেথ একদিন রাবেয়ার গোপন অভিসারের কথা জানতে পারল। বখতাসকে রাজধানী থেকে বের করে দেওয়া হল; কয়েকদিন পরে জানা গেল, তাকে খুন করা হয়েছে। রাবেয়ার কাছেও খবর পৌঁছে গেল। তখন সন্ধ্যা নামছে, মান্টোভাই। রাবেয়া জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল, কালো আকাশের বুক চিরে এক ঝাঁক সারস উড়ে যাচ্ছে। তারপর সে স্নানঘরে গিয়েছিল; চুলের কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করেছিল হাতের শিরা, প্রবাহিত রক্তের দিকে সে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়েছিল, তারপর সেই রক্ত দিয়ে স্নানঘরের দেওয়ালে লিখেছিল তার শেষ কবিতা, বিষ পান করো রাবেয়া, তবু মুখে যেন মিষ্টি লেগে থাকে। মান্টোভাই, সে-রাতে আমি খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলুম; আমার দিলরুবা যদি রাবেয়ার মতো...কিন্তু কেন...আমার দুনিয়ায় তো কেউ কাউকে ভালবাসে না; কোঠার একটা মেয়ে, তার সঙ্গে আমার দু'দিনের দেখা, সে-ই বা আমাকে রাবেয়ার মতো ভালবাসবে কেন? ভালবাসার জন্য নিজের রক্তের স্বাদ ক'জন নিতে পারে, মান্টোভাই? মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে এইসব ভাবতে ভাবতেই শুনতে পেলুম, কে যেন গুনগুন করে গাইছে :

কৌন মুরলী শব্দ সুন আনন্দভয়ো  
জোত বরে বিন বাতী।  
বিনা মূলকে কমল প্রগট ভয়ো  
ফুলবা ফুলত ভাঁতী ভাঁতী।।

জৈসে চকোর চন্দ্রমা চিতবে।
জৈসে চাতৃক স্বাঁতী।
জৈসে সন্ত সুরতকে হোকে
হো গয়ে জনম সংঘাতী।।

বেশ কিছু দূরে একজন ছায়া-ছায়া মানুষ বসে আছেন। গান তিনিই গাইছেন, বুঝতে পারলুম। আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার গেয়ে উঠলেন,

চরখা চলৈ সুরত-বিরহিনকা।।
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর
মহল বনা চেতনকা।
সুরত ভাবরী হোত গগনমে
পীঢ়া জ্ঞান রতনকা।।
মিহিন সূত বিরহিন কাতৈঁ
মাঝাঁ প্রেমে ভগতিকা।
কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সাধো।।
মালা গূথৌ দিন রৈনকা।।
পিয়া মোর ঐহৈঁ পগা রখিহৈঁ
আসুঁ ভেঁট দৈহৌঁ নৈনকা।।

গান শুনতে শুনতে আমি তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। শীর্ণ একজন মানুষ, কোমরে শুধু একখণ্ড কাপড় জড়ানো, আর গলায় তুলসীর মালা। মান্টোভাই, বিশ্বাস করুন, সে যেন গান নয়, বহুদিন ধরে আটকে থাকা কান্না বেরিয়ে আসছে। মানুষটির দু'চোখ বোজা, গাল ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে। তিনি যত গাইছেন, যত কাঁদছেন, ততই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, গান শুনতে শুনতে, আমার ভিতরটাও শান্ত হয়ে আসছিল, একসময় আমিও গাইতে শুরু করেছিলুম, 'চরখা চলৈ সুরত-বিরহিনকা।'

তিনি একসময় চোখ খুললেন, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কী মজা ভাবুন মির্জাসাব, প্রেমবিরহিনীর চরখা চলছে তো চলছেই।'

—গুরুজি—

—গুরু কোথায়, মিঞা! আমি তো কবিরদাস। আপনি যে গুরুর দাস, আমিও সেই গুরুরই দাস।

—কে সেই গুরু?

—মিঞা, বিষয়বাসনা নিয়ে মনপাখি এখানে-ওখানে উড়ে বেড়ায়। বাজপাখি যতক্ষণ না তাকে ঝাপট মেরে তুলে নিয়ে যাবে, ততক্ষণ তো গুরুর দেখা মিলবে না। তা, মিঞা, কাল তো আপনি কাশী ছেড়ে চলে যাবেন, তাই না?

—আপনি জানেন?

কবিরসাব হাসলেন।—রোজই তো দেখি, আপনাকে। কাশীর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান। রোজ একটু-একটু করে দেখি আর একটু-একটু করে আপনার ভেতরে ঢুকি। এভাবে তো জানা হয়, না কি?

—আমার ভেতরে ঢোকেন? কীভাবে ঢোকেন?

—একটু ভুল হল মির্জাসাব। আমি ঢুকব, তার সাধ্য কী! এই যে দু'টি নূর দেখছেন—কবিরসাব আঙুল দিয়ে তাঁর দু'টি চোখকে দেখান—এই দুই নূরের মধ্য দিয়েই আমার ভেতরে সব ঢুকে পড়ে। সে এক মজা হয়েছিল, জানেন মির্জাসাব। তাও এই চোখ দু'টো নিয়েই। শেখ তুকী নামে একজন পির ছিলেন এই কাশীতে। পিরসাহেব সিকন্দর লোদির কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করলেন, আমি নাকি লোকের কাছে বলে বেড়াই, ভগবানের দেখা পেয়েছি। হাসি পায় না বলুন? আমার মতো সাধারণ দাসকে দেখা দেবেন কেন তিনি? সে যাকগে। সম্রাট আমাকে বন্দি করার জন্য পরওয়ানা জারি করলেন, তাঁর বিচারসভায় হাজির হওয়ার জন্য আমার বাড়িতে লোক পাঠালেন। তা আমি তাদের বললাম, সম্রাটের অত বড় বিচারসভায় আমার মতো সামান্য মানুষকে ডাকা কেন?

—বিচার হবে, তা-ই। একজন পেয়াদা বলল।

—জাঁহাপনার কাজ বিচার করা। তা তিনি বিচার করুন। যা শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমি গিয়ে কী করব?

—সম্রাটের হুকুম।

—তাঁর হুকুম তিনি জারি করেছেন। তাই বলে আমাকে যেতে হবে কেন?

—জাঁহাপনার রাজত্বে বাস করো, ভুলে গেছ?

—রামরহিমের প্রজা আমি। তাঁদের তালুকেই আমার বাস। আপনাদের জাঁহাপনার অত বড় দুনিয়ায় বাস করার ক্ষমতা কোথায় আমার?

—তা হলে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে দেখছি।

—তাই করুন। আপনাদের এত ক্ষমতা, তা না দেখিয়ে, এমনি এমনিই নিয়ে যাবেন কেন? কিন্তু তার আগে আমি একটু স্নান করে আসি।

—কেন?

—সাফসুরত না হয়ে জাঁহাপনার দরবারে যাওয়া যায়?

আমি গঙ্গামাই-এর বুকে আশ্রয় নিলাম, পেয়াদারা সব ঘাটে বসে রইল। আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে, জলে ডুবে থাকতে থাকতে বিকেল হয়ে এল। ঘাট থেকে পেয়াদারা মাঝে মাঝেই চেঁচাচ্ছে, কত যে গালাগালি দিচ্ছে আমাকে, কিন্তু সে ব্যাটারা জলে এসেও নামবে না। জাঁহাপনার দেওয়া উর্দি ভিজে যাবে যে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হল দরবারে।

আমি চুপ করে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সম্রাট তাঁর পেয়াদাদের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে বললেন, 'সকালে তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম, সন্ধেয় এসে হাজির হলে? স্নান করতে তোমার এতক্ষণ লাগে?'

—না, জাঁহাপনা। আমি তো কতদিন স্নানই করি না।

—তা হলে?

—আজ স্নান করতে করতে যা দেখলাম, আমি জল থেকে উঠতেই পারছিলাম না।

—কী দেখলে? হাজার হাজার কুমির তোমার দিকে ধেয়ে আসছে?

সম্রাটের কথায় দরবার জুড়ে হাসির রোল উঠল।

—সে বড় মজার দৃশ্য জাঁহাপনা। ছুঁচের মাথার ফুটো দেখেছেন তো?

—ছুঁচ? সে আবার কী?

—গোস্তাকি মাফ করবেন। জাঁহাপনারা কে আর কবে ছুঁচ দেখেছেন। কী বোঝাই আপনাকে—

সিকন্দর লোদি চিৎকার করে উঠলেন, 'কে আছিস, ছুঁচ নিয়ে আয়। এমন কী জিনিস, তা আমি দেখিনি!'

আমি হেসে ফেললাম। সম্রাট আরও জোরে গর্জে উঠলেন, 'হাসছ কেন কাফের? হাসির কী হল?'

বুঝলেন মির্জা, হাসি দেখেও যারা খেপে ওঠে, তাদের আর দুর্দশার অন্ত থাকে না। জাঁহাপনার দিকে তাকিয়ে আমি একটা কবিতা নিজেকেই শোনাচ্ছিলাম;

এই নগরে কোটাল হবে কে?
মাংস এত ছড়িয়ে আছে—
চৌকিদারি শকুন করে যে।
ইঁদুর তরী, বিড়াল তাকে বায়,
দাদুরী শুয়ে, সর্প পাহারায়।
বলদ বিয়োয়, বন্ধ্যা হল গাই,
তিন সন্ধে বাছুর দোয়ায় তাই।
শেয়াল রোজই সিংহের সাথে জোঝে।
কবীর-কথা বিরল কেউ তা বোঝে।

দরবারে এবার ছুঁচ এল। সম্রাট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁচটি দেখলেন, ছুঁচের মাথার ফুটোয় চোখ রাখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছুঁচের কথা কী হচ্ছিল?'

—ছুঁচের ফুটো দিয়ে কিছু দেখলেন জাঁহাপনা?

—না। এই ফুটো দিয়ে কিছু দেখা যায়?

—আমি কী দেখছিলাম, এবার তাহলে বলি। ছুঁচের মাথার ফুটোর চেয়েও সরু একটা গলি দিয়ে একসারি উট চলে যাচ্ছে।

—বখোয়াস বন্ধ করো। মিথ্যেবাদী কোথাকার!

—মিথ্যে কথা বলছি না হুজুর। জন্নত আর এই দুনিয়া কত দূরে আপনি তো জানেন জাঁহাপনা। সূর্য আর চাঁদের মধ্যে যে দূরত্ব সেখানে কোটি কোটি হাতি, উট ধরে যেতে পারে। চোখের তারার একটা বিন্দুর ভেতর দিয়ে আমরা তাদের দেখি। জাঁহাপনা আপনি তো জানেন, চোখের তারার সেই বিন্দু ছুঁচের মাথার ফুটোর চেয়েও ছোট।

সম্রাট অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেন। মির্জাসাব, আর সবকিছু আপনি লুকোতে পারেন, কিন্তু চোখের ভাষা লুকোতে পারবেন না। আনন্দে, বিষাদে আমাদের মন চোখেই এসে ঘর খুঁজে নেবে। সে এক আশ্চর্য সরোবর। তার দিকে তাকালে একেবারে গভীর পর্যন্ত আমি দেখতে পাই। আপনাকে আমি রোজ দেখি মির্জাসাব, আর ভাবি, রামরহিমের পা ছুঁয়ে থেকেও কত না খিদমতগারি করতে হচ্ছে আপনাকে, কোথাও আপনি স্থির হয়ে বসতে পারছেন না।

কবিরসাবের কথা শুনে আমার হাসি পেল, বললুম, 'সবচেয়ে বড় কাফের যদি দুনিয়ায় কেউ থাকে, সে আমি। রামরহিমের পা ছোঁয়ার যোগ্যতা কোথায় আমার?'

—আপনি শব্দের সাধক মির্জাসাব। শব্দ থেকে তাঁর জন্ম। তিনি কি আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন?

—কিন্তু আপনার মতো সাধনা তো আমার জীবনে নেই।

—সাধনা কি এত সহজ, মিঞা? সে সাধ্য কী আমার! সাঁই দশ মাস ধরে যে চাদর বোনেন, আমি তার একটু যত্ন করেছি মাত্র, যাতে ময়লা না লাগে। যাঁর চাদর তাঁর হাতেই তো একদিন তুলে দিতে হবে। ময়লা চাদর কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়, বলুন?

—আমি তো নোংরা চাদরই তাঁর হাতে তুলে দেব কবিরজি।

—তা কী করে হবে? সে তো আপনি পারবেনই না, মির্জাসাব। সময় হলে তিনি আপনাকে দিয়েই চাদরখানা পরিষ্কার করিয়ে নেবেন। তা হলে কবীরদাসের গান আপনাকে শোনাই—

সাহিব হৈ রংগবেজ<br>
চুনর মেরী রংগ ডারী।<br>
স্যাহী রংগ ছুড়ায়কেরো<br>
দিয়ো মজীঠা রংগ।<br>
ধোয়েসে ছুটে নহীঁ রে<br>
দিন দিন হোত সুরংগ।।

ভাবকে কুণ্ড নেহকে জলমেঁ
প্রেম দংগ দই বোর।
দুখ দই মৈল ছুটায় দেরে
খুব রংগী ঝকঝোর।।
সাহিবনে চুনরী রংগীরে
পীতম চতুর সুজান।
সব কুছ উনপর বার দূঁ রে
তন মন ধন ঔর প্রাণ
কহৈঁ কবীর রংগরেজ পিয়া রে
মুঝপর হুয় দয়াল।
শীতল চুনরী ওঢ়িকে বে
ভঙ্গ হৌঁ মগন নিগাল।।

মিঞা, ভবের কুণ্ডে প্রীতির জলে তিনিই তো প্রেম রং-এ আপনার চাদরটা রাঙিয়ে দেবেন। তিনি দিয়েছেন, তিনি নেবেন, রূপ-রস-রং-এ রাঙিয়ে, তবেই না নেবেন। আপনার সাধ্য কী যে তাঁর হাতে ময়লা চাদর তুলে দেবেন! এবার ঘরে ফিরে যান মিঞা, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, আপনাকে তো আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।

—আপনি যাবেন না?

—গঙ্গামাইকে ভৈরবী শুনিয়ে তবে না আমি ঘরে যেতে পারব।

—আমি আর কোথাও যাব না কবিরসাব। কাশীতেই থেকে যাব। এত দৌড়ঝাঁপ আমার ভাল লাগে না।

কবিরসাব মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন।—না, না মিঞা, এ ঠিক কথা নয়, জীবন আপনার সামনে যে-পথ খুলে দিয়েছে, সেই পথটুকু আপনাকে পেরোতেই হবে। সে-পথে যত কষ্ট, যত বঞ্চনা থাক, সাহিবের লিখে দেওয়া পথটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। আপনার পথে আপনি ছাড়া কে যাবে, বলুন?

—কলকাতায় গিয়ে আমি কি কিছু পাব?

—যা চাইছেন, তা হয়তো পাবেন না। আরও অনেক কিছু পাবেন, যা শাহজাহানাবাদ আপনাকে দিতে পারেনি, কাশী দিতে পারবে না। শুনুন মিঞা, মরার আগে আমি কাশী ছেড়ে মগহরে চলে গিয়েছিলাম। মগহরে যাব শুনে সবাই বলে, কাশীর মতো পবিত্র জায়গা ছেড়ে মগহর? ওখানে মরলে তো পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাতে হবে। তা-ই হবে। সাহিব যদি চান, আমি আবার গাধা হয়ে জন্মাব, তবে তাই হোক। কিন্তু তিনিই তো ঠিক করে দিয়েছেন, মগহরে গিয়েই মরতে হবে আমাকে। মগহরে পৌঁছনোর আগে অমী নদীর তীরে কসরবাল গ্রামে কিছুদিন ছিলাম। বিজলী

খাঁ তখন মগহর শাসন করেন। তিনি আমাদের জন্য ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেছিলেন। মগহরে বারো বছর ধরে খরা চলছিল, কোথাও এককোঁটা জল পাওয়া যায় না। আমাদের ভাণ্ডারায় গোরখনাথ নামে এক সাধুজি ছিলেন। সবাই তাঁকে গিয়ে ধরল। সাধুজি মাটিতে পা ঠুকে জলস্রোত বইয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও জলের অভাব মিটল না। তখন সবাই আমাকে এসে ধরল। আমি যত বোঝাই, গোরখনাথজির মতো সাধু আমি নই, আমার কোনও ক্ষমতাই নেই, তারা কিছুতেই কথা শোনে না। মিঞা, সত্যি সত্যি বলছি, মাটিতে পা ঠুকে জলস্রোত বইয়ে দেব, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বললাম, সবাই মিলে রামনাম করো, প্রভুই যা করার করবেন। ভাণ্ডারার সবাই রামনাম গাইতে শুরু করল। বিশ্বাস করুন মিঞা, সত্যি সত্যিই রামনামের গুণে বর্ষা নামল। অমী নদী জলে ফুলেফেঁপে উঠল। রাম নামে কী হতে পারে, তা তো আমি মগহরে যাওয়ার পথেই দেখতে পেলাম। দয়াল আমাকে তো এজন্যই কাশী থেকে মগহর নিয়ে এসেছিলেন। এরপরে যদি আমি গাধা হয়ে জন্মাই, তাতে কী এসে যায় বলুন?

কবিরসাব উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরলেন।—চলুন, মিঞা, আপনাকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

—আমি একা চলে যেতে পারব।

তিনি হাসলেন।—আপনি এখনও একা হাঁটতে শেখেননি, মিঞা। আরও অপমান সহ্য করুন। তারপর তো পারবেন।

—আরও কত অপমান সহ্য করতে হবে আমাকে?

—আপনার জীবনে এখনও অপমান আসেনি, মিঞা। তবে এবার আসবে। রামরহিমের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন অত অপমান সহ্য করতে পারেন। আপনার কোনও ঘর নেই, আমি জানি। কবিরদাসের প্রার্থনা মঞ্জুর হোক, আপনি শব্দের ভেতরে নিজের ঘর খুঁজে পাবেন। শব্দই আপনার শিকড়, মিঞা।

বলতে বলতে তিনি আমার কপালে চুম্বন করেছিলেন। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'যাওয়ার আগে একটা কিস্‌সা শুনে যান মিঞা। খুশ-দিল নিয়ে যেতে পারবেন। চলুন, যেতে যেতে বলি।'

কাশীর গলির পর গলি পেরিয়ে যেতে যেতে কবিরসাব তাঁর কিস্‌সা বুনতে লাগলেন, 'বহুদিন মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে এক দরবেশ এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। তবে সেই জায়গাটিও বড় রুক্ষ, সবুজ প্রায় চোখেই পড়ে না বলতে গেলে। পশুপালন করেই জীবন কাটাতে হয় ওখানকার মানুষদের। রাস্তায় দরবেশ একটি লোককে জিজ্ঞেস করলেন, একরাত থাকার মতো জায়গা কোথাও পাওয়া যাবে কি না।

লোকটা মাথা চুলকে বলল, 'আমাদের গ্রামে তো এখন কোনও থাকার জায়গা

নেই। কেই বা আসে এখানে। তবে শাকিরসাবের বাড়িতে যেতে পারেন। উনি খুশি হয়েই লোকজনকে আশ্রয় দেন।'

—সে বুঝি খুব ভাল মানুষ?

—হ্যাঁ, এমন মানুষ দ্বিতীয়টি আর এ-তল্লাটে নেই। পয়সাকড়িও প্রচুর। হাদ্দাদ তার ধারেকাছেও আসবে না।

—হাদ্দাদ কে?

—পাশের গ্রামে থাকে। চলুন, শাকিরসাবের বাড়ির পথটা আপনাকে দেখিয়ে দিই।

শাকির আর তার বউ-মেয়েরা দরবেশকে খুবই আপ্যায়ন করল। একরাতের বদলে বেশ কয়েকদিন দরবেশ থেকে গেলেন। যাওয়ার সময় শাকির পথের জন্য প্রচুর খাবার, জল দিয়ে দিল। দরবেশ তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আল্লা করুন, তোমার আরও সমৃদ্ধি হোক।'

শাকির হেসে বলল, 'দরবেশ বাবা, চোখে যা দেখছেন, তাতে ভুলবেন না। এ-ও একদিন চলে যাবে।'

দরবেশ শাকিরের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কী মানে এই কথার? তারপর নিজেকেই বললেন, আমার পথ তো প্রশ্ন করার নয়। নীরবে শুনে যেতে হবে। সব কথার মানে একদিন নিজে থেকেই ধরা দেবে। সুফিসাধনায় এই শিক্ষাই তো তিনি পেয়েছেন।

দেশে-দেশে ঘুরে বছর পাঁচেক কেটে গেল। দরবেশ আবার সেই গ্রামে ফিরে এলেন। শাকিরের খোঁজ জানতে চাইলেন। জানা গেল, শাকির এখন পাশের গ্রামে থাকে। হাদ্দাদের বাড়িতে কাজ করে। দরবেশ সেই গ্রামে গিয়ে শাকিরের সঙ্গে দেখা করলেন। শাকিরকে আগের চেয়ে অনেক বুড়ো মনে হল, জামাকাপড়ও ছেঁড়াফাটা। শাকির আগের মতোই দরবেশকে আপ্যায়ন করল।

—এই অবস্থা কী করে হল তোমার? দরবেশ জিগ্যেস করলেন।

—তিন বছর আগে বিরাট বন্যা হল। আমার সব জন্তু জানোয়ার ভেসে গেল, বাড়ি ডুবে গেল। তখন হাদ্দাদ ভাইয়ের দরজাতে এসে দাঁড়াতে হল।

দরবেশ বেশ কয়েকদিন শাকিরের ঘরে থাকলেন। যাওয়ার সময় শাকির আগের মতোই খাবারদাবার, জল দিয়ে দিল। দরবেশ শাকিরকে বললেন, 'তোমার এই অবস্থা দেখে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবে এও জানি, খোদা বিনা কারণে কিছু করেন না।'

শাকির হেসে বলল, 'এ-ও একদিন চলে যাবে।'

তার মানে? শাকির এই অবস্থা থেকে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে? কী করে? প্রশ্নগুলো মনে এলেও দরবেশ তাদের সরিয়ে দিলেন। অর্থ তো একদিন নিজে থেকেই ধরা দেবে।

আরও কয়েক বছর ঘুরেফিরে দরবেশ একই গ্রামে ফিরে এলেন। দেখলেন, শাকির আবার বড়লোক হয়ে গেছে। হাদ্দাদের কোনও সন্তান ছিল না। মারা যাওয়ার সময় সব সম্পত্তি শাকিরকে দিয়ে গেছে সে। এবারও কয়েকদিন শাকিরের কাছে থাকলেন তিনি। যাওয়ার সময় শাকির আবারও বলল, 'এ-ও একদিন চলে যাবে।'

দরবেশ এবার মক্কা ঘুরে এসে শাকিরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। শাকির মারা গেছে। দরবেশ শাকিরের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলেন। কবরের গায়ে লেখা আছে, 'এ-ও একদিন চলে যাবে।' দরবেশ ভাবলেন, গরিব বড়লোক হয়, বড়লোকও গরিব হয়, কিন্তু কবর কী করে বদলাবে? এরপর থেকে প্রতি বছর দরবেশ শাকিরের কবর দেখতে আসতেন, কবরের সামনে বসে প্রার্থনা করতেন। একবার এসে দেখলেন, বন্যায় সব ভেসে গেছে। শাকিরের কবরও ধুয়েমুছে সাফ। খণ্ডহর হয়ে যাওয়া কবরখানায় বসে দরবেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এ-ও একদিন চলে যাবে।'

দরবেশ যখন আর চলাফেরা করতে পারেন না, তখন এক জায়গায় থিতু হলেন। বহু মানুষ তাঁর কাছে আসত উপদেশ শুনতে। তাঁর মতো জ্ঞানী নেই, খবরটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবাবের উজির-এ-আজমের কানে গিয়েও পৌঁছল কথাটা।

সে এক মজার ব্যাপার, মিঞা। নবাবের ইচ্ছে হয়েছিল একটা আংটি পরবেন। কিন্তু সেই আংটিতে এমন কিছু লেখা থাকবে, যাতে নবাব যখন বিষণ্ণ হবেন, আংটির লেখাটি পড়ে খুশ হবেন আর যখন সুখী থাকবেন, তখন আংটির লেখা পড়ে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন। কত মণিকার এল, কত জ্ঞানী-গুণীর সমাগম হল, কিন্তু নবাব কারও পরামর্শেই সন্তুষ্ট হলেন না। তখন উজির-এ-আজম দরবেশকে সব জানিয়ে খৎ পাঠালেন, আপনার সাহায্য ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আপনি একবার আসুন। দরবেশের তখন চলাফেরার ক্ষমতা কোথায়? তিনিও চিঠিতে তাঁর পরামর্শ জানিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পরে নবাবকে নতুন আংটি উপহার দেওয়া হল। বেশ কয়েকদিন ধরে নবাবের মনখারাপ ছিল, আংটি পরে হতাশভাবে তার দিকে তাকালেন। আংটির গায়ের লেখাটি পড়েই, তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি। আংটির গায়ে কী লেখা ছিল জানেন মির্জা? 'এ-ও একদিন চলে যাবে।'

তারপরেই দেখলুম, কাশীর রাস্তায় আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। কবিরসাব কোথাও নেই।
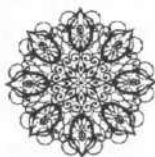
পিন্‌হাঁ থা দাম সখ্‌ৎ করীব আশিয়াঁ-কে,
উড়নে নহ্ পায়ে হে কেহ্ গিরফ্‌তার হম হুয়ে।।
(ফাঁদ পাতা ছিল বাসার খুব কাছে,
উড়তে-না-উড়তেই ধরা পড়ে গেলাম আমি।।)

অনেকক্ষণ ধরে আপনারা উসখুস করছেন, বুঝতে পারছি, ভাইজানেরা। মির্জাসাব বড় ভারী কিস্‌সা শোনালেন, কিন্তু আমরা হচ্ছি রাস্তার কুত্তা, পেটে ঘি সইবে কেন? দেখুন, দেখুন মির্জাসাব, আমাদের লোম খসতে শুরু করেছে। চিন্তা নেই ভাইজানেরা, এই মান্টো আছে কী করতে, আপনাদের জন্য এর মধ্যেই ডাস্টবিন থেকে হাড়গোড় কুড়িয়ে এনেছি, বেশ মজা করে চিবোতে পারবেন।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই মির্জাসাব, আমিও শালা কী করে ফাঁদে পড়ে গেলাম! বম্বেতে এসে মস্তিতেই দিনগুলো কাটছিল; খোলিতে থাকলেও একা-একা থাকার মজাই আলাদা, ঝাড়া হাত-পা, কারুর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার নেই, যেমন খুশি বাঁচো, সেই যেমন হাফিজসাব বলেছিলেন,

ইশক্ বাযী ব জবানী
ব শরাবে লালা ফাম
মজলিসে ইন্‌স ব হরীফে
হমদব ব শুর্বে মুদাম।

মানেটা বুঝলেন তো ভাইজানেরা? যৌবন দাও, প্রেম দাও, লাল সুরা দাও, আসর ভরে উঠুক সাঙ্গোপাঙ্গে, যেন প্রিয় বন্ধু পাই, খাবারদাবারটুকু যেন মিলে যায় খোদা। একা মানুষ আর কী চাইতে পারে? এভাবে বেঁচে থাকার মতো স্বাধীনতা আর আছে? কিন্তু শালা মান্টোও ফাঁদে পড়ে গেল। ভাইজানেরা, সেই কিস্‌সাটাই এবার আপনাদের বলছি।

বিবিজান তো অমৃতসর থেকে বম্বেতে এসে পৌঁছল। আমার দিদি ইকবাল বেগমের বাড়িতেই তার থাকার ব্যবস্থা হল। খোলিতে আমিই দুমড়ে-মুচড়ে জীবন কাটাই, সেখানে তো আর আম্মিজানকে নিয়ে আসা যায় না। বিবিজানের সঙ্গে আমি রাস্তায় দেখা করতাম, কোনও চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করতাম। দিদির বাড়িতে তো আমার মতো কাফেরের ঢোকার অনুমতি নেই। ইকবাল বেগমের

বাদশা তো আমাকে সহ্য করতে পারত না। বিবিজান রোজই বলে, বেটা তুমি কোথায় থাকো, আমাকে নিয়ে চলো। আমি তো তোমার জন্যই এসেছি। কিন্তু ওই খোলিতে তো বিবিজানকে নিয়ে যাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কী, মানুষ কত নোংরা ভাবে বেঁচে থাকে, তা আমি বিবিজানকে দেখাতে চাইনি। তার সুন্দর মনটাকে নষ্ট করে দেওয়াটা কি ঠিক, বলুন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আটকাতে পারিনি। বিবিজান একদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে খোলিতে এলোই। অন্ধকার খুপরিটার চারদিকে চোখ চালিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর তার দুই চোখ থেকে জলের ধারা নামল। বিবিজানকে এমনভাবে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। আমার চোখ তো জ্বালা করছিল। তবু হেসে বললাম, 'একজন মানুষের এর চেয়ে বড় ঘরের কী দরকার বলো?'

—মান্টো—

বিবিজান আমার হাত চেপে ধরে নোংরা বিছানার ওপর বসে পড়ল। আমি তার পাশে বসে মাথায়, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। তবু বিবিজানের কান্না থামে না আর মাঝে মাঝেই বলে ওঠে, 'খোদা, ইয়ে মুঝে কেয়া দিখায়া!' অনেক পরে কান্না থামল, কোনও কথা না-বলে বিবিজান আমার নোংরা জামাকাপড়গুলো এখান-ওখান থেকে জড়ো করতে লাগল।

—আরে, এসব কী করছ তুমি বিবিজান?

—এখনই আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায় যাব?

—ইকবালের বাড়িতে।

—বিবিজান, তুমি তো জানো, ও-বাড়িতে আমার জন্য নফ্‌রত ছাড়া আর কিছুই নেই।

—তাই বলে এই জাহান্নমে—

—আমি ভাল আছি, বিবিজান। খোদা কসম, খুব ভাল আছি। ঘৃণার দাওয়াত খাওয়ার চেয়ে একা একা এভাবে থাকা অনেক আনন্দের।

বিবিজান চুপ করে বসে রইল। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। এজন্যই এখানে তোমাকে আনতে চাইনি। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, বিবিজান।' অনেকক্ষণ নিজেকে সামলে রাখার পর আমি আর পারিনি, মির্জাসাব, কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। আমি খোলিতে থাকি বলে নয়, বিবিজানকে এই নরক-জীবন দেখতে হল বলে।

দীর্ঘ বছর পর, যেন আমি ছোট্টটি, বিবিজান আমাকে জড়িয়ে ধরে কত যে চুমু খেল আর কোরানের একটাই রুকু বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল। কী যে বলছিল, আমি বুঝতেও পারছিলাম না। কোরান তো কখনও পড়িনি। মরে যাওয়ার আগের যে-রাতে আমি রক্তবমি করছিলাম, তখন মাঝে মাঝে যেন বিবিজানের ওই বিড়বিড়ানি শুনতে

পাচ্ছিলাম, সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, কথাগুলো যদি বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারলেই বা কী হত? তখন তো শুধু অন্তিম অপেক্ষা।

রাস্তায় যেতে যেতে বিবিজান বলল, 'তুমি আর একটু বেশি রোজগার করতে পারো না?'

—কেন?

—তা হলে তো এই কিচরের মধ্যে—

—আমি ভালই আছি, বিবিজান। বেশি টাকা দিয়ে কী করব বল তো? যা রোজগার করি, তাতে আমার বেশ চলে যায়।

—না, চলে না, আমি জানি। লেখাপড়া বেশি দূর করলে না, বেশি রোজগারই বা করবে কী করে?

বিবিজানের ওপর আমি কখনও রাগ করিনি। কিন্তু তার এই কথাটা শুনে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো বললাম, যা রোজগার করি, তাতে আমার চলে যায়। লেখাপড়া না শিখেও অনেক টাকা রোজগার করা যায়।'

—তুমি চেষ্টা করো না কেন?

এবার আমার মজা করার ইচ্ছে হল। আর এই মজাই হল আমার কাল। আমি বলে ফেললাম, 'কার জন্য আরও বেশি টাকা কামাব বলো তো? বিবি থাকলে দেখতে, আমিও কত কামাতে পারি।'

—শোভানাল্লা। নিকে করতে চাও?

—হ্যাঁ। না করার কী আছে?

এসব হচ্ছে কথার পিঠে কথা। কিন্তু কথাটা বলে কী যে বেওকুফি করে ফেললাম, তা বুঝতেও পারিনি। বিবিজান আমাকে পরের সপ্তাহে মাহিমে যেতে বলল। ইকবালরা মাহিমেই থাকত। মির্জাসাব, নিজেকে ধরার ফাঁদ আমি নিজেই পাতলাম। কিন্তু তখনও তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম পরের রবিবার মাহিমে গিয়ে।

ইকবালের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। বিবিজান চারতলার জানলা দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে নেমে এল।

—আসতে বলেছ কেন?

—আমার সঙ্গে চলো, বেটা।

—কোথায়?

—আরে সামনেই। চলো না—

—ব্যাপার কী বল তো?

—তোমার বিবি ঠিক করেছি।

—মানে?

বিবিজান হেসে বলল, 'শফিয়া। বড়ি আচ্ছি বেটি। তোমাকে ঠিক সামলে রাখতে পারবে।'

—আমি নিকে করব, কে বলেছে?

—কেন? সেদিন তুমিই তো বললে, বেটা। শফিয়াকে যেদিন দেখি, আমার খুব মনে ধরেছিল। ফিরে এসেই ওর চাচার সঙ্গে কথা বললাম। আমরা কাশ্মীরি, ওরাও কাশ্মীরি, এককথায় রাজি।

—বিবিজান—

—তকলিফ কেয়া হ্যায়?

—আমার রোজগার তো তুমি জানো। এভাবে নিকে করা যায়?

—বিবি এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো-চলো—শফিয়াকে দেখলে তোমারও পছন্দ হবে।

বিবিজান আমার হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু বিবিজানের শক্ত মুঠোয় আমার হাত।

জলহস্তীর মতো একটা লোকের সামনে বসিয়ে বিবিজান ভেতরে চলে গেল। তাঁর নাম মালিক হাসান, শফিয়ার চাচা, চাকরি করতেন গোয়েন্দা বিভাগে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমিও বলে যেতে লাগলাম এবং সুযোগ বুঝে জানিয়ে দিলাম যে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমার পানাভ্যাস আছে। আমি তো ফাঁদ কেটে বের হতে চাইছি। এই নিকে কখনও হয় নাকি? এরা রইস আদমি আর আমি তো বম্বেতে রাস্তার কুকুর।

সব শুনে হাসানসাহেব পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, 'বহৎ খুব, বহৎ খুব।' তারপর কাকে যেন ডেকে বললেন, 'বহিনজিকে বোলাও।' একটু পরেই বিবিজান এসে হাজির। হাসানসাব বিবিজানের হাত চেপে ধরলেন, 'ক্যায়সি বেটা বানায়া বহিনজি।'

বিবিজান আমার দিকে তাকায়। আমি তখন মনে মনে ভাবছি, এবার আমাদের দু'জনকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। এর চেয়ে খুশি আর কী হতে পারে?

—বাত খতম্‌।

—মতলব? বিবিজানের ফ্যাসফেসে গলা শুনতে পাই।

—নিকাহ পাক্কা। প্রথম কথা, কাশ্মীরি পরিবার ছাড়া আমি শফিয়ার বিয়ে দেব না। আর আপনার বেটা। একদম সাফ দিল্‌। হর রোজ পিতে হ্যায়, এ ভি কবুল কিয়া। হামকো সাচ্চা আদমি চাহিয়ে।

মির্জাসাব, এ কেমন বদনসিব আমার বলুন, মালিক হাসানের মতো গোয়েন্দা অফিসার আমাকে সাচ্চা আদমি মনে করলেন? হিরামান্ডির রাতগুলোর কথা না বলে কী যে ভুল করেছিলাম! এরপর যে-কাণ্ডটা ঘটল, তাতে আমিই নিজেকে ফাঁসিয়ে দিলাম। হাসানসাব বললেন, 'বহিনজি, বিটিয়া কো লে আইয়ে।'

শফিয়া এল। ওড়নায় মুখ ঢাকা। অস্পষ্ট, ছায়া-ছায়া, দেখলাম তাকে। তাকে ছুঁতে ইচ্ছে করল, সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, আমি একা থাকবার মতো মানুষ নই, আমার একাকিত্বের জন্যও পাশে কাউকে দরকার। সারা জীবন ধরে আমার ওই খামখেয়ালির মূল্য দিতে হয়েছে শফিয়া বেগমকেই। যখন আমরা দুয়েকদিন ভাল থাকতাম, আমি নিজেকে বলতাম, কী হবে মান্টো এইসব লেখা লিখে? তুমি অন্তত একজন মানুষকে সুখী করো। কাগজ-কলম জ্বালিয়ে দাও। তুমি তার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকো, সে তোমার চুলে অদৃশ্য সব তসবির এঁকে দিক, তুমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ো।

আমার নিকাহ্-র দিন ঠিক হয়ে গেল। বিশ্বাসই হতে চায় না আমার। এসব তো স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। পকেটে ফুটো পয়সা নেই, আমি যাব নিকে করতে? বিবিজানকে কত বোঝালাম, সে কিছুতেই আমার কথা শুনবে না, সে শুধু বলে, 'বেটা সব ঠিক হয়ে যাবে। বিবি তোমার নসিব বদলে দেবে। খোদার ইচ্ছে না থাকলে তো হাসানভাই রাজি হতেন না।'

আমি আর কী করি, নসিবের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম। নৌকো ভাসালাম, দরিয়া, এবার তুমি যেখানে পারো নিয়ে চলো। তখন কিছুদিন ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি-তে গল্পলেখক হিসাবে পার্ট-টাইম কাজ করেছিলাম। তা সে কোম্পানিরও তখন লাটে ওঠার দশা। নইলে কিছু টাকা আগাম পাওয়া যেত। হঠাৎ মনে পড়ল, কোম্পানির কাছে আমিই তো শালা দেড় হাজার টাকা পাই। শেঠ আরদেশারকে গিয়ে ধরলাম টাকার জন্য। শেঠের তখন অবস্থা খুবই খারাপ। টাকা দিতে পারলেন না, তবে আমার হবু বিবির জন্য কিছু গয়নাগাঁটি, শাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাবুন ভাইজানরা, আমার পকেটে একটাও পয়সা নেই, অথচ বিবির শাড়ি-গয়না জোগাড় হয়ে গেল। এরই নাম মান্টো-ম্যাজিক। তো আমি একা-একাই নিকাহ্-র সব জোগাড়যন্তর করে ফেললাম। এভাবেই একটু একটু করে শফিয়াকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত শালা মান্টোর নিকে হয়ে গেল। শফিয়া ওর চাচার কাছেই রয়ে গেল, আমি ফিরে এলাম খোলিতে। হ্যাঁ ভাইজানেরা, ওই নিকাহ্‌র দিনেই। ছারপোকা ভরা বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম, শালা সত্যি সত্যিই নিকে হয়েছে তো আমার? নাকি খোয়াব দেখছিলাম? আমার পকেটে তখনও শুকনো খেজুর, এলাচ। তার মানে আজই তোমার নিকে হয়েছে মান্টো। তবু বিশ্বাস হচ্ছিল না। পাগল না হলে কেউ তার মেয়ের সঙ্গে মান্টোর বিয়ে দেয়?

বছরখানেক কেটে গেল। শফিয়া ওর চাচার বাড়িতে, আমি আমার খোলিতে। হাসানসাহেব অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন, আমরা যাতে একসঙ্গে থাকি। কিন্তু বিবিকে তো ওই খোলিতে নিয়ে তোলা যায় না। শেষ পর্যন্ত আমিও আর পারলাম না। কে পারে বলুন, ভাইজানেরা? কচি বউ তোমার থাকবে এক জায়গায়, আর তুমি নোংরা বিছানায় রোজ তার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়বে? মাসে ৩৫ টাকা ভাড়ায়

একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম। এও মান্টো-ম্যাজিক। মাইনে আমার ৪০ টাকা, আর ফ্ল্যাটের ভাড়াই ৩৫ টাকা। সারা মাসের সংসার খরচের জন্য ৫ টাকা।

কিন্তু প্রোডিউসার নানুভাই দেশাইয়ের কাছে তখন আমি আঠেরশো টাকা পেতাম। তাঁর সিনেমার জন্য কয়েকটা গল্প লিখে দিয়েছিলাম। বিবিকে ঘরে নিয়ে আসার দিন তো দাওয়াতেরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানুভাইকে গিয়ে ধরলাম টাকার জন্য। শালা একবার হাসে তো একবার কাঁদে, আর বলে, 'দেখুন মান্টোসাব, নিজের চোখে দেখুন, আমার পকেট একদম ফুটা। আমি কোথা থেকে টাকা দেব আপনাকে?'

শেঠকে সব খুলে বললাম, তবু সে কিছুতেই বোঝে না। শেষে হাতাহাতি হওয়ার মতো অবস্থা। নানুভাই তার লোক ডেকে আমাকে অফিস থেকে বার করে দিল। আমিও ঠিক করলাম টাকা না পেলে অফিসের দরজা থেকে নড়ব না। দরকার হলে অনশন শুরু করব। এরা গল্পলেখককে কী ভাবে? গল্প নিয়ে কৃতার্থ করে দিয়েছি? গল্পলেখক পেটে কিল মেরে বসে থাকবে, তাই না? শালা, সবাইকে সব কিছুর জন্য তোমরা টাকা দিতে পারো, আর গল্প নেবে মুফতে? লেখা কি লাওয়ারিশ নাকি? খবরের কাগজেও আমি এক জিনিস দেখেছি। গল্পলেখকের জন্য সবচেয়ে কম টাকা বরাদ্দ। কেন ভাই? খোয়াবের কোনও দাম নেই নাকি? দুনিয়াটাকে তোমরা টাকা দিয়ে বিচার করো, আর খোয়াবটাই ফেলনা?

নানুভাই-এর সঙ্গে আমার লড়াইয়ের খবরটা বাবুরাও প্যাটেলের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। শুনেছি, উটের শরীরের কোনও অঙ্গই নাকি সোজা নয়। তা হলে উটের পরেই বাবুরাওয়ের নাম আসবে। কথায় কথায় 'শালা-বাঞ্চোত' বলে গালাগালি দিতেন। চোখ দু'টো ছোটো ছোটো, মোটা নাক, ঠোঁট, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত, তবে কপাল বেশ চওড়া ছিল। ফিল্ম ইন্ডিয়া-র সম্পাদক বাবুরাও 'কারবা' নামেও একটা উর্দু পত্রিকা চালাতেন। সেখানে কয়েকমাস আমি চাকরি করেছিলাম। শুনেছি, যৌবনেই বাবার সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাবার কথা উঠলেই বলতেন, 'ও শালা একটা আস্ত হারামি।' শুনে হাসি পেত। বুড়ো প্যাটেল যদি সত্যিই হারামি হয়ে থাকেন, তা হলে বাবুরাও হারামিপনায় তার চেয়ে কয়েক পা এগিয়েই ছিলেন। আর মেয়ে দেখলেই হয়, অমনি তার পিছনে পড়ে যাবেন। রিটা নামে ওঁর এক সেক্রেটারি ছিল জানেন, মির্জাসাব। সবার সামনেই রিটার পেছনে চাপড় মেরে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতেন। তো বাবুরাওজি নানুভাইকে ফোন করে একচোট ঝাড়লেন, শেষে নিজেই নানুভাইয়ের অফিসে এলেন। অনেক দর কষাকষি করে আটশো টাকায় রফা হল। আমাকে আর দেখে কে? কড়কড়ে টাকা হাতে পেয়ে আমি তো একেবারে বাদশা।

শফিয়ার জন্য শাড়ি-গয়নাগাটি আর নিজের জন্য এক বোতল জনি ওয়াকার কেনার পর দেখি, পকেটের অবস্থা আগের মতোই ফাঁকা। নতুন ভাড়া নেওয়া ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হল, আরে ঘর তো আমার পকেটের চেয়েও ফাঁকা। আসবাবপত্র বলে

তো কিছু ছিল না। তবে, আমি দেখেছি, ভাইজানেরা, মানুষ সবসময়ই মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। আমার পাশেই থাকত একটা পরিবার। তো সেই পরিবারের বাবুটি কিস্তিতে কিছু আসবাব কেনার ব্যবস্থা করে দিল। তাতেও দু'টো ঘর মরুভূমির মতোই মনে হচ্ছিল।

বাড়িতে বিবি আসবে, একটা তো দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে হয়। নাজির লুধিয়ানভিসাব কার্ড ছেপে দিলেন। বেশ জোরদার পার্টি হল। ফিলিমের সব লোকজনেরাই এসেছিল।—কারদার সাব, গুঞ্জলি, বিলিমোরিয়া সাব, বাবুরাওজি, নূর মহম্মদ, পদ্মা দেবী, আরও কত যে। পদ্মা দেবীকে কেউই তেমন চিনত না। কিন্তু বাবুরাওজি-র হাতে পড়ে তার ভোল পাল্টে গেছিল। বাবুরাওজি তাকে একেবারে 'কালার কুইন' বানিয়ে দিলেন। ফিল্ম ইন্ডিয়া-র প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁর ছবি, নিজে হাতে ক্যাপশন লিখে দিতেন বাবুরাওজি। খেলাটা বুঝতে পারছেন তো ভাইজানেরা? ফিলিমের দুনিয়াটাই এমন। ঠিক লোকের বিছানায় যেতে পারলে, তাকে আর পায় কে!

জমজমাট দাওয়াত হয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে, মির্জাসাব, আমি একেবারে আপনারই মতো। এ-ব্যাপারে কোনও ভেজাল বা কঞ্জুষি চলবে না। সব রান্না হয়েছিল একেবারে কাশ্মীরি স্টাইলে। বাবুরাওজি নাচ জুড়ে দিলেন, ওদিকে রফিক গজনবি, নন্দা আর আগা কাশ্মীরি সমানে এ-ওকে খিস্তি করে যাচ্ছে। যাকে বলে নরক গুলজার। সব শেষ হওয়ার পর বিলিমোরিয়া সাবের গাড়িতে চড়ে বিবিজান, আমি, শফিয়া নতুন ঘরে এসে উঠলাম। কী বলব, ভাইজানেরা, পরদিন দেখি, আমার অর্ধেকটা শফিয়ার শওহর হয়ে গেছে। তবে ভালও লেগেছিল খুব। এই অনুভূতির স্বাদই আলাদা।

পরদিন সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে বোতল খুলে বসেছি, শফিয়া এসে আমার হাত চেপে ধরল। সে যে নতুন বিবি, তার কোনও লক্ষণই নেই। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এসব খাবেন না মান্টোসাব।

—কেন?

—আপনার শরীরের ক্ষতি হবে।

—না খেলে আমি লিখতেই পারব না।

—লেখার জন্য শরাব খেতে হয় বুঝি?

—তা নয়—

—তবে ছেড়ে দিন।

—ঠিক হ্যায়। আজকের দিনটা তো খেতে দাও।

—না, আর একদিনও নয়।

—আজ খুব আনন্দের দিন শফিয়া।

—কেন?

—তোমাকে প্রথম কাছে পেয়েছি।

—তা হলে শরাব লাগবে কেন?

—লাগবে, লাগবে। আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম।—না হলে বিছানায় তুমি আসল মান্টোকে পাবে কী করে?

শফিয়া হাসতে-হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। শফিয়া ছিল এইরকমই—সহজ, সোজা, মনের কথা স্পষ্ট বলতে পারত, সোজাভাবে যেমন আপত্তি জানাত, তেমন ভালবাসতেও পারত, কোনও ভণিতা ছিল না। কিন্তু মান্টোর সঙ্গে ওর জীবনটা জড়িয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি, ভাইজানেরা। মান্টো নিজের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলতে খেলতে বড় হয়েছে। খোলা রাস্তার বদলে গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতেই তার ভাল লাগত। শফিয়া অনেক চেষ্টা করেছিল, তবু শরাব থেকে আমাকে সরিয়ে আনতে পারেনি। নেশার জন্য কত মিথ্যে কথা বলেছি, ওর সঙ্গে জোচ্চুরি করেছি। হ্যাঁ, মির্জাসাব, মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিনের জন্য খাওয়া ছেড়ে দিতাম। বেশ ভাল লাগত তখন, মনে হত, নতুন করে জন্ম হয়েছে। কিন্তু তারপর আবার। ওই পথ কেটে আমি আর সারা জীবনে বেরোতেই পারলাম না। অনেক পরে শফিয়া একদিন বলেছিল, 'মান্টোসাব আপনি কাহানি না লিখলে, আমাদের জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে যেত না।' হয়তো তাই।

অপনে খ্বাহিশ-এ মুর্দহ্-কো রোঈয়ে
থী হমকো উস্‌সে স্যাঁকাড়ো উম্মীদবারিয়াঁ।।
(নিজের মৃত বাসনার কান্না কাঁদো,
ওর কাছ থেকে কতশত না আশা ছিল আমার মনে।।)

মুর্শিদাবাদ পেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন সেখানে বসন্ত। মনপ্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল মান্টোভাই, দিল্লিতে তো বাহারকে সেভাবে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু কলকাতা—বাংলা—শুধু সবুজ আর সবুজ, একই সবুজ রংয়ের কত যে লীলা প্রকৃতিতে, তা বাংলায় না গেলে জানতেই পারতুম না। বসন্তে এক আশ্চর্য বাতাস বয় সেখানে, আমার দোস্তরা বলত, সেই হাওয়ায় নাকি প্রেমের নেশা মিশে থাকে।

আমিও টের পেয়েছি। মসলিনের স্পর্শের মতো সেই হাওয়া আপনাকে ছুঁয়ে গেলেই বেচায়েন হয়ে উঠবেন, মনে হবে, অধরা কেউ আপনার জন্য কোথাও অপেক্ষা করে আছে। আর তখন বসন্তের হাওয়ার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হবে। মনে হবে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে যাই। মীরসাবের সেই শেরটা মনে পড়ত :

জ্যয়সে নসীম হর শহর তৈরী করূহুঁ জুস্তজু,
খানহ্ বখানহ্ দর বদর শহর বহ্ শহর কূ বহ্ কূ।।
(যেন আমি সমীরণ, প্রতি প্রত্যূষে তোমাকে খুঁজে বেড়াই
ঘরে ঘরে, দুয়ারে দুয়ারে, অলিতে গলিতে, নগর নগরান্তরে।।)

আমার দোস্ত রাজা শোহনলাল সিমলা বাজারে মির্জা আলি সওদাগরের হাভেলিতে ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভাড়া মাসে দশ টাকা। সঙ্গের ঘোড়াটাকে বেচে দিয়ে যাতায়াতের জন্য একটা পালকি ভাড়া নিলুম। ঠিক করলুম, পঞ্চাশ টাকার বেশি কিছুতেই মাসে খরচ করব না। কী মান্টোভাই, আপনার এই মির্জাকে চিনতে পারছেন? শাহজাহানাবাদ থেকে বেরিয়ে কলকাতায় আসতে আসতেই আমি বুঝতে পারছিলুম, একের পর এক সমঝোতা না করে গেলে, জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়াই অসম্ভব। আর আমাকে তো সমঝোতা করতেই হবে। মাথায় দেনার বোঝা নিয়ে আমি কলকাতায় এসেছি পেনশনের ব্যাপারটার ফয়সালা করতে। কিছু হল না। ভাইজানেরা আমি যে ফকির, সেই ফকির হয়েই ফিরে গেলুম দিল্লিতে। ইংরেজের কাছে বিচার পাব বলে কলকাতায় গিয়েছিলুম, পাথরে মাথা কুটে আমাকে ফিরে যেতে হল। সে-সব কথা বলে আপনাদের মন ভার করতে চাই না। মোট কথা বছরে পাঁচ হাজার টাকা পেনশনই মেনে নিতে হল।

কিন্তু কলকাতা আমাকে যা দিল, তা কী করে ভুলব বলুন, ভাইজানেরা। দুনিয়াতে এমন তরতাজা এক শহর, এ-তো আল্লারই দান। সম্রাটের সিংহাসনে বসার চেয়েও ময়দানের সবুজ ঘাসে বসে থাকা যে কী আনন্দের, আহা গঙ্গা থেকে ভেসে আসা ওই হাওয়া আর কোথায় পাব বলুন! সকালে-বিকেলে গোরা মেয়েরা ঘোড়ায় চেপে ময়দানে ঘুরছে, যেমন তাগড়াই আরবি ঘোড়া, তেমনই গোরাসুন্দরীরা, মনে হত, সবুজ মাঠে যেন এক-একটা ছবি আঁকা হচ্ছে। ঘোড়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় তাদের শরীরের ভঙ্গিমা, যেন একেকটা তির বুকে এসে বেঁধে। তেমন জবরদস্ত লাটসাহেবের বাড়ি, আর চৌরঙ্গি অঞ্চলের বাগানঘেরা বাড়িগুলো দেখে কী যে লোভ হত। সে-সব সাহেবদের বাড়ি। বিশ্বাস করুন মান্টোভাই, পরিবারের দায় না-থাকলে আমি ওই শহরেই থেকে যেতুম। গোরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এমন নির্মল হাওয়া আর জল তো শাহজাহানাবাদে নেই। জন্নত, একেবারে জন্নত।

কলকত্তে কো যে জিকর কিয়া তুনে হমনশীঁ
এক তীর মেরে সিনে মে মারা কে হায় হায়।

উয়ো সব্‌জ জার হায় মর্তরা কে হ্যায় গজব।
উয়ো নাজনীন্ বতান্-এ খুদ আরা, কে হায় হায়।
সবর আজমাঁ উয়ো উন্ কী নিগাহ হ্যাঁয় কে হফ্ নজর
তাকতরুবা উয়ো উন্ কা ইশারা কে হায় হায়।
উয়ো মেওয়ে হায় তাজ্‌হ শিরিন্ কে ওয়াহ্ ওয়াহ্
উয়ো বাদ্ হায় নাব্-এ-নওয়ারা কে হায় হায়।
(কলকাতার কথা যেই তুমি বললে হে বন্ধু,
আমার হৃদয় যেন তিরের আঘাতে রক্তাক্ত হল।
সেই নিবিড়, সবুজ শ্যামলিকা,
সেই নারীদের রূপ,
সে কটাক্ষ, সে ইশারা
সবলতম বক্ষকেও বিদ্ধ করল।
ধন্য তার তাজা মধুর ফল,
অবিস্মরণীয় তার মদিরা রসাল।)

কলকাতার মতো ভাল শরাব আগে কখনও খাইনি। আর আম। কলকাতায় এসেই আমি আমের প্রেমে পড়লুম। আগেও আম খেয়েছি। কিন্তু বাংলার আম যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আশিকের চুম্বন। দেখলেই আমার জিভ লক লক করে উঠত। এক-একটা টুকরো মুখে ফেলে চোখ বুজে আসত আমার, জন্নতের সব ফলও যদি আপনার সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়, কলকাতার আমের কথা আপনি কখনও ভুলতে পারবেন না, মান্টোভাই। এমনই পেটুক আমি যে একবার হুগলির ইমামবাড়ার মুতাল্লিকেও আম পাঠানোর জন্য চিঠি লিখে ফেললুম। মুতাল্লিসাব, আমি চাই সেই ফল, দস্তরখানে যাকে সাজালে যেমন সুন্দর লাগে, তেমনই মনপ্রাণ ভরে ওঠে। আপনি তো জানেনই, একমাত্র আমেরই সেই গুণ আছে। আর হুগলির আমের তো তুলনা নেই, যেন বাগান থেকে সদ্য তুলে আনা ফুল। আমের মরশুম শেষ হওয়ার আগেই দু-তিনবার যদি আমার কথা স্মরণ করেন, তবে কৃতার্থ হব। মুতাল্লিসাব আমার আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। আমার চাকরেরা রাত থেকে আম জলে ভিজিয়ে রাখত, সকালে একবার খেতুম, তারপর আবার দুপুরের পরে। ঠান্ডা আমের স্বাদ কেমন জানেন, মান্টোভাই? যেন আপনি সবচেয়ে প্রিয় নারীর সারা শরীর লেহন করছেন।

আমের কথা এল বলে দু-একটা কিস্‌সা বলি আপনাদের। আসলে কিস্‌সা নয়, কিন্তু আমার জীবন তো এখন একটা কিস্‌সাই। শাহজাহানাবাদের হাকিম রাজিউদ্দিন খাঁ আমার খুব দোস্ত ছিলেন, তিনি আবার আম খেতেন না। একদিন হাভেলির বারন্দায় আমরা দু'জনে বসে আছি। গলি দিয়ে একটা লোক গাধা নিয়ে যাচ্ছিল। গলিতে আমের অনেক খোসা পড়েছিল। গাধাটা খোসার গন্ধ শুঁকল, কিন্তু খেল না,

হাকিমসাব হেসে বললেন, 'দেখুন, মির্জা, এত যে আম-আম করেন, গাধাও তা খায় না।'

আমি শুধু বললুম, 'সহি বাত। গাধার পক্ষে তো আমের স্বাদ বোঝা সম্ভব নয় হাকিমসাব।'

হাকিমসাব প্রথমে হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'মতলব?'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'কোনও গাধা-ই আম খায় না।'

'বুঝেছি,' বলেই তিনি উঠে পড়লেন।

আমের ক্ষেত্রে আমি দু'টো জিনিসই বুঝি, মান্টোভাই, খুব মিষ্টি হতে হবে আর যতক্ষণ খেতে চাইব, যেন খেতে পারি। কলকাতায় আমি দু'টোই উপভোগ করেছি। শুধু তো খাওয়া নয়, জলে ভেজানো আমে মাঝে মাঝে গিয়ে হাত বোলাতুম, তাতে যে কী সুখ! চোখেরও কত আরাম। জলের ভেতরে শুয়ে আছে ওরা। হিমসাগর, সূর্যোদয়ের হাল্কা কমলা রং ছড়িয়ে আছে তার শরীরে; আবার ল্যাংড়া দেখুন, একেবারে সবুজ, মাঝে মাঝে হাল্কা হলুদের ছটা; গোলাপখাসের শরীরে কোথাও টকটকে লাল, কোথাও সবুজ বা হলুদ। আর কোনও ফলে এত রংয়ের খেলা নেই, মান্টোভাই। আমসুন্দরীদের কথা যেন বলে শেষ করা যায় না। আমার নেশা দেখে দূর দূর থেকে দোস্ত, শাগির্দরা কতরকম যে আম পাঠাত। বেগম একবার বলেছিল, 'এতই যখন আম ভালবাসেন, শরাব তো ছেড়ে দিতে পারেন।'

—আমার বাইরের জীবন তো তুমি জানো, বেগম। তবু তোমাকে কি ছাড়তে পেরেছি? আমার দুই-ই চাই।

—আর আমার চাওয়া?

—তুমি তো চাও, ঠিক ঠিক শওহর হয়ে উঠব। এ-জীবনে আর হবে না বেগম। কিন্তু তোমাকেও আমি ছাড়তে পারব না। নইলে কবেই তো তালাক দিতুম।

—কেন পারবেন না, মির্জাসাব?

—আমার বদখেয়ালির জীবনের আশ্রয় তো তুমি।

—তাই?

—না হলে সবকিছুর পরে এই হাভেলিতে কেন ফিরে আসি আমি? তোমার সঙ্গে সারাদিন একটা কথা না হলেও কেন মনে হয়, এখনও আমার ঘর আছে?

মান্টোভাই, বেগমকে আমি এসব কিছুই বলিনি। সব আমার খোয়াব—খোয়াবে বলা কথা। উমরাও বেগমের সঙ্গে স্বপ্নেই কথা বলতুম আমি। বেগমও নিশ্চয়ই এভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলত। নইলে আর এতগুলো বছর কী করে একসঙ্গে থেকে গেলুম আমরা! কোথাও তো প্রাণ ছিল, আমরা দু'জনেই চিনতে পারিনি।

প্রাণ! কী অলীক এক শব্দ। কলকাতায় গিয়েই শব্দটি শিখেছিলুম আমি। নবাব

সিরাজউদ্দিন আহমদ, আমার কলকাতার দোস্ত, একদিন এসে বললেন, 'চলুন মির্জা, আপনাকে আজ এমন একজনের কাছে নিয়ে যাব, আপনার মন খুশ হয়ে যাবে।'

—কে?

—নিধুবাবু।

—ইনি কোথাকার বাবু?

—না, না, বাবু নন। তবে সবাই নিধুবাবুই বলে। আসল নাম রামনিধি গুপ্ত। তিনি গান লেখেন, গান করেন, তবে এখন আর গাইতে পারেন না।

—তবে গিয়ে কী হবে?

—কথা বলে আনন্দ পাবেন, মির্জা।

দিনের বেলাতেও অন্ধকার গলির ভেতরে দোতলা বাড়ির ছোট একটা ঘর। আমরা দুপুরের একটু পরে গিয়ে পৌঁছলুম। তখনও তিনি ঘুমিয়ে আছেন। চাকর গিয়ে তাঁকে ডাকতে তিনি আড়মোড়া ভেঙে ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন। সিরাজউদ্দিনসাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হঠাৎ অবেলায় কেন নবাবসাব?'

—আমার এক দোস্তকে নিয়ে এসেছি।

—গানবাজনা করেন?

—শায়র। দিল্লিতে থাকেন।

তিনি দু'হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'নবাবসাব আপনাকে নিয়ে এসেছেন। আমার বয়স আজ নব্বুইয়ের কাছাকাছি। আপনাকে খুশি করার মতো আর কিছু নেই এই বান্দার জীবনে। গান তো এখন গাইতে পারি না।'

—যদি ইচ্ছে হয়, দু'টো-একটা শোনাবেন। সিরাজউদ্দিনসাব বললেন।

—ইচ্ছে হয়। কিন্তু গলা তো খেলে না নবাবসাব; যে গায়নে প্রাণ আসে না, তা কি গাওয়া যায়? আপনি তো জানেন।

—আপনি গাইলেই জন্নত নেমে আসবে।

—তা হয় না, নবাবসাব। আপনিও জানেন, আমিও জানি। কেন মিথ্যে বলছেন? নাভি থেকে স্বর আসে—স্বর থেকে সুর হয়—নাভি শুকিয়ে গেলে সুর কী করে জন্মাবে? আপনি তো জানেন, কাকের গলায় গান গেয়ে লোকভোলানো আমার পেশা নয়। আপনারা বসুন, বসুন—এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

সে-ঘরে বসার আর কোনও ব্যবস্থা ছিল না; আমরা নিধুবাবুর বিছানাতেই গিয়ে বসলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতায় কোনও কাজে এসেছেন?'

আমি তাঁকে সব বললুম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এই হারামজাদারা এখানে এসেছে দেশটাকে শুষে খাওয়ার জন্য। আপনার—আমার জন্য ওরা কিছু করবে না। আপনি সাধক রামপ্রসাদের গান তো শোনেননি। নবাবসাব আপনার, মনে আছে?'

আমার আশা আশা কেবল আসা মাত্র হল।
চিত্রের কমলে যেমন ভৃঙ্গ ভুলে গেল।।
খেলব বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো আশা না পুরিল।

মির্জাসাব, ওই সায়েবদের মতো এই শহরেরও হৃদয় নেই। আপনি এখানে কিছু পাবেন না। দিল্লিতেই ফিরে যান। এ-শহরে এখন নতুন বাবুদের উদয় হয়েছে, তারা বলে, নিধুবাবুর সব গান অশ্লীল। আরে গুখেগোর ব্যাটারা, তোর ইংরেজ ঠিক করে দেবে কোনটা শ্লীল আর অশ্লীল? তা হলে কবি ভারতচন্দ্রকে কোথায় জায়গা দিবি তোরা? বিদ্যাসুন্দরকে ধুয়েমুছে ফেলবি? ওই এক সায়েব—শালা ডিরোজিও—মদ-মাংস খাইয়ে সবাইকে শেখাচ্ছে, ইংরেজের বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আরে মদ-মাংস কি আমরা কম খেয়েছি? রাঁঢ়ও রেখেছি। তা বলে কি আমরা উচ্ছন্নে গেছি? একটা গান শুনুন তবে :

প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তা বুঝ না।।
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাই দেখ,
প্রাণ গেলে সদায়তে, কি গুণ বল না।।

বলুন, নিধুবাবুর এই গান অশ্লীল?

পর-পর টপ্পা গেয়ে চললেন তিনি। আর প্রতিটি গানেই ওই একটি শব্দ, প্রাণ। শব্দটি যখন তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, মনে হচ্ছিল, ফুটে-ওঠা পদ্ম যেন তুলে দিচ্ছেন আমাদের হাতে। গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে অনেকক্ষণ তিনি চুপচাপ বসে রইলেন।

সিরাজউদ্দিনসাব বলে উঠলেন, 'কী নসিব আমার! কতদিন পর আপনার গলায় গান শুনতে পেলাম।'

নিধুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফিরে যান মিঞা, দিল্লিতে ফিরে যান। কলকাতা আপনাকে কিছু দেবে না। শুধু অপমান পাবেন। যারা অন্ধ, তারা সবচেয়ে বেশি দেখে আজ। এখানকার মানুষ কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু জানে না। মুর্শিদাবাদের মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। শ্রীমতী নামে তাঁর এক বাঁধা রাঁঢ় ছিল। আমি রোজ সন্ধেবেলা গিয়ে গান গেয়ে মহারাজকে আনন্দ দান করতাম। কেন কে জানে, শ্রীমতীও আমাকে ভালবাসতেন, আমি যতক্ষণ থাকতাম, যাতে অযত্ন না হয়, লক্ষ রাখতেন। সবাই রটিয়ে দিল, শ্রীমতী আমার রাঁঢ়। আমি তাঁকে মনে রেখে অনেক গান বেঁধেছিলাম, তাই বলে তিনি আমার রাঁঢ়? কলকাতা এ-ভাবেই সবকিছু বোঝে। আরও কিছুদিন থাকুন, বুঝতে পারবেন। এখানে গুণের কদর নেই, শুধু ফটফটিয়ে কথা বলতে জানতে হবে। সব ইংরেজি শিক্ষার ফল মির্জা, ওরা নিজেদের বাইরে কাউকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না।'

ফিরে আসার সময় কাঁধে হাত রেখে নিধুবাবু বললেন, 'হতাশ হবেন না মিঞাসাব, আপনার সামনে অনেক পথ। আমি তো শেষ হয়ে গেছি। তাই কিছু আজেবাজে কথা বললাম।'

নিধুবাবুর কথা যখন বললুম, তখন আরেক কবির গানের কথাও বলতে হবে। নিধুবাবুর অনেক আগেই এন্তেকাল হয়েছিল কবি রামপ্রসাদ সেনের। তিনি সাধক-কবি, মান্টোভাই। শুনেছিলুম, মা কালী নাকি তাঁর মেয়ের রূপ ধরে এসে বাড়ির বেড়া বাঁধার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। আরও কত যে কিস্‌সা তাঁকে নিয়ে। কাশীর দেবী অন্নপূর্ণা এসেছিলেন তাঁর গান শুনবেন বলে। যে-বাবুর সেরেস্তায় তিনি চাকরি করতেন, সেখানকার হিসেবের খাতাতেই গান লিখতেন। তাঁর একটা গানের পিলু-বাহারের সুর অনেকদিন ভ্রমরের মতো মনের ভেতরে ঘুরে বেড়িয়েছিল, তা-ও একদিন হারিয়ে গেছে; ধীরে ধীরে সব রং, সব সুরই তো আমাকে আলবিদা জানিয়েছে।

নিধুবাবুর কথা শুনে, তাঁর চোখ দিয়ে আমি আরেক কলকাতাকে দেখতে পেলুম মান্টোভাই। আর সেই কলকাতা—বুজুর্গের সম্মান দিতে যে জানে না—কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও পাঁকের মধ্যে এনে ফেলল। মাসের প্রথম রবিবার বড় একটা মুশায়েরা হত। একবার সেই মুশায়েরা-য় ফারসি গজল পড়তে আমাকে নেমন্তন্ন করা হল। অতবড় মুশায়েরা দিল্লিতেও হত না। প্রায় হাজার পাঁচেক লোকের জমায়েত। আমার গজল শুনে একদল লোক কতিলের নাম করে আমার গজলের ভাষা ও শৈলী নিয়ে প্রশ্ন তুলল। যে যাই বলুক, কতিলকে আমি কোনওদিনই বড় ফারসি কবি হিসেবে মানিনি। মানব কী করে বলুন? সে তো আসলে ফরিদাবাদের ক্ষত্রী দিলওয়ালি সিং। পরে মুসলমান হয়েছিল। হ্যাঁ, আমির খসরু-র কথা বলুন, মানতে পারি। মুশায়েরা-য় এসব বলতেই তো চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আমার মনে পড়ে গেল, নিধুবাবুর কথা। তর্ক না বাড়িয়ে মুশায়েরা থেকে চলে এলুম। কিন্তু আমি চুপ করে থাকলে কী হবে? কতিলসাবের ভক্তরা কেন ছেড়ে দেবে আমায়? তারা পেছনে লেগে পড়ল। ভেবে দেখলুম, আমি তো পেনশনের সুরাহা করতে এখানে এসেছি, লোকজনকে খেপিয়ে লাভ কী, কে কোন কাজে লাগবে, বলা তো যায় না। বাদ-এ-মুখালিফ নামে একটা কবিতা লিখে ক্ষমাপ্রার্থনা করলুম। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে সরে আসিনি, মান্টোভাই। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। রাজা শোহনলাল জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী করলেন মির্জাসাব?'

—কেন?

—আপনি নিজেকে এতখানি ছোট করলেন কেন?

—হাতি গর্তে পড়লে পিঁপড়েও লাথি মারে, জানেন না? তখন ওঠবার জন্য পিঁপড়ের কাছেও মিনতি জানাতে হয়।

—তবু আপনি—

—আমি কেউ নই। বলতে পারেন অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকা একটা ঘুম।

—মানে?

মানে কী ছাই, আমিও জানতাম! কথা মুখে আসে, বলে দিই। সবদিক ভেবে যদি কথা বলতে পারতুম মান্টোভাই, তা হলে জীবনটা মখমল-মোড়া বিছানা হয়ে যেত। আমি তা চাইওনি। কলকাতা থেকে এত হতাশা নিয়ে দিল্লিতে ফিরলুম, তবু কলকাতার কথা ভুলতে পারলুম কোথায় বলুন? অনেক ছোট ছোট কথা মনে পড়ে জানেন। পেনশনের জন্য কত বড় বড় সায়েবসুবোর সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের কথা আর মনে নেই। অথচ এক মেছুনির কথা এখনও ভুলতে পারি না। আমি রোজ একজন চাকরকে নিয়ে সিমলাবাজার যেতুম, ঘুরে-ঘুরে মাছ-তরিতরকারি-ফল কিনতুম। তো সেই বাজারে এক মেছুনির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছিল আমার। সে আমার জন্য প্রায়ই তোপসে মাছ নিয়ে আসত; সায়েবরা বলত ম্যাঙ্গো ফিস। কমলা রঙের ছোট ছোট মাছ। তোপসে মাছ ভাজা খেতে খুব ভাল লাগত। বিশেষ করে, শরাবের সঙ্গে তো জবাব নেই। সেই মেছুনি দু-এক কথার পর রোজ আমাকে একটা করে কিস্‌সা শোনাত। তখন কেউ মাছ কিনতে এলেও সে মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, 'যাও দিকিনি, দেকছো না, মিঞার সঙ্গে মনের কথা বলতিছি।'

খদ্দের বলত, 'মনের কথা? তা হলে মাছ বেচবে না?'

—না, বেচব না। আমার মাছ আমি বেচব না, তাতে তোমার কী? তার পর আমার দিকে ফিরে বলত, 'শোনো মিঞা, ভটচায বামুনের কথা শুনলে তুমি হাসতে হাসতে বাজারে গড়াগড়ি খাবে।'

কিস্‌সার নেশায় আমিও তার পাশে বসে পড়তুম।

—ভটচায বামুনেরা তো শুধু পুঁথি পড়ে আর আকাশপানে তাকিয়ে ভাবে। দুনিয়ার কিছুই তেনাদের চোখে পড়ে না। এক ভটচাযের গিন্নি ডাল রাঁধছিল। হঠাৎ দেখে, ঘরে জল নেই। সোয়ামিকে রান্নাঘরে বসিয়ে জল আনতে গেল। বউ তো গেছে জল আনতে, এদিকে ডাল উথলে উঠেছে। বামুন তো ভেবেই পায় না, উথলানো ডাল সামলাবে কী করে? এ যে বিষম বিপদ। শেষপর্যন্ত করল কী জানো? হাতে পৈতে জড়িয়ে সেই হাত ডালের ওপর মেলে চণ্ডীপাঠ করতে লাগল। মিঞা, এমন মজার কথা কখনও শুনেচো? চণ্ডীপাঠে ডাল উথলানো সামলায়?

—তারপর?

—গিন্নি ফিরে এসে ব্যাপার দেখে বলে, 'এ কী? ডালে একটু তেল ফেলে দিতে পারনি?' তেল ফেলতেই উথলানো থেমে গেল। তারপর ভটচায কী করল জানো মিঞা?

—কী?

মেছুনি হাসতে-হাসতে আমার গায়ে ঢলে পড়ল। তার কোনও লাজ-লজ্জা নেই। আমার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'বামুন তখন বৌয়ের পা ধরে বলতে লাগল, তুমি কে মা, আমি যেখানে হার মানলাম, একফোঁটা তেল ছিটিয়ে তুমি সব জয় করলে।'

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বৌটা 'আ মরণ' বলে এক ঝামটা দিয়ে চলে গেল। মেছুনি হাসতে হাসতে বলল, 'মিঞা, মেয়েছেলের সঙ্গে বেটাছেলে কখনও পারে?'

পুরুষকারের কথাই যদি বলেন, মান্টোভাই, তবে একজনের কথাই আমার মনে পড়ে, তিনি রামমোহন রায়। তাঁকে আমি দেখিনি। সারা কলকাতায় তাঁর নাম শুনেছি। তার বাড়ির ভোজসভায় নাকি বাইজি নাচত। কত বিখ্যাত সব বাইজি তখন কলকাতায়। বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান, জিন্নাৎ, সৈয়দ বক্স। না, না ভাইজানেরা এঁদের আমি দেখিনি। কলকাতার বড় বড় বাবুদের কাছে বাঁধা ছিল তারা। আমার তো বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। শুনেছিলুম, বাবু রামমোহন 'মিরাত-উল-আখ্‌বার' নামে একটা ফারসি খবরের কাগজ বার করেছিলেন। আমি কলকাতায় যাবার অনেক আগেই তা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ফারসিতে 'জামিজাহানুমা' নামে একটা খবরের কাগজ বেরুত। তা ছাড়া ইংরেজি, বাংলায় কত যে কাগজ। কলকাতা আমার ভেতরে খবরের কাগজ পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন তো দিল্লিতে খবরের কাগজ আসেনি। আসবেই বা কী করে? ছাপাখানা তৈরি হলে তো খবরের কাগজের কথা আসে। আর কলকাতায় তখন কত ছাপাখানা। সিরাজউদ্দিনসাব আমাকে একটা বই দেখিয়েছিলেন। কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'; বলেছিলেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে কেউ একজন বইটা ছাপিয়েছিল। পঞ্চানন কর্মকার বলে একজনের নামও শুনেছিলুম। ছাপাখানার জন্য প্রথম বাংলা হরফ তৈরি করেছিল সে।

মান্টোভাই, আমি রামমোহনের কথাই বলছিলুম না? এই মানুষটাকে আমি চোখে দেখিনি, তাঁর সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা শুনেছি, সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের কথা শুনে আমি আর কিছু মনে রাখিনি। নিমতলা ঘাট শ্মশানে সতীদাহ আমি দেখেছি। আর দেখেছি গঙ্গাযাত্রীদের। মৃতপ্রায় লোকদের গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া হত, সেখানে একটা ঘরে তাদের রেখে দেওয়া হত, রোজ জোয়ারের সময় আত্মীয়-স্বজনরা ঘর থেকে বার করে তার শরীরের অনেকখানি গঙ্গার জলের ভিতর ডুবিয়ে রেখে দিত। এর নাম অন্তর্জলী যাত্রা, মান্টোভাই। দিনের পর দিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কষ্ট পেয়ে তারা মারা যেত। তখন একটু মুখাগ্নি করে তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। আর সতীদাহের সময় চন্দন কাঠ, ঘি দিয়ে জ্বালানো হত চিতা; স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হত স্ত্রীকে। চলত মন্ত্রোচ্চারণ, বাজত কাঁসর-ঘণ্টা-ঢোল,

যেন এক উৎসব। জীবন্ত নারীর পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা কেউ শুনতেও পেত না। এই দৃশ্য যেদিন প্রথম দেখি, আমার বুক জুড়ে নিধুবাবুর সেই শব্দটাই ঘুরে ফিরে এসেছিল, প্রাণ...ওগো...প্রাণ। পরে শুনেছিলুম রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল।

সব আশা ত্যাগ করে কলকাতা ছেড়েছিলুম। শুধু এইরকম কয়েকটা স্মৃতি নিয়ে। হ্যাঁ, মান্টোভাই, সেখানে আশ্চর্য বসন্তের বাতাস বয় ঠিকই, কিন্তু সেই শহরেই পাথরে মাথা কুটতে-কুটতে রক্তাক্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে হয়। দিল্লিতে যখন ফিরলুম, আমার মাথায় তখন হাজার চল্লিশেক টাকার দেনার বোঝা।

অনেকদিন মান্টোর উপন্যাস অনুবাদের কাজ বন্ধ ছিল। তার কারণ, তবসুম এক পরিরানির মা হয়েছে। মাস দুয়েক তাই ওকে বিরক্ত করিনি। মেয়ের নাম দিয়েছে ফলক আরা। ইতিমধ্যে আমিও জীবনের এক অজানা পর্ব পেরিয়ে এসেছি। হঠাৎই আমার মদ্যপান এত বেড়ে গিয়েছিল যে চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করা হয়। নেশাগ্রস্ত ও উন্মাদদের মধ্যে দিন পনেরো থাকতে-থাকতে আমি বুঝতে পারি, এই মানুষগুলোরও সংলাপ আছে, শুধু তা আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিনের মতো নয়। বরং অনেক বেশি স্বপ্ন আর আবোলতাবোল-এ রাঙানো। সেই মানসিক হাসপাতালের জানলায় বসে আকাশের গায়ে টক-টক গন্ধ আমি টের পেয়েছিলাম। ঠিকানাহীন এক আত্মার নামই উন্মাদনা।

সত্যি বলতে কী, মান্টোর উপন্যাস অনুবাদ করার ব্যাপারে আমি আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার কারণ, ওই মানসিক হাসপাতালের মানুষগুলো আমাকে টানছিল; বার বার মনে হচ্ছিল, ওদের মধ্যে ফিরে যাই। কেন, কখন, কোথায়, কীভাবে—এসব কোনও প্রশ্নই ছিল না সেখানে; শুধু একেকজনের অনর্গল সংলাপের প্রবাহ অথবা নীরবতার দূরপ্রসারিত ছায়া।

একদিন তবসুমকে ফোন করলাম 'ফলক আরা'র খবর জানার জন্য।

—ছানাটা যে কী হাসতে পারে, ভাবতে পারবেন না। একদিন এসে দেখে যান। এ কেমন তরিবৎ আপনার, শুধু ফোন করে খবর নেন?

—যাব একদিন।

—আর কাজটা, সেটার কী হবে?

—ও, মান্টোর উপন্যাস—

—আপনি তো ভুলেই মেরে দিয়েছেন দেখছি।

—ভুলিনি।

—তা হলে আসুন, কাজটা আবার শুরু হোক।

আমি কোনও কথা বলি না।

—কী হল? কথা বলছেন না কেন, জনাব?

—ভাবছি—

—কী?

—এই মান্টোর ভূত আমার ঘাড়ে এসেই যে কেন চাপল।!

তবসুমের হাসি শোনা যায়।—সে তো আপনি নিজে যেচেই ঘাড়ে নিয়েছেন। এবার ঘাড় থেকে নামাতে চাইছেন?

—কেমন হয়, তা হলে?

—না, জনাব। এ-কাজটি করবেন না। ফলক আরা-কে নিয়ে থাকতে থাকতেই আমি পুরো উপন্যাসটা পড়ে ফেলেছি। পড়তে পড়তে মান্টোসাবকে কী যে ভালবেসে ফেলেছি! একজন লেখক—কোনও ভান নেই, কায়দা নেই—মির্জা গালিবের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকেই মেলে ধরছেন। এত সৎ লেখকের প্রতি অবিচার করবেন না। আসুন, আমরা অনুবাদটা শেষ করবই।

—মান্টো সৎ লেখক, বুঝলে কী করে? আমি হেসে বলি।

—বুঝতে পারি। আমি তো লেখক নই, বুঝিয়ে বলতে পারব না আপনাকে। মানুষ যেমন বুঝতে পারে, কোনটা সত্যিকারের প্রেম।

—কীভাবে বোঝ?

—জানি না।

আমি মনে মনে বলি, এই অজ্ঞানতা বাঁচিয়ে রেখো তবসুম। তা হলে তোমার কাছে আরও কিছুদিন গিয়ে বসতে পারব আমি।

—কথা বলছেন না কেন?

—কাল যাব?

—আলবৎ। জিজ্ঞেস করতে হয়? একবার ফলক আরা-কে তো দেখবেন।

—হুঁ। যে-উপন্যাসটা লেখা শুরু হয়েছে সবে।

—কোন উপন্যাস?

—ফলক আরা। সে-ও তো একটা উপন্যাস।

—আপনার মাথা-ভর্তি শুধু উপন্যাস, তাই না?

—আমার মাথায় শুধু গু-গোবর-জঞ্জাল।

পরদিন তবসুমের বাড়িতে যাই। তার মেয়ে ফলক আরা সত্যিই এক নক্ষত্রের হার; যেন শিল্পী বিহ্‌জাদের কলম তাকে এঁকে দিয়ে গেছে। মেয়েটির মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি না।

—কী দেখছেন এত? তবসুম হেসে বলে।

—মীরসাব একটা শের লিখেছিলেন।

—কী?

— আলম-এ হুস্‌ন হ্যয় অজব আলম।
চাহিয়ে ইশক্ ইসভী আলম সে।।

—আপনি পারেনও বটে। এইটুকু বাচ্চার জন্য মীরসাবের শের?

—রূপ কখন, কোথা থেকে তার ছুরি মারবে, তুমি বুঝতেও পারবে না তবসুম।

—তেমন ছোরার ঘা খেয়েছেন না কি, এর মধ্যে?

—সব মরচে-ধরা ছোরা তবসুম। গলগল করে রক্ত বেরোয় না। ভেতরটা পচিয়ে দেয়।

—আপনি তো দরবারি ডায়ালগ বেশ রপ্ত করেছেন দেখছি!

আমি হেসে ফেলি।—এই জন্য তোমাকে ভাল লাগে তবসুম।

—কেন?

—এই জন্য।

—মানে?

—জানি না।

—দাঁড়ান, এ-বেটিকে কারুর কাছে রেখে আসি।

তবসুম ঘর থেকে চলে যেতেই দেওয়ালে ঝোলানো রাক্ষুসে আয়নাটা আমাকে গিলে ফেলে। আয়নার ভেতরে বহু দূরে আগ্রার চহরবাগ ফুটে ওঠে। ওই তো—ওই তো—বেগম ফলক আরার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আসাদুল্লা। আর এই মধ্য কলকাতার গলিতে তবসুমের বাড়িতে জন্ম নিয়েছে আর এক ফলক আরা। মানুষ ফেরে না, তবু নাম কেমন ফিরে ফিরে আসে। আয়নার ভেতরেই একসময় তবসুমকে দেখতে পেলাম।

—এই আয়নাটায় আপনি কী এত দেখেন, বলুন তো?

—তোমাদের আয়নাটায় কত পথ যে লুকিয়ে আছে।

—পথ?

—বাদ দাও। এবার মান্টোসাবের কথা বলো।

—হুঁ। আবার কাজটা শুরু করুন তো—। বলতে-বলতে সে আলমারি খুলে মান্টোর পাণ্ডুলিপি বার করে। তারপর বিছানায় এসে বসে পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বলে, 'আজ লিখবেন কি?'

—খাতা তো আনিনি।

—ফাঁকি দেবার কত যে ফিকির আপনার।

—পরদিন লিখব। আজ না হয় তোমার মুখেই শুনি। এখন লিখতে বড় ক্লান্ত লাগে তবসুম।

—কিন্তু এই অনুবাদটা আপনাকে শেষ করতেই হবে।

—করব, নিশ্চয়ই করব। তুমি পড়ো।

তবসুম পড়তে থাকে, এমন একটা সময়ে মির্জা গালিবকে নিয়ে কিস্‌সাটা লিখতে শুরু করলাম, যখন আমার দিনগুলো হাতে গোনা যায়। পাকিস্তানে আসার পর একেবারে খতম হয়ে গেছি। মনটাকে পোড়ো জমি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শুধু কয়েকটা ক্ষতবিক্ষত কাঁটাঝোপ জেগে আছে। কী যে করব, বুঝতেই পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, লেখা বন্ধ করে দেব; আবার মনে হয়, কে কী বলল, না ভেবেই লিখে যেতে হবে। এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছি, শুধু মনে হয়, কালি-কলম ছেড়ে একটা নির্জন কোণে যদি পড়ে থাকতে পারতাম, মাথায় ভাবনা এলে তাদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতাম; এটুকু শান্তিও যদি না পাই, তবে কালোবাজারে গিয়ে না হয় টাকা কামাব, বিষ মেশানো মদ তৈরি করে রোজগার করব। টাকার দরকার, খুব দরকার। সারা দিন-রাত গল্প আর খবরের কাগজের লেখা লিখেও সংসার চালানোর টাকা হাতে আসে না। শুধু ভয় হয়, হঠাৎ যদি মরে যাই, আমার বিবি আর তিন মেয়ের কী হবে? আমাকে আপনারা যা খুশি তাই বলুন—অশ্লীল গল্পের লেখক, প্রতিক্রিয়াশীল—কিন্তু একই সঙ্গে আমি তো একজনের স্বামী, তিনজনের বাবা। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে দোরে-দোরে গিয়ে ভিক্ষা করতে হবে। সংসার খরচ ছাড়াও আমার রোজকার অ্যালকোহলের জন্য টাকা দরকার। চার্জড না হলে একটা বাক্যও তো এখন লিখতে পারি না। আঙ্কল স্যাম, আপনিই বলুন, এই কি একজন লেখকের ভবিতব্য?

গতকাল আবার হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। মদ ছাড়ানোর জন্য শফিয়া কত চেষ্টাই না চালিয়ে যাচ্ছে। এরা বোঝে না, মদ আমাকে এখন গিলে খাচ্ছে। মদ খাওয়ার জন্যই কত বন্ধুর বাড়িতে পড়ে থাকি। লেখালেখির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। তারা জানেই না, মান্টো কে? আমিও জানাতে চাইনি। শুধু দিনে-দিনে নিজের শরীর আর মনকে ক্ষয়ে যেতে দেখেছি আমি। নিজের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে সত্যিই ঘেন্না হয়। আমি সবসময় সবকিছু সাফসুরত রাখতে চেয়েছি, শফিয়া একা পারবে না বলে একসময় ঘরদোরও পরিষ্কার করতাম, এক কণা ধুলো পড়ে থাকলেও তা সরিয়ে না ফেলা পর্যন্ত আমার স্বস্তি ছিল না। শফিয়া বলত, এসব নাকি আমার বাতিক। কিন্তু চারপাশটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে না পারলে, মানুষের ভেতরটাও আর সুন্দর থাকে না। মদ্যপান আমার কাছে শুধু নেশা করার ব্যাপার ছিল না; পানের আসরের তরিকা আমি নিখুঁতভাবে মেনে চলতাম। বম্বেতে থাকার সময়

পছন্দ করে কতরকম যে গ্লাস কিনেছিলাম। আর এখন আমি মদের বোতল বাথরুমে কমোডের পেছনে লুকিয়ে রাখি। শফিয়াকে লুকিয়ে বাথরুমে ঢুকে মদ খেতে হয় আমাকে। শফিয়া একেক সময় জিজ্ঞেস করে, এতবার বাথরুমে যাই কেন? মিথ্যে বলি। পেচ্ছাপ পায়, মুখচোখে জল দিতে ইচ্ছে করে। কোনও মিথ্যেই আর এখন আমার মুখে আটকায় না। অথচ শফিয়াকে আগে কখনও মিথ্যে বলিনি। নেশা আমাকে দিনে-দিনে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু কী করব? না-খেলে কলম চলতে চায় না। আর না-লিখলে রোজগারও বন্ধ। বুঝতে পারি, নিজের তৈরি এক গোলকধাঁধায় আমি ঘুরপাক খাচ্ছি। আমি জানি, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ নেই আমার। কিন্তু মির্জাকে নিয়ে এই লেখাটা আমাকে শেষ করে যেতেই হবে। সকালের দিকে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম। হাসপাতাল থেকে আসার পর কয়েকদিন মদ ছুঁতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, সারা শরীর জুড়ে নতুন ঘাস গজিয়েছে, গন্ধ পাই সেই ঘাসের, কী যে ফ্রেশ লাগে। প্রতিবার প্রতিজ্ঞা করি, নাঃ! আর নয়, এ-জীবনে আর মদ ছোঁব না, শফিয়ার সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে। কয়েকদিন পরেই আবার মদের দোকানের লাইনে গিয়ে দাঁড়াই।

সকালের দিকে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে একটা শব্দও লিখতে পারিনি। মাথাটা একেবারে ফাঁকা। কীভাবে শুরু করব, বুঝতেই পারছিলাম না। আমি জানি, একটু পেটে পড়লেই কলম তরতর করে এগোবে। হঠাৎ বাইরের গলিতে কে যেন চিৎকার করে ডাকল, 'খালেদ মিঞা—খালেদ মিঞা—।'

আমার হাত থেকে কলম খসে পড়ল। মনে হল, এক্ষুনি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে; হয়তো এই বাড়িটা ভেঙে পড়বে। আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম, 'জুজিয়া জি—জুজিয়া জি—।'

ছোটমেয়ে নসরতকে আমি আদর করে এই নামেই ডাকি। মেয়েটা কোথা থেকে দৌড়ে আমার কাছে চলে আসে। আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকি। তখনই শফিয়া এসে ঘরে ঢোকে। হাসতে হাসতে বলে, 'বাপ-বেটির আজ যে খুব মহব্বত দেখছি।'

—বোসো শফিয়া।

নসরতকে কোল থেকে নামিয়ে বলি, 'খেলছিলি বুঝি?'

—জি আব্বা।

—যা তবে।

ফড়িং-এর মতো রোগা মেয়েটা হাসতে-হাসতে দৌড় লাগায়।

আমি শফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। মান্টোর জীবনে এসে কত তাড়াতাড়ি এই

মেয়েটা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শফিয়া আমার পাশে এসে দাঁড়ায়; কাঁধে হাত রাখে। বলে 'চোখে জল কেন মান্টোসাব?'

—খালেদ মিঞার কথা মনে পড়ে তোমার?

শফিয়ার হাত আমার কাঁধে খামচে ধরে। মুহূর্তেই সে যেন এক মর্মরমূর্তি।

—অনেকদিন পর আমার মনে পড়ল।

ঝড়ে-ভাঙা গাছের মতো শফিয়া মেঝেতে বসে পড়ল। আমি তার মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। শফিয়া অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল, তারপর মুখ তুলল; সেই মুখ, আমার মনে হল, কেউ যেন এখনই পাথরে খোদাই করে তৈরি করেছে।

—খালেদ মিঞাকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম শফিয়া। তোমাকে কখনও পড়াইনি।

—কেন?

—তুমি কষ্ট পেতে।

—আমার হাতের ওপর খালেদ মরেছিল, আমি সহ্য করিনি মান্টোসাব?

—মৃত্যুকে সহ্য করা যায় শফিয়া। স্মৃতিকে নয়। জীবনের অনেক বড় আঘাত আমরা সহ্য করতে পারি, তারপর হয়ত মনেও থাকে না। কিন্তু এক-একটা লেখা এসে বারবার আমাদের কাঁদায়। লেখার ভেতরে তো স্মৃতি ছাড়া আর কিছু থাকে না।

—গল্পটা আজ শোনাবেন?

—তোমার শুনতে ইচ্ছে করছে?

—খালেদের জন্য।

—সে-গল্পে আমার নাম ছিল মমতাজ। রোজ ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে মমতাজ তাদের তিনটে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করত। এতটুকু নোংরা যেন না থাকে। তখন তার ছেলে খালেদ সবে টলোমলো পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। এইরকম বাচ্চারা তো মেঝেতে ছড়ানো যা পায়, তাই তুলে মুখে দেয়। মমতাজ অবাক হয়ে দেখত, যতই সে ঘর পরিষ্কার করুক, ছেলেটা কিছু না কিছু খুঁজে বার করে মুখে পুরবেই। হয়তো দেওয়াল থেকে খসে পড়া প্লাস্টার, ঘরের কোণায় লুকিয়ে থাকা পোড়া দেশলাই কাঠি। আর মমতাজ মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিত।

খালেদের প্রথম জন্মদিন যতই এগিয়ে আসছিল, মমতাজের মনে এক অদ্ভুত ভয় ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তার সবসময় মনে হত, এক বছর হওয়ার আগেই খালেদ মারা যাবে। একদিন বিবিকে সে ভয়ের কথাটা বলেও ফেলেছিল। বিবি তো সে-কথা শুনে অবাক। মমতাজ তো এইরকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। বিবি বলল, 'তাজ্জব কি বাত! আপনার মুখে এমন ভয়ের কথা? শুনে রাখুন মমতাজ সাব, আমাদের ছেলে একশো বছর বাঁচবে। ওর জন্মদিনের যা ব্যবস্থা করেছি, দেখে আপনার তাক লেগে যাবে।' তবু ভয়টা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে থাকে।

খালেদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গালের রং দেখে মনে হয় যেন রুজ মাখানো হয়েছে। অফিস যাওয়ার আগে রোজ মমতাজ ছেলেকে এক গামলা জলে বসিয়ে স্নান করায়। কিন্তু ইদানীং স্নান করাতে করাতে খালেদের দিকে তাকিয়ে তার মনে কালো মেঘ জমে। নিজেকে সে বলে, 'আমার বিবির কথাই ঠিক। খালেদের মৃত্যুর ভয় কোথা থেকে আমার ভেতরে এল? কেন মরবে ও? অনেক বাচ্চার চেয়েই ওর স্বাস্থ্য বেশ ভাল। খালেদকে খুব ভালবাসি বলেই কি এই ভয়?'

রোজ সকালে ঘর ঝাঁট দেওয়ার পর মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে থাকতে ভাল লাগত মমতাজের। আর একদিন পরেই খালেদের জন্মদিন। হঠাৎ বুকের ওপর ভার অনুভব করতেই সে চোখ খুলে দেখল, খালেদ তার বুকে শুয়ে আছে। পাশে তার বিবি দাঁড়িয়ে। খালেদ নাকি সারারাত ছটফট করেছে, কী এক ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠেছে। মমতাজ ছেলের শরীরে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে উঠল, 'আল্লা, মেরে বেটে কো—।'

—এত ভয় কীসের মমতাজ সাব! সামান্য জ্বর, আল্লার দয়াতেই চলে যাবে। বলে তার বিবি চলে গেল। মমতাজ ছেলেকে যে কতভাবে আদর করতে লাগল।

খালেদের প্রথম জন্মদিনের জন্য মমতাজের বিবি বিরাট ব্যবস্থা করেছিল। সব আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। খালেদের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করতে দিয়েছে। এত জাঁকজমক মমতাজের ভাল লাগছিল না। সে চাইছিল, নীরবে এক বছর পার হয়ে যাক। তা হলে আর কোনও ভয় থাকবে না।

খালেদ একসময় তার বুক থেকে উঠে টলোমলো পায়ে অন্য ঘরে চলে গেল। মমতাজ একই ভাবে শুয়ে ছিল। হঠাৎ ভেতর থেকে বিবির আর্তনাদ ভেসে এল, 'মমতাজ সাব, তাড়াতাড়ি আসুন, মমতাজ সাব।'

মমতাজ দৌড়ে ভেতরে গিয়ে দেখল, বাথরুমের সামনে খালেদকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বিবি। খালেদ হাত-পা ছুঁড়ছে। সে বিবির কাছ থেকে খালেদকে কোলে তুলে নিল। জল নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎই খালেদের ফিট শুরু হয়ে যায়। মমতাজের কোলে খালেদ দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। মমতাজ তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আরও কিছুক্ষণ হাত-পা ছোঁড়ার পর খালেদ অজ্ঞান হয়ে যায়। একেবারে নিস্পন্দ। মমতাজ ডুকরে ওঠে, 'খালেদ আর নেই।'

তার বিবি ঝাঁঝিয়ে ওঠে। 'ইয়া আল্লা, এ কী কথা! একটু তড়কা হয়েছে, দেখবেন এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর খালেদ চোখ মেলে। মমতাজ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, 'খালেদ, বেটা আমার, কী হয়েছে, কী কষ্ট হচ্ছে?'

খালেদের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। মমতাজ তাকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে যেতেই আবার শুরু হয় খালেদের শারীরিক উন্মাদনা। মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে

থাকে খালেদ। মমতাজ তাকে সামলাতে পারে না। তারপর আবার খালেদ শান্ত হয়ে যায়। মমতাজ ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে যায়। ডাক্তার এসে খালেদকে দেখে বলে, 'বাচ্চাদের এমন তড়কা হয় মাঝে মাঝে। কৃমির জন্যও হতে পারে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। চিন্তার কিছু নেই।'

কিন্তু খালেদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে, জ্বর বেড়ে চলে। পরদিন সকালে আবার ডাক্তার আসে। বলে, 'ভয় পাবেন না মিঞা। মনে হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস। তিন-চারদিনেই ভাল হয়ে যাবে।'

খালেদের জ্বর বাড়তেই থাকে। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ ছাড়াও বাড়ির চাকর জামশেদের কথায় তাকে জলপড়া খাওয়ানো হয়। দুপুরে অন্য এক ডাক্তার আসে। ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে কুইনাইন ইঞ্জেকশন দেয়। খালেদের জ্বর ১০৬ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছয়। মমতাজ ঠিক করে, হাসপাতালেই নিয়ে যেতে হবে খালেদকে। ঘোড়ার গাড়ি ডেকে খালেদকে কোলে নিয়ে বিবির সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে।

সারাদিন শুধু জলতেষ্টা পেয়েছে মমতাজের। কত যে জল খেয়েছে! ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে মনে হয়, কোথাও দাঁড়িয়ে একটু জল খেয়ে নেবে। আর তখনই কে যেন বলে ওঠে, 'মিঞা, মনে রেখো, জল খেলেই তোমার খালেদ মারা যাবে।' গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু সে জল খায় না।

হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছে সে একটা সিগারেট ধরায়। দু'টান দিয়েই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কে যেন বলে উঠেছে, 'মমতাজ, সিগারেট খেও না, তা হলে তোমার ছেলে মারা যাবে।' কে, কে তার কানে এসে এইসব কথা বলছে? যতসব বখোয়াস। সে আবার নতুন করে সিগারেট ধরাতে যায়, কিন্তু পারে না।

হাসপাতালে খালেদকে ভর্তি করার পর ডাক্তার জানায়, 'ওর ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া হয়েছে। অবস্থা ভাল নয়।'

খালেদের জ্ঞান ছিল না। ওর মা বিছানায় মাথার পাশে বসে আছে। মমতাজের আবার জলতেষ্টা পেল। ওয়ার্ডের কাছে কল খুলে জল খেতে গিয়ে মমতাজ আবার শুনতে পেল সেই কণ্ঠস্বর, 'কী করছ মমতাজ? জল খেয়ো না। তোমার খালেদ তা হলে মারা যাবে।' তবু মমতাজ জল খেতেই লাগল; তার মনে হল, একটা সমুদ্র খেয়ে ফেললেও সেই তৃষ্ণা মিটবে না। জল খেয়ে এসে সে দেখল, খালেদ আরও বিবর্ণ হয়ে গেছে। মমতাজের মনে হল, আমি জল না খেলে খালেদ হয়ত এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত না। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর তার ভিতরে বারবার বলে চলেছে, এক বছর বয়স হওয়ার আগেই খালেদ মারা যাবে।

তখন সন্ধ্যা নামছে। কত ডাক্তার এসে দেখে গেল খালেদকে। কত ওষুধ, ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। খালেদের তবু জ্ঞান ফেরেনি। হঠাৎ সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'এখনই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাও মমতাজ, নইলে খালেদ মারা যাবে।'

মমতাজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল। সেই কণ্ঠস্বর তার মাথার ভেতরে কত কথা বলে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বরের নির্দেশে সে একটা হোটেলে গিয়ে বসল, মদের অর্ডার দিল, মদ এল, কণ্ঠস্বর তাকে বলল, 'ছুঁড়ে ফেলে দাও মদ।' মমতাজ মদ ছুঁড়ে ফেলে দিতেই আবার নির্দেশ এল, 'মদের অর্ডার দাও'; আবার মদ এল; কণ্ঠস্বর বলল, 'ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

মদ আর ভাঙা গ্লাসের দাম চুকিয়ে মমতাজ হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মনে হল, এই কণ্ঠস্বর ছাড়া পৃথিবী থেকে সব শব্দ হারিয়ে গেছে। সে হাসপাতালে ফিরে এল, খালেদের ওয়ার্ডে যাওয়ার সময় কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'ওখানে যেও না মমতাজ। খালেদ তা হলে মারা যাবে।'

হাসপাতালের মধ্যেই একটা পার্কের বেঞ্চে সে শুয়ে পড়ল। তখন রাত প্রায় দশটা। অন্ধকারে হাসপাতালের বাইরের ঘড়িটা শুধু দেখা যাচ্ছিল। সে বিড় বিড় করে বলছিল, 'খালেদ বাঁচবে তো? মরে যাওয়ার জন্য বাচ্চারা কেন এই দুনিয়াতে আসে? জন্মের পরেই কেন মৃত্যু এভাবে ওদের গ্রাস করে নেয়? খালেদ নিশ্চয়ই...'

সেই কণ্ঠস্বর তাকে বলল, 'মমতাজ এভাবেই শুয়ে থাকো। একটুও নড়ো না খালেদ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।'

মমতাজ একসময় নিজের ভিতরে চিৎকার করে উঠল, 'আল্লা মেহরবান, আমাকে বাঁচাও। খালেদকে মারতে চাইলে মারো। আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন?'

তার কাছেই দু'জন লোক বসে কথা বলছিল।

—কী সুন্দর বাচ্চা!

—ওর মায়ের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ডাক্তারদের পায়ে পড়ে শুধু কাঁদছে।

—ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না।

হঠাৎ তারা মমতাজকে দেখতে পেল।—আপনি এখানে কী করছেন?

মমতাজ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—কে আপনি? একজন জিজ্ঞেস করল।

মমতাজের গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্যাসফেসে গলায় সে বলল, 'আমি পেশেন্ট ডাক্তারবাবু।'

—পেশেন্ট তো বাইরে কেন? ভেতরে যান। এখানে কেন?

—স্যর, আমার ছেলে...ওপরের ওয়ার্ডে...

—আপনার ছেলে—

—আপনারা বোধহয় ওর কথাই বলছিলেন। আমার ছেলে, খালেদ।

—আপনি তার আব্বা?

মমতাজ শুধু মাথা নাড়ে।

—এখানে শুয়ে আছেন? ওপরে যান তাড়াতাড়ি।

মমতাজ দৌড়তে থাকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই ওয়ার্ডের সামনে জামশেদকে দেখতে পায়। জামশেদ তার হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'সাব, খালেদ মিঞা চলে গেল।'

ওয়ার্ডে ঢুকে মমতাজ দেখল, বিছানার ওপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তার বিবি। ডাক্তার ও নার্সরা তাকে ঘিরে আছে। মমতাজ বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুজে শুয়ে আছে খালেদ। মৃত্যুর শান্তি ছড়িয়ে আছে তার মুখে। মমতাজ তার রেশমের মতো চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে, 'লজেন্স খাবি খালেদ?'

খালেদের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মমতাজ বিড়বিড় করে বলে, 'খালেদ মিঞা, তুমি আমার ভয়টাকে নিয়ে যাবে না?'

মমতাজের মনে হল, খালেদ যেন মাথা নেড়ে বলল, 'জি আব্বা।'

গল্প শুনতে শুনতে শফিয়া কখন যেন আমার হাত চেপে ধরেছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তার চোখ মরুভূমির মতো উজ্জ্বল। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে সে ডাক দেয়, 'জুজিয়া জি—জুজিয়া জি—।'

শফিয়া তো কখনও নসরতকে ওই নামে ডাকেনি।

কুছ খুব নহীঁ ইতনা সতানা ভী কিসূকা
হ্যয় মীর ফকীর, উসকো নহ্‌ আজার দিয়া কর।।
(এমন করে কাউকে যন্ত্রণা দেওয়াটা কি খুব ভালো কাজ?
মীর এমনিতেও সর্বহারা, তাকে আর কষ্ট দিও না।।)

নসিবের কী লিখন দেখুন, কলকাতায় গিয়েছিলুম টাকার ঝোলা নিয়ে ফিরব বলে, আর ফিরে এলুম ফকিরের তাপ্পিমারা ঝুলি নিয়ে। একটা সুফি কিস্‌সা মনে পড়ে গেল, মান্টোভাই। এইসব কিস্‌সাই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে কবেই ফৌত হয়ে যেতুম। এক সুফি গুরু একদিন তাঁর শিষ্যদের বললেন, মানুষকে যতই সাহায্য করার চেষ্টা করো না কেন, দেখবে সেই মানুষের ভিতরে এমন কিছু থাকবে, যাতে কিছুতেই সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। শিষ্যরা অনেকেই তাঁর কথা মেনে নেয়নি।

এর কিছুদিন পরে তিনি এক শিষ্যকে বললেন, নদীর ওপর যে সেতুটা আছে, তার মাঝখানে এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা রেখে এসো তো। অন্য শিষ্যকে বললেন, শহর ঘুরে দেখো কোন মানুষটা ঋণে একেবারে জর্জরিত। তাকে সেতুর একদিকে নিয়ে এসে বলো সেতুটা পার হতে। তারপর দেখো কী হয়! গুরুর কথা মতো শিষ্যরা কাজ করল। যে লোকটিকে সেতু পার হওয়ার জন্য আনা হয়েছিল, সে সেতুর ওপারে আসতেই গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেতুর মাঝখানে কী দেখতে পেলে?'

—কই, কিছু না।

—কিচ্ছু দেখতে পাওনি?

—না।

—তা কী করে হয়? একজন শিষ্য বলল।

—সেতু পেরোনোর সময় হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা চোখ বন্ধ করে যদি যাই, তবে কেমন হয়? দেখাই যাক না, যেতে পারি কি না। তা দেখছি, চোখ বন্ধ করে ঠিক চলে এসেছি।

গুরু তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

কলকাতা থেকে ফেরার সময় ওই কিস্‌সাটাই বার বার মনে পড়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছি, গালিব তোমার পথের মাঝে অনেক স্বর্ণমুদ্রা ছড়ানো ছিল, কিন্তু খেয়ালের বশে তুমি চোখ বুজে এলে, তাই কিছুই পেলে না। অনেক পরে ভেবে দেখেছি, আমার জীবনে এছাড়া আর কীই বা হতে পারত? কত ভুলই না করেছি। দুনিয়াদারির হালহকিকৎ মাথায় ঠিক মতো ঢুকত না। আমি ভাবতুম একরকম, আর হয়ে যেত উল্টো। কেন বলুন তো, মান্টোভাই? এমনিতে তো আমি এমন কিছু ভোলাভালা মানুষ ছিলুম না, পেনশনের টাকা আদায় করতে কলকাতা অবধি ছুটেছিলুম তো, যাকে খুশি করার দরকার খুশি করতুম, যার পেছনে চিমটি মারলে মজা, তার পেছনে চিমটিও দিতুম, তবু ওই লোকটার মতো আমার অবস্থা দাঁড়াল, খেয়ালের বশে চোখ বুঝেই সেতু পার হলুম।

আরে, সেই জন্যেই তো দিল্লি দরবারে জায়গা পেতে এত দেরি হল। তাকেও অবশ্য জায়গা বলে না, কোনও মতে টিকে থাকতে পারলুম। দরবারের রাজনীতি বুঝতুম না, তারপর গোরাদের জমানা শুরু হতে চলেছে, সব মিলেমিশে, বুঝলেন মান্টোভাই, একেবারে ঘোটালা অবস্থা। রাজনীতি বোঝা আমার মতো বুরবাকের কম্মো না। চেষ্টা করলে কি আর বুঝতে পারতুম না? চেষ্টাই তো করিনি। জওকসাব এসব খুব ভাল বুঝতেন। তাই জাঁহাপনা বাহাদুর শাহও তাঁকে চোখে হারাতেন। কিন্তু জওকসাবের ক'টা শের আপনার মনে আছে? মান্টোভাই, একটা মানুষ দু'টো কাজ পারে না। রাজনীতি আর কবিতা—এ হল দুই মহলের ব্যাপারস্যাপার। এক মহলে জিততে চাইলে, অন্য মহলে তোমাকে হারতেই হবে। রাজনীতির মহলে আমি জিততে

পারিনি। জওকসাব আমাকে দেখলে মিটিমিটি হাসতেন। আমি মনে-মনে বলতুম, ঠিক হ্যায় মিঞা, হাসো, বহুৎ খুব, আওর হাসো, কিন্তু দরবারের খিদমতগারি করতে করতে কবিতা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তুমি বুঝতেও পারছ না। জওকসাব একদিন মজা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মির্জা, আপনার শের সহজে বোঝা যায় না কেন? এত কঠিন ক'রে লেখেন কেন?'

আমি হেসে বলেছিলুম, 'আপনার দিল কঠিন হয়ে যায়নি তো?'

—মানে?

আমি উত্তর দিইনি। মোমিনসাবের একটা শের বলেছিলুম :

রোয়া করেঙ্গে আপ ভি পহ্‌রোঁ ইসি তরহ্‌
অটকা কহিঁ যো আপ কা দিল ভি মেরী তরহ্‌।
(কাঁদবেন আপনিও প্রহরে প্রহরে আমার মতো
হৃদয় যদি বাঁধা পড়ে কোথাও, আমারই মতো।)

মান্টোভাই, দিল্লি দরবারের সঙ্গে যত জড়িয়েছি, ততই বুঝতে পেরেছি, রাজনীতির সঙ্গে কবিতার কখনও দোস্তি হতে পারে না। আমাদের বাদশা বাহাদুর শাহ এত-এত শের লিখতেন, সব কিচর, জঞ্জাল, আর আমি তাঁর চাকর বলে সেইসব শের সংশোধন করে দিতে হত। কিছুদিন পর্যন্ত গোরাদের ওপর আমার ভরসা ছিল, হয়তো ওরা নতুন কিছু করবে, কিন্তু ১৮৫৭-র পর বুঝতে পারলুম, সবই ক্ষমতার খেলা। আর কবিকে এই ক্ষমতার খেলা থেকে দূরে থাকতে হয়, মান্টোভাই, নইলে, আমি বলছি, লিখে রাখুন, কবিতা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে দরবারে গিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলতে পারে, অনেক বিষয়ে মতামত দিতে পারে, সব—সব ফালতু; আমরা তো আসলে তার কাছে কবিতাই চেয়েছিলুম। তার বদলে তিনি আমাদের কী দিলেন? বাদশা বাহাদুর শাহের জন্য লেখা প্রশস্তি। এছাড়া আর কীই বা দিতে পারেন জওকসাবদের মতো কবি, যাঁরা কোনও না কোনও ক্ষমতার কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন? তাঁদের বাজারদর তো বাঁধা হয়ে গেছে। সত্যি বলছি মান্টোভাই, পারলে ওই জওকের পেছনে আমি লাথি মারতুম; গজলের সঙ্গে এত দূর বেইমানি? একবার রাজনীতির ভেতরে গিয়ে ঢুকলে, বেইমানি আপনার রক্তে কখন ছড়িয়ে যাবে, বুঝতেও পারবেন না। রাজনীতি তো আসলে মুখোশ-বদলের খেলা। বাহাদুর শাহের সময় তো দরবারের কোনও রোশনাই ছিল না, সবই বিকিয়ে গেছে, তবু কত যে ষড়যন্ত্র আর পিছন থেকে এর পিঠে ওর ছুরি মারা দেখেছি।

বাদশা আকবর শাহ, মানে দু'নম্বর আকবর শাহ, তখন তখ্‌তে। হ্যাঁ, ১৮৩৪ সালই হবে। প্রথম বার আমি দরবার যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলুম। জাফর, মানে বাহাদুর শাহ তার পরে বাদশা হবেন। কিন্তু আমি জানতুম, আকবর শাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে অন্য এক ছেলে সেলিমকেই দেখতে চান। এ বিষয়ে বাদশা ইংরেজদের সঙ্গে

কথাবার্তাও চালাচ্ছিলেন। ভাবলুম, আমাকে সেলিমের দিকেই থাকতে হবে, কেননা জাফর ততদিনে জওককে উস্তাদ হিসেবে বরণ করেছেন। আকবর শাহের জন্য লেখা একটা কসীদায় সেলিমের খুব গুণগান করলুম, রাজা-বাদশাদের কাছে পৌঁছবার সেটাই তরিকা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টোটা। ইংরেজরা সেলিমকে মেনে নিল না; তিন বছর পর আকবর শাহের মৃত্যু হল, আর বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে বাদশা হয়ে গেলেন জাফর। আমার অবস্থাটা তা হলে বুঝতেই পারছেন। বাহাদুর শাহের কাছে একেবারে নামঞ্জুর হয়ে গেলুম। তাঁকে উদ্দেশ্য করেও অনেক কসীদা লিখেছিলুম, কিন্তু তাঁর মন পেলুম না, দরবারেও যাওয়া হল না। কালে সাহেব আর অহ্‌সানউল্লা খান সাহেবের সুপারিশে অনেক পরে আমাকে দরবারে জায়গা দিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি যেন তার গলার কাঁটা হয়েই ছিলুম।

খেয়াল বড় মারাত্মক জিনিস; খেয়ালের পাল্লায় যে পড়েছে তার জীবন সতরঞ্জের খোপ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেই। আর ওই যে, অন্ধের মতো ভাবতুম, আমার শরীরে মোঘল রক্ত, আমির খসরুর পর আমার মতো ফারসি গজল কে লিখতে পারে, বুঝতেই চাইনি, রুপেয়া না-থাকলে রক্তের কোনও মূল্য নেই, তোমার গজল লোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। দিল্লি কলেজে তো পড়ানোর চাকরি হয়ে যেত আমার। ফারসি পড়ানোর জন্য কলেজের একজন শিক্ষক দরকার ছিল। ভারত সরকারের সচিব থমসন সাহেব এসেছিলেন সাক্ষাৎকার নিতে। কবি মোমিন খান, মৌলবি ইমাম বখ্‌শ আর আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছিল ফারসি শিক্ষক-পদের জন্য। থমসন সাহেব আমাকেই প্রথম ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তো পাল্কিতে চড়ে সাহেবের বাড়িতে গেলুম; বাড়িতে পৌঁছে সাহেবকে খবর পাঠিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। সাহেব এসে আমাকে না নিয়ে গেলে ভিতরে যাব কেন? তোমার দরজায় যদি একজন মির্জা আসেন, তাকে নিজে এসে আপ্যায়ন করে নিয়ে যাওয়াই তো তরিকা। অনেকক্ষণ চলে যাওয়ার পর সাহেব এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মির্জাকে আপ্যায়নের তরিকার কথা সাহেবকে বললুম। সাহেব হেসে বললেন, 'আপনি যখন গভর্নরের দরবারে আসবেন তখন নিশ্চয়ই আপ্যায়ন করা হবে। কিন্তু এখন তো আপনি চাকরির জন্য এসেছেন মির্জা।'

আমি বললুম, 'একটু বেশি সম্মান পাওয়ার জন্যই তো সরকারি চাকরি করব বলে ভেবেছি। এ তো দেখছি, যেটুকু সম্মান আমার আছে, তাও আর থাকবে না।'

—এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই মির্জা।

—তা হলে আপনিও আমাকে মার্জনা করুন। চাকরিটা আমি নিচ্ছি না।

কথাটা বলে সাহেবের দিকে আর ফিরেও তাকাইনি। পাল্কিতে উঠে বসলুম। চাকরিটা পেলে আমার একটু সুরাহা হত, উমরাও বেগমের মুখে হাসি দেখতে পেতুম,

কিন্তু খোদা যে আমার জীবনের জন্য অন্য খেলা ছকে রেখেছেন।

কলকাতা থেকে ফেরার পর শাহজাহানাবাদ আমার কাছে জেলখানা হয়ে উঠল। মাথায় চল্লিশ হাজার টাকার ওপরে দেনার বোঝা। কীভাবে শোধ করব জানি না। মান্টোভাই, একা-একা ঘরে বসে একটা-একটা করে মাথার চুল ছিঁড়ি। রাস্তায় বেরোলেই পাওনাদাররা চেপে ধরে, 'কী হল মিঞা, কলকাতা যাওয়ার আগে কত বড়-বড় কথা বলে গেলেন।'

আমাকে মিনমিন করে বলতে হয়, 'আর একটু সময় দিন। কিছু একটা হয়ে যাবেই। আমার কেসটা তো উঁচু আদালতে গেছে।'

কিন্তু আমি জানতুম, কিছুতেই কিছু হবে না। উঁচু আদালতে পাঠানো রিপোর্ট তো নিগ্রোর কোঁকড়ানো চুলের মতো, আশিকের রক্তঝরা হৃদয়ের মতো, বধ্যভূমিতে উচ্চারিত হত্যার ঘোষণার মতো।

একদিকে পাওনাদার, অন্যদিকে শামসউদ্দিনের পা-চাটা লোকজনেরা। চোখ নাচিয়ে, হেসে আমাকে জিগ্যেস করত, 'কী মিঞা, কলকাতায় কী হল বলুন?' ওরা সবই জানত। কিন্তু মানুষ তো অন্য মানুষের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েই আনন্দ পায়। আমি ওদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠলুম। বাইরে আর বেরুতে ইচ্ছে করত না। একা দিবানখানায় বসে একের পর এক চিঠি লিখতুম নাসিখসাবকে, মীর আজম আলি, হাকিরকে। খৎ লিখতে-লিখতে যেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতুম। আর তো কেউ কথা বলার ছিল না; মহলে নয়, শাহজাহানাবাদেও নয়; দূরের মানুষের সঙ্গেই সারা জীবন আমার যত কথাবার্তা। তারা কেউ এই মাটি-পৃথিবীতে থাকে, কেউ আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়ায়। মান্টোভাই, আমি ধীরে-ধীরে বুঝতে পারছিলুম, এই দুনিয়ায় আমার কোনও দেশ নেই, আমি এখানে নির্বাসনে এসেছি।

এক দুপুরে হঠাৎই উমরাও বেগম দিবানখানায় এল। আমি তখন মনে-মনে একটা নতুন গজল ভাঁজছি আর কাপড়ে গিঁট দিচ্ছি। কাপড়ে গিঁট দেওয়ার ব্যাপারটা জানেন না তো? ওটা আমার অভ্যেস ছিল। একটা গজল কখন, কোথা থেকে ভেসে আসবে, কেই বা জানে। কাগজ-কলম নিয়ে বসার অভ্যেস আমার ছিল না। এক-একটা শের মনে-মনে ভাঁজছি, আর কাপড়ে একটা করে গিঁট দিচ্ছি। একটা গিঁটে বাঁধা রইল একটা শের। তারপর কাউকে এক সময় বলতুম লিখে নিতে। কাপড়ের এক-একটা গিঁট খুলতেই এক-একটা শের বেরিয়ে আসত। আমার বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল না, মান্টোভাই। কখনও নিজের হাভেলি করার কথা মনেও আসেনি, সঞ্চয় নেই বলে দুঃখ হয়নি, শুধু চেয়েছিলুম, কয়েকটা মানুষ যেন একটু ভাল ভাবে খেয়ে-পরে থাকতে পারি, রোজ সন্ধেবেলা যেন পছন্দের পানীয়টুকু পাই। একটা কিতাব পর্যন্ত কখনও কিনিনি। ধার করে পড়েছি। আমার বাড়িতে কোনও কিতাব ছিল না, মান্টোভাই। কী হবে কিতাব দিয়ে? খোদা তবে দিলকেতাব দিয়েছেন কেন?

কথায়-কথায় আবার খেই হারিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, তো এক দুপুরে উমরাও বেগম এল আমার কাছে। তখন একটা শের মনের ভেতরে পাক খাচ্ছে :

মওত কা একদিন মুআইন হ্যায়
নিদঁ কিয়োঁ রাত ভর নহীঁ আতী।

সত্যিই তখন আমার মনের অবস্থা ওইরকম। সবসময় মনে হয়, একমাত্র মৃত্যুই আমাকে এত অপমান, নিগ্রহ থেকে মুক্তি দিতে পারে। মৃত্যু তো আমি ডাকলেই আসবে না। যখন আসবার সে আসবে। কিন্তু সারা রাত আমার চোখে ঘুম আসে না কেন? মনে হত, নিজের কবরের সামনেই বসে আছি। গৃহবন্দি হওয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোনও রাস্তা ছিল না। বাইরে বেরুলেই পাওনাদাররা ঘিরে ধরে। মাঝে মাঝে বাড়িতেও হানা দেয়। তারপর দু'জন পাওনাদার গিয়ে আদালতে নালিশ করল। রায় বেরুল, হয় আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে, না-হলে জেলে যেতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব? তাই বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। শাহজাহানাবাদে রইস আদমিদের জন্য একটা নিয়ম ছিল। কারও নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকলে, সে রাস্তায় না-বেরুলে বাড়িতে এসে গ্রেফতার করা হত না। তাই নিজের ঘরেই কারাবাস মেনে নিতে হল আমাকে। দোস্তরাও কেউ আসে না। মান্টোভাই, একেই বোধহয় বলে কাফেরের জীবন। তবে একশো বছর দোজখে থেকে কাফের যে-যন্ত্রণা ভোগ করে আমি তার দ্বিগুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। উরফির কবিতা মনে পড়ত বারেবারেই। ভাগ্য আমার পেয়ালায় যে বিষ ঢেলে দিয়েছে, তার তিক্ত বাস আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে, আশা-নিরাশার দোলায় দুলত আমার হৃদয়।

বেগম বলল, 'আপনি ঘর থেকে একেবারেই বেরোন না শুনলাম, মির্জাসাব?'

আমি হেসে বললুম, 'আমার খবর তুমি রাখো না কি, বেগম?'

—আপনি কি খোঁচা না-দিয়ে কথা বলতে পারেন না?

—খোঁচা দেব কেন? তুমি থাকো মসজিদে, সেখানে কাফেরের খবর পৌঁছয় কী করে?

—আমি বোধহয় আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন, তাই না?

—তা কেন? তা কেন? মজাও বোঝো না? বোসো বেগম। আমি তাকে সব কথা খুলে বললুম।

—কিন্তু এভাবে আপনি থাকবেন কী করে মির্জাসাব?

—পারছি তো বেগম।

—না, না। মানুষ এইরকম থাকলে পাগল হয়ে যায়। দোস্তরা কেউ আসে না কেন?

—কে আমার দোস্ত? হ্যাঁ, একজনই আছে—মওত—সে কবে আসবে তা তো জানি না।

—ইয়া আল্লা। মওতের কথা কেন বলেন আপনি?

—এছাড়া আর কী চাইবার আছে আমার জীবনে? উদ্দেশ্যহীন একটা জীবন কেটে যাচ্ছে আমার। কোথাও কোনও নকশা দেখতে পাই না। নকশা তো একটা থাকার কথা ছিল। মওলা রুমির মুর্শিদ শামসউদ্দিন তাবরিজির কথা ক'দিন ধরেই মনে পড়ছে, বেগম। শামসউদ্দিনসাব তখন যুবক। দিনের পর দিন রাতে ঘুমোতে পারেন না, খিদে পায় না তাঁর। বাড়ির লোকেরা বারবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মুহম্মদ—হ্যাঁ তাঁর আসল নাম ছিল মুহম্মদ মালেকদাদ—কেন ঘুমোতে পারো না, কেন কিছু খাও না? শামসউদ্দিনসাব বলেছিলেন, 'আল্লা আমাকে ধুলো থেকে তৈরি করেছেন। তিনি কেন আমার সঙ্গে কথা বলছেন না? তা হলে আমি কেন খাব, কেন ঘুমোব? আমি তাঁর কাছে জানতে চাই, কেন আমাকে সৃষ্টি করলেন, কবে আমি এসেছি, কোথায় যাব? তিনি যদি আমাকে উত্তর দেন, তবেই আমি আবার খেতে পারব, ঘুমোতে পারব।' আমার জীবনের নকশাটা যদি দেখতে পেতুম, বেগম।

—তা হলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন কেন, মির্জাসাব?

—ঠাট্টা করি না বেগম। তবে তোমার-আমার পথ আলাদা। তোমার আল্লা থাকেন মসজিদে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো তুমি। মৌলবি-মোল্লারা তোমাকে পথ দেখান। আর আমার খোদা থাকেন দরগায়, সেখানে মওলা রুমি গান করেন, শেমা নাচেন। তোমার পথটা আমার জন্য নয় বেগম; আমি আনন্দ-উৎসবের ভেতরে খোদাকে পেতে চাই।

—আমিও তাই চাই মির্জাসাব। কিন্তু আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই বলেন না। বলতে-বলতে উমরাও কেঁদে ফেলেছিল। মান্টোভাই, সেই প্রথম আমার মনে হল, কত দীর্ঘ দিন ধরে উমরাও বেগমও জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে। আমি যদি তার দিকে একবার হাত বাড়িয়ে দিতে পারতুম! পারিনি। একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে, মান্টোভাই?

উমরাও বেগম মহলসরায় চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি কাপড়ে গিঁট দিলুম :

দিখাউঙ্গা তমাশা দী অগর ফুরসত জমানে নে
মেরা হর দাগ-এ দিল এক তুখমা হ্যায় সর্ব-এ-চিরাগাঁ কা।

শোনো, শোনো বেগম, আমি তোমাকে বলছি, যদি সময় পাই তবে আমিও দেখিয়ে দেব, আমার হৃদয়ের ক্ষতগুলো এক-একটা অঙ্কুরিত বীজ।

বন্দিত্বের দিনগুলোতে আমার একজন বন্ধু তো সঙ্গেই ছিল—আমার গজল। মান্টোভাই, আমি সেই গভীর-গোপন সুরকে জিগ্যেস করলুম, বলো তো, আমার

নসিবে কেন এই সারা জীবনের বন্দিত্ব? সে কী বলল জানেন? আরে তুমি কি কাক যে জাল পেতে তোমাকে ধরা হবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য? তুমি বুলবুল বলেই তো খাঁচায় বন্দি করা হয়েছে, কত অনাগত যুগকে গান শোনাবে তুমি। মানুষ এভাবেই নিজের সামনে কত মরীচিকা যে তৈরি করে রাখে! গালিবের ব্যর্থতার কথা কোনও শব্দে প্রকাশ করা যায় না, মান্টোভাই। অন্ধকারে ডুবে আছে আমার ঘর। আমি নিভে যাওয়া মোমবাতি ছাড়া কিছু নই। লজ্জায় নিজের কালো মুখের দিকে নিজেই তাকাতে পারি না।

এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সময়ের কোনও হিসেবই করতে পারতুম না। মনে হত, জন্ম থেকেই যেন এই ঘরে বন্দি হয়ে আছি। শুধু কাল্লুর সঙ্গে মাঝেমধ্যে যা কথাবার্তা। সন্ধেবেলা শরাব দিতে এসে কাল্লু কিছুক্ষণ আমার সামনে বসে থাকত। আর ওর তো একটাই নেশা, কিস্‌সা শোনা। কিছু বলত না, শুধু চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমি কখন কথা বলব, সেই অপেক্ষায়। তারপরেই একটা কিস্‌সার জন্য আবদার করবে কাল্লু। এমন আজিব আদমি আমি দেখিনি ভাইজানেরা। কিস্‌সার পর একটা কথা বলবে না। রোজ-রোজ কি আর কিস্‌সা বলতে ভাল লাগে? তবে একেকদিন বলতুম। নইলে কাল্লুই বা বাঁচবে কী করে? একটা মজার কিস্‌সা, ইশ্‌কের কিস্‌সা শুনিয়েছিলুম একদিন কাল্লুকে। শুনুন, আপনাদেরও ভাল লাগবে, ভাইজানেরা; গালিবের কফন-ঢাকা জীবনের কথা কতই বা আর শুনবেন?

এ এক সুন্দরীর গল্প। তার নাম জাহানারা। কেমন তার রূপ? মীরসাব যেমন একটা শের-এ লিখে গেছেন :

উসকে ফরোগ-এ হুস্নসে চুকে হ্যাঁয় সবনে
শমা-এ হিরম হো য়া দীয়া সোমনাথ কা।।
(তার রূপের ঔজ্জ্বল্যের কাছে সবাই ঋণী
কাবার বাতিই হোক অথবা সোমনাথের প্রদীপ।।)

তিনজন যুবক জাহানারাকে নিকে করার জন্য নবাবের দরবারে এল। কেউ কারও চেয়ে কম নয়; নবাব ঠিকই করতে পারেন না, কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। শেষে তিনি মেয়ের হাতেই পছন্দের ভার ছেড়ে দিলেন। মাসের পর মাস চলে যায়, জাহানারা তবু মন ঠিক করতে পারে না। খোদার কী খেয়াল। নিকে আর হল না সুন্দরীর; হঠাৎই অসুস্থ হয়ে মারা গেল আমাদের গল্পের জাহানারা। তিন যুবক তাকে একসঙ্গে মিলে কবরে শুইয়ে দিয়ে এল। প্রথম যুবক রয়ে গেল সেই সমাধিক্ষেত্রেই। সে শুধু ভাবত, নসিবের এ-কোন খেলা তার আশিককে দুনিয়া থেকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে গেল!

দ্বিতীয় যুবক ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। যাকে সে ভালবেসেছে, তার মৃত্যুর কারণ সে জানতে চায়। আর তৃতীয় যুবকটি রয়ে গেল নবাবের কাছে, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য।

যে ফকির হয়েছিল, সে অনেক জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে এল এক নতুন দেশে। শুনতে পেল, সেখানে নাকি একজন মানুষ থাকেন, যিনি আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটাতে পারেন। ফকির-যুবক তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। রাতে যখন তারা দু'জনে খেতে বসেছে, তখন সেই জ্ঞানী মানুষটির নাতি কেঁদে উঠল। মানুষটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গিয়ে বাচ্চা ছেলেটিকে আগুনে ফেলে দিলেন।

ফকির-যুবক চিৎকার করে উঠল, 'এ কী করলেন আপনি? দুনিয়ায় অনেক পাপ-দুঃখ দেখেছি আমি, কিন্তু এমন অপরাধ কেউ করতে পারে?'

মানুষটি হেসে বললেন, 'এত ভাববেন না। যথার্থ জ্ঞান না-থাকলে সাধারণ বিষয়কেও অন্যরকম মনে হয়।' বলেই তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আগুনের ভেতর থেকে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল।

ফকির-যুবক মন্ত্রটি স্মরণ রেখেছিল। সে বেশ কিছুদিন পর ফিরে এল নিজের দেশে। প্রেমিকার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতেই জাহানারা তার সামনে এসে দাঁড়াল। নবাব তো মেয়েকে পেয়ে দেশ জুড়ে উৎসব শুরু করে দিলেন। তিন যুবক জাহানারাকে নিকে করার জন্য আবার এল। জাহানারা কাকে বেছে নিয়েছিল জানেন? তার আশিককে। কে তার আশিক, বলতে পারেন মান্টোভাই?

হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন? এটুকু না বলতে পারলে, আপনাকে তো লেখক হিসেবে মেনে নেব না।

কী বললেন, হ্যাঁ...হ্যাঁ...ঠিক বলেছেন, আমি জানতাম আপনি বলতে পারবেন। ফকির-যুবক জাহানারাকে জীবন দিয়েছে, এর নাম মানবিকতা। তৃতীয় যুবক একেবারে সন্তানের মতো নবাবকে সান্ত্বনা দিয়েছে। প্রথম যুবকই, হ্যাঁ, একমাত্র সেই আশিক, যে এতদিন ধরে সুন্দরীর সমাধির পাশে বসে থেকেছে। মৃত্যুও তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম, দিল্লির রেসিডেন্ট ফ্রেজারসাহেব খুন হয়ে গেছেন। ইয়া আল্লা!
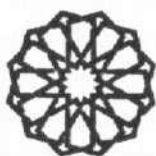
তুম-সে বেজা হৈ মুঝে অপনী তবাহী-কা গিলা,
ইস-মেঁ কুছ শাইবা-এ খূবী-এ তকদীর-ভী থা।।
(কেমন করে তোমাকে বলি তুমিই করেছো আমার সর্বনাশ,
এতে ভাগ্যের দশ হাতের খেলাও ছিল কিছু।।)

বম্বে শহরটা আমার সঙ্গে কথা বলত, মির্জাসাব। বলবে না-ই বা কেন বলুন? বম্বে আর আমার জীবনের এত মিল, মাঝে মাঝে মনে হত, আমি একদিন আসব বলে শহরটা অপেক্ষা করে ছিল। দেশভাগের পর লাহোরে গিয়েও মনে হত, আমি যেন বম্বেতেই আছি, ভাইজানেরা। বারো বছর ধরে বম্বের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা; শহরটা ছেড়ে যাওয়ার সময় মনে হয়েছিল, দু'টো ডানা হারিয়ে একটা পঙ্গু সিন্ধুসারস পাকিস্তানে চলেছি। আমার মতো একটা লাথখোরকে তো আশ্রয় দিয়েছিল বম্বেই। আমার কানে ফিসফিস করে বলেছিল, দিনে দু'পয়সা বা দশ হাজার টাকা, যাই রোজগার করো না কেন, ইচ্ছে করলেই তুমি এখানে মস্তিতে থাকতে পারো, মান্টো। পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষ হিসেবেও এখানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো তুমি। যা খুশি, তা-ই করতে পারো। কেউ তোমার খুঁত ধরতে আসবে না। কেউ তোমার কানের কাছে এসে ভাল হওয়ার কথা বলবে না। একা তোমাকেই সবচেয়ে কঠিন কাজ করতে হবে, হ্যাঁ, একা তোমাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি ফুটপাথে থাকতে পারো, প্রাসাদেও থাকতে পারো; তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও কিছু যাবে আসবে না। আমি যেখানে আছি, সেখানেই থেকে যাব। সে আমার হাত ধরে তার সব গলিঘুঁজি, রইস এলাকা, সমুদ্র, তার দিন-রাত্রি, তার উল্লাস-শিহরন-পাপ-পতন চিনিয়েছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি আমি কাউকে কখনও ভালবেসে থাকি, তবে ওই শহরটাকে, আর কাউকে নয়।

মির্জাসাবের তুলনায় আমার জীবন খুব ছোট, ভাইজানেরা। তাই আমার জীবনের কিস্‌সা বলতে হলে, কত যে মানুষের কথা বলতে হবে। বম্বেই আমাকে এইসব মানুষকে চিনিয়েছিল। আমি যেসব গল্প লিখেছি, তার চরিত্ররা সবাই আমার চেনা; চেনা বলছি কেন, তাদের সঙ্গেই তো আমি জীবন কাটিয়েছি, তারা আমার আত্মার আত্মীয়। আমি যা লিখেছি, সব—সব ব্যক্তিগত, আমার নিজের দেখা-শোনা-জানা-অনুভবের কথা। কোনও বিশেষ রাজনীতি আমার অনুপ্রেরণা ছিল না। তাই কখনও

আমাকে প্রগতিশীল, কখনও প্রতিক্রিয়াশীল বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যের নামে টন-টন কাগজ খরচ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ছাপা হয়েছে তার মতো কদর্য, অসৎ সাহিত্য আর কখনও দেখা যায়নি। তাকে সাহিত্য বলা যায় না। কোনও রাজনীতি বা তত্ত্বের চশমা চোখে লাগিয়ে আমি দুনিয়াটাকে দেখিনি, ভাইজানেরা। নিজের মতো করে বুঝতে চেয়েছি, যাকে কখনও দেখিনি, তার গল্প শুনেও বুঝতে চেয়েছি একটাই কথা—জীবন আমাদের জন্য কী নিয়ে এসেছে? তা হলে পেরিন-এর কিস্‌সাটাই শোনাই আপনাদের। পেরিনকে আমি কখনও দেখিনি, শুধু তার কথা শুনেছি ব্রিজমোহনের কাছে, তবু এই গল্পের প্রধান চরিত্র পেরিন পেরিন যেন বম্বের আত্মা।

আমি তখন সেই খোলিতে থাকি, যার কথা আগেই আপনাদের বলেছি। বম্বের খোলি মানে দোজখের চেয়েও নোংরা। ছারপোকা, উকুন, ইঁদুর, মানুষ—একসঙ্গে থাকে। সে বাড়িটায় একটাই গোসলখানা, তার দরজা বন্ধ করা যায় না। ভোর থেকে মেয়েরা সেখানে ভিড় করে খাবার জল নেওয়ার জন্য। তারপর চান করার জন্য লাইন পড়ে যেত। ব্রিজমোহন থাকত আমার পাশেরই একটা খোলিতে। প্রতি রবিবার ব্রিজমোহন তার বান্ধবী পেরিনের সঙ্গে দেখা করতে যেত বান্দ্রায়। পেরিন পারসি মেয়ে। ওর সঙ্গে ব্রিজমোহনের সম্পর্কটা যে আসলে কী, তা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। ব্রিজমোহন কেন প্রতি রবিবার বান্দ্রায় যায়? পেরিন যেন তার জীবনের তীব্র এক নেশা। যাওয়ার জন্য প্রত্যেকবার আমাকে আট আনা ধার দিতে হত তাকে। বান্দ্রায় গিয়ে পেরিনের সঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে সে ফিরে আসত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করো তোমরা? বেড়াতে যাও, না ঘরে বসে আদর-টাদর করো?'

—না, না। ব্রিজমোহন হেসে বলে, 'পেরিনের জন্য শব্দজব্দ সমাধান করে দিই।'

—শব্দজব্দ?

—ইলাসট্রেটেড উইকলিতে বেরোয় তো। পেরিন ওগুলো পাঠায়। অনেকগুলো প্রাইজও পেয়েছে।

ব্রিজমোহনের কোনও কাজ ছিল না। খোলিতে বসে ও পেরিনের জন্য শব্দজব্দের সমাধান করত। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'পেরিন তো প্রাইজ পায়। তুমি কী পাও?

—কিছু না।

—প্রাইজের একপয়সাও তোমাকে দেয়নি?

—না।

—কেন? তুমিই তো ওর শব্দজব্দ করে দাও।

—তাতে কী? পেরিন তো ওর নামেই পাঠায়। ও প্রাইজ জেতে। আমাকে পয়সা দেবে কেন?

—আচ্ছা বুরবাক তুমি!

ব্রিজমোহন ওর হলদেটে দাঁত বার করে হাসত।

ছবি তুলত ব্রিজমোহন। পেরিনের অনেক ছবি আমাকে দেখিয়েছিল। কত ভঙ্গিমা, কত পোশাক। শালওয়ার-কামিজে, শাড়িতে, প্যান্ট-শার্টে, এমনকী সাঁতারের পোশাক পরেও। ছবি দেখে পেরিনকে আমার একেবারেই সুন্দরী মনে হয়নি। কিন্তু ব্রিজমোহনকে কখনও সে-কথা বলিনি, মির্জাসাব। কে কাকে সুন্দর দেখবে, সে তার চোখের ব্যাপার। ওই যে বলে না, আমারই চেতনার রঙে পান্না হয়ে উঠল সবুজ। পেরিন সম্পর্কে ব্রিজমোহনের কাছে আমি কিছুই জানতে চাইনি। ব্রিজমোহনও আমাকে যেচে কিছু বলেনি। শুধু আমি জানতাম, প্রতি রবিবার নাস্তা করে ব্রিজমোহন বান্দ্রা যাওয়ার জন্য আমার কাছে এসে আট আনা চাইবে, আর আমাকে ওই পয়সাটুকু দিয়ে দিতে হবে। দুপুরের মধ্যেই ব্রিজমোহন ফিরে আসত। এক রবিবার ফিরে এসে ব্রিজমোহন বলল, 'সব খতম করে দিলাম।'

—মানে?

—মান্টোভাই, আগে তোমাকে কখনও বলিনি। আসলে পেরিন আমার জীবনের কুফা। ওর সঙ্গে যখনই রেগুলার দেখা করি, আমার কোনও কাজ থাকে না। এই কথাটাই আজ পেরিনকে বলেছি।

—শুনে কী বলল?

—বলল, তা হলে আর দেখা কোরো না। দ্যাখো কোনও চাকরি পাও কি না। তুমি ভাবো, আমার জন্য কাজ প ও না, আসলে দোষ তোমারই। তুমি কাজ করতে চাও না।

—তুমি কী বললে?

—ওসব কথা বাদ দাও, মান্টোভাই। কাল আমি একটা কাজ জোগাড় করবই। তুমি শুধু কাল সকালে আমাকে চার আনা দিও। আমি শেঠ নানুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

শেঠ নানুভাই ছিলেন সিনেমার পরিচালক। আগেও অনেকবার তিনি ব্রিজমোহনকে কাজ দেননি। তবু পরদিন সকালে আমি ব্রিজমোহনকে বাসভাড়া দিলাম। রাতে ফিরে শুনলাম, নানুভাই ব্রিজমোহনকে কাজ দিয়েছেন। মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে। ব্রিজমোহন পকেট থেকে এ শো টাকা বার করে বলল, 'এই যে অ্যাডভান্স। খুব ইচ্ছে করছিল বান্দ্রায় গিয়ে পেরিনকে জানিয়ে আসি। তারপরেই মনে হল, ওর কাছে গেলেই পরদিন কাজটা চলে যাবে। এমনটাই তো সবসময় হয়েছে, মান্টোভাই। কাজ পেয়েছি, পেরিনকে জানাতে গেছি, তারপরেই বরখাস্ত হয়েছি। ভগবানই জানে, কোন গ্রহনক্ষত্রে ওর জন্ম। তবে গ্রহটা যে অশুভ, তা আমি জানি। শোনো মান্টোভাই, অন্তত এক বছর আমি ওর থেকে দূরে থাকব। থাকতেই

হবে। জামাকাপড়ের অবস্থা দেখেছ? একবছর ঠিকঠাক কাজ করতে পারলে, কয়েকটা জামাপ্যান্ট তো বানানো যাবে।'

ছ'মাসের মধ্যে ব্রিজমোহন পেরিনের কাছে গেল না, মির্জাসাব। মজাসে চাকরি করছে, নতুন জামাকাপড় হয়েছে। ওর ছিল খুব রুমালের শখ। সুন্দর-সুন্দর সুতোর কাজ করা অনেক রুমাল কিনেছে। হঠাৎ একদিন ওর নামে একটা চিঠি এল। চিঠিটা হাতে নিয়েই ব্রিজমোহন বলে উঠল, 'সব খতম হয়ে গেল, মান্টোভাই।'

—কেন?

—পেরিনের চিঠি।

—কী লিখেছে?

—রোববার যেতে লিখেছে। আমাকে নাকি অনেক কথা বলার আছে। আজ শনিবার তো?

—হ্যাঁ। তাতে কী?

—তার মানে পরশু শেঠ নানুভাই আমাকে লাথ মারবে।

—তা হলে পেরিনের কাছে যেও না।

—তা হয় না, মান্টোভাই। ও চাইলে আমাকে যেতেই হবে।

—কেন?

ব্রিজমোহন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'আমিও কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মান্টোভাই। ছ'মাস তো হয়ে গেল।'

পরদিন বান্দ্রায় গেল ব্রিজমোহন। ফিরে এসে আমাকে পেরিনের কথা কিছুই বলল না। হাজির হোটেলে খেতে বসে একবার শুধু বলল, 'দেখা যাক, কাল কী হয়!'

সোমবার ব্রিজমোহন ফিরে এসে হা-হা করে হাসতে শুরু করল।—আমি জানতাম, মান্টোভাই, আমি জানতাম। পেরিন ওর কাজ ঠিক করেছে।

—কী হল?

—স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেল, মান্টোভাই। শুধু আমার জন্য। আমি কাল পেরিনের কাছে না গেলে—বলতে-বলতে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রিজমোহন। এত রাতে ক্যামেরা নিয়ে ও কোথায় যাবে?

ব্রিজমোহন আবার বেকার হয়ে গেল। জমানো যা টাকা ছিল, ফুরিয়ে গেল। আবার সেই পুরনো নিয়ম চালু হল। প্রত্যেক রবিবার নাস্তার পর সে আমার কাছে এসে আট আনা নিয়ে বান্দ্রায় যায়, কয়েক ঘণ্টা পেরিনের সঙ্গে কাটিয়ে খোলিতে ফিরে আসে।

একদিন ব্রিজমোহনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পেরিন তোমাকে ভালবাসে?'

—না।

—তা হলে, প্রতি রোববার যাও কেন?

—না গিয়ে পারি না, মান্টোভাই।

—পেরিন কি—

ব্রিজমোহন ঝাঁজিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেরিন অন্য একজনকে ভালবাসে। কিন্তু তাতে দোষ কোথায়?'

—দোষ কিছু নেই। তোমাকে ডেকে পাঠায় কেন?

—পেরিনের খুব একা লাগে।

—কেন?

—জানি না। ও কখনও বলেনি।

ব্রিজমোহন তার বিছানায় শুয়ে পড়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'হয়তো আমাকে দেখে ও মজা পায়। মান্টোভাই, জীবনে এমন মানুষও তো দরকার, যাকে দেখে মজা পাওয়া যায়। হয়তো আমি ওর ছবি তুলি বলে। ছবিতে ওকে অনেক সুন্দর দেখায় তো, কে জানে, হয়তো শব্দজব্দ সমাধান করে দিই বলে। মান্টোভাই, এই মেয়েদের তুমি বুঝতে পারবে না।'

—কেন?

—তুমি ভালবাসা চাও।

—আর তুমি?

—জানি না। তবে পেরিনের মতো মেয়েদের জানি।

—কীরকম ওরা?

—ওরা অন্য কাউকে ভালবাসে, তার ভেতরে যা পায় না, অন্যের মধ্যে তা খুঁজে পায়, তখন তাকে শঙ্খলাগা সাপের মতো জড়িয়ে ধরে মনে-মনে। শরীরের কাছে কিছুতেই পৌঁছতে দেয় না।

—তা হলে তুমি যাও কেন?

—ভাল লাগে।

—কী ভাল লাগে? পেরিন তো তোমাকে কিছু দেয় না।

ব্রিজমোহন হাসে।—দেয় তো। ওর নক্ষত্রের দোষ আমার ওপর চাপিয়ে দেয়, মান্টোভাই। আমি তো একটা খেলাই খেলে যাচ্ছি। কত কালো মেঘ ও আমার জীবনে নিয়ে আসতে পারে! পেরিনের তুলনা নেই। যতবার ওর কাছে গেছি, আমি কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েছি। আমার শুধু একটাই ইচ্ছে।

—কী?

—পেরিনকে আমি একবার ঠকাব।

—কী করে?

ব্রিজমোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। শুনতে পাই, একটা ইঁদুর ঘরের ভিতরে কটকট করে কিছু কেটে যাচ্ছে। ব্রিজমোহন বিছানা থেকে নেমে পায়চারি করতে থাকে। আমি আবার বলি, 'পেরিনকে ঠকানোর প্ল্যানটা ঠিক করেছ?'

—হুঁ।

—কীরকম?

—চাকরি থেকে তাড়ানোর আগে আমি ইস্তফা দিয়ে দেব। মালিককে সরাসরি বলে দেব, আমি জানি, আপনি আমাকে তাড়াবেন, কিন্তু এমন খারাপ কাজ করতে না-দেওয়ার জন্য আমিই ইস্তফা দিচ্ছি। আমি তাঁকে আর একটা কথাও বলব। আসলে আপনি নন, পেরিন আমাকে বরখাস্ত করছে। এটুকুই আমার ইচ্ছে, মান্টোভাই।

—অদ্ভুত ইচ্ছে।

—হ্যাঁ।

ব্রিজমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর ফিরে আসে। আমি জিগ্যেস করি, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

—আকাশ দেখতে। মান্টোভাই, রাত্তিরবেলা আমি বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি না। খোলিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই আকাশ দেখতে যাই।

—কী দেখ, ব্রিজমোহন?

—কিছু না।

—তারা দেখ?

—অন্ধকার নীল দেখি শুধু, মান্টোভাই, তার ভেতরে আমার অদ্ভুত ইচ্ছেরা ফুটে আছে। আগের রোববারেই পেরিনের একটা ফটো তুলেছি। ফটোটা ওর লাভার নিজের নামে একটা কম্পিটিশনে পাঠাবে। আমি শিওর, মান্টোভাই, ছবিটা প্রাইজ পাবেই।

—লোকটাকে তুমি চেনো?

—না। এর আগেও কতবার আমার তোলা পেরিনের ছবি পাঠিয়ে লোকটা প্রাইজ পেয়েছে।

—পেরিন তোমাকে কিছু বলেনি?

—না।

এক রবিবার বান্দ্রা থেকে ফিরে এসে ব্রিজমোহন বলল, 'এবার সত্যিই সব শেষ করে এলাম, মান্টোভাই। কয়েকদিনের মধ্যেই চাকরি জোগাড় করব। শেঠ নিয়াজ আলি নতুন সিনেমা তৈরি করছে। শেঠের ঠিকানাটা জোগাড় করে দিতে পারো?'

—দেখি।

এক বন্ধুকে ফোন করে শেঠ নিয়াজ আলির ঠিকানা পাওয়া গেল। পরদিন

ব্রিজমোহন শেঠের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাজটা পেয়ে গেলাম, মান্টোভাই। মাসে দু'শো টাকা দেবে। তবে খুব তাড়াতাড়ি মাইনে বাড়াবে বলেছে। খুশি তো?'

—তুমি খুশ হলে আমিও খুশ।

—ওঃ বাঁচা গেল। ব্রিজমোহন বিছানায় ঝাঁপ দিল।

পরদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পেরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?'

ব্রিজমোহন মিটিমিটি হেসে বলল, 'ইচ্ছে তো করছে। কিন্তু—না, মান্টোভাই, এবার আর তাড়াহুড়ো নয়। কয়েকটা নতুন জামা-প্যান্ট কিনতে হবে। এই যে—এই যে—পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছি, তুমি পঁচিশ টাকা রাখো।'

—কেন?

—ধার শোধ।

এরপর দিনগুলো খারাপ কাটছিল না, মির্জাসাব। আমি শ'খানেক টাকা রোজগার করি। ব্রিজমোহন অবশ্য আমার দ্বিগুণ পায়। টাকার খুব একটা অভাব ছিল না। খোলির জীবনে বেশ যথেষ্টই বলা যায়।

মাস পাঁচেক পরে ব্রিজমোহনের নামে একটা চিঠি এল। খামের ওপর চোখ বুলিয়ে সে বলল, 'মওত কা রানি'। আমি বুঝলাম, পেরিনের চিঠি।

ব্রিজমোহন হাসতে-হাসতে চিঠি খুলল। চিঠি পড়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রোববার দেখা করতে বলেছে। জরুরি দরকার।'

—তুমি যাবে?

ব্রিজমোহন লাফিয়ে উঠল।—যাব না? মান্টোভাই, তুমি কী করে ভাবলে, পেরিন ডাকলে আমি যাব না?

নতুন একটা হিন্দি সিনেমার গান শিস দিতে দিতে ব্রিজমোহন বিছানায় বসে পা নাচাতে থাকল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'পেরিনের কাছে আর গিয়ে কাজ নেই ব্রিজমোহন। ওর সঙ্গে দেখা করে আসার পর কত কষ্ট করে তোমাকে প্রতি রোববার আট আনা দিই, তুমি ভাবতে পারবে না।'

ব্রিজমোহন হা-হা করে হেসে উঠল।—আমি জানি। মান্টোভাই, সেইসব দিন আবার ফিরে আসছে, তবে তুমি কোথা থেকে প্রতি রোববার আমাকে আট আনা দেবে, কে জানে!'

পরদিন সকালেই পেরিনের কাছে চলে গেল ব্রিজমোহন। রাতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলল পেরিন?'

—কিছুই না।

—জরুরি দরকার লিখেছিল।

—ওইরকম লেখা ওর অভ্যেস। সবসময় বোধহয় ভয় পায়।

—কেন?

—কে জানে! তবে আমি ওকে বলে এসেছি, এই নিয়ে বারো বার আমি তোমার জন্য ছাঁটাই হব। জরাথুস্ত্র তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

—পেরিন কী বলল?

—তুমি একটা বুরবাক।

—ঠিক। আমি হেসে বললাম।

—একশোবার ঠিক। ব্রিজমোহন হেসে উঠল।—কাল অফিসে গিয়েই আমি ইস্তফা দেব।

—কেন?

—ওরা যাতে বরখাস্ত করতে না পারে। পেরিনের ঘরে বসেই ইস্তফার চিঠিটা লিখে এনেছি।

সে আমার হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিল।

পরদিন সকাল-সকাল ব্রিজমোহন বেরিয়ে গেল। রাতে ফিরে দেখি, সে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার কার কাছে চাকরি চাইতে যাবে?'

—কেন? ব্রিজমোহন উঠে বসল।

—পেরিনের দয়া পাওনি?

ব্রিজমোহন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম, তার দু'চোখে জলের পর্দা দুলছে। ফ্যাসফেসে গলায় সে বলল, 'শেঠ নিয়াজ আলির হাতে ইস্তফার চিঠি দিয়েছিলাম, মান্টোভাই। কিছুক্ষণ পর শেঠ আমাকে একটা চিঠি দিলেন। আমার মাইনে দু'শো থেকে বাড়িয়ে তিনশো টাকা করা হয়েছে।'

মির্জাসাব, সেইদিনের পর থেকে পেরিনের প্রতি আর কোনও আগ্রহ ছিল না ব্রিজমোহনের। একদিন সে আমাকে বলেছিল, 'পেরিনের অভিশাপ যখন নেই, মান্টোভাই, পেরিনও আর নেই। আমার জীবনের সব রং হারিয়ে গেল। এখন আমি কার জন্য কাজ ছেড়ে দেব বলতে পারো?'

সেদিন প্রথম আমি পেরিনকে দেখতে পেলাম। আরবসাগরের বেলাভূমিতে ঘুমিয়ে পড়েছে পেরিন। অদূরে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছে একটা অন্ধকার জাহাজ। মির্জাসাব, বম্বে এমনই এক অলীক মানুষদের শহর।

রাহগুজর সৈল-এ হবাদিস হ্যায় বেবুনিয়াদ দহর্‌
ইস খরাবেমেঁ নহ্‌ করনা ফিক্র্‌ তুম্‌ তামীরকা।।
(ভিত্তিহীন এই জগতে তো কেবল এলোমেলো ঘটনার পরম্পরা,
এই ভাঙনের মধ্যে কিছু গড়ে তুলবার ভাবনা রেখো না মনে।)

কলকাতা থেকে ফেরার পর সতেরোটা বছর আমার কোনও না কোনওভাবে কয়েদখানাতেই কেটে গেল, মান্টোভাই। সব সময় মীরসাবের কথা মনে পড়ত। একটা অন্ধকার কুঠুরিতে তাঁকে হাত-পা বেঁধে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আর মীরসাব বিড়বিড় করে বলে চলেছেন :

পত্তা পত্তা বুতা বুতা হাল হামারা জানে হ্যায়
জানে না জানে, গুল্‌ হি না জানে, বাগ তো সারে জানে হ্যায়।

হ্যাঁ মান্টোভাই, ফুলেরা বড় নিষ্ঠুর, ওরা কারুর খোঁজ রাখে না, নিজের খুশবুতেই মাতাল হয়ে থাকে। কেন বলুন তো? দু'-একদিনের জন্ম বলে? বড় তাড়াতাড়ি ঝরে যায় বলে? আমরাও তো ঝরে যাই, হয়তো ফুলের চেয়ে কিছু বেশিদিন দুনিয়াতে থাকি, তবু আমরা তো ফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাকে আদর করি, ফুল কিন্তু আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। ফুলজন্ম পেতে ইচ্ছে করে না আপনার, মান্টোভাই? সারা রাত একা একা নিজের সৌরভ নিয়ে ফুটে থাকো, তারপর ভোরবেলা ঝরে যাও। আহা, খোদার কী অপূর্ব সৃষ্টি—এই ফুলজন্ম—যেন একটা স্বর জেগে উঠেই অন্য স্বরের ভিতরে হারিয়ে গেল। কেমন জানেন এই ফুলজন্ম? যেন মিঞা তানসেনের গলা থেকে সুরের একটা দানা গড়িয়ে পড়ল—জন্ম-মৃত্যু সব একাকার ওই দানার ভিতরে, কিন্তু সারা জীবনেও তাকে আপনি ভুলতে পারবেন না। বুড়ো হয়ে যখন পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেছি, চহরবাগের সেই বেগম ফলক আরাকে সুরের একটা দানা বলেই মনে হত আমার, হয়তো কোনও তবায়েফের গলা থেকে গড়িয়ে পড়েছিল, তারপর হারিয়ে গেছে, শুধু মৃত নক্ষত্রের মতো তার আলো জেগে আছে। আর সেই ফুলজন্মের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে গেলুম।

হোশ্‌ ও সব্র্‌ ও খ্যয়র ও দীন ও হবাস ও দিল ও তাব
উসকে এক আনেমেঁ কেয়া কেয়া নহ্‌ গয়া মৎ পুছো।।

সে এসেছিল, শুধু একবার, মান্টোভাই। তার এই আসাতেই আমার কী কী চলে গেল জানতে চাইবেন না। আমার শান্তি ও ধৈর্য, শক্তি ও স্বাস্থ্য, যৌবন ও উদ্যম, আরও কত কীই যে চলে গেল! সে আমাকে কী দিয়ে গেল? জুনুন। মধ্যরাত্রি চিরে হারিয়ে যাওয়া পুকার। ওই দেখুন, সেই পুকার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মির্জা গালিবের একটা এতিম শেরকে :

ইশক সে তবিয়ৎ নে জিস্ত কা মজা পায়া
দর্দ কি দাবা পায়ি, দর্দ-ই লাদওয়া পায়া।

হ্যাঁ, ভাইজানেরা, জীবনের কত আনন্দকেই তো নিয়ে এসেছিল ভালবাসা, কত যন্ত্রণার দাওয়াই পেয়েছিলুম, কিন্তু এমন এক যন্ত্রণা সে রেখে গেল, হায় খোদা, তার কোনও দাওয়াই তোমার কাছেও নেই। কেন নেই? খোদা খুদ এক দর্দ হ্যয়। যত বয়স বেড়েছে, মান্টোভাই, আমার মনে হয়েছে, আল্লাই আসলে আদিম বেদনা। আশ্ শহিদ। বেদনা ছাড়া কেই বা আমাদের জীবনের সাক্ষী হতে পারে বলুন?

না, না, উসখুশ করবেন না, ভাইজানেরা, আমার মনে আছে ফ্রেজারসাবের খুনের বৃত্তান্তটা আপনাদের বলতে হবে। আসলে কী জানেন, নিজের জীবনের কথা আর বলতে ইচ্ছে করে না, নিজেকে যত মুছে দেওয়া যায়, ততই শান্তি। একসময় যে গজল লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম, তা দুঃখ-দারিদ্র্যের চাপে নয়, কে আমার লেখা পড়বে, তা ভেবেও নয়; মনে হয়েছিল, এবার নিজের সঙ্গেই কথা বলার সময়; হ্যাঁ মান্টোভাই, বিশ্বাস করুন, আমি নিজের হাতে আমার শিল্পকে হত্যা করেছিলুম শুধু বেদনার পায়ে কদমবুশি করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, মান্টোভাই, শিল্পীকে তার জীবনের সেই মুহূর্তটি খুঁজে নিতে হবে, যখন সে তার শিল্পকে হত্যা করবে। আসলে এই দুনিয়াতে সে কেন এসেছে? না, কিছু সৃষ্টি করার জন্য নয়। আল্লার পর আর কারুর কিছু সৃষ্টি করার নেই। আমরা তাঁর সৃষ্টিকে নকল করতে পারি মাত্র। আমরা শুধু পারি, জীবনকে ছুঁয়ে থাকতে। খোদার এই দানের তুলনা নেই, মান্টোভাই। কলকাতা থেকে ফেরার পথে এক বৃষ্টির দিনে আমি একটা নিঃসঙ্গ টিলা দেখেছিলুম। সবুজ প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়েছিল টিলাটি, আর তার পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে শ্যাওলা-ঢাকা অনেক সমাধি। আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। জীবন এত নিঃসঙ্গ, এত সুন্দর, এত বর্ষার আদরে স্নাত। গভীর রাতে এক সুফি সাধক কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'এই দুনিয়ার বন্ধ কফিনের ভিতরে কত ভুল আর অজ্ঞানতা নিয়েই না আমরা বেঁচে আছি, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? মৃত্যু এসে যখন কফিনের ডালা খুলবে, ডানাওয়ালা উড়ে যাবে অনন্তের পথে, আর যাদের ডানা নেই, তারা কফিনেই আটকে থাকবে। দোস্ত, কফিনের ডালা খোলার আগেই এমন কিছু করো যাতে পাখি হতে পারো, ডানা গজাও, হাত দু'টোকে যত তাড়াতাড়ি পারো ডানা বানিয়ে ফ্যালো।' সব শুনেছি মান্টোভাই, তবু আমার ডানা গজাল না, একদিন মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলুম শাহজাহানাবাদের খণ্ডহরে।

উতলা হবেন না, ভাইজানেরা। এই বুড়োকে একটু নিজের মতো করে কথা বলতে দিন। কথা দিচ্ছি, কোনও কিস্‌সাই বাদ পড়বে না। তো এক রাতে ফ্রেজারসাব খুন হয়ে গেলেন। কাশ্মীরি গেটের কাছে গুলি করে মারা হয়েছিল তাঁকে। খবরটা শুনে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলুম। ফ্রেজারসাব দিল্লির রেসিডেন্ট ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার দোস্তিরই সম্পর্ক ছিল বলতে পারেন। গোরাদের মধ্যে আলাদা ধাতের মানুষ ছিলেন। যাদের সঙ্গে চাকরি করতেন, তাদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমাদের দেশটাকে জানতে চেয়েছিলেন, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করতেন না। তাঁর কিতাবখানা থেকে কত বই এনে আমি পড়েছি। সেখানে বসে কত যে গল্প হয়েছে ফ্রেজারসাবের সঙ্গে। তিনিই আমাকে প্রথম সুফি সাধক জামি-র এক আশ্চর্য কথা শুনিয়েছিলেন মান্টোভাই। কথাটা বলি, ভাইজানেরা? জামি বলেছিলেন, মানুষ কে? সেই নূরের প্রতিফলন। আর এই দুনিয়া? অনন্ত সমুদ্রের এক ঢেউ। নূর থেকে কি প্রতিফলন আলাদা করা যায়? সমুদ্র থেকে ঢেউকে আলাদা করা যায়? শুনে রাখো, এই প্রতিফলন ও ঢেউই নূর আর সমুন্দর। ফ্রেজারসাবের সঙ্গে দোস্তির আর একটা কারণও ছিল। সম্পত্তির ব্যাপারের মামলায় শামসউদ্দিনের বৈমাত্রেয় ভাই আমিনুদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনকে সাহায্য করতেন তিনি। আর আমি তো শামসউদ্দিনের চোখের বিষ ছিলুম।

ফ্রেজারসাবকে হত্যার অপরাধে সহিস করিম খানকে গ্রেফতার করা হল। করিম খান ছিল শামসউদ্দিনের কর্মচারী। দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। মাথায় ঋণের দায়, দিনের বেলা হাভেলি থেকে বেরুতে পারতুম না। গ্রেফতারের ভয়ে, রাতে প্যাঁচার মতো নিঃশব্দে উড়ে যেতুম ম্যাজিস্ট্রেটসাবের বাড়িতে। ফ্রেজারসাবের খুনের বিষয় নিয়েও কথাবার্তা হত। শামসউদ্দিনের সম্পর্কে আমি কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু তদন্তে জানা গেল, শামসউদ্দিনই ফ্রেজারসাবকে খুন করার জন্য করিম খানকে কাজে লাগিয়েছিল। শাহজাহানাবাদের রাস্তায় প্রকাশ্যে দু'জনের ফাঁসি হয়েছিল। আমি ফাঁসি দেখতে যাইনি; শুনেছি, ফাঁসি দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়েছিল। মানুষের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই, মান্টোভাই। সেই প্রথম বুঝলাম, ইংরেজও একইরকম বর্বর। কী জানি, হয়তো সভ্যতার ইতিহাসই আরেকরকম ভাবে বর্বরতার ইতিহাস।

এরপরই শাহজাহানাবাদে শুরু হল আমার সম্পর্কে গালিগালাজ। আমিই নাকি শামসউদ্দিনকে ফাঁসিতে চড়ানোর জন্য দায়ী। কেউ বুঝল না, যে বীজ তুমি জমিতে বুনবে, তার ফসলই তো তোমাকে তুলতেই হবে। এমনকী উমরাও বেগমও একদিন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মির্জাসাব, আপনিই শামসউদ্দিন ভাইয়ের কথা ম্যাজিস্ট্রেটসাবকে বলেছেন?

—তুমি বিশ্বাস করো বেগম?

—মহল্লার পর মহল্লা সবাই এক কথা বলছে।

—সবাই বললেই সত্যি?

—আমি জানি—

—কী?

—আপনি এ-কাজ করতে পারেন না।

—তবু আমাকে জিজ্ঞেস করতে এলে?

—গোস্তাকি মাফ করবেন।

—শামসউদ্দিন আমার যতবড় শত্রু হোক, আমি তার মওত চাইতে পারি?

—আমি ভুল করেছি মির্জাসাব।

—বেগম, অনেক মানুষের কথার মধ্যে সত্যি থাকে না। সত্য শুধু একজনের, একা মানুষের। অনেক মানুষের মতামত মানেই তা মিথ্যে।

—আমাকে মাফ করুন, মির্জাসাব।

আমি উমরাও বেগমের হাত ধরে বসে রইলুম। এ যেন নতুন করে ভালবাসা। তার ভিতরে মরে যাও আসাদ। তোমার পথ অন্য দিকে। আকাশ হও, কুঠার দিয়ে কারাগারের দেওয়াল ভাঙো। পালাও। রং—রঙের ভিতরে জন্ম নাও, এখনই। মরো, আর চুপ করে থাকো। নীরবতা মানেই তুমি মরে গেছ। পুরনো জীবনে তুমি শুধু নীরবতা থেকে দৌড়ে পালিয়েছ। দেখো, নির্বাক চাঁদ এবার আকাশে ফুটে উঠছে।

ভাইজানেরা, আমিই শামসউদ্দিনের খুনি, এই ছাপ্পা লেগে গেল আমার গায়ে। বেশ কয়েক বছর শামসউদ্দিনের সমাধি হয়ে উঠেছিল দিল্লির মানুষদের তীর্থযাত্রার জায়গা। আর সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনেক ব্রিটিশের সমাধি অটুট থাকলেও ফ্রেজারসাবের সমাধি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ আসলে ব্যক্তিকে—তার নিজস্বতাকে দেখে না—কোনও না কোনও জাত দিয়ে বিচার করে।

ইংরেজরাও এভাবেই আমাদের মুসলমানদের সবসময় সন্দেহের চোখে দেখেছে, আর হিন্দুদের দেখেছে অন্য চোখে। কেন জানেন? রেনেসাঁসের ধ্বজা তো তুলে ধরেছিল হিন্দুরা—কলকাতার বাঙালি হিন্দুরা। মান্টোভাই, এরা বেশির ভাগ সব সুদখোর, মহাজন ছাড়া আর কিছু নয়। সিরাজউদ্দিনসাব তো কলকাতা থেকে আমাকে অনেক চিঠি লিখছে, আমিও উত্তর দিতুম, তো তাঁর চিঠি পড়তে পড়তে আমি বুঝেছিলুম, কলকাতা আসলে একটা দো-আঁশলা শহর; রাজধানী বলে কথা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সবকিছুরই জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিধুবাবুর গানের 'প্রাণ' আর সেখানে নেই।

প্রাণ শাহজাহানাবাদেও ছিল না। কোনক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা দরবার।

ইংরেজরা সব গ্রাস করে নিচ্ছে। মান্টোভাই, ওরা তো হাঙরের মতো খায়। কাল্লু একদিন এক ফকিরকে নিয়ে হাজির হল দিবানখানায়। ফকিরসাব অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—কী দেখছেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—সামনে খুব খারাপ সময়, মিঞা।

—আর কত খারাপ সময় আমার জীবনে আসবে?

—আপনার কথা বলছি না।

—তা হলে?

—শাহজাহানাবাদ কারবালা হয়ে যাবে, মিঞা।

আমি হেসে বললুম, 'আমার ভেতরে সেই কারবালা দেখতে পেলেন না কি?

—ঠিক তাই। আমি আপনার ভিতরে পুরো শাহজাহানাবাদকে দেখতে পেলাম মিঞা। এ-শহরের সব পুরনো হাভেলি, মসজিদ ভেঙে পড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লোকদের। বেগমরা সব ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাগলের পেট থেকে জন্ম হচ্ছে সাপের বাচ্চার।

আমি হা-হা করে হেসে উঠি।—এসব কবে হবে ফকিরসাব?

—হবে, হবে। আপনি তা দেখেও যাবেন, মিঞা।

—আর আমার কী হবে?

—আপনি তখন ইনসানে কামিল হয়ে যাবেন।

—হাসালেন ফকিরসাব। আমার মধ্যে ইনসানিয়াতই নেই।

—ইনসানিয়াত নিয়ে কেউ পয়দা হয় না, মিঞা। আগুনে পুড়তে পুড়তে তবেই না হকিকায় পৌঁছবেন। আসুন একটা কিস্‌সা বলি।

কাল্লু যেন লাফিয়ে ওঠে।—হ্যাঁ, হ্যাঁ কিস্‌সা হোক বাবা। কাল্লু ফকিরের গা ঘেঁষে বসে।

—শিষ্যদের দীনের কথা বলতে বলতে শাল আবদুল্লা একদিন ভরে পড়লেন। তাঁর চোখ লাল, ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন, তার সঙ্গে খিচুনি,। পরদিন ইবন সালিম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল আপনার মুর্শিদসাব?' আবদুল্লা হেসে বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও শক্তি আমার ভিতরে প্রবেশ করছিল না। বরং ওটা আমার দুর্বলতা।' অন্য এক শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা যদি দুর্বলতা হয়, তা হলে শক্তি কী?' আবদুল্লা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'শক্তি যখন ভিতরে প্রবেশ করে, শরীর-মন তখন একেবারে শান্ত হয়ে যায়।' কিছু বুঝলেন, মিঞা? সেই মানুষই হচ্ছে ইনসানে কামিল।

—বাবা—। কাল্লু ফকিরসাবের পা চেপে ধরে।

—বোলো বেটা।

—আউর এক কিস্‌সা শুনাইয়ে বাবা।

কাল্লু ফকিরসাবের সঙ্গে কিস্‌সায় মজে গেল; আমি গিয়ে ঢুকলুম আমার কুঠুরিতে, শয়তানের সেই কামরা। তবে কী জানেন, মান্টোভাই, স্বেচ্ছাবন্দিত্বের দিনগুলোতে নিজের জন্যই কিছু কাজও করে উঠতে পারলুম। উর্দু দিবানকে নতুন করে গুছিয়ে তুললুম। কত গজলই যে বাদ দিয়েছি। নতুন করে পড়তে গিয়ে দেখলুম, অনেক গজলই দিবানে রাখা যায় না। ফজল-ই-হক সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, অনেক গজলেই ফারসি প্রভাব ছিল, সহজে বোঝা যায় না। আর আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি, যে-গজল প্রথমেই তিরের মতো বুককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে না-দিতে পারে, গজল হিসাবে তার শিল্পমূল্য নেই। আসলে কী জানেন মান্টোভাই, কম বয়সে গয়না, সাজপোশাকের দিকে বড় ঝোঁক থাকে মানুষের; নিজেকে দেখানোর জন্য সে অনেক জবরজং করে সাজে। কিন্তু সৌন্দর্য যতদিন না ভিতর থেকে ফুটছে, ততদিন শান্তি কোথায় বলুন? আমার ফারসি রচনা সংকলনের কাজও করে উঠতে পারলুম এই সময়েই। পাঁচ খণ্ডের সংকলন তৈরি হল। পাঁচ নম্বর খণ্ডে রেখেছিলুম বন্ধুদের কাছে লেখা আমার চিঠিপত্র। নাম দিয়েছিলুম পন্‌জ্‌ আহঙ্‌। সে-সব চিঠি পড়লে খুবই মজা পেতেন। আর একটা ব্যাপার কী জানেন? নিজের লেখা ফারসি গদ্য পড়ে আমিই চমকে উঠতুম; নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতুম, মাশাল্লা, কেয়া লিখা মিঞা, বহুৎ খুব। হাসছেন কেন মান্টোভাই? আপনি কখনও এভাবে নিজের পিঠ চাপড়াননি? কোনও কোনও গল্প লিখে মনে হয়নি, আরে ভাই, এ চিজ আমার ভিতরে কোথায় ছিল? ভিতরে ভিতরে এতদিন ধরে একে আমি বহন করেছি? এতে দোষের কী আছে, মান্টোভাই? শিল্পী নিজেকে এইটুকু দিতে পারবে না? নিজের প্রতি এই সামান্য মুগ্ধতা তো সারাজীবন বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আলিফ বেগকে লেখা আমার লেখা খত্‌-এর কথা বলি, ভাইজানেরা, শুনে মজা পাবেন। বেশি বয়সে আলিফ সাবের এক ছেলে হয়েছিল। আমাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, মিঞা, আমার ছেলের জন্য একটা নাম বেছে দিন। তো আমি তাঁকে লিখে পাঠালুম, আপনার ছেলের নামের জন্য আমাকে একটুও ভাবতে হল না, এক ফোঁটাও সময় খরচ হল না। নামটা মাথায় খেলে যেতেই আমি একটা কবিতাও লিখে ফেললুম।

> বৃদ্ধ বয়সে আলিফের এক
> অপরূপ পুত্র জন্মেছে।
> তার নাম দিলাম হম্‌জা
> এ তো সকলেই জানে
> বয়েসকালে সব আলিফ হম্‌জাই হয়।

তাই হয় না কি না, বলুন ভাইজানেরা? আলিফ একটা সোজা দাগ আর হম্‌জা কুঁকড়ে যাওয়া দাগ। বয়স হলে তো সব মানুষই কুঁকড়ে হম্‌জা হয়ে যায়।

এভাবেই আমার শয়তানের কামরায় বসে চিঠি লিখে, মজা করে দিনগুলোকে কোনওমতে পার করে দিচ্ছিলুম। এরই মধ্যে আবার এই ইংরেজ পাওনাদার, লোকটার নাম ম্যাকফারসন, কোর্ট থেকে অর্ডার বার করল, আমাকে আড়াইশো টাকা ফেরত দিতে হবে। এমন নসিব আমার, সেইসময় একদিন হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সেপাই এসে আমাকে গ্রেফতার করল। জেলেই যেতে হত; লোহারুর নবাব, আমার দোস্ত আমিনুদ্দিন ভাই এসে বাঁচালেন। আমার হয়ে চারশো টাকা দিয়ে তিনি ব্যাপারটার ফয়সালা করলেন। একে কি মানুষের মতো বাঁচা বলে, ভাইজানেরা? কতদিন একটা কুঠুরিতে নিজেকে আটকে রাখা যায়? আর বাইরে এলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে কয়েদখানা। তবু হাসতে হাসতে নিজেকে বলেছি :

> রন্‌জ সে খূ গর হুয়া ইনসাঁ তো মিট যাতা হ্যয় রন্‌জ্
> মুশকিলেঁ ইতনী পড়ীঁ মুঝ্ পর কে আসাঁ হো গয়েঁ।
> (দুঃখে অভ্যেস হয়ে গেলে দুঃখ ঘুচে যায়
> কষ্ট এত পেলাম যে সহজ হয়ে গেল।)

শামসউদ্দিনের ফাঁসির পর ফিরোজপুর-ঝিরকার নবাবি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আমি পেনশন পেতুম ইংরেজ বাহাদুরের কাছ থেকে। বাষট্টি টাকা আট আনা-ই। ওই আট আনা আমার আর পেছন ছাড়ল না, মান্টোভাই। আমার নসিবে সবকিছু আট আনাতে ধার্য; ষোলো আনা কোনও দিন পেলুম না। এত দুর্দশার মধ্যেও কিছু কিছু মানুষের সান্নিধ্য আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ফজল-ই-হক সাব দিল্লি থেকে চলে যাওয়ার পর আমার বুকের ভেতর যেন একটা ইমারতই ভেঙে পড়ল। তাঁর মতো বুজুর্গ আদমি সারা শাহজাহানাবাদে আর ক'জন ছিল বলুন? যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনই মানুষকে অনুভব করতে জানতেন। যে-পদে তিনি চাকরি করতেন, তাঁর মতো যোগ্যতার মানুষের জন্য তো সে-পদ নয়। তবু চাকরি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা অপমান করার সুযোগ পেলে তো ছাড়ে না। সুযোগেরও দরকার হয় না; ওরা সবসময় আমাদের দিকে অনেক ওপর থেকে তাকায়; ভাবে পিঁপড়ে বা পোকামাকড় দেখছে। তাই পায়ে দলে যেতে এক মুহূর্ত ভাবে না। সেভাবেই অপমান করা হল ফজল-ই-হক সাহেবকে। তিনি তো ইমানদার মানুষ; ইস্তফা দিলেন। তবে বসে থাকার মানুষ তো আর নন। নবাব ফৈজ মহম্মদ খান পাঁচশ টাকা মাসোহারা দিয়ে তাঁকে নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন। আমি পড়ে রইলুম ভগ্নহৃদয় নিয়ে। এও জানি, ফজল-ই-হক সাহেবও অনেক কান্না বুকে নিয়েই দিল্লিকে বিদায় জানিয়েছিলেন। এমনকী জাঁহাপনা বাহাদুর

শাহ নিজের গায়ের শাল খুলে তাঁকে পরিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, 'আপনি যখন আলবিদা বলবেন, আমি জানি, আমার কিছু করার নেই। কিন্তু আমাকে যখন খুদা হাফিজ বলতে হবে, তখন খোদাই শুধু জানবেন, এই শব্দ দু'টো উচ্চারণ করতে আমি কত যন্ত্রণা পেয়েছি।' মান্টোভাই, আমার প্রিয় দোস্ত, আমার গজলের সমঝদার অপমান মাথায় নিয়ে শাহজাহানাবাদ ছেড়ে চলে গেলেন।

তবে আর একজন মানুষ আমার জীবনে এলেন। খোদা কি আমাকে একবারে পথে বসিয়ে দিতে পারেন? নবাব মুস্তাফা খান শইফতাকে বন্ধু হিসাবে পেলুম। আমার চেয়ে ন' বছরের ছোট। শাহজাহানাবাদের মানুষ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা এসেছিল আফগানিস্তান থেকে। আরবি-ফারসিতে চৌখস। গজলও খুব ভাল লিখতেন। এক সময় সুরা আর নারীই ছিল শইফতা সাবের জীবনের দুই বাহার। রামজু তবায়েফের সঙ্গে খুবই আশনাই ছিল তাঁর। রামজু কিন্তু যে সে তবায়েফ ছিল না। যেমন টাকাপয়সা ছিল, তেমনই পড়াশুনো।

শইফতা সাব যে কত ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তা হিসাব করে বলা যাবে না, ভাইজানেরা। আর আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে একমাত্র তিনিই আমার পাশে ছিলেন। খোদা কসম, তাঁকে আমার সত্যিই কবিতার আত্মা মনে হত, যার গায়ে এই দুনিয়ার কোনও কলঙ্কদাগ লাগেনি। এরই মধ্যে আগ্রায় আম্মিজান মারা গেলেন, ভাই ইউসুফ একেবারে উন্মাদ। আমি আর পেরে উঠছিলুম না। তাই আবারও নিজেকে নিয়ে বাজি ধরলুম। জুয়ার আড্ডা খুললুম আমার শয়তানের কামরায়। জুয়া তো আগেও খেলেছি, একবার সেজন্য একশো টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছিল, কিন্তু এবার আমি স্থির নিশ্চিত, জুয়া থেকেই নসিব ফেরাতে হবে আমাকে। তখন অবশ্য দিল্লিতে জুয়া খেলা বন্ধ করার জন্য খুব কড়াকড়ি। আমি ভাবলুম, বড় বড় ইংরেজরা আমার দোস্ত, আমাকে ধরবে কে? এই ভাবনাই আমার কাল হয়েছিল, মান্টোভাই। দিনে দিনে জুয়ার আসর সরগরম হয়ে উঠল। হাতেও মাঝে মাঝে টাকা আসছে। আমি নিজেকে মনে মনে বলি :

> হম্ কো মালুম হ্যায় জন্নৎ কী হকীকৎ লেকিন
> দিল কে খুশ রখনে কো গালিব য়ে খয়াল আচ্ছা হ্যায়।
> (স্বর্গের খবরাখবর আমার জানা আছে, কিন্তু
> মনকে আনন্দে রাখতে গালিব, এমন খেয়াল মন্দ নয়।)

তমাশা-এ গুল্‌শন, তমন্না-এ চীদন্—
বহার-আফ্‌রীনা, গুনহ্‌গার হৈঁ হম।।
(ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই—
হে বসন্তের স্রষ্টা, আমার মন পাপী।।)

রোজগার কম ছিল ঠিকই, তবে শফিয়ার সঙ্গে সংসারে বেশ মন বসে গেল আমার, মির্জাসাব। শফিয়া তো জান দিয়ে ভালবাসত আমাকে। সবচেয়ে বড় কথা, ও আমাকে বুঝতে চেয়েছিল। তাই প্রথম প্রথম আমার মদ খাওয়া নিয়ে আপত্তি থাকলেও, পরে মেনে নিয়েছিল। তবে সবসময় নজর, যাতে আমি বেশি না খেয়ে ফেলি। আমি যে কী সংসারী হয়ে গিয়েছিলাম ভাইজানেরা, আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। নিজে হাতে ঘর ঝাঁট দিতাম, জিনিসপত্র পুঁছে পুঁছে পরিষ্কার করতাম। এক-একদিন রান্নাতেও হাত লাগিয়েছি। রান্না করতে খুব মজা পেতাম, বিশেষ করে কাবাব বানাতে। মশলা আর মাংস পোড়ার গন্ধে নেশা ধরে যেত আমার। বাইরে তো বম্বের সিনেমার জগতের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ছিলাম; সেই দুনিয়ায় ঢুকে পড়লে মনে হত আমি যেন আমির হামজা, কত যে অ্যাডভেঞ্চার আমার সামনে অপেক্ষা করে আছে। পাকিস্তান যাওয়ার পর বম্বের ফিল্মি দুনিয়ার এই সব রংবাহার মানুষদের নিয়ে লিখেছিলাম 'গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে'। কোনও রকম সাজপোশাক না-পরিয়ে, স্নো-পাউডার না-মাখিয়েই আমি এই মানুষগুলোর আসলি চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম। তাতে কেউ কেউ আপত্তি করেছিল। কিন্তু যে-সমাজে কেউ মারা যাওয়ার পর তার কাজকর্মকে লন্ড্রিতে পাঠিয়ে খুব করে সাফাই করে দেখানো হয়, আহা কত শরিফই না ছিলেন মানুষটা, সেই সমাজ গোল্লায় যাক। আমার মনে আছে, 'সাকী'-তে ইসমতের 'দোজখি' গল্প ছাপা হয়েছিল। এই গল্পে ইসমত ওর মৃত দাদা আজিম বেগ চুঘতাইকে একেবারে নগ্ন করে ছেড়েছিল। গল্পটা পড়ে আমার বোন ইকবাল বলেছিল 'এ তো আজিব মেয়ে সাদাত। নিজের মরা ভাইকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। গল্পে এ-সব কথা লেখা কি ঠিক?'

আমি বলেছিলাম, 'ইকবাল, আমার মৃত্যুর পর তুমি যদি এমন একটা গল্প লিখতে পারো, খোদা কসম, আমি আজই মরতে প্রস্তুত।'

—আমি তোমাকে নিয়ে লিখব? কী লিখব?

—তোমার সাদাত নরকের সবচেয়ে জঘন্য কীট।

—তুমি পাগল সাদাত। প্রিয় মানুষকে কেউ ওভাবে দেখতে চায়?

—প্রিয় মানুষকেই তো ওভাবে দেখানো যায় ইকবাল। তুমি তার পাপ-পুণ্য সব জানো। তুমি তার প্রতি কখনও অবিচার করতে পারো না। মানুষ কি শুধু ভাল-ভাল গুণের একটা পিণ্ড? তার ভেতরে কোনও ফাটল নেই?

—তুমি লেখক, তুমি এভাবে ভাবতে পারো।

—না, ইকবাল। তুমিও এভাবেই ভাবো। শুধু সত্যিটা দেখতে ভয় পাও। একদিন তোমাকে সিতারার গল্প বলব। আমি মনে করি, পৃথিবীতে একশো বছরে ওইরকম এক মেয়ে জন্মায়। অথচ চারদিকে ওর কত বদনাম। সবাই মনে করে, সেক্স ছাড়া ওর জীবনে আর কিছু নেই।

না, না, ভাইজানেরা অমন চনমনে হয়ে উঠবেন না। সিতারার কিস্‌সা আমার হাতের একটা লুকনো তাস, পরে দেখাব। সেই বাঘিনীর গল্প কি এত তাড়াতাড়ি বলতে হয়? দোজখে আরও কতদিন পচতে হবে আমাদের, হাতে কত সময়। তখন সিতারা আসবে, নাসিম বানু আসবে, নার্গিস, নূরজাহান-রা আসবে। শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে, ভাইজানেরা। এ-সব কতদিন আগের কথা, সাল-তারিখ সব ভুলে গিয়েছি, মনে হয় যেন, দীর্ঘ দিন ধরে এক লম্বা স্বপ্নে ওদের দেখেছিলাম আমি। কিন্তু এখন ক্ষমাঘেন্না করে এই মান্টো হারামির জীবনের দু'একটা কথা শুনুন।

'মুসাওয়ার' কাগজে কাজ করতে করতেই বাবুরাও প্যাটেল আমাকে একটা সিনেমার চিত্রনাট্য উর্দুতে অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন। প্রভাত স্টুডিও সিনেমাটা তৈরি করবে। বম্বের সিনেমা দুনিয়ায় এভাবেই আমি পা রেখেছিলাম। একদিন নাজির লুধিয়ানভিসাব—'মুসাওয়ার'-এর মালিক—ইমপেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সিনেমার জন্য সংলাপ লিখে দিতে হবে; মাসে চল্লিশ টাকা করে পাব। ভাবলাম, এবার তা হলে কপাল খুলল। কিন্তু লুধিয়ানাভিসাব আমার মাইনে কমিয়ে চল্লিশ থেকে কুড়ি টাকা করে দিলেন। ব্যাপারটা বুঝলেন? একদিক থেকে পাইয়ে দিলেন, অন্য দিক থেকে কেড়ে নিলেন। আমার মাসে রোজগার দাঁড়াল ষাট টাকা। তবে ইমপেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির তখন যা অবস্থা, প্রতি মাসে ঠিক মতো টাকা দিতে পারত না। আমি মাঝে মাঝে আগাম টাকা নিয়ে নিতাম। বেশিদিন কাজটা টিকল না। লুধিয়ানভিসাবের চেষ্টাতেই ফিল্ম সিটিতে মাসে একশো টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে গেলাম। কত যে ফিল্ম কোম্পানিতে তখন কাজ করেছি, যা টাকা হাতে আসে। কিন্তু 'মুসাওয়ার'-এর চাকরি ছাড়িনি। 'মুসাওয়ার'-ই তো আমাকে বম্বেতে নিয়ে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত লাথিটা মারলেন লুধিয়ানভিসাবই। কোনও কারণ না জানিয়েই আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। পায়ের তলার মাটি সরে গেল ভাইজানরা। ফিল্ম কোম্পানিতে তো আজ আছি, কাল নেই। বরখাস্তের চিঠি নিয়ে সরাসরি দেখা করলাম বাবুরাও প্যাটেলের সঙ্গে। বাবুরাওজি তাঁর 'কারবা' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমাকে চাকরি দিতেও রাজি হয়ে গেলেন। বাবুরাওজি তাঁর

সেক্রেটারি রিটা কারলাইলকে ডেকে পাঠালেন। শুনেছিলাম, রিটা তাঁর সেক্রেটারি, স্টেনো, প্রেমিকা—সবকিছুই। রিটা ঘরে ঢুকতেই বাবুরাওজি বললেন, কাছে এসো।

কাছে যেতেই বাবুরাওজি রিটার পেছনে চাপড় মেরে বললেন, 'যাও কাগজ পেনসিল নিয়ে এসো।'

রিটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বাবুরাওজি হেসে বললেন, 'এমন ঠাসা নিতম্ব আগে দেখিনি, মান্টো।'

—খুব চাপড় মারেন বুঝি?

—মারিই তো। আর হাত বুলিয়ে কী যে সুখ। যেন পলসন মাখনে হাত বোলাচ্ছি।

রি টা শর্ট হ্যান্ড-এর খাতা-পেন্সিল নিয়ে ফিরে এল। আমার নিয়োগপত্রের বয়ান বলতে বলতে বাবুরাওজি মুখ তুলে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মান্টো, কত হলে চলবে?' একটু থেমে নিজেই বললেন, 'একশো টাকায় চলবে তো?'

—না।

—মান্টো, এর বেশি তো আমি দিতে পারব না।

—আমি মাত্র ষাট টাকা নেব। তার বেশিও নয়, কমও নয়।

বাবুরাওজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি দেখছি একটা আস্ত গাধা।'

—ঠিক তাই।

—তার মানে?

—আমি ষাট টাকার বেশি নেব না। কিন্তু কোনও টাইমটো ল আমি মানতে পারব না। যখন খুশি আসব, যাব। পত্রিকা ঠিকমতো বেরলেই তো হ ব?

চাকরি পেলাম ঠিকই, তবে সাত মাসের বেশি টিকল ন.। এদিকে বম্বেতেও কোনও কাজ নেই। ১৯৪১-এ রেডিও'তে কাজ নিয়ে দিল্লি চলে গেলাম। মাইনে মাসে দেড়শো টাকা। রেডিও-র জন্য অনেক নাটক লিখেছিলাম। কিন্তু দেড় বছরের বেশি টিকতে পারলাম না রেডিও'তে। সরকারি দপ্তরের চাকরি আমার জন্য নয়, মির্জাসাব। সে যে কী বিরক্তিকর সব লোক চারপাশে। আর বম্বের ফিল্মি দুনিয়ার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। আপনি আমির হলেন, কী ফকির কেউ যেমন ফিরে দেখবে না, তেমনই আপনার কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ তা নিয়েও প্রশ্ন তুলবে না কেউ। শুধু বাঁচো, বেঁচে থাকো, হাড়েমজ্জায় বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করো। যেমন আমার বন্ধু শ্যাম বলত, 'মান্টো, এই জীবনটাই আমার আশিক। বলো মান্টো, তুমি কী চাও? শুধু জীবনটা বেঁচে থাকুক, আর সব জাহান্নামে যাক। তুমি চাও না, বলো, চাও না?' শ্যামের কথাও একদিন আপনাদের বলতে হবে, ভাইজানেরা। পাকিস্তানে মদ ছাড়ানোর জন্য মানসিক হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় শ্যামের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলাম। শ্যাম যেন আমার কানে কানে এসে বলেছিল, 'মান্টো, মৃত্যুর স্বাদ সত্যিই অন্যরকমের। কোনও দিন কল্পনাই করতে পারিনি।'

দিল্লির চাকরি একদিন ছেড়ে দিলাম, ভাইজানেরা। তখন আদবানি বলে কে যেন একজন দিল্লি রেডিও-র অধিকর্তা ছিল। সে একদিন আমার একটা নাটক পড়ে বলল, কয়েকটা শব্দ বদলাতে হবে। রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল তখন বোখারিসাব; আদবানি তাঁর খুবই প্রিয় মানুষ। কেউ আদবানির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না। আমি সরাসরি জানিয়ে দিলাম, আদবানিজি উর্দু জানেন না, বোঝেন না, পড়তেও পারেন না। আমার নাটকের ভুল ধরার ক্ষমতা তাঁর নেই। চাকরি থেকে ইস্তফাই দিতে হল আমাকে। আর ওই বোখারিসাব? তিনি আমাকে আর কোনও দিন সহ্য করতে পারেননি। দেশভাগের পর রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে কোনও দিন রেডিওর অনুষ্ঠানে ডাকেননি। তো বয়ে গেছে, মির্জাসাব। আমার মৃত্যুর পর তো আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল রেডিও পাকিস্তানে। বোখারিসাবই তখন রেডিওর হর্তাকর্তা। এরা ভুলে যায় মির্জাসাব, তুমি সরকারের নোকর মাত্র, সে তুমি যত উঁচু পদেই থাকো, চেয়ার সরে গেলেই কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

দেড় বছর দিল্লিতে কাটিয়ে আবার বম্বেতে ফিরে এলাম, মির্জাসাব। 'মুসাওয়ার' থেকে আবার ডাক এল, তার ওপর বম্বের হাতছানি ছিল বড় মারাত্মক। টাকা তো সেখানে উড়ছে, শুধু ধরতে পারলেই হল। আমি, কৃষণ চন্দর, রাজিন্দর সিং বেদি, উপেন্দ্রনাথ অশক, ইসমত—আমরা যে ফিল্মের দুনিয়ায় ভিড়ে গিয়েছিলাম, তা শুধু টাকার জন্য। ভাল ভাবে খেয়ে-পরে বাঁচব বলে। রোজ যেন জনি ওয়াকার পাই, ক্যাভার্ন সিগারেটের প্যাকেট যেন পকেটে রাখতে পারি। ফিল্মের গল্প লেখার সঙ্গে সাহিত্যের তো কোনও সম্পর্ক নেই। কৃষণ একটু সরল ছিল, প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝত না। ভাবত, সিনেমার জন্য গল্প লিখে মহৎ কাজ করছে। একবার আমরা দু'জনে 'বানজারা' নামে একটা গল্প লিখলাম সিনেমার জন্য। গল্প বিক্রির জন্য জগৎ টকিজ-এর মালিক শেঠ জগৎ নারায়ণের কাছে যাওয়া হল। গল্পটা শুনে শেঠ বলল, 'বহৎ খুব। আমি স্টোরিটা কিনব। কিন্তু মান্টোসাব। আপনি কারখানার ম্যানেজারকে বড় বুরা আদমি বানিয়েছেন। ওকে একটু ভাল করা যায় না? কারখানার ওয়ার্কাররা তো ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে না। বুঝতে পারছেন, কী বলছি।'

—নিশ্চয়ই, আমি বললাম।—কারখানার ম্যানেজারকে ভাল করতে বেশি সময় লাগবে না শেঠজি।

—মতলব?

—একটু কাগজ-কলম নিয়ে বসা আর কী।

—সহি বাত। শেঠ হাসতে লাগল।

কৃষণ তো আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আ[illegible] কী যেন বলতে চাইছিল, আমি থামিয়ে দিলাম।

—আর একটা কথা বলি মান্টোসাব?

—জি।

—ম্যানেজারের বউকে আনলেন কেন? ওকে ম্যানেজারের বহিন বানিয়ে দিন।

—কেন?

—অনেক সুবিধা আছে তাতে।

—কী সুবিধে? কৃষণ প্রায় গর্জে ওঠে।

—কৃষণ, তুমি চুপ করো। শেঠজি তো গল্পটা কিনছেন। উনি যা চাইবেন—

—সহি বাত। আমার কথা তো ভাববেন। শুনুন মান্টোসাব, বোনটার যেন শাদি না হয়। একটু ভ্যাম্প টাইপ বানিয়ে দেবেন। হিরোর সঙ্গে নখরা করবে। ব্যাপারটা জমে যাবে কি না বলুন?

—ইনশাল্লা। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না শেঠজি।

কৃষণ আমার কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি তার চেনা সেই মান্টো, যে রেডিও-র নাটকে একটাও শব্দ বদলাতে চায়নি? দেখলাম, অবিশ্বাস ও ঘৃণায় তার চোখ ছলছল করছে।

শেঠের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃষণ তো চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল।—তুমি লেখক মান্টো? এইভাবে নিজেকে বেচে দিলে? আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

—আমি কি তোমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছি?

—তোমার লেখার একটা শব্দ বদলাতে বললে, তুমি ছাপতে দেবে?

—না।

—শেঠজির কথা তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম কৃষণভাই। শেঠের কাছে আমরা সাহিত্যের জন্য আসিনি। তুমি কি মনে করো, গল্পটার কোনও সাহিত্যমূল্য আছে? ওটা আমরা সিনেমার জন্য ভেবেছিলাম। মা সেখানে বোন হয়ে যেতে পারে, বোন ভ্যাম্প হয়ে যেতে পারে, হিরোর সঙ্গে যা খুশি তাই করতে পারে। তাতে তোমার-আমার কী আসে যায়? সিনেমার গল্প লিখতে এসেছি টাকার জন্য। সাহিত্যের কথা এখানে ভেবো না কৃষণ। বুঝলে আমার কথা?

—হুঁ।

—তা হলে গল্পটা বদলানো যায়, তাই তো?

কৃষণ মাথা নেড়েছিল।

আমি জানতাম মির্জাসাব, কার জন্য জীবন দেব, আর কার জন্য নখরা করব। ফিল্মি দুনিয়া সেই নখরার জায়গা। কত লোক গল্প লিখে অপেক্ষা করে থাকত, কবে তার গল্প থেকে সিনেমা হবে। এদের আপনি লেখক বলবেন, মির্জাসাব? আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসে ভাবতাম, আমি যে গল্প লিখতে যাচ্ছি দুনিয়ার কেউ এই

গল্পটাকে সিনেমা বানাতে পারবে না। সাহিত্যের সব সত্য লুকিয়ে থাকে তার শব্দে-বাক্যে-অনুচ্ছেদে, কোনও ছবি তাকে প্রকাশ করতে পারে না; যেমন কোনও ছবিকে আমরা শব্দ দিয়ে বোঝাতে পারি না। আর বম্বের ফিল্মি দুনিয়া কখনও ছুঁতে পারবে মান্টো, কৃষণ চন্দর, ইসমত চুঘতাইয়ের গল্পকে? একদিন বম্বে টকিজ থেকে ট্রামে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ইসমতকে বলেছিলাম, 'কৃষণের লেখায় আজকাল দু'টো জিনিস আমি প্রায়ই লক্ষ করি।'

—কী?

—ধর্ষণ আর রামধনু।

—একদম ঠিক মান্টোভাই।

—ভাবছি ওই নামেই একটা প্রবন্ধ লিখব কৃষণকে নিয়ে। জিনা বিলজবর আউর কাওস ও কাজা। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ওর লেখায় ধর্ষণ আর রামধনুর সম্পর্কটা কী?

ইসমত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'রামধনুর অতগুলো রং কী সুন্দর। কিন্তু তুমি তো অন্য দিক থেকে বিষয়টাকে ভাবছ, মান্টোভাই।'

—হ্যাঁ। আগুন আর রক্তের রং লাল। মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে এই রঙের গভীর যোগ আছে ইসমত। আর একই রং দেখা যায় ধর্ষণ ও রামধনুতে।

—হতে পারে। লেখাটা তবে লিখেই ফেলো।

—আরও একটু ভাবো ইসমত। খ্রিস্টান চিত্রকলায় লাল ঈশ্বরীয় প্রেমের প্রতীক। এই রং জড়িয়ে আছে খ্রিস্টকে ক্রুশে চড়ানোর সঙ্গে। কুমারী মেরিও পরেন লাল পোশাক। পবিত্রতার রং। বলতে বলতেই দেখলাম, ইসমতের পোশাক সেদিন সম্পূর্ণ সাদা।

ইসমত হেসে বলল, 'লিখে ফেলো মান্টোভাই। তবে লেখার নামে বিলজবর—'জোর করে' শব্দটা দিও না।'

—কিন্তু কৃষণ আপত্তি করবে। বিলজবর বলেই তো কৃষণ ধর্ষণকে ঘৃণা করে।

—ও আপত্তি টিকবে না মান্টোভাই।

—কেন?

—কৃষণ কী করে জানবে, ওর নায়িকা ভায়োলেন্সটাকেই ভালবেসেছিল কি না।

হ্যাঁ, ইসমত ছিল এইরকম, বেপরোয়া, না হলে 'লিহাফ'-এর মতো গল্প তো ও লিখতে পারত না। মির্জাসাব, উর্দু সাহিত্যে সে এক বিস্ফোরণ; তাও এক মেয়ের কলমে। ইসমতের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনই গল্পটা নিয়ে কথা তুলেছিলাম। সেটা বোধহয় ১৯৪২-এর অগাস্টের কথা। ক্লেয়ার রোডে অ্যাডেলফি চেম্বার্সে 'মুসাওয়ার'-এর অফিসে কাজ করছিলাম। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাকে তখন গ্রেফতার করা হয়েছে। সারা শহর জুড়ে গোলমাল। তখন একদিন শহিদ লতিফ

ওর বেগম ইসমতকে নিয়ে এল। আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে শহিদের সঙ্গে পরিচয়। লক্ষ করলাম, ইসমত একই সঙ্গে লাজুক এবং কথা বলার সময় স্পষ্ট চোখের দিকে তাকাতে পারে। কিছুক্ষণ স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে কথা বলার পর গল্প-কবিতার দিকে আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরে গেল।

আমি ইসমতকে বললাম, 'আদাব-ই-লতিফ-এ আপনার লিহাফ গল্পটা পড়েছিলাম।'

—তখন দিল্লিতে ছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। ভাল, বেশ ভাল। তবে শেষ বাক্যটা—আহমদ নাদিম কাসিমি-র জায়গায় আমি সম্পাদক হলে শেষ বাক্যটা কেটে দিতাম।

—কেন?

—আপনি কী লিখেছিলেন, মনে আছে?

—হুঁ।

—লেপটা এক ইঞ্চি ওঠার পর আমি কী দেখেছিলাম, তা কেউ এক লক্ষ টাকা দিলেও বলব না। লাইনটা তো এমনই ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—বলার দরকার ছিল?

—কেন, অসুবিধে কোথায়?

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ইসমতের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে পারলাম না। যেন এমন কিছু তাকে বলেছি, যা শোনা তার পক্ষে পাপ। ইসমত ছিল এমনই; হঠাৎ এমন কথা বলবে, মির্জাসাব, আপনি সহ্য করতে পারবেন না, পরক্ষণেই সে যেন লজ্জাবতী লতাটি।

ইসমতের কথা তো সহজে ফুরোবে না, ভাইজানেরা। হায়দরাবাদ থেকে একজন আমাকে চিঠি লিখেছিল, 'কী ব্যাপার, এখনও ইসমত চুঘতাইয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হল না? মান্টো আর ইসমত যদি এক হয়ে যেত, তা হলে কত ভাল হত। বড় আফশোস মান্টোসাব, ইসমত আপনাকে বিয়ে না করে শহিদ লতিফকে বিয়ে করল।'

তখন হায়দরাবাদে প্রগতিশীল লেখকদের একটা সম্মেলন চলছিল। সেখানে নাকি অনেক মেয়ে ইসমতকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি মান্টোসাবকে বিয়ে করলেন না কেন? এসব কতদূর সত্যি আমি জানি না। তবে ইসমত বম্বেতে ফিরে শফিয়াকে বলেছিল, হায়দরাবাদের এক মেয়ে নাকি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মান্টোসাব কি অবিবাহিত?' 'জি না', ইসমতের উত্তর শুনে মেয়েটি চুপসে গিয়েছিল।

পরে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছিলাম, মির্জাসাব। যদি ইসমত আর আমার সত্যিই নিকাহ্ হত, তা হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত? এই 'যদি'-র মানে খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে হবে। যেমন ধরুন, এই প্রশ্নের আপনি কী উত্তর দেবেন, ক্লিওপেট্রা-র

নাক যদি এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের এক ভাগ বড় হত, তা হলে নীল নদের অবস্থা কী দাঁড়াত? মান্টো আর ইসমতের বিয়ে নিয়ে প্রশ্নটাও এমনই আজগুবি। শুধু এটুকু বলা যায়, বিয়েটা হলে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে একটা আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে যেত। হয়তো নিকাহনামার স্বাক্ষরই হত দু'জনের শেষ লেখা। আর আমি কল্পনা করতাম সেই বিয়ের মজলিসে কাজি সাহেবের সামনে আমার ও ইসমতের কথাবার্তা :

—কাজি সাহেবের কপালটা বেশ চওড়া, স্লেটের মতো নয় ইসমত?

—কী বললে?

—কানের মাথা খেয়েছ নাকি?

—আমার কান ঠিকই আছে। তোমার গলায় কি ইঁদুর ঢুকেছে?

—তওবা, তওবা, বলছিলাম, কাজি সাহেবের কপাল একেবারে স্লেটের মতো।

—তবে বেশ মসৃণ।

—মসৃণ কাকে বলে তুমি জানো থোড়াই।

—না, আমি জানি না। তুমি যেন খুব জানো।

—তুমি জানো তোমার মাথা।

—কাজি সাহেবের মাথা খুব সুন্দর। তুমি বড় বকবক করছ মান্টো।

—বকবক তো তুমিই করছ।

—না। আমি না, তুমি।

—তুমি—তুমি—কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছ।

—ও বাবা, এখন থেকেই দেখছি আমার শওহর বনে গেছ।

আমি কাজি সাহেবের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'এ মেয়েকে আমি কিছুতেই নিকে করব না। যদি আপনার মেয়ের মাথা ঠিক আপনার মাথার মতো হয়, তবে তার সঙ্গেই আমার নিকাহ পড়িয়ে দিন।'

ইসমতও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমিও এই লোকটাকে নিকে করব না কাজি সাহেব। আপনি যদি এখনও চার বিবি না নিয়ে থাকেন, তবে আমাকেই নিকে করুন। আমি আপনাকেই পছন্দ করি কাজি সাহেব।'

বম্বের জীবন এমন কিস্‌সার মতোই মির্জাসাব, সত্যি-মিথ্যে সেখানে একাকার হয়ে যায়। আমি পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পর ইসমত যে আমার একটা চিঠিরও উত্তর দেয়নি, সেই নীরবতায় কি কোনও সত্য লেখা ছিল না, মির্জাসাব? ইসমত একবার আমার হাত ধরে বলেছিল, 'মান্টোভাই, জীবনে একটা কথাও তুমি মুখ ফুটে বলতে পারলে না?' মির্জাসাব, আমি ইসমতকে আপনার একটা শের শুনিয়েছিলাম :

আ-হী জাতা বোহ রাহ-পর, গালিব,<br>কোঈ দিন অওর-ভী জীয়ে হোতে।।

খরাবী দিল কী ইস হদ্ হ্যয় কেহ্ য়হ্ সমঝা নহীঁ জাতা,
কেহ্ আবাদী ভী য়াঁ থী য়া-কেহ্ বীরানহ্ থা মুদ্দৎকা।।
(হৃদয় আমার এমন উজাড় হয়েছে যে বোঝাই যায় না—
এখানে কোনও দিন বসতি ছিল, না কি যুগ যুগ ধরে উজাড় হয়েই আছে।।)

সেদিন আমার শয়তানের কামরায় জুয়ার আসর বেশ জমে উঠেছে। আমরা চৌসরের জুয়া খেলতুম। বেশ কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী এসেছেন। আমার নসিব সেদিন বেশ ভালই ছিল, মান্টোভাই। কয়েকটা খেলায় জিতেছি। মনের মধ্যে মীরসাবের একটা শের ভোমরার মতো গুনগুন করে যাচ্ছিল :

ইশক্ মাশুক, ইশক্ আশিক হ্যয়
ইয়ানি আপনা হি মুবতলা হ্যয় ইশক্।

এমন সময় কাল্লু এসে জানাল, একটা পালকি এসেছে বাড়ির সামনে। পালকিতে কয়েকজন জেনানা। আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তা আমাকে বলতে এসেছিস কেন? বেগম সাহেবার কাছে হয়তো এসেছে। মহলসরায় নিয়ে যা।'

কাল্লু চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন বোরখাপরা মহিলা কুঠুরিতে এসে হাজির। আমরা সবাই তো অবাক। কারা এরা? সঙ্গে সঙ্গে সবার বোরখা খুলে গেল। দেখি, কোতোয়াল ফয়জুল হাসান, আর তার সিপাইরা। ফয়জুল হাসান গর্জে উঠল, 'সব কো হাথকড়ি লাগাও।'

আমি শান্ত হয়ে বললুম, 'বসুন কোতোয়ালসাব। আমি মির্জা গালিব। আমাকে তো আপনি চেনেন। এঁরা আমার দোস্ত, শাহজাহানাবাদের ইমানদার আদমি।'

—তাই জুয়া খেলেন?

আমি হেসে বলি, 'জুয়া কোথায়? চৌসর খেলা কি অপরাধ?'

—চৌসরের পিছনে জুয়া আছে আমি জানি, মির্জা। এর আগেও একবার আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আগে তো থানায় চলুন।

মালিক রাম ফয়জুল হাসানের হাত ধরে বললেন, 'মির্জার মতো শায়র জুয়া খেলবেন, আপনার বিশ্বাস হয়?'

ফয়জুল হাসান হো-হো করে হেসে ওঠে, 'মির্জা জুয়া খেলেন না, এ-কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছেন?'

—খেলি তো কোতোয়ালসাব। আমি হেসে বললুম।

—দেখুন, নিজেদের কানেই শুনুন।

—লেকিন জিন্দেগি কে সাথ।

—মির্জা, বড় বড় কথা বলে আপনি পার পাবেন না। তারপর ফয়জুল হাসান সিপাইদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব কো হাথকড়ি লাগাও।'

এবার আমার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, 'সাহেবরা কিন্তু আমার দোস্ত, মনে রাখবেন কোতোয়াল সাব।'

—ওসব কথা আদালতে গিয়ে বলবেন।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, মান্টোভাই। সত্যি সত্যিই হাথকড়ি পরিয়ে শাহজাহানাবাদের রাস্তা দিয়ে আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হল। এই অপমানও প্রাপ্য ছিল এ-জীবনে? আমার সঙ্গে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, কেউ টাকা দিয়ে, কেউ মুরুব্বি দেখিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল। আমি সারারাত রয়ে গেলুম থানার হাজতে।

খবর পেয়ে পরদিন শইফতা সাব হাজতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'চিন্তা করবেন না মির্জাসাব। আমি আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবই।'

—কী করে?

—দেখি, কী করা যায়। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

শইফতা সাবের কোনও চেষ্টাই কাজে লাগল না। আমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। কোতোয়াল ফয়জুল হাসান আমার ওপর কেন যে এমন নারাজ হল, কিছুই বুঝতে পারলুম না। নতুন ম্যাজিস্ট্রেটও আমার সম্পর্কে না-ওয়াকিফ। ম্যাজিস্ট্রেট সাব তো কোতোয়ালের ওপরে, তবু বিচারের সময় এমন ভাব দেখালেন যেন কোতোয়ালই শেষ কথা। সেশন জজ আমার দোস্ত ছিলেন, আমার সঙ্গে খোলামেলা ভাবে মিশতেন, এবার তিনিও আমাকে চিনতে পারলেন না। বিচারে সাব্যস্ত হল, আমাকে দু'শো টাকা জরিমানা দিতে হবে আর সঙ্গে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জরিমানা না দিতে পারলে কয়েদখানায় থাকার মেয়াদ আরও বাড়াবে আর দু'শো টাকার ওপর আরও পঞ্চাশ টাকা দিলে কারাবাসের সময় আমাকে কাজ করতে হবে না। দিল্লির কাগজে এ-নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। শইফতা সাব উঁচু আদালতে শাস্তি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু সেখানেও একই রায় বহাল রইল. শইফতা সাবের কাছে শুনেছিলুম, এই রায় শুনে শাহজাহানাবাদে নাকি তোলপাড় শুরু হয়েছিল। আখবারেও লেখা হয়েছিল, আমার মতো অভিজাত, প্রতিভাবান মানুষকে এমন সাধারণ অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া ঠিক হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, জাঁহাপনা বাহাদুর শাহ—আমাকে তো তিনি পছন্দ করতেন না—সাহেবদের লিখিত অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। তাঁর আবেদনও নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল, মান্টোভাই।

মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলুম। নিজের ঘরেই তো বছরের পর বছর বন্দি হয়ে থেকেছি, কয়েদখানায় আর নতুন কী শাস্তি পাব? আমার মন অন্য দিক থেকে ভেঙে যাচ্ছিল। আমাকে কয়েদখানায় যেতে হবে শুনে আত্মীয়বন্ধুরা এভাবে দূরে সরে যেতে পারল? পারবে না-ই বা কেন? মীরসাবকে তো তাঁর পরিজনরাই অন্ধ কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছিল। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলুম লোহারুর নবাব আমিনুদ্দিন সাবের ব্যবহারে। কী দোস্তি ছিল তাঁর সঙ্গে। আর তিনি আমাকে একেবারে অস্বীকার করে বসলেন। তাঁর ভাই জিয়াউদ্দিনও সরে দাঁড়ালেন।

রোনে-সে অয় নদীম সলামৎ নহ্ কর মুঝে,
আখির কভী তো উক্‌দাহ্-এ দিল বা করে কোঈ।।
(একটু কেঁদে নিতে দাও, ভর্ৎসনা কোরো না বন্ধু,
কোনও এক সময় তো হৃদয়ের ভার হালকা করবে মানুষ।।)

সে-সময় আমার হাত ধরেছিলেন শুধু শইফতা সাব। ফরিস্তার মতো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মামলার সব খরচ, জরিমানার টাকা তিনিই দিয়েছিলেন। প্রায় রোজই কয়েদখানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি হজ করে এসেছেন। দারুও আর খান না। আমার মতো কাফেরের কাছে আসেন কেন?'

—তওবা, তওবা। এ কী বলছেন মির্জাসাব?

—সবাই তো আমাকে ছেড়ে গেছে। আপনি এখনও কেন আসেন?

—মির্জাসাব, আপনি কতটা শরিফ, কতটা শরিয়তি পথে চলেন, এসব নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। আমার কাছে আপনি একমাত্র কবি, যাঁকে আমি আমির খসরুর পাশে বসাতে পারি। মিঞা তানসেনের সুরসঞ্চার আর আপনার গজল, আমার কাছে একাকার হয়ে যায়।

—এ কী বলছেন আপনি? মিঞা তানসেন খোদার নূর। আমি তার পাশে কে? আপনার মনে আছে, সেই যেবার মল্লার গেয়ে মিঞা বর্ষা নামিয়েছিলেন? আমি রাতে আমার শয়তানের কামরায় শুয়ে শুয়ে সেই দৃশ্য দেখি। কবেকার সেইসব দিন! আর কি কখনও এই দুনিয়াতে ফিরে আসবে?

—আসে তো।

—কোথায়?

—ওই যে আপনার শের—

হৈ খবর গর্ম উন-কে আনে-কী,
আজ-হী ঘর-মেঁ বোরিয়া নহ্ হুয়া।

আমি তো দেখতে পাই মির্জাসাব, জোর খবর তিনি আসছেন। আল মুসব্বির। আর তাকিয়ে দেখি, আজকেই আমার ঘরে একটা মাদুরও নেই।

—আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না শইফ্‌তা সাব।

—আপনি মদ খান, জুয়া খেলেন, এসব কী আমরা জানি না, মির্জাসাব! কয়েদখানায় বন্দি আছেন বলে আমি আপনার পাশ থেকে সরে যাব? আপনি কবি—শব্দ নিয়ে আপনি এখনও যা খুশি করতে পারেন—এর চেয়ে বড় কথা তো আমার কাছে কিছু নেই।

আমি হেসে বলি, 'আপনি হজ করে এসেছেন। আপনার এসব কথা শুনলে শরিয়তিরা পাথর ছুঁড়ে আপনাকে মেরে ফেলবে।'

—আমি তাদের বলব, মহম্মদ মিরাজে গিয়েছিলেন। জন্নত-জাহান্নাম—দুই-ই দেখে এসেছেন। ভাইসব, তোমরা তাঁর পিছনে পিছনে যাও।

—এই লোকজনদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকেই বুরাক হতে হবে শইফতা সাব।

—তাই সই। আল্লার পথেই তো যাব।

মান্টোভাই, আমি দেখলুম, সংসারের যে জেলখানা, তার চেয়ে কয়েদখানা তো খুব খারাপ নয়। চোর, ডাকাত, খুনি, পাগল—কতরকম মানুষের সঙ্গে যে আমি মিশে যেতে পারলুম। তাদের নানা কিস্‌সা, কতরকম কথা বলার ধরন। সাহেবদের বাড়িতে পিয়ানোয়-বেহালায় কতরকম সুরের ওঠাপড়া শুনেছিলুম, কয়েদখানার জীবন ঠিক সেইরকম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হারমনি—ফ্রেজারসাবের মুখেই শব্দটা প্রথম শুনেছিলুম—সেই হারমনি-ই শুনতে পেলুম জেলখানায় এসে। 'হাবসিয়া' নামে তখন একটা নাজ্‌ম লিখেছিলুম কয়েদখানায় বসেই। হারমনি-টা ওখানে শুনতে পাবেন, মান্টোভাই।

এখানে বন্দি আমি, কবিতার বীণায় তুলি ঝঙ্কার,
হৃদয়ের দুঃখস্রোত সুর হয়ে যায়
রক্ত থেকে ছেনে তুলি গান— বন্দি আমি
খুলে ফেলি অদৃশ্য জানলা,
গড়ে তুলি পাখিদের সরাইখানা।
কত কাজ দেবে দাও,
তোমার এই বন্দিত্বের উপহার,
শিকলে বাঁধতে পারবে কি কণ্ঠস্বর
বিলাপ যখন হয়ে ওঠে ঝরনা?

পুরনো বন্ধুরা, এখানে এসো না,
কখনও আমার দরজায় ধাক্কাও দিও না,
আমি তো আগের মতো সহজ হব না।

এখন চোরেরা আমার সঙ্গী,
আমাকেই প্রভু মেনে নেয়,
আমি বলি, 'বাইরে যেও না ভাই,
ওখানে কিছুমাত্র বিশ্বস্ততা নেই।'

ওরা আসে, জেলের রক্ষক ও প্রহরী
যেহেতু আমি তো এসেছি।
খুলে দেয় দরজা,
জানে, আমিই এসেছি।
জেলকুঠুরির বন্ধুরা, উল্লাস করো,
আমি এসে গেছি।
কবির শব্দে তুমি খুঁজে পাবে ঘর,
দ্যাখো, আমিই এসেছি।
বন্ধুরা ফিরিয়েছে মুখ,
আত্মীয়েরা সরে গেছে দূরে,
ওগো, অচেনা মানুষ, বন্দি হৃদয়,
তোমার দিকেই বাড়িয়েছি হাত।

তিন মাস কয়েদখানায় ছিলুম, ভাইজানেরা, আমার সবার সঙ্গেই ভাব-ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল। কতজন যে এসে শের শুনতে চাইত। জেলখানায় এসে বুঝলুম, গজল শুনতে প্রায় সকলেই ভালবাসে। কিন্তু এমন-এমন কাজ করতে হয় তাদের,শোনার সময়টুকুও পায় না। সন্ধের পর সবাই এসে আমাকে ঘিরে বসত; সে যেন এক মুশায়েরা। শের বলবার লোক তো একা আমিই। একদিন নতুন একটা শের তৈরি করে ওদের শোনালুম :

দায়েমুল-হবস ইস্-মেঁ হৈ লাখোঁ তমন্নায়েঁ, অসদ;
জানতে হৈঁ সীন্‌হ্-এ পুরখূঁ-কো জিন্দাখানহ্ হম।।
(এখানে যাবজ্জীবন বন্দি হয়ে আছে লক্ষ কামনা-বাসনা, আসাদ,
আমার রক্তাক্ত বক্ষকে কারাগার বলেই জানি।।)

—মিঞা—। একটা মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল। দেখি, যে লোকটা বেশির ভাগ সময় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে, সে উঠে বসছে।

—ইকবাল ভাই, নিন্দ টুট গিয়া ক্যায়া? একজন বলে ওঠে।

—ঘুম তো আসে না, ভাইজান। কম্বলের ভেতরে অন্ধকারে শুয়ে থাকি, তবু ঘুম আসে না। কিন্তু মিঞা—সে আমার দিকে সোজাসুজি তাকায়—আপনি কয়েদ হয়ে আছেন বলে, আপনার দিল্‌ও কয়েদখানা হয়ে যাবে?

ইকবালের কয়েদখানায় আসার কিস্‌সাটা আজিব, ভাইজানেরা। বিয়ের পর অনেকদিন ওর সন্তান হচ্ছিল না। তারপর হঠাৎই ওর বিবি গর্ভধারণ করে। ইকবালের ছেলে হয়। ছেলের জন্মের দু' বছর পর ইকবাল জানতে পারে, সে নয়, তার খানদানের অন্য কেউ ছেলেটির জন্মদাতা। ইকবাল ছেলেটিকে হত্যা ক'রে কবর দিয়ে আসে। এরপর থেকে সে আর ঘুমোতে পারত না। একদিন নিজেই থানায় গিয়ে হাজির হয়। সব কথা কবুল করে, তারপর কয়েদখানায় চলে আসে।

এই প্রথম ইকবালের মুখ দেখলুম। যেন একটা ঝরে যাওয়া ফুল। এখনও কয়েকটা শুকনো পাপড়ি শরীরে লেগে আছে। সে হঠাৎ বলতে শুরু করল :

ভালা গর্দিশ ফলক কী চ্যয়ন দেতি হ্যয় কিসে, ইনশা
ঘানিমৎ হ্যয় কে হম সুরত ইহাঁ দো চার বৈঠে হৈঁ।।

আহা, কতদিন পরে ইনশা আল্লা খান ইনশার শের শুনলাম। অওধে ইনশার মতো শায়র আর কেই বা ছিলেন? কথাগুলো ভাবুন মান্টোভাই, সময়ের ঘূর্ণি, কাউকেই রেয়াত করে না, খোদা হাফিজ, কয়েকজন দোস্ত তো এখনও বসে কথা বলতে পারছি। এর চেয়ে বড় আর কী পাওয়া যায় এই জীবনে?

আমি বললুম, 'ইকবাল ভাই, এইরকম কয়েকজন বন্ধুদের আমি বিশ্বাস করেছিলুম। কিন্তু আমার কয়েদখানায় আসার খবর শুনেই তারা দূরে সরে গেল।'

—কেন বিশ্বাস করেছিলেন? খোদা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা যায়? তা হলে একটা কিস্‌সা শুনুন, মিঞা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কাল্লুর কথা মনে পড়ল। সবাই হইহই করে উঠল, 'শুনাও ইকবাল—আজ মশহুর কিস্‌সাকা রাত—। আর ছড়িয়ে পড়ল হাসির উথালপাথাল ঢেউ।

—সিকন্দরের জীবনে একটা ভারী গোপন কথা ছিল। কাউকে তা সিকন্দর বলতেন না।

—সিকন্দর? সমস্বরে চিৎকার ওঠে, 'কেয়া বাত ইকবাল ভাই।'

কেউ একজন বলে ওঠে, 'কয়েদখানায় সিকন্দরের কিস্‌সা! লা জবাব ইকবাল মিঞা।'

আমি হেসে বলি, 'সিকন্দর ছাড়া কয়েদখানায় আর কেউ আসতে পারে?'

—বহুৎ খুব।

—তা, গোপন কথাটা কী, ইকবাল ভাই? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—সিকন্দরের কান দু'টো ছিল বিরাট, যেন হাতির মতো। কেউ সে-কথা জানত না। লোকে দেখে হাসবে বলে বড় টুপিতে কান ঢেকে রাখতেন। কানের কথা জানত শুধু তাঁর বুড়ো নাপিত। একদিন নাপিত এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার আর কাজ কার

ক্ষমতা রইল না। কিন্তু সম্রাটের জন্য তো এমন লোক খুঁজে দিতে হবে, যে কখনও গোপন কথাটা কারুর কাছে ফাঁস করবে না। সম্রাটের দরবারে বিলাল নামে একটি ছেলে কাজ করত। বুড়ো নাপিত তাকে জানত; বিলালকেই সে সিকন্দরের নাপিত হিসাবে বেছে নিল। সিকন্দর প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু বুড়ো নাপিতের কথা শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। বিলাল কাজে বহাল হল।

—তারপর? অনেকে ইকবালকে ঘিরে ধরল।

—প্রথমবার সিকন্দরের চুল কাটতে গিয়ে তো বিলালের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার দশা। মানুষের এত বড় কান? ভয়ে-বিস্ময়ে তার হাত থেকে কাঁচি পড়ে গেল। সিকন্দর বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যা দেখেছ, তা নিজের মনেই রেখো। ও-কথা আর কেউ জানতে পারলে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব, আর গর্দান তো যাবেই, মনে রেখো।' এই কথা শোনার পর থেকে বিলাল ভয়ে একেবারে কাঁটা হয়ে গেল। সব সময়ই সে দেখতে পায়, তার কাটা মুণ্ডু এখানে-ওখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ভয়ে কারও সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিল সে। যদি কোনওভাবে সম্রাটের কানের কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে এ-ও বুঝতে পারছিল, কথাটা কাউকে না বলা অব্দি সে শান্তি পাবে না। গোপন কথাটা তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেলেই সে মুক্তি পাবে। কিন্তু চেনাজানা কাউকে বললেও, সে জানত, কথাটা সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে রটে যাবে, আর অমনি তার কাটা মুণ্ডু রাস্তায় গড়াগড়ি খাবে।

—বিলাল কী করল?

—একদিন লুকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে কিছুটা দূরে একটা বনে গিয়ে ঢুকল। সেখানে একটা পুকুর ছিল। রাখালেরা সেই পুকুরে ভেড়াদের এনে জল খাওয়াত, পুকুরপাড়ে নিজেরাও একটু জিরিয়ে নিত। আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিলাল পুকুরের উদ্দেশ্যে বলল, 'উরিব্বাশ, সে কী ইয়া বড় বড় সম্রাট সিকন্দরের কান।' কথাটা বলেই নিজেকে হালকা লাগল তার, যেন অনেকদিন ধরে বুকের ভেতরে আটকে থাকা একটা পাথর বেরিয়ে গেল।

—গুল, গুল। সব গুলগাপ্পা। একজন চেঁচিয়ে উঠল।

—বেওকুফ। ইকবাল বলে ওঠে।—গুলগাপ্পা ছাড়া কোথায়, কবে কিস্‌সা জন্মেছে শুনি? মানুষের জীবনই গুলগাপ্পায় ভরা, আর কিস্‌সা—সে তো মানুষেরই তৈরি করা।

—শালা হারামখোরের কথা না শুনে কিস্‌সাটা তো বলো ইকবাল ভাই। আরেকজন গলা চড়িয়ে বলে।

—বেশ কয়েক মাস চলে গেল। বিলালের ভয়ডর তখন কেটে গেছে; সিকন্দরও নতুন নাপিতকে নিয়ে খোশমেজাজে। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার ততদিনে ঘটে গেছে। সেই পুকুরে কিছু নললতা জন্মেছিল। এক রাখাল একদিন একটা নললতা তুলে তার গায়ে ফুটো করে বাঁশির মতো বাজাতে শুরু করল। বাঁশির আওয়াজ শুনে তার তো

চক্ষু চড়কগাছ। সেই আওয়াজের মধ্যে কে যেন বলে চলেছে, 'উরিব্বাশ, সে কী ইয়া বড় বড় সম্রাট সিকন্দরের কান।'

—তারপর?

—একদিন সেই বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সিকন্দরও সেই বাঁশির সুর শুনতে পেলেন। আওয়াজ অনুসরণ করে তিনি রাখালদের ডেরায় পৌঁছলেন। যে বাঁশি বাজাচ্ছিল, তাকে গ্রেফতার করে দরবারে নিয়ে এলেন। জেরায় রাখাল সব কথা খুলে বলল। 'অসম্ভব', সম্রাট গর্জে উঠলেন। সিকন্দর এবার বিলালকে ডেকে পাঠালেন। বিলাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হুজুর, আমি তো কানের কথা কাউকে বলিনি। শুধু পুকুরকে বলেছিলাম।'

—পুকুরকে? সম্রাটের চোখ কপালে উঠল।

—হুজুর, কথাটা আমি আর বইতে পারছিলাম না। অন্য কাউকে তো বলা যাবে না, তাই পুকুরকে গিয়ে বলেছিলাম।

—তারপর?

—সিকন্দর সেই পুকুর থেকে আরও একটা নললতা তুলে আনতে বললেন। রাখালটি সেই নললতা থেকে বাঁশি বানাল। সেই বাঁশি থেকেও একই কথা শোনা গেল, 'উরিব্বাশ, সে কী ইয়া বড় বড় সম্রাট সিকন্দরের কান।' শুনে সিকন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর সিপাইদের বললেন, 'রাখালকে ছেড়ে দাও।' আর বিলালের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, 'চাইলে তুমি এখনও আমার নাপিত থাকতে পারো।'

—তারপর?

—সিকন্দর শহরের সেরা লিপিচিত্রকরকে ডেকে পাঠালেন। সোনার কালিতে সে লিখে দিয়ে গেল কয়েকটা কথা; সিকন্দর তা বাঁধিয়ে রাখলেন নিজের শোবার ঘরে যাতে রোজসকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পান।

—কী কথা?

—নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস ক'রো না। এমনকী পুকুরও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

সবাই তো হাসিতে ফেটে পড়ল।

ইকবাল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বুঝলেন, মিঞা?'

—তুমি যা বলতে চেয়েছ বুঝেছি। তবে এই কিস্‌সার মধ্যে আরও একটা লুকনো কথা আছে।

—কী মিঞা?

—জাঁহাপনারও কিছু লুকনো থাকে না। খোদা একদিন না একদিন সবার পর্দা ফাঁস করে দেন। সব ক্ষমতা একদিন এভাবেই হাস্যকর মনে ওঠে, তাই না ইকবাল ভাই?

—জি। এ-কথাটা তো আমি ভেবে দেখিনি।

—সবাই নিজের মর্জি মোতাবেক ভাবে। তাই তো দুনিয়ার খেলাটা টিকে আছে। খোদার দয়ায়, কয়েদখানাকেও আমি একসময় খেলাঘর বানিয়ে তুলতে পেরেছিলুম, মান্টোভাই। আর কয়েদখানা থেকে বেরোনোর পর নসিব আমার দিকে তাকিয়ে প্রথম হাসল। মাত্র কয়েক বছরের জন্য। তাও তো জীবনেরই দান। এই দানের অর্থ জানেন তো, মান্টোভাই? খোদা আপনিই যা দিয়েছেন, আর জুয়ার দান চেলে আমি যেটুকু কেড়ে নিয়েছি। শুধু আয়নায় আসন্ন মৃত্যুর ছায়া এসে লেগে আছে।

য়েহ্ নহ্ থী হমারী কিসমৎ কেহ্ বিসাল-এ য়ার হোতা,
অগর অওর জীতে রহ্‌তে য়হী ইন্তজার হোতা।
(বন্ধুর সাথে মিলন ভাগ্যে ছিল না;
যদি আরও বাঁচতাম, এই প্রতীক্ষাই চলত।)

মির্জাসাব, এই দোজখে, আপনাদের সামনে আজ স্বীকার করছি, ইসমতকে আমি ভালবেসেছিলাম। কখনও ওকে বলার প্রয়োজন হয়নি, কেননা, আমরা দু'জনেই তা জানতাম। ইসমতের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের কথা আমি কখনও ভাবিইনি; বিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কতগুলো অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে ফেলে, আর তারপর সম্পর্কটা বিবর্ণ হতে হতে একেবারে ধূসর হয়ে যায়। ইসমতকে আমি দেখেছিলাম একটা তসবির মহলের মতো; সে-মহলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কত নতুন নতুন ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠত, কত যে দৃশ্যের জন্ম হত। ইসমত আহামরি কিছু সুন্দরী ছিল না, কিন্তু একই সঙ্গে স্নিগ্ধ ও প্রখর। চশমার কাচের ওপারে ওর চোখ দু'টো যেন সবসময় বিস্মিত হওয়ার অপেক্ষায় মুখর হয়ে আছে। গালে যখন টোল পড়ত তখন সত্যিই চোখ ফেরানো যেত না। আর ওর আইসক্রিম খাওয়া দেখতে এত মজা লাগত আমার; আইসক্রিম পেলে ইসমত একেবারে বাচ্চা মেয়ে হয়ে যেত।

আমার চোখ দেখলেই নাকি ওর ময়ূরের পেখমের কথা মনে পড়ত। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন এইরকম মনে হয়, ইসমত?'

—জানি না। মনে হয়।

—গল্প লিখতে লিখতে বানিয়ে কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করেছ বেশ।

—আমি মিথ্যে বলি না মান্টোভাই।

—কেন বলো না? মিথ্যে ছাড়া জীবনে কোনও রং থাকে?

—তুমি তো বলো। সেখান থেকে রং চুরি করি।

—মাশাল্লা।

—আর একটা কথা শুনে রাখো মান্টোভাই। তোমার চোখের দিকে তাকালে আমি হার্টের একটা বিট মিস করি।

—আরিব্বাস। শফিয়াকে বলতে হবে। তার কখনও এমনটা হয় বলে শুনিনি।

—নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভাল লাগে, না?

—কার না লাগে?

—তোমার সবচেয়ে বেশি লাগে। তোমার মতো নার্সিসাস আমি দেখিনি।

যেন একটা খেলার মতোই গড়ে উঠেছিল আমাদের সম্পর্কটা। কথায় কথায় তর্ক বেধে যেত। ইসমত তো কোনও কিছুতেই কাউকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। আমার কাজ ছিল ওকে রাগিয়ে দেওয়া। রাগী ইসমতের সৌন্দর্য যে কত আদিম, তা আমার মতো কেউ জানে না, মির্জাসাব। ঝগড়া একেক দিন এমন জায়গায় পৌঁছত, মনে হত, এর পর থেকে আর আমাদের দেখা হবে না। একবার ঝগড়া হতে হতে আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তুমি মেয়ে না হলে এমন কথা বলতাম, আর কথা বলার মুরোদ রাখতে না।'

—যা মনে হয় বলো না। আমাকে ছাড় দেওয়ায় দরকার নেই। ইসমত গম্ভীর হয়ে বলল।

—তাই? তুমি ছেলে হলে—

—আরে বলো না। কোন খিস্তিটা দেবে আমায়? কী করবে?

—লজ্জা পাবে ইসমত।

—একেবারেই না।

—তা হলে তুমি মেয়ে নও। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

—কেন? লজ্জা না পেলে শুধু মেয়ে বলে আমাকে লজ্জা দেখাতে হবে কেন? মান্টোভাই, তুমিও তা হলে এভাবে নারী-পুরুষকে আলাদা করে দ্যাখো? আমি ভেবেছিলাম, তুমি আম আদমির চেয়ে আলাদা।

ইসমতের জিভ এইসব কথা বলার সময় একেবারে ছুরির ফলা হয়ে যায়।

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, 'একেবারেই না...ছেলে আর মেয়েদের আমি একেবারেই আলাদা করে দেখি না।'

—তা হলে কথাটা বলছ না কেন?

আমি চুপ করে গেলাম। ইসমত এবার খোঁচাতে লাগল, 'বলো মান্টোভাই, বলো, কথাটা শুনি। তারপর না হয় মেয়েদের মতো লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাই।' বাচ্চা মেয়ের মতো আমাকে খ্যাপাতে লাগল। আমি হেসে ফেললাম, 'না ইসমত, আমার রাগ জল হয়ে গেছে।'

এভাবেই, ইসমতের কাছে হেরে যেতেই হবে। একেবারে একা—নিজে-নিজে—ইসমত তার নিজস্ব দুনিয়াটা তৈরি করেছিল। ওর বাবা কাসিম বেগ চুঘতাই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট; বদলির কত জায়গাতেই না থাকতে হয়েছে। আলিগড়ে ইসমত যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, ওর বাবা বদলি হয়ে গেলেন রাজস্থানের সম্ভরে। ইসমত হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে চেয়েছিল; ওর বাবা-মা রাজি হননি। সম্ভরে এসে ইসমতের দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। পড়াশোনার কোনও সুযোগই সেখানে নেই। একদিন সকালে নাস্তার পর ওর বাবা বসে আখবার পড়ছেন; পাশেই একটা চৌকিতে বসে মা সুপুরি কাটছিলেন। ইসমত ঘরে ঢুকে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। তারপর খুব শান্তভাবে বলল, পড়াশোনা করতে সে আলিগড়ে যেতে যায়। মা তো চোখ বড়-বড় করে ইসমতের দিকে তাকিয়ে আছে। কাসিম বেগ চুঘতাই দেখলেন, মেয়ে তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। কোনও ছেলেমেয়েই এভাবে তাঁর চোখের ওপর চোখ রাখতে পারেনি কখনও।

ইসমত সোজাসুজি আবারও বলল, 'পড়াশোনা করতে আমি আলিগড়ে যাব।'

—এখানে তো বড়ে আব্বার কাছে পড়ছ।

—আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চাই।

—কেন? জুগনু'র আর দু'বছর পড়া বাকি। তারপরই তো তোমাদের শাদি হবে।

—আমি ম্যাট্রিক দেব।

—কোনও দরকার নেই।

—তা হলে আমি পালাব।

—পালাবে? কোথায় যাবে?

—যেখানে খুশি।

ইসমতের মা খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাসিম বেগ চুঘতাই মেয়ের এই সমানে সমানে কথায় হয়তো কিছু আঁচ করেছিলেন। তিনি ইসমতকে আলিগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। ইসমতের জীবনের প্রথম জয়। অন্যান্য বোনের মতো ও ছোটবেলায় পুতুল খেলেনি, ছেলেদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নেমেছে; ইসমত কখনও চায়নি, বোনেদের মতো তারও কুড়ি বছরের মধ্যেই নিকে হয়ে যাক।

ছ'বছর ধরে ইসমতের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন একটা জল রং-এ আঁকা ছবির মতো। ছবিটা কীভাবে আঁকা শুরু হয়েছিল, কবে শেষ হয়েছিল, কিছুই আর মনে নেই। তার

ওপর, মদ খেতে খেতে, বুঝতেই পারছেন ভাইজানেরা, আমার মাথার হালত খুব খারাপ, কোনটা আগে, কোনটা পরে, কিছুতেই খেই খুঁজে পাই না। একটা মজার রাতের কথা মনে পড়ছে, ভাইজানেরা। শহিদ আর ইসমত তখন মালাদে থাকে। আমরা রাত বারোটার পর গিয়ে ওদের বাড়িতে হানা দিলাম। আমি, শফিয়া, নন্দাজি আর খুরশিদ আনোয়ার। শফিয়া তো এসবে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু আমাকে একা ছাড়বে না বলেই ওর আসা। দরজা খুলতেই শফিয়া ইসমতের হাত চেপে ধরে বলতে লাগল, 'কত করে বোঝালাম, এত রাতে ওদের বিরক্ত কোরো না। তোমার মান্টোভাই আসবেই।'

—তুমি আমাকে ঠেকাবে শফিয়া? আমার যখন যেখানে খুশি যাব।

শহিদ এসে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'রাতটা জমে যাবে মান্টো, এসো—এসো—।'

আমাদের তো খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু সব হোটেল তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'ইসমত, আজ নিজেরাই রেঁধে খাব। আটা, ডাল আর আলু থাকলেই চলবে।'

শফিয়া তো কিছুতেই আমাদের রান্নাঘরে যেতে দেবে না। ছেলেরা রান্না করে খাবে, তা কখনও হয় নাকি? কিন্তু আমরা রান্নাঘরেই বসে গেলাম বোতল আর গ্লাস নিয়ে। আমি আটা মাখছি, নন্দাজি স্টোভ ঠিক করছে, আর খুরশিদ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। একসময় খুরশিদ বলে উঠল, 'এ শালা আলুর খোসা ছাড়ানো আমার কম্মো নয়। মান্টোভাই, কাঁচা খেতে পারবে না?' আমি রুটি বানালাম, তবে আধপোড়া, আর পুদিনার চাটনি। খেয়েদেয়ে আমরা ক'জন রান্নাঘরেই শুয়ে পড়লাম। এইরকম কত রাতে ইসমত আর শহিদ আমার অত্যাচার সহ্য করেছে। মদের মাত্রা যত বাড়ত, আমি ইসমতকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, 'আল্লার কসম ইসমত, আমি মাতাল হইনি। দেখতে চাও? বাজি লড়ো। কালই আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেব। মদ ছেড়ে দেওয়া কোনও ব্যাপারই না আমার কাছে।'

—বাজি লড়ো না মান্টোভাই, তুমি হেরে যাবে। এখন তুমি মাতাল।

মজা লাগে, মির্জাসাব, খুব মজা লাগে, আপনার-আমার গায়ে কেমন মাতালের ছাপ্পাটা লেগে গেল। আপনি যদি সবসময় মাতালই থাকতেন, তা হলে এত গজল লিখলেন কখন? এত চিঠি লেখা সম্ভব হত আপনার পক্ষে? আমিই বা এত-এত গল্প লিখলাম কী করে? এলোমেলো, ছন্নছাড়া একটা জীবন, পেটের ভাত জোগাড় করতেই সকাল থেকে রাত্তির কত নোংরামিতে ডুবে থাকা, মদ খাওয়ার পর ঠিকঠাক ফোকাস করতে পারতাম, আমার লেখার ঘরটা খুঁজে পেতাম। সে-ঘরে শব্দরা হাঁটাচলা করে, উড়ে বেড়ায়, গুনগুন করে গান গায়, কী যে বেদনায় গুমরে গুমরে ওঠে, শব্দের ভেতরেই তো খুঁজে পেতাম কত গোপন অশ্রু, মুচকি হাসি, খেটে খাওয়া

মানুষদের অট্টহাসি আর খিস্তি, কত ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, হতাশ্বাস, শব্দের ভেতরেই জ্বলে উঠত সেই নীল আলো যার গভীরে লুকিয়ে থাকে কামনার লাল শিখা। আমি তো কখনও নিজের কথা লিখতে চাইনি মির্জাসাব। কোনও লেখকই কি সে দৈনন্দিনে কীভাবে বেঁচে আছে, তার সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দের কথা লেখে? সে তো শব্দের ভেতরে খুঁজে বেড়ায় চেনা-অচেনা মানুষদেরই সেইসব ছবি, যে ছবিগুলো তারা লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল, যে সব ছবির স্মৃতি তাদের গভীর দহনের পথে নিয়ে গেছে। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে যে নারী রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, সে কখনও আমার গল্পের নায়িকা হতে পারেনি, ভাইজানেরা। যে-মেয়েটা সারারাত বাতি জ্বেলে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে, তারপর দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে আর হঠাৎই একটা স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জেগে ওঠে, আমি তার কথাই ভেবেছি। কী স্বপ্ন দ্যাখে সে? তার বৃদ্ধ, লোলচর্ম শরীর তারই দরজায় এসে কড়া নাড়ছে।

ইসমত সবসময় বলত, এই যে আমি নানা কোঠা আর বেশ্যাদের গল্প বলি, এসবই নাকি আমার বানানো। আমার দোস্তদের সম্পর্কেও যা বলতাম, তা-ও বিশ্বাস করত না। এই ধরুন রফিক গজনভি। ও তো একটা লোফার ছিল, একেবারে লোচ্চা। এক বাড়ির চার বোনকে পর পর বিয়ে করেছিল, লাহোরের কোঠার এমন কোনও মেয়ে ছিল না, যার সঙ্গে শোয়নি। রফিককে আমার সত্যিই ভাল লাগত। জীবনটা যেন একটা খেলার মতো ওর কাছে। একদিন ইসমতকে বললাম, 'চলো, রফিকভাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

—আমার তাতে লাভ? তুমি তো বলো, ও একটা লোচ্চা।

—সেইজন্যই তো আলাপ করবে। তোমাকে কে বলেছে, লোচ্চা মানেই সে খারাপ মানুষ? রফিকের মতো শরিফ আদমি খুব কম দেখা যায়।

—মান্টোসাব, তোমার কথার মানে কিছু বুঝছি না। আমি হয়তো ততটা বুদ্ধিমান নই।

—ভান করো না তো! একবার দেখা করোই না। রফিকভাই খুব মজার মানুষ। ওকে দেখলে প্রেমে পড়েনি এমন কোনও মেয়ে নেই, বুঝলে?

—আমিও তো মেয়ে।

—আরে তুমি তো আমার ইসমত বহিন।

—আমার বহিন। তোমার এই ভাঁড়ামো আমার ভাল লাগে না, মান্টোভাই। ইসমত আমার পাঞ্জাবির কাঁধ খামচে ধরে।

—তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে এভাবে বহিন বলি না, ইসমত। ইকবালকেও না।

—কেন বলো?

এর যে কোনও উত্তর নেই, মির্জাসাব। ইসমতই তো একদিন বলেছিল, 'জীবনে একটা কথাও তুমি মুখ ফুটে বলতে পারলে না?' ইসমত জানত, মান্টোর মতো শয়তানেরও মুখোশের দরকার হয়।

রফিকভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম ইসমতের। ইসমত স্বীকার করেছিল, সত্যিই ও শরিফ আদমি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করে এমনটা হয় মান্টোভাই?'

—জানি না। আমি কখনও রফিকভাইকে বোঝবার চেষ্টা করিনি। ও যেমন, তেমন ভাবেই মেনে নিয়েছি।

—মান্টোভাই—

—হুকুম করো।

—পাঁক খুঁড়ে খুঁড়ে এইসব মুক্তো তুমি কীভাবে বার করো?

—খোদাকে সালাম জানাও।

—আর কোঠার গল্পগুলো? ওগুলোও সত্যি? আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যে বলায় তো তোমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না।

—মিথ্যের কী আছে? পকেটে পয়সা থাকলে যে কেউ কোঠায় যেতে পারে।

—তোমার দু'নম্বরি বন্ধুগুলোর সে-সাহস নেই মান্টোভাই। হ্যাঁ, মুজরো শুনতে যেতে পারে, তার বেশি কিছু করার সাধ্য ওদের নেই।

—আরে, আমিও তো গেছি।

—মুজরো শুনতে? ইসমত বাঁকা হাসে।

—কেন? কেন? শুধু মুজরো কেন? কোঠায় গিয়ে যে-জন্য টাকা খরচ করে মানুষ, সেজন্যই গেছি।

—চুপ করো। বেহায়া কোথাকার! ইসমত চিৎকার করে ওঠে। মিথ্যে বলার একটা সীমা আছে!

—কেন? অসুবিধে কোথায়?

—হতে পারে না। নিজের এইরকম ইমেজ তুমি ইচ্ছে করে তৈরি করো।

—খোদা কসম, ইসমত, আমি কোঠায় গেছি।

—খোদার নাম মুখে এনো না। তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো?

—আমার মরা ছেলের কসম।

—মান্টোভাই। সে দু'হাতে আমার চুল খামচে ধরে।—তুমি কি মানুষ? মরা ছেলের নামে কসম খাচ্ছ?

দেখতে পেলাম, ইসমতের দুই চোখ ঝাপসা। আমি হাসতে লাগলাম।

—তুমি বিশ্বাস করছ না কেন, ইসমত বহিন, আমি মেয়ে পটাতে ওস্তাদ।

—মান্টোসাব, এই কিন্তু আমাদের শেষ দেখা বলে দিচ্ছি। ইসমত ফুঁসতে থাকে। ওর দুই গালে টোল পড়েছে। এইরকম সময়ে ওকে আরও রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমার। বলি, 'দাঁড়াও, শফিয়াকে ডাকি। ও কী বলে শোনো।'

শফিয়া আসতেই ইসমত ফেটে পড়ে, 'মান্টোভাই তোমাকে বলেছে, ও কোঠার মেয়েদের কাছে গেছে?'

—কতবারই তো বলেছেন।

—হতে পারে না। ইসমত রাগে গরগর করতে করতে পায়চারি করতে থাকে।—আচ্ছা, না হয় গেছে, গেলেও ওদের সঙ্গে দু'টো একটা কথা বলে চলে এসেছে, মান্টোভাই। ঠিক কি না শফিয়া?

—কী জানি। মান্টোসাবই বলতে পারবেন।

আমি হা-হা করে হাসতে থাকি। আর ইসমত তত চেঁচাতে থাকে, 'হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। মান্টোভাই কোরান ছুঁয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।'

কী শিশুর মতো বিশ্বাস! মনেই হয় হয় না, এই ইসমত মৃত দাদা আজিম বেগকে নিয়ে 'দোজখি'-র মতো গল্প লিখতে পারে। ইসমত লিখেছিল, আজিম বেগের লেখা-বলা সব গল্পই মিথ্যে। আজিম বেগ কথা বলতে শুরু করল্লেই নাকি ওদের বাবা বলতেন, 'আবার তুমি হাওয়ায় মহল তৈরি করতে শুরু করলে?' আজিম বেগ বলতেন, 'আব্বাজান, জীবনে যেটুকু রং, তা তো মিথ্যের জন্যই। সত্যের সঙ্গে মিথ্যে না মেশালে, শুনতে মজাদার হয় না।' আজিম বেগের পাগলামিটা ইসমতের মধ্যেও ছিল। অদ্ভুত সব খেয়াল চাপত ওর মাথায়। একবার বলল, মোরগ-মুরগিদের ইশ্‌ক নিয়ে একটা কিস্‌সা লিখবে। একদিন মনে হল, লেখা ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে উড়োজাহাজ চালাবে। জানেন মির্জাসাব, ও এমনই একটা মেয়ে, হয়তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু আপনাকেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করবে বা আপনার সঙ্গে কথাই বলবে না। হয়তো খুব চুমু খেতে ইচ্ছে করছে ওর, তার বদলে গালে সুঁচ ফুটিয়ে তামাসা করবে। শফিয়াও ইসমতের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সে-কথা একদিন বলায় ইসমত শফিয়াকে বলেছিল, 'বাব্বা, প্রেমে পড়ার আদিখ্যেতা তো তোমার কম নয়! তোমার বয়সের মেয়েদের বাপেরা আমার প্রেমে হাবুডুবু খায়, আর তুমি এসেছ—।' একজন লেখক তো ইসমতের প্রেমে একেবারে দিবানা হয়ে গিয়েছিল; পরেরপর চিঠি লিখত। ইসমতও চিঠি লিখে যেত। শেষে এমন ল্যাং মারল, ভাইজানেরা, লেখকের তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ইসমত এইরকম, একখণ্ড উড়ো মেঘের মতো। যখন লিখত না, মাসের পর মাস কেটে যেত, জোর করেও ওকে লিখতে বসানো যেত না। আর লিখতে বসলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যাবে, নাওয়া-খাওয়া-ঘুম, সব ভুলে যেত। শুধু আইসক্রিম রেখে দিতে হবে তার সামনে।

আচ্ছা, মির্জাসাব, এই যে ইসমতকে নিয়ে এত কথা বলছি, ওকে কি আপনি চিনতে পারছেন? যেন নানা রংয়ের—সবুজ, লাল, হলুদ, গোলাপি আবির আনা হয়েছে উঠোনে আর কোথা থেকে হাওয়া আসছে, রংগুলো মিলেমিশে যাচ্ছে, কাউকে আর আলাদা করে ছোঁয়া যাচ্ছে না। ঠিক সেইরকম না? দাদা আজিম বেগকে নিয়ে লেখা ওর 'দোজখি'-র সেই জায়গাটা মনে পড়ছে, মির্জাসাব। একদিন ভোরে শামিম এসে ইসমতকে ডাকল, বলল, 'তৈরি হয়ে নাও, আজিমভাই মারা যাচ্ছে।' ইসমত বলল, 'আজিমভাই কখনও মরবে না। শুধু শুধু ঘুম থেকে তুললে কেন?'

শামিম ওকে ঠেলতে লাগল, 'ওঠো ইসমত। আজিমভাই তোমাকেই খুঁজছে।'

—বলো কেয়ামতের দিন দেখা হবে। বলছি না, আজিমভাই মরতে পারে না।

ইসমত লিখেছিল, জন্নত বা জাহান্নাম, মুন্নাভাই যেখানেই থাকুক, আমি তাকে দেখতে চাই। আমি জানি, সে এখনও হাসছে। পোকারা তার শরীর খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে, হাড়গুলো ধুলো হয়ে গেছে, মোল্লাদের ফতোয়ায় তার ঘাড় ভেঙে গেছে। তবু সে হাসছে। দুষ্টু চোখ দু'টো নাচছে। বিষে নীল হয়ে গেছে তার দুই ঠোঁট, তবু তার চোখে কেউ জল দেখতে পাবে না। আসলে সে তো এক দোজখ থেকে অন্য দোজখে গেছে।

আজিম বেগের পর আর একজন দোজখি-কে ইসমত খুঁজে পেয়েছিল, আমার মধ্যে। হয়তো পাঁচ মিনিট দেখা হওয়ার কথা, কিন্তু কোথা থেকে পার হয়ে যেত পাঁচ ঘণ্টা। শুধু তর্ক আর তর্ক। আমাকে ও হারাবেই। ওর হারানো মুন্নাভাইয়ের ওপর শোধটা কি আমার উপর দিয়েই তুলতে চাইছিল? মদ খেতে খেতে আমার খুব কাশি হত। ছোটবেলা থেকেই তো কফের ব্যারাম। আমার এই কাশি ইসমত একেবারে সহ্য করতে পারত না। একদিন বলল, 'এত কাশির অসুখ তোমার, চিকিৎসা করাও না কেন, মান্টোভাই?'

—চিকিৎসা! ডাক্তার মানেই গাধা। কয়েক বছর আগে ওরা বলেছিল আমি বছর খানেকের মধ্যে টিবি-তে মারা যাব। দেখতেই পাচ্ছ, আমি কেমন বহাল তবিয়তে আছি। ডাক্তারদের চেয়ে জাদুকররা অনেক ভাল।

—তোমার আগে আরেকজনের মুখেও আমি কথাটা শুনেছি। ইসমত গম্ভীর হয়ে বলে।

—কে সেই ফরিস্তা?

—আমার দাদা, আজিম বেগ। এখন কবরে নাক ডাকছে।

হ্যাঁ, মির্জাসাব, আমি একদিকে ওর মান্টোভাই, কখনও মান্টোসাব, অন্যদিকে ওর মুন্নাভাই—আজিম বেগ চুঘতাই। দাদার সঙ্গে যে-খেলাটা ও খেলতে পারেনি, আমাকে সেই খেলার টার্গেট করে নিয়েছিল। আর ওর বর শহিদ খেলাটা খুব উপভোগ করত; শহিদ জানত, একমাত্র মান্টোকে ছিন্নভিন্ন করেই শান্ত হবে ইসমত; ইসমতের সব দরাজদস্তি মেনে নেবে মান্টো নামের একটা ভাঁড়।

দরাজদস্তি নিয়েই ইসমতের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল খুব। একবার শহিদ আর ইসমত আমাদের নেমন্তন্ন করেছে ওদের মালাদের বাড়িতে। খেতে খেতে শহিদ বলল, 'মান্টো, তোমার উর্দুতে এখনও ভুল থাকে কেন?'

—বাজে কথা বোলো না।

কথার চাপানউতোর চলল। রাত দেড়টা বেজে গিয়েছে। শহিদ ক্লান্ত হয়ে বলল, 'ছাড়ো তো এখন, ঘুম পাচ্ছে।'

ইসমত কিছুতেই ছাড়বে না। ও তর্ক চালিয়ে যেতেই লাগল। কী একটা কথা প্রসঙ্গে ও 'দস্তদরাজি' শব্দটা বলে ফেলল। আমিও মওকা পেয়ে গেলাম। বললাম, 'অনেক বড়-বড় কথা বলছ তখন থেকে। দস্তদরাজি বলে কোনও শব্দ হয় না ইসমত। ওটা দরাজদস্তি।'

—কিছুতেই না।

—অভিধান দ্যাখো।

—দরকার নেই। আমি বলছি, দস্তদরাজি।

—ফালতু তর্ক ক'রো না।

—তুমি নিজেকে কী মনে করো, মান্টোভাই? উর্দু সাহিত্যের শাহেনশা?

শেষে শহিদ পাশের ঘর থেকে অভিধান নিয়ে এল। দস্তদরাজি বলে কোনও শব্দই নেই। লেখা আছে দরাজদস্তি। শহিদ বলল, 'ইসমত, তুমি হেরে গেছ, মেনে নিতেই হবে।'

কিন্তু ইসমত কিছুতেই মানবে না। এবার শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। আমি ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে; চারপাশে মোরগরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। ইসমত অভিধানটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'আমি যখন অভিধান তৈরি করব, সেখানে দস্তদরাজি শব্দটাই থাকবে। দরাজদস্তি কোনও একটা কথা হল! যত্তসব।'

ইসমত—ও একটা খেপি, সত্যিকারের খেপি। কেউ যদি কখনও সত্যিই আমাদের প্রশ্ন করত, কেন এত টান-ভালবাসা তোমাদের, বলো তো মান্টো, ইসমতের কী তোমার ভাল লাগে? মান্টোর ভেতরের কী তোমাকে টানে ইসমত, জানো? আমি জানি, আমরা দু'জনেই কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারে ডুবে যেতাম। সেই অন্ধকারে ইসমত আর আমি, পরস্পরের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। কারও জন্যই একটা জীবন যথেষ্ট নয়, মির্জাসাব।

মওজুঁ করো কুছ অওরভী, শায়দ কেহ্ মীরজী
রহ জায়ে কোঈ বাত কিস্‌কী জবান পর।।
(আরও কিছু কাব্যরচনা করো মীরসাহেব, হয়তো বা
তোমার কোনো কথা রয়ে যাবে কারুর মুখে।।)

একটা সুফি কিস্‌সা মনে পড়ল, ভাইজানেরা। এক ভিখিরি খিদের জ্বালায় শহরের বাড়ি থেকে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভিখিরিকে জানলা দিয়ে দেখে কেউই আর দরজা খোলে না। শেষে এক বাড়ির দরজা খুলল। বাড়ির কত্তা জিজ্ঞেস করল, 'কী—কী হয়েছে কী—তখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন?

—হুজুর কিছু খাবার। তিনদিন কিছু খাইনি।

—তা আমি কী করব? বাড়িতে এখন কেউ নেই।

—আমি কাউকে চাই না হুজুর। শুধু একটু খাবার। আর কিছু চাই না।

এই ভিখিরিটার মতোই আমি দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর খোদা আমার জন্য কয়েকদিনের খাবারের বন্দোবস্ত করে দিলেন। মিঞা নাসিরুদ্দিন সাব আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁকে সবাই মিঞা কালে শাহ বলেই ডাকত। বাদশা বাহাদুর শাহ তাঁকে মুর্শিদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তো জেল থেকে বেরিয়ে আমি লালকুঁয়ায় মিঞা কালে সাবের হাভেলির একটা অংশে এসে উঠলুম। ভাড়া দিয়ে থাকার মতো সামর্থ্য তখন আমার ছিল না; কালে সাবও সে-সব কথা তোলেননি। একদিন কালে সাবের সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানায় বসে আছি, কে একজন এসে বলল, 'মুবারক মির্জাসাব।'

—কেন?

—জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তাই।

আমার মাথায় তো সবসময় বদবুদ্ধি খেলে, মান্টোভাই। কালে সাবের দিকে তাকিয়ে হেসে বললুম, 'ছাড়া পেয়েছি? কী যে বলেন মিঞা! গোরাদের জেলখানা থেকে বেরিয়ে কালে সাবের জেলখানায় এসেছি বলতে পারেন।'

কালে সাব রসিক মানুষ; হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'জাঁহাপনা কেন যে আপনাকে এতদিন দরবারে ডাকেননি, বুঝতে পারি না। আপনার রসের ছিটেফোঁটা বাদশাহর গায়ে লাগলে, তাঁর জীবনটা এমন অভিশপ্ত হত না।'

—জাঁহাপনা কেন আমাকে ডাকবেন, মিঞাসাব। আমি তো খোদার কুকুর।

—মাশাল্লা! এই তো মির্জা গালিবের মতো কথা।

—কিছু ভুল বললুম?

—আপনি সেই কিস্‌সাটা শোনেননি? নকস্‌বন্দি তরিকার মুর্শিদ মওলা দরবেশ নিজেকে কুকুর বলতেন।

—আপনি কিস্‌সাটা বলুন জনাব। শুধু তার আগে আমি একবার কাল্লুকে ডেকে পাঠাই।

—কেন?

—কিস্‌সা না-শুনলে ওর ঘুম আসে না। আমার যেমন দারুর নেশা, ওর নেশা হয় কিস্‌সায়।

—বড় আজিব নোকর আপনার, মির্জা।

কাল্লুকে ডেকে পাঠালুম। নতুন কিস্‌সা শোনার লোভে ওর চোখ দু'টো চকচক করছিল; কালে সাবের সামনে বসে তাঁর পা টিপতে শুরু করে দিল। কাল্লুকে নিয়ে একটা নাজ্‌ম লেখা আমার উচিত ছিল, মান্টোভাই; এমন কিস্‌সাখোর মানুষ আমি আর দেখিনি জীবনে।

কালে সাব তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন।—একদিন মওলা দরবেশ দরগায় বসে মুরিদদের মওলা রুমির বচন শোনাচ্ছিলেন। মওলা রুমি কী বলেছিলেন জানেন তো? মানুষকে তার জীবনে তিনটে পর্ব পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথমে সে যে-কোনও কিছুকেই পুজো করে, পুরুষ, নারী, টাকা, শিশু, এই দুনিয়া, একটা পাথর, যাই হোক না কেন। পরের ধাপে সে আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে। আর শেষ ধাপে পৌঁছলে 'আল্লাই আমার সব' যেমন বলে না, আবার 'আল্লা বলে কেউ নেই' এ-কথাও বলে না। এমন সময় এক মোল্লা রাগে গরগর করতে করতে দরগায় এসে ঢুকল। মওলার উদ্দেশে বলতে শুরু করল, 'কুত্তা কাঁহিকা। এখানে বসে বসে তুমি মুরিদদের নিয়ে খোশগল্প করছ, আর আমি যতই খোদার দিকে সবার মন ফেরাতে চাই, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

—তারপর? কাল্লু উত্তেজিত হয়ে ওঠে।—মোল্লাটাকে বেধড়ক পেটানি দিলে—

—সবুর করো কাল্লু। কালে শাহ হাসলেন।—পেটালেই কি কাজ হাসিল হয়? তবে কিনা মুরিদরা সব উঠে দাঁড়িয়ে মোল্লাকে এই মারে তো সেই মারে।

—মারাই তো উচিত। কাল্লু আবার উত্তেজিত।—আমি থাকলে মোল্লার দাড়ি ছিঁড়ে—

—কাল্লু, মিঞাকে কিস্‌সাটা বলতে দে। তুই সেখানে থাকলে কিস্‌সাটাই আর আমরা শুনতে পেতুম না। আর তুই মোল্লার দাড়ি হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতিস। আমি হাসতে হাসতে বলি।

—মওলা তো তাঁর মুরিদদের থামালেন। হাসতে হাসতে তাদের বললেন, 'আরে করো কী, করো কী! কুত্তা শব্দটা এমন খারাপ কি শুনি? আমার তো বেশ ভালই মনে হয়। আমি কুকুর বই আর কী? প্রভুর সব কথা শুনে চলছি। প্রভুর বিপদ দেখলে ঘেউ ঘেউ করি, প্রভুর আনন্দ হলে লেজ নাড়াই। ঘেউ ঘেউ করা, লেজ নাড়ানো, প্রভুকে ভালবাসা—এই তো কুকুরের ধর্ম। এতে তো অপমানের কিছু আমি দেখছি না।' তো মির্জা আপনি যদি খোদার কুকুর হন, তার চেয়ে বড় সম্মানের আর কী আছে?

এই হচ্ছেন মিঞা কালে শাহ। যেমন রসিক মানুষ, তেমনই পরম করুণাময়। জাঁহাপনাকে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলতেন। তিনি সর্বান্তকরণে চাইতেন, দরবারে যেন আমি জায়গা পাই। আমাকে বলতেন, 'মনে রাখবেন মির্জা, খোদা এই দুনিয়াতেই সব হিসেবনিকেশ মিটিয়ে দেন। কেয়ামতের দিনে শুধু তো তাঁরই সঙ্গে থাকা। সেখানে চাওয়া-পাওয়া বলতে কিছু নেই। খোদার জন্য যে-সৌন্দর্য আপনি সৃষ্টি করেছেন, তার মূল্য আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।'

—খোদাই তো সব সৌন্দর্যের স্রষ্টা, মিঞাসাব। তাঁর জন্য আমরা আর কী সৃষ্টি করতে পারি?

—তা হলে তিনি আমাদের এই দুনিয়াতে আনলেন কেন, মির্জা? তিনি আমাদের দেন সত্য, আর আমরা তাঁকে দিই মায়া।

কালে সাব ঠিকই বলেছিলেন। গজল তো আসলে মায়া-ই। 'গজল' শব্দের ভেতরে লুকিয়ে আছে একটা কথা। আওরতো সে গুফ্‌তগু। দয়িতার সঙ্গে প্রণয়ের কথা। বাহার যেমন আসে, আবার হারিয়ে যায়, প্রেমও তো বসন্তের মতোই আসে, তারপর হারিয়ে যায়। ভাবলে খুব শীত করে না, মান্টোভাই? মিলনের আকাঙ্ক্ষার ভেতরেই ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে মৃত্যুর বীজ। শরীর ঝরে যাবে, মন ঝরে যাবে, আকাঙ্ক্ষা এগিয়ে যাবে তার মৃত্যুর পথে। মায়ার তসবিরমহলে আমরা কয়েকটা দিন ঘুরে-ফিরে বেড়াই। বাদ দিন এসব ছেঁদো কথা। মায়া খেয়ে তো আর মানুষ বাঁচে না। আমার তখন দরকার একটু পরোটা-গোস্ত-সুরা।

বাহান্ন বছর বয়সে দরবারে জায়গা পেলুম। আগ্রা থেকে যখন শাহজাহানাবাদে এসেছিলুম, তখন দরবার ছিল আমার কাছে স্বপ্নের জগৎ। সেই স্বপ্ন কবেই মরে হেজে গেছে, মান্টোভাই। শায়র হিসাবেও আর কিছু চাই না। আমি তো জানি, গুফ্‌তগু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু খেয়ে-পরে বাঁচবার জন্য দরবারে একটু জায়গা দরকার ছিল। দরবার তো আর কোনও শিল্পীর জীবনে সৃজনের বসন্ত নিয়ে আসতে পারে না। যখন সত্যিই লিখতে পারতুম, তখন দরবারে ঠাঁই পেলে বেঁচে থাকার জন্য নানা নোংরামি করতে হত না, ভাষাকে আরও গভীরভাবে আদর করার সময় পেতুম।

কালে সাব তো ছিলেনই, বাদশার হাকিম অহ্‌সানউল্লা খানও আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আমার ফারসি রচনা খুবই পছন্দ করতেন। বাদশাকে আমার ফারসি দিবান আর পঞ্চ অহঙ্গ-এর কথা বলে দরবারে চাকরি জুটিয়ে দিলেন। চাকরি ছাড়া আর কী? আরে, কবিতা লেখো বা যতই ভাল ফারসি লেখো, মনে রাখতে হবে, তুমি দরবারের চাকর ছাড়া আর কিছু নও। বাদশার হারেমের খোজার চেয়ে নিজেকে বড় কিছু ভাবতে যেও না। বাদশার কাছে সবাই খোজা, মান্টোভাই। নইলে যে-লোকটা গজল লেখে, বাদশা তাকে কী কাজ দিলেন? মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে হবে ফারসিতে। বছরে এজন্য আমাকে ছশো টাকা দেওয়া হবে।

সব অপমানই আনুষ্ঠানিক। তাই দরবারি, পোশাকের সঙ্গে খেতাব দেওয়া হল আমাকে। নজ্‌ম-উদ-দৌল্লা, দবীর-উল্‌-মুলক-নিজাম-জঙ্গ। এটা কোনও কবির খেতাব? কিন্তু বাদশার মর্জি। তার মানে, আপনি আর কবি নন; সাম্রাজ্যের তারকা, দেশের রচনাকার ও যুদ্ধের নায়ক। আরে, কোন যুদ্ধটা আমি করতে পারি? টিকে থাকার যুদ্ধেই যে পরাজিত, সে হবে যুদ্ধের নায়ক? ঘরে ফিরে আমি খুব একচোট হেসেছিলুম; সে হাসি আর থামতেই চায় না। আমি হলুম ইতিহাসকার? সিকন্দর ও দারার গল্প আমি পড়িনি, প্রেম আর মৃত্যুর কিস্‌সা নিয়েই তো আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেছে। কিন্তু বাদশা চাইলে আমাকেও ইতিহাসকার হতে হবে। বছরে ছ'শো টাকা দেবে বলে কথা। বাদশা চাইলে আমাকে তাঁর হারেমের খোজা প্রহরীও করে দিতে পারেন।

সেদিন উমরাও বেগম আমার কাছে এল। হয়তো কাল্লুর মারফত শুনেছিল, গাধার ডাকের মতো আমার অনর্গল হাসির কথা। আমি সেদিন একটু বেশি নেশাও করেছিলুম। উমরাওকে দেখেই আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'আরে, মসজিদ ছেড়ে আমার দোজখে কেন বেগম?'

—আজ আপনার খুশির দিন, মির্জাসাব।

—বটেই তো। আমি নিজাম-জঙ্গ।

আবার হাসতে শুরু করলুম।

—কী হল মির্জাসাব?

—তুমি বুঝবে না বেগম।

—আমি কি আপনাকে একেবারেই বুঝি না?

—না, বেগম। তুমি একেবারেই আমাকে বোঝো না।

কতদিন পর, উমরাওকে আমার বুকের ভিতরে টেনে নিই।—বেগম, আমার আর কোনও স্বপ্ন নেই। কবিতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু খাওয়া-পরার জন্য যে আমাকে চাকর হতে বলবে, আমি তার নোকর হতে পারি। আমি তো শুধু আসাদুল্লা

খাঁ ছিলাম না, আমি গালিবও—এই দু'টো মানুষ আলাদা বেগম। আসাদুল্লা খাঁ দারু খেতে ভালবাসে, কাবাব-পরোটা খেতে ভালবাসে; গালিব খেতে ভালবাসে শুধু শব্দ—রামধনু-লাগা শব্দ; বাদশা কিনতে পারে আসাদুল্লা খাঁ-কে, গালিবকে কেনার টাকা কোথায় তাঁর রাজকোষে? কেনো না, আমার আপস যত খুশি কেনো।

—মির্জাসাব—

—বলো।

—আপনি তা হলে চাকরিটা ছেড়ে দিন।

—না, বেগম।

—কেন?

—এখন তো আর অসুবিধে নেই বেগম। গজল যাকে ছেড়ে চলে গেছে, সে এবার যা খুশি তা-ই করতে পারে। বাদশার পা টিপতে পারে, রাজনীতি করতে পারে। তুমি আমাকে না হয় কাল একটু কিমাপোলাও খাওয়াও। বেগম, এবার একটু সুখ চাই।

আমি বুঝতে পারতুম, জাঁহাপনা আমাকে একটুও পছন্দ করতেন না। শুধু কালে সাব আর অহ্‌সানউল্লা খান সাবের জন্যই মেনে নিয়েছিলেন আমাকে। দরবারের আদবকায়দাও তো ভাল লাগত না আমার। ঈদের জন্য বাদশাকে খুশি করে কবিতা লেখো, আরও কত কত উৎসব যে লেগে থাকত, সব কিছুর জন্য কবিতা লিখে দাও। আমি ওসব লিখতে পারতুম না। মুখে-মুখেই দু' একটা শের বলে দিতুম; সেসব কখনও লিখে রাখিনি। ওসব কবিতা নাকি? উৎসবের সময় তো জাঁহাপনাকে নজরানা দিতে হত; সেই টাকা বাঁচানোর জন্যই কিছু-না-কিছু লিখতে হয়েছে। ওগুলো সবই গু-গোবর, মান্টোভাই, যা আমি বাদশার মুখে ছুঁড়ে মেরেছি; বাদশার সাধ্য কি শিল্পীর হারামিপনা বুঝবে? তাঁর তো চাই শুধু প্রশস্তি। সভাকবি জওকসাবের কাছে প্রশস্তি শুনতে-শুনতে তাঁর মজ্জায় মজ্জায় একটা কথাই ঢুকে গিয়েছিল, দুনিয়ার সব কবিতা আসলে জাঁহাপনা বাহাদুর শাহর প্রশস্তি। সব সম্রাট এমনটাই ভাবেন। তাঁদের এই ভাবনার বিপরীতে গেলেই আপনাকে সারাজীবন লাথিঝাঁটা খেতে হবে। জাঁহাপনা আকবরকে নিয়ে ইতিহাসে কতই না প্রশস্তি ভাবুন! কিন্তু আনারকলিকে তিনি কীভাবে হত্যা করেছিলেন? তার আসল নাম ছিল নাদিরা বেগম। কেউ কেউ বলত, শরফ্‌উন্নিশা বেগম। জাঁহাপনা আকবরের হারেমের অতি সুন্দরী ক্রীতদাস-কন্যা। একদিন আয়নামহলে বসে জাঁহাপনা আকবর আয়নায় দেখতে পেলেন, আনারকলি যুবরাজ সেলিমের দিকে তাকিয়ে হাসছে। শুধু ওই হাসিটুকু হয়ে গেল আনারকলির মৃত্যুবীজ। প্রাসাদের দেওয়ালের গভীরে জীবন্ত আনারকলি হারিয়ে গেল। সব—সব সাম্রাজ্য এভাবেই মানুষকে গ্রাস করে।

সাম্রাজ্য আর ইতিহাস বড় সর্বগ্রাসী, মান্টোভাই। জাঁহাপনার আদেশে আমি ইতিহাস লিখতে শুরু করলুম। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে দুই খণ্ডে ছকে নিলুম।

প্রথম ভাগে থাকবে তৈমুর লং থেকে হুমায়ুন; আর দ্বিতীয় পর্বে সম্রাট আকবর থেকে বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডের নাম দিলুম মিহর-ই-নিমরোজ। মধ্যদিনের সূর্য। আর দ্বিতীয় খণ্ড মাহ-ই-নিম্‌মাহ। মধ্য মাসের চাঁদ। পুরো বইয়ের নাম হবে পরতাবি স্তান, আলোর রাজ্য।

টাকা পেতে হবে বলে কথা, তাই তাড়াতাড়ি লিখতে শুরু করলুম। কথা ছিল, ছ'মাস অন্তর আমাকে পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হবে। তা প্রথম ছ'মাসে আমি জাঁহাপনা বাবরের জীবনেতিহাস লিখে ফেললুম। কিন্তু এইরকম একটা বিরক্তিকর কাজের জন্য ছ' মাস অন্তর টাকা পেলে চলে? আমার পারিশ্রমিক যাতে প্রতি মাসে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ জানিয়ে বাদশাকে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলুম। ঠিকই করেছিলুম মাসে-মাসে টাকা-না-দিলে ইতিহাস লেখা বন্ধ করে দেব।

আপ কা বন্দহ্‌ অওর ফিরুঁ নঙ্গা?
আপ কা নৌকর, অওর খাঁউ উধার?
মেরী তনখাহ্‌ কীজিয়ে মাহ্‌ ব মাহ্‌
তা না হো মুঝকো জিন্দগী দুশওয়ার।
(আপনার ভৃত্য, নিঃস্ব রিক্ত?
আপনার দাস, ঋণগ্রস্ত বারোমাস?
মাসে মাসে, হোক আমার বেতন
দুরূহ না হয় যেন জীবনযাপন।)

ওই ইতিহাস আমি আর শেষ করতে পারিনি ভাইজানেরা। শুধু প্রথম খণ্ড মিহর-ই-নিমরোজই প্রকাশিত হয়েছিল। মাহ-ই-নিম্‌মাহ-এর কাজ এগোয়নি। হয়েছিল কী, হাকিম অহ্‌সানউল্লা খান সাবকে জানিয়েছিলুম, আমার মতো মানুষের পক্ষে ইতিহাসের জঙ্গল ঢুঁড়ে ঠিক ঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, হৃদয়ের আলোয় আমি শুধু কবিতাই লিখতে পারি হাকিমসাব, তাই যে-তথ্যগুলো ইতিহাসে যাওয়া দরকার, সেগুলো বেছে পাঠিয়ে দিলে আমার সুবিধে হয়। তিনি কী করলেন জানেন? আদমের জন্মকাল থেক চেঙ্গিজ খান পর্যন্ত নানা তথ্য লিখে পাঠালেন। আমি তো সাম্রাজ্যের ইতিহাস শুরু করেছিলুম তৈমুর লং থেকে। কী আর করা? যা লিখেছিলুম, তার আগে ওই অংশটা জুড়ে দিলুম। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আর তথ্য এল না। চৌষট্টি পাতার মতো লিখেছিলুম। কতবার খবর পাঠালুম পরবর্তী তথ্যগুলো পাঠানোর জন্য। একবার উত্তর এল, 'এখন রমজান চলছে।' পরের বার জানাল, 'সবাই এখন ঈদের উৎসবে ব্যস্ত।' ধুত্তোরি। আরে আমার কী দায় পড়েছে রাজা-বাদশার সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখার? ওই চৌষট্টি পাতাই পাঠিয়ে দিলাম। সে-লেখা কেল্লার কোন অন্ধকার ঘরে উইয়ে কেটেছে কে জানে! ইতিহাস তো উইয়ে কাটার জন্যেই, তাই না, মান্টোভাই?

ইতিহাস লেখানো যেমন রাজাবাদশার খেয়াল, ইতিহাসকে মুছে দেওয়াও তাঁদেরই অহঙ্কার। আমরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারি? আর যে কবিতা লেখে? সে তো ইতিহাসের শরীরে প্রজাপতির রংচঙে দু'টো ডানা জুড়ে দিতে চায়—উড়ুক—উড়ে যাক—জন্নত, জাহান্নম, যেখানে খুশি। জাঁহাপনা বাহাদুর শাহ আমার গজল পছন্দ করতেন না, তা তো আপনাদের আগেই বলেছি। জওকসাবের শের শুনতে শুনতে তিনি 'হায় হায়', 'কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ' বলতেন, আর আমার শের শুনে একটাই কথা, 'ঠিক হ্যায়।' একবার বললেন, 'মির্জা, আপনি পড়েন খুব ভাল।' মানে বুঝলেন? গজলের অর্থ যেন কিছুই নয়। তা তাঁরও তো খুব কবি হওয়ার শখ হয়েছিল। একসময় তাঁর গজল সংশোধন করে দিতেন জওকসাব; আর জওকসাবের মৃত্যুর পর আমি। কী লিখেছেন আমাদের জাঁহাপনা? কী লেখা সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে? ওইরকম একটা কাপুরুষ—পূর্বপুরুষের টাকায় বসে বসে খাওয়া ছাড়া যাঁর জীবনে আর কিছুই ছিল না, বেগম জিনত মহলের হাতের পুতুল, জীবনটা শুধু পরজীবী হয়ে কাটিয়ে দিলেন, তিনি লিখবেন গজল? আওরতো সে গুফ্‌তগু-র জন্য অনেক দম্‌ লাগে, মান্টোভাই।

বাদশার ছোট ছেলে মির্জা জওয়াঁ বখতের শাদির সময় এক কাণ্ড ঘটল। জওয়াঁ বখত বেগম জিনত মহলের ছেলে। ফলে বাদশার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী। খুব জাঁকজমক করে শাদি হবে। বেগমের নির্দেশে আমাকে শাদির জন্য একটা সেহ্‌রা—বিবাহগীতি লিখে দিতে হল। তো সেই সেহ্‌রার শেষে আমি লিখেছিলুম :

> হম্‌ সুখন্‌ মহিম হ্যায়, গালিব কে তরফদার নহীঁ
> দেখে, ইস সহ্‌রে সে কহ্‌ দে দোই বেহ্‌তর সেহরা।
> (কবিতার মর্ম বোঝেন, গালিবের তরফদার নন
> লিখুন দেখি তো কেউ, সব সেরা সেহ্‌রা এমন।)

বাদশা ভেবে নিলেন আমি এখানে তাঁকে এবং তাঁর উস্তাদ ইব্রাহিম জওকসাবকে অপমান করেছি। তার মানে কী দাঁড়াল? জওকসাবকে যিনি 'মালিক-উশ-শুয়ারা' খেতাব দিয়েছেন, তিনি যেমন কবিতা বোঝেন না, জওকসাবের পক্ষেও এমন কবিতা লেখা সম্ভব নয়। আমি চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে বাদশা বললেন, 'একটু বসুন মির্জা। উস্তাদজিকে আসতে দিন।'

—জি হুজুর।

জাঁহাপনা হঠাৎ শের বলতে শুরু করলেন :

> হমসে ভী ইস বসত্‌ পে কম হোঙে বদ-কমর,
> জো চাল হম চালে, সো নিহায়ৎ বুরি চালে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কার শের জানেন?'

—না, জনাব।

—উস্তাদজির। আপনাকে দেখতে দেখতে শেরটা মনে পড়ল।

এমন সময় জওকসাব দরবারে এসে ঢুকলেন। জাঁহাপনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

—আইয়ে আইয়ে উস্তাদজি। মির্জাসাব কেমন সেহ্‌রা লিখেছেন পড়ে দেখুন।

সেহ্‌রাটা পড়ে জওকসাব আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমার প্রতি আমর্ম ঘৃণা। যেন পোকার দিকে তাকিয়ে আছেন।

জাঁহাপনা বললেন, 'উস্তাদজি, আপ ভি এক সেহ্‌রা কহ্ দিজিয়ে।'

—বহৎ খুব। বলেই তিনি সেহ্‌রা লিখতে বসে গেলেন। শেষ দুই পংক্তিতে লিখেছিলেন :

> জিস্ কো দেওয়া হ্যয় সুখন্ কা, য়ে সুনা দে উস্ কো
> দেখ ইস্ তরহ্ সে কহতে হ্যাঁয় সুখনবর সেহ্‌রা।
> (শুনিয়ে দাও তাদের, কবি বলে দাবি করে যারা,
> দেখো এইভাবে কবিরা লেখেন সেহ্‌রা)

—কেয়া বাৎ। কেয়া বাৎ। জাঁহাপনা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তারপর কী হল জানেন? সন্ধেবেলায় দিল্লির অলিগলিতে জওকসাবের সেহ্‌রা মাতিয়ে তুলল সবাইকে।

জাঁহাপনা এভাবেই আমাকে অপমান করতেন। তিনি পতঙ্গবাজি করতে যাবেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কেন জানেন? অপমান, কত দূর অপমান করা যায়। মাসে মাসে যখন টাকা দিই, তুই মির্জা গালিব বা যেই হোস, আমার হারেমের একটা খোজা ছাড়া আর কী? মুশায়েরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখতেন। সব শেষে বা মাঝামাঝি কোন সময়ে আমাকে কবিতা পড়ার জন্য ডাকা হত।

সত্যি বলতে কী মা ভাই, সেহ্‌রার শেষ দুই পংক্তিতে আমি কাউকে আঘাত করতে চাইনি। তবু আমাকে ক্ষমা চেয়ে জাঁহাপনার কাছে কবিতা পাঠাতে হল। এছাড়া আর কীই বা করার ছিল বলুন? এই সমাজের চোখে কবি তো ভিখিরিরও অধম। আমাকে বেশির ভাগ মানুষ পছন্দ করত না কেন জানেন? মুশায়েরায় কেউ কবিতা পড়লেই—তা সে ভাল, খারাপ যা হোক—সবাই 'হায় হায়', 'কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ' করত। আমি তা পারতুম না। কবিতার মর্মোদ্ধার না-করা পর্যন্ত কারুর প্রশংসা আমি করতে পারিনি। সবাই আমার ওপর ক্ষেপে যেত। কিন্তু দেবী সরস্বতীর শুভ্রতা কবিতায় ফুটে না-উঠলে, আমি কী করে প্রশংসা করব বলুন? অথচ কোনও গজল ভাল লাগলে আমার প্রশংসা বাধ মানতে চাইত না। একবার মুনশি গুলাম আলি খান দাবা খেলতে খেলতে একটা শের বললেন। ওঃ কী শের! একেবারে তিরের মতো বুকে এসে বিঁধল। আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, 'এটা কার শের মুনশিজি?'

—জওকসাবের।

—আবার বলুন।

মুনশিজির কাছে কতবার যে আমি শেরটা শুনতে চেয়েছি। জওকসাব

লিখেছিলেন, ক্লান্ত হতে হতে মৃত্যুর কাছেই তো আমরা আশ্রয় খুঁজি। কিন্তু মৃত্যুতেও যদি শান্তি না পাওয়া যায়? মুশায়েরায় যেতে আমার একেবারেই ভাল লাগত না। কবিতা তো একা একা জন্মায়—সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে যেমন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুক্তার জন্ম হয়।

মীর সাব একটা শের-এ যেমন লিখেছিলেন :

জুলফ্‌-সা পেচদার হ্যয় হর শের
হ্যায় সুখন্‌ মীরকা আজব ঢবকা।।
(তার কেশের কুণ্ডলীর মতো আমার প্রত্যেকটি শের,
মীরের কবিতার ধরনই অদ্ভুত।।)
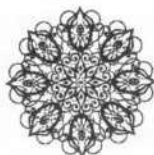
খুলতা কিসী-পে কিঁউ মেরে দিল-কা মুআমিলহ্‌;
শেরোঁ-কে ইন্তখাব-নে রুস্‌বা কিয়া মুঝে।।
(কেই-বা জানতো আমার হৃদয়ের ব্যাপার;
কোন্‌ কুক্ষণেই যে কবি হতে গেলাম, মান-মর্যাদা সবই গেলো।)

ভাইজানেরা, কবরে আজ আমাদের খুশির দিন। আমি জানি, মির্জাসাবের কথা শুনতে শুনতে আপনাদের মন ভারী হয়ে উঠেছে; কিন্তু মনে রাখবেন, মির্জাসাবের জীবন তো একটা পাথরকে বার বার পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে তোলার চেষ্টা, বার বার পাথরটা নেমে এসেছে আর মির্জাসাব তাকে আবার ওপরে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। জীবন কি সবসময় এভাবে পাথর বইবে? তার চেয়ে নরক গুলজার হোক। আমরা আজ গাঞ্জে ফেরেশ্‌তে-দের কিস্‌সা শুনব। এরা বেশির ভাগই বম্বের সিনেমা জগতের লোকজন। পর্দার ছবিতে তাদের যেমন দেখাত, আসলে জীবন তো তেমন ছিল না। জীবন তো সিনেমার মতো সাজানো-গোছানো নয়। রোটি, আওরত আর তখ্‌তের জন্য লড়াইয়ের নামই জীবন। দুনিয়ার সব কিস্‌সাও লেখা হয়েছে এই লড়াই নিয়েই। খিদে সবচেয়ে আদিম, তাই না ভাইজানেরা? খিদের কথা কেউ কখনও ভুলতে পারে না। মানুষ যবে থেকে এই দুনিয়ায় এসেছে, সেদিন থেকেই ক্ষমতার জন্য তার লোভ, নারীর জন্য তার রিরংসা। এগুলো কোনওদিনই বদলায় না,

ভাইজানেরা। শুধু রুটি, নারী ও সিংহাসনের ওপর যখন ঘৃণা জন্মায় তখনই মানুষ আল্লার কথা ভাবে। এই তিনের চেয়ে তিনি তো আরও রহস্যময়, যাঁকে লড়াই করেও পাওয়া যায় না।

মাফ করবেন, বেশি বকবক করে ফেললাম। আপনাদের কথা দিয়েছিলাম, সিতারার কিস্‌সা একদিন শোনাব; গাঞ্জে ফেরেশ্‌তেদের কথা ওকে দিয়েই শুরু করছি। ভাইজানেরা, সিতারা এক বাঘিনীর নাম, যেন একটা ঘূর্ণিঝড় ওর ভিতরে লুকিয়ে ছিল, বাইরে থেকে তাকে বোঝা যায় না। রোজ সকালে এক ঘণ্টা সিতারা নাচের রেওয়াজ করত অথচ তারপর ওকে কখনও ক্লান্ত দেখিনি। সিতারা চুপচাপ বসে থাকতে পারত না, কিছু না কিছু করছেই বা করার ফন্দি আঁটছে। সিতারার আরও দুই বোন ছিল—তারা ও অলকানন্দা। ওরা একে-একে নেপালের এক গ্রাম থেকে বম্বেতে এসেছিল নসিব বদলানোর জন্য। তবে তিন বোনের মধ্যে সিতারার কোনও তুলনা নেই। লাখে একজন এইরকম মেয়ে জন্মায়। আমার মাঝে মাঝে মনে হত, সিতারা আসলে অনেকগুলো মেয়ের নাম, নইলে অত পুরুষকে নিয়ে সে খেলত কী করে? সিতারা যেন বম্বের পাঁচতলা কোনও বাড়ি, সেখানে কত যে ফ্ল্যাট, আলোকিত, কোনওটা বা অন্ধকার। সবসময় পাতলা, ফিনফিনে মসলিন শাড়ি পরত। ফলে ওর শরীর নিয়ে কল্পনা করার কিছু ছিল না।

সিতারা বম্বেতে এসেছিল সিনেমার এক পরিচালকের হাত ধরে, তার নাম ভুলে গেছি, আমরা দেশাই বলেই ডাকতাম। ওদের বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারেনি। দেশাই বলত, 'ওই মেয়ের সঙ্গে যুঝে ওঠা আমার কম্মো নয়।' সিতারা তখন অন্য কার সঙ্গে যেন থাকে, কিন্তু মাঝেমধ্যেই দেশাইয়ের কাছে আসত। তবে দেশাই তাকে বেশিদিন নিজের কাছে রাখত না। হিন্দু আইন মেনে দু'জনের বিয়ে হয়েছিল তো, তাই নতুন নতুন প্রেমিক জোটালেও সিতারার পরিচয় ছিল মিসেস দেশাই।

মেহবুব সাবের কপাল তখন তুঙ্গে। সিতারাকে একটা সিনেমায় নিয়েছিলেন। মেহবুব সাবও সিতারার শিকার হয়ে গেলেন। আমাদের লাইনে তখন তাদের নিয়ে রোজই নতুন নতুন কিস্‌সা। মেহবুব সাবের ছবিও শেষ, সিতারাও নতুন প্রেমিক পাকড়ে ফেলল। তার নাম পি এন অরোরা। ইংল্যান্ড থেকে সিনেমার ট্রেনিং নিয়ে এসেছিল। তারপর সিতারা ঝাঁপ দিল আল-নাসিরের ওপর। এর মধ্যে পি এন অরোরার একটা গল্প বলে নিই, ভাইজানেরা। আমি তখন দিল্লিতে চাকরি করি। হঠাৎ একদিন রাস্তায় অরোরাকে দেখতে পেলাম। লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মনে হল, লোকটার সামান্য জীবনীশক্তিও অবশিষ্ট নেই। টাঙ্গা থামিয়ে আমি অরোরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—আরে মান্টো, কেমন আছ?

—আমি তো ভালই। আপনার এই হাল কেন? কী হয়েছে?

অরোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হাসল।—সিতারা, মান্টো, সিতারা। সব সিতারার জন্য।

আল-নাসির এসেছিল দেরাদুন থেকে নায়ক হবে বলে। দেখতে-শুনতে ভাল, পুরুষালি চেহারা। সুযোগও পেয়ে গেল একটা ছবিতে আর সেই সিনেমাটায় সিতারাও অভিনয় করছিল। আল-নাসির একেবারে বাঘিনীর মুখে গিয়ে পড়ল। এমন ভাববেন না ভাইজানেরা যে, সিতারা এক প্রেমিক ছেড়ে আর এক প্রেমিক ধরত। সবাইকে ও একসঙ্গে ধরে রাখত; দেশাই, অরোরা, মেহবুব, আল-নাসির, আরও কত যে ছিল, হিসেব নেই। বম্বেতে ফিরে এসে আল-নাসিরের অবস্থাও আমি দেখেছিলাম। তার রং ছিল একেবারে গোলাপি, তা ছাইয়ের মতো পোড়া-পোড়া হয়ে গেছে। অমন সুন্দর চেহারাও ভাঙাচোরা, যেন ওর শরীরের সব রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। আল নাসিরও একই কথা বলেছিল, 'সিতারা, মান্টো, সিতারা, সব সিতারার জন্য।'

—কেন, ও কী করেছে?

—ও একটা ভ্যাম্পায়ার মান্টো। আমাকে ছিবড়ে করে দিয়েছে। ওর কাছ থেকে বেরোতে না পারলে আমি শেষ হয়ে যাব।

আল-নাসির তারপর দেরাদুন পালাল। তিনমাস সেখানে এক স্যানাটোরিয়ামে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ফিরেছিল।

এরপর সিতারা এক আশ্চর্য কাণ্ড করেছিল। আরে লাখে এইরকম একটা মেয়ে হয়, বলেছি না ভাইজানেরা। যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সিতারা এবার ফাঁসাল নাজির সাবকে। নাজির সাবের প্রেমিকা জেসমিন তখন তাঁকে ছেড়ে গেছে। সোসাইটি সিনেমায় নাজির সাব সিতারাকে নিয়েছিলেন। আর অমনি সিতারার জালে আটকে গেলেন। খুব সোজা সাপ্টা, দিলখোলা মানুষ নাজির সাব। যাকে পছন্দ করতেন, তাকে খিস্তি দিতে দিতে বুকে টেনে নিতেন। সিতারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ কয়েক বছর টিকেছিল। নাজির সাবের ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর, তাই সিতারা প্রথম দিকে কিছুদিন অন্য পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু ওভাবে থাকা তো সিতারার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়, ভাইজানেরা। অরোরা, আল-নাসির, মেহবুব, দেশাইয়ের কাছেও আবার যাওয়া-আসা শুরু হল। নাজির সাহেব মতো মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। নাজির সাব মাঝেমধ্যেই সিতারাকে পেটাতেন। সিতারা যেন সেই মারের মধ্যেও এক ধরনের যৌন আনন্দ উপভোগ করত।

এবার কিস্‌সাটা আরেকরকম ভাবে জমে উঠতে চলেছে, ভাইজানেরা। নাজির সাবের ভাইপো আসিফও একই ফ্ল্যাটে থাকত। বয়স কম হলে কী হবে, বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, দেখতেও খুব সুন্দর। তখনও পর্যন্ত আসিফের জীবনে কোনও মেয়ে আসেনি। কাকার কাছে থেকে সিনেমার কাজকর্ম শেখাতেই ওর আগ্রহ। নাজির

সাব আর সিতারার মধ্যে কী কাণ্ড চলছে, সে বুঝতে পারত। বন্ধ ঘর থেকে ভেসে আসা সিতারার শীৎকার ও উন্মাদনা তাকে দিনে দিনে খেপিয়ে তুলছিল। একদিন সে কী করে যেন সবটা দেখেও ফেলল। আসিফ আমাকে বলেছিল, 'মান্টোসাব, যেন দুটো কুকুর-কুকুরী নিজেদের ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। সিতারার সঙ্গে কাকা পারবে কেন?'

—সে এক ভয়ঙ্কর খেলা, তাই না আসিফ?

—জন্তু। মানুষ যে আসলে জন্তু, এই প্রথম বুঝতে পারলাম। আর মহব্বত কী জানেন, মান্টোসাব?

—কী?

—মওতের সঙ্গে মোকাবিলা। আমিও শালা একবার এইরকম মোকাবিলা করতে চাই।

—সিতারার সঙ্গে?

—আলবাৎ। একবার পাঞ্জা লড়বই মান্টোসাব। তবে কী জানেন, মেয়েছেলেটাকে দেখলেই কেমন ভয় করে।

—কেন? সিতারাকে ভয়ের কী আছে?

—মনে হয়, ওর ভেতরে জিন ঢুকে বসে আছে।

—আসিফ, বরফের মতো ঠাণ্ডা মেয়েদের চেয়ে সিতারা অনেক ভাল। ওর উন্মাদনার মধ্যে জীবন আছে। লড়ে যাও।

আসিফ সিতারার সঙ্গে প্রথমে কথাবার্তা শুরু করল। কিন্তু ছুঁয়ে দেখার সাহস পাচ্ছিল না। কেননা কাকার মেজাজ সে জানে। অথচ কে না জানে, আসিফ একবার ইঙ্গিত দিলেই সিতারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আসিফ দিনে দিনে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। চনমনে যুবক, কতদিন নিজেকে ধরে রাখবে? নাজির সাব আস্তে আস্তে খেলাটা টের পাচ্ছিলেন। একদিন সিতারাকে বহুৎ পেটালেন, তারপর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বললেন। সিতারা তবু গেল না। সেই রাতে রাগে গরগর করতে করতে নাজির সাব তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আসিফ দেখল, এই সুযোগ। সে সিতারার ঘরে গিয়ে তার ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতে শুরু করল। ব্যস, কেল্লা ফতে। মৃত্যুর সঙ্গে আসিফের প্রথম মোকাবিলা হয়ে গেল। তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে সে সিতারাকে পৌঁছে দিল দাদারের ফ্ল্যাটে। ওখানে সিতারার নিজের একটা ফ্ল্যাট ছিল। আসিফের সঙ্গে শুরু হল সিতারার নতুন প্রণয়পর্ব। সেদিনই আসিফ সিতারাকে বলেছিল, 'আমাদের সম্পর্কটা অনেক গভীর সিতারা। তুমি আর কারও কাছে যেও না। শুধু আমার কাছেই থাকো।'

—মেরি জান, আমি এতদিন ধরে তোমাকেই খুঁজেছি। বিশ্বাস করো, সিতারা আজ থেকে আর কারুর দিকে তাকাবে না।

—না-হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

—কথা দিলাম।

সিতারা আসিফকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলল।

পরদিন আসবে বলে আসিফ ফিরে গেল। সিতারা তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল। নতুন করে সাজল। শাড়ি বদলাল। রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভারকে অরোরার ঠিকানায় নিয়ে যেতে বলল। আচ্ছা মির্জাসাব, আপনার কি মনে হয়, এই মেয়েটা সারাজীবন শুধু যৌনখিদের পিছনে দৌড়েছে? আমি এক গভীর অসহায়তা দেখতে পাই। একই অসহায়তা দেখতে পেয়েছিলাম সৌগন্ধীর মধ্যে। মধু তাকে শুষে খাচ্ছিল। তারপর একদিন মধুকে তাড়িয়ে দিয়ে সৌগন্ধী তার পোষা রাস্তার কুকুরটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সিতারা আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম ও যেন একদিন সৌগন্ধীর মতো ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

এরা সব আশ্চর্য মেয়ে, ভাইজানেরা। পরিরানি নাসিম বানুর কথা কি আমি কোনওদিন ভুলতে পারব? কী চোখ তার। যেন সরোবরে ফুটে ওঠা দু'টো পদ্ম। 'বেগম' সিনেমার গল্প লেখার সময় আমি নাসিমকে কাছ থেকে দেখেছিলাম। নাসিমের বাড়িতে বসে আমি আর এস মুখার্জি গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতাম, গল্পের অদলবদল করতাম। আমরা ভেবেছিলাম, নাসিম না জানি কত বড় বাড়িতে থাকে। ওর পোরবন্দর রোডের বাড়িটা একেবারেই সেকেলে ধরনের, দেওয়ালের পলেস্তারা খসা, জানলার খড়খড়ি টুটাফুটা। ঘরে সাধারণ কিছু আসবাবপত্র, সবই ভাড়া করা। একদিন দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে গোয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছে। গোয়ালা নাকি আধ সের দুধের হেরফের করেছে। আমি তো অবাক। যে নাসিমের জন্য লোকজন দুধের নহর বইয়ে দিতে পারে, সে আধ সের দুধের জন্য গোয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে? 'পুকার'-এর নূরজাহান আসলে এইরকম? কেনই বা হবে না? আমাদের সবার ভিতরেই তো খড়ের একটা কাঠামো আছে। একেক সময় তা বেরিয়ে পড়ে।

সিনেমার লোকরা এই খড়ের কাঠামোটা সবসময় ঢেকে রাখতে চায়, ভাইজানেরা। নাসিম বেশির ভাগ সময় গোলাপি রঙের পোশাক পরত। গোলাপি তো বড় মারাত্মক রং, চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। নাসিম যেন সেটাই চাইত। তবে ধাঁধা লাগানোর মতো ব্যাপারও ওর মধ্যে ছিল। গোলাপের পাপড়ির মতো অমন ত্বক আর কারও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

গয়না, আতর, সেন্টের প্রতি নাসিমের তীব্র আকর্ষণের পাশাপাশি দেখেছি অন্য এক অনুরাগ, তার বাবার প্রতি। ওর ভ্যানিটি ব্যাগে সবসময় বাবার ছবি থাকত। আমি একবার লুকিয়ে ছবিটা দেখেছিলাম। আমার একটা বদভ্যাস ছিল, মির্জাসাব। চুরি করে মেয়েদের ব্যাগ দেখা। এভাবেই একদিন ওর ব্যাগ দেখছিলাম আর তখনই নাসিম এসে হাজির।

—এ কী করছেন, মান্টোসাব?

—মাফ কিজিয়ে, এটা আমার খুব বাজে অভ্যাস। তবু নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।

নাসিম হেসে ফেলল।—মেয়েদের দিল লুকিয়ে দেখার অভ্যাস নেই, এটাই বাঁচোয়া।

—ও আমি এমনিতেই দেখতে পাই।

—মেয়েদের দিল?

—হুঁ।

—আমার হৃদয়ে কী আছে বলুন তো?

—একটা গোলাপি ওড়না উড়ছে।

—ভারি মজার আপনি, মান্টোসাব।

—কিন্তু ফটোটা কার?

—কেন? আমার আব্বাজানের। শুধু ওই শব্দটা আব্বাজান—উচ্চারণ করতেই ও যেন শৈশবের শিশিরভেজা দিনগুলোতে ফিরে গেল। আমি দেখতে পেলাম, মির্জাসাব, কী গভীর টান-ভালবাসা ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

'বেগম'-এর গল্প লেখার সময় এস মুখার্জির সঙ্গে একটা দৃশ্য নিয়ে ঝগড়া করতে করতে প্রায় রাত দু'টো হয়ে গেল। সেদিন আমার সঙ্গে শফিয়াও ছিল। আমরা বেরোবার জন্য পা বাড়াতেই নাসিম বলল, 'এটা যাবার সময়? আজ এখানেই থেকে যান।'

—কোনও অসুবিধে হবে না। সাড়ে তিনটের ট্রেন আছে। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতেই ট্রেন এসে যাবে।

কিন্তু নাসিম আর ওর বর এহসান কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা থেকে যেতে হল। শফিয়াকে নিয়ে নাসিম শোবার ঘরে চলে গেল। আমি আর এহসান বারান্দাতেই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন শফিয়ার মুখ থেকে এক অন্য নাসিমের ছবি দেখতে পেলাম, ভাইজানেরা। শোবার ঘরে ঢুকেই পালঙ্কে নতুন চাদর বিছিয়ে দিল নাসিম। তারপর একটা শোওয়ার পোশাক বার করে শফিয়াকে বলল, 'এটা পরে নাও। একেবারে নতুন। তারপর শুয়ে পড়ো।'

—তুমি?

—আমার কয়েকটা কাজ বাকি আছে।

নাসিম কাপড় বদলে মুখের মেকাপ ধুয়ে এল। শফিয়া ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'এ কী চেহারা তোমার নাসিম? তুমি তো একেবারে শ্যামলা। তা হলে...?'

—সব সাজের বাহার শফিয়া। নইলে আমিও তো একটা বাজে মেয়ের মতোই।

নাসিম তারপর নানারকম তেল মালিশ করল মুখে। অজু করে পড়তে শুরু করল কোরান শরিফ। শফিয়া মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিল, 'নাসিম, তুমি তো আমাদের

চেয়েও অনেক ভাল মেয়ে।' নাসিম কোনও উত্তর দেয়নি; আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

এইরকম ছেঁড়া ছেঁড়া কতজনকে যে মনে পড়ে, মির্জাসাব। আমি কি কোনওদিন ভুলতে পারব নূরজাহানের কণ্ঠস্বর? সবাই তার সৌন্দর্যের কথা বলত, কিন্তু তার রূপ আমাকে কোনওদিন ছুঁতে পারেনি। শুধু কণ্ঠস্বর। নূরজাহান মানেই, আমার কাছে, আকাশপথে ভেসে যাওয়া একটা পুকার। অমন দরাজ গলা, অপূর্ব খরজ, তীব্র শাণিত পঞ্চম আমি আর কখনও শুনিনি, মির্জাসাব। বাজিকররা যেমন শূন্যে দড়ির ওপর স্থির হয়ে থাকতে পারে, নূরজাহানের তানও সেইরকম—ঘণ্টাখানেক তো সে ধরে রাখতেই পারত। তবে কি জানেন, খোদা যাদের দয়া করেন, তারাই সবচেয়ে বেশি অপচয় করে। মদে গলা নষ্ট হয়ে যায়, আর সায়গল সাব মদ ছাড়া এক পাও চলতে পারতেন না। টক আর তেলেভাজায় গলার ক্ষতি হয়, আর নূরজাহান এক পোয়া তেলের আচার একবারে খেয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে মনে হয়, খোদার সঙ্গে টক্কর দিতেই সায়গল-নূরজাহানদের জন্ম। এই গ্রহ যতদিন থাকবে, মির্জাসাব, নূরজাহানের কণ্ঠস্বরও ততদিন থেকে যাবে।

নূরজাহানের কত যে প্রেমিক ছিল, তার ঠিকঠিকানা নেই। রইস আদমিদের কথা বাদ দিন, কত হোটেলের বাবুর্চিকে জানি, তারা নূরজাহানের ছবি উনুনের ধারে লটকে ওর গাওয়া গান বেসুরো গলায় গাইতে গাইতে সাহেব-মেমদের জন্য রান্না করত। নূরজাহানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় রফিক আমাকে বলেছিল, 'এ হল নূর, নূর-এ-জাঁহা। খোদার কসম এমন গলা পেয়েছে যে বেহস্তের হুরও যদি শোনে তা হলে আকাশ থেকে নীচে নেমে আসবে।' রফিক আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগেই আমি নূরজাহানকে জান-মন দিয়ে চিনতাম, শুধু ওর গলার জন্য। নূরজাহানের এক প্রেমিক ছিল নাপিত। তার মুখে সবসময় নূরজাহানের কথা আর ওর গান। একদিন নাপিতের দোস্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সত্যিই নূরজাহানকে ভালবাস?'

—খোদা কসম, নূরজাহান বেগম মেরা জান হ্যায়।

—তার জন্য জান দিয়ে দিতে পারো?

—ছোটা সা চিজ।

—মহিওয়ালের মতো নিজের মাংস কেটে দিতে পারবে?

নাপিত সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুর বার করে বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, 'যে কোনও জায়গা থেকে গোস্ত কেটে নাও।'

বন্ধুও ভারী আজিব আদমি। নাপিতের হাত থেকে মাংস কেটে ফেলল। রক্তাক্ত হাত দেখে সে নিজেই পালাল। নাপিত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরতেই তার মুখে একটাই নাম, 'নূরজাহান'। সে এক আজিব দুনিয়া ছিল, ভাইজানেরা। ইশ্‌ক, খুন, রক্তপাত—এই না হলে জীবন?

জীবনকে একেবারে খুল্লামখুল্লা উপভোগ করেছিল আমার বন্ধু শ্যাম। আমি তখন পাকিস্তানে। শ্যাম একটা চিঠিতে লিখেছিল, 'আমি মানুষকে ঘেন্না করি। এভাবেই জীবন যাচ্ছে। এই জীবনটাই আমার প্রেমিকা, যাকে আমি হাড়েমজ্জায় ভালবাসি।' শ্যাম ছিল অদ্ভুত মানুষ। সভা-সমিতিতে যারা পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরে ভালোমানুষ সেজে বসে থাকে শ্যাম তাদের বলত জোকার। মদ খেয়ে কেউ জীবন নিয়ে বড় বড় কথা বললে খিস্তির বন্যা বইয়ে দিত সে। টাকা আর খ্যাতি পাওয়ার জন্য অনেক লড়াই করতে হয়েছিল শ্যামকে। টুটাফাটা অবস্থায় হাতে পয়সা নিয়ে হাসতে হাসতে বলত, 'দোস্ত আর কত কষ্ট দেবে? একদিন না একদিন আমার পকেটে তোমাকে আসতেই হবে।' বাড়ি, গাড়ি, খ্যাতি—সবই হয়েছিল শ্যামের। শ্যাম কখনও আমাকে ভোলেনি।

পাকিস্তানে এসে আমার তখন ল্যাজেগোবরে অবস্থা। সিনেমা প্রায় তৈরিই হয় না বলতে গেলে, কার জন্য গল্প লিখব, এদিকে 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্প লেখার জন্য মামলায় জেরবার। আদালত আমাকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশো টাকা জরিমানার শাস্তি দিয়েছে। মন একেবারে বিষিয়ে গেছে। বারে বারেই মনে হচ্ছিল, এতদিন যা লিখেছি, সব পুড়িয়ে ফেলব। এর চেয়ে কোনও অফিসে কেরানিগিরি করব। বউ-বাচ্চারা তো বাঁচবে। দিনে দিনে মদ খাওয়াও বেড়ে যাচ্ছিল। একদিন 'তাহসিন পিকচার্স'-এর মালিকের চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি দেখা করুন। বম্বে থেকে একটা চিঠি এসেছে। আমি পাকিস্তানে, আমাকে বম্বে থেকে কে চিঠি পাঠাবে? তবু গেলাম। শ্যামের চিঠি। সঙ্গে পাঁচশো টাকা। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, মির্জাসাব। ও কী করে জানল, আমার খুব টাকার দরকার। অনেকবার ওকে চিঠি লেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব ছিঁড়ে ফেলেছি। শ্যামকে ধন্যবাদ দেওয়া কি মানায়? ও নিশ্চয়ই তা হলে লিখত, মান্টো এই তোমার উত্তর?

শ্যাম একবার একটা অনুষ্ঠানে লাহোরে এসেছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে দেখার জন্য দৌড়লাম। গাড়ি থেকে শ্যাম আমাকে দেখতে পেয়েছিল, হাত নাড়ল, ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। কিন্তু ওর ভক্তদের ভিড় এড়াতে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারল না। হলের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, রাতে তোমার হোটেলে যাব।

হোটেলে আমি বহিরাগতের মতোই বসেছিলাম। ভক্তদের ভিড় ঠেলে শ্যামের কাছে পৌঁছতে ইচ্ছে করছিল না। শ্যাম একসময় এসে আমাকে বলল, 'সবাই হিরামন্ডি যাচ্ছে। তুমিও চলো। আমার সঙ্গে।'

—না।

—কেন?

—আমি যাব না, তুমি গেলে যাও।

—তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। আমি এই এলাম বলে।

শ্যাম চলে গেল। আমিও বাড়িতে ফিরে এলাম। আমি জানি, শ্যাম আর আমি এখন অনেক দূরের মানুষ। যেমন হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান। আমরা আর কেউ কারও বন্ধু নই। যেভাবে আমি পাকিস্তানে চলে আসার পর ইসমত আর আমার কোনও চিঠির উত্তর দেয়নি। উত্তর দিলেই বা আর কী হত?

করেঁ কেয়া কেহ্ দিলভী তো মজবুর হ্যয়।
জমীন সখ্‌ত হ্যয়, আসমাঁ দূর হ্যয়।।
(কবর কী, হৃদয়ের কি কোনও স্বাধীনতা আছে?
মাটি কঠিন, আকাশ দূর।।)

এেকেকজন মানুষ কয়েক দিনের জন্য এসে জীবনটাকে একেবারে শূন্য করে দিয়ে চলে যায়। বুকের ভেতরে ধূ-ধূ করে কারবালা। আরিফ আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেল। সেই প্রথম বুঝলুম, অন্য সব প্রবৃত্তির মতো সন্তানস্নেহও মানুষের কত গভীরে লুকিয়ে থাকে। সন্তানস্নেহ যে অনুভব করেনি, তার জীবনে একটা বড় জায়গা অন্ধকারেই থেকে যায়। যে-মোমবাতি আমার ঘর আলো করে, আরিফ ছিল তার শিখা, মান্টোভাই।

উমরাও বেগমের বোনের ছেলে আরিফ; ওর আসল নাম জৈন-উল-আবিদিন খাঁ। আরিফ ওর তখল্লুশ। ও আর ওর দোস্ত গুলাম হুসেন খাঁ মাহব রোজ আমার কাছে আসত। একের পর এক প্রশ্ন, গজল নিয়ে। আরিফের কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ। মনে হত, হ্যাঁ, আরিফই আমার একমাত্র ছেলে হতে পারে। আমি তো মুশায়েরায় যেতে চাইতুম না। ওই বাচ্চা ছেলে দু'টো এসে আমাকে জোর করে নিয়ে যেত। আরিফ মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্যেস করত, 'আপনি মুশায়েরায় যেতে চান না কেন, মির্জাসাব?'

—আমি বজ্‌ম্-এর বাইরের লোক আরিফ।

—কেন এমন মনে করেন নিজেকে?

—আমি তো পথে-পথেই সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছি। মজলিসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি সবসময় পথের পাশেই বসে থাকতে চেয়েছি। তবু সেখান থেকেও আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কেন মির্জাসাব?

—পাগলকে কে না ভয় পায় বলো? গজল লিখতে-লিখতে তুমি একদিন বুঝতে পারবে, শব্দের জান্-কে ছুঁতে হলে ভেতর থেকে একেবারে ফকির হয়ে যেতে হবে। কেউ তোমার পাশে থাকবে না আরিফ। প্রিয়জনরা তোমার মুখে থুতু ছিটোবে। আর সেদিন তুমি বুঝতে পারবে, গুফ্‌তগু শব্দটার অর্থ। কাকে বলে আশিকের সঙ্গে প্রেমালাপ। কত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ওই শব্দের ভেতরে লুকিয়ে আছে।

—আমি লিখতে পারব, মির্জাসাব?

—খোদা চাইলে পারবে।

আরিফকে একদিন না-দেখলে অস্থির হয়ে উঠতুম, মান্টোভাই। তাই একদিন বললুম, তুমি আমার বাড়িতে এসেই থাকো। আরিফ এক কথায় রাজি। আকাশের মতো মন ছিল ওর। বিবি আর দুই ছেলেকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেই উঠল। উমরাও বেগমও আনন্দে আত্মহারা। ছেলে, ছেলের বউ, নাতিরা এসেছে। অনেকদিন বড় একা-একা কাটিয়েছি, মান্টোভাই। ওরা এসে আমাদের ঘর রংদার বানিয়ে দিল। বাচ্চা দু'টোর কিচিরমিচির শুনতে-শুনতে মনে হত, একটা বাগানই যেন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পাখিরা গান গাইছে। ফুলের খুশবু পেতে লাগলুম। জীবন যদি এইরকম উৎসব না-হয়, তবে আর বাঁচা কেন? আমার রোজগারে তো এত মানুষের ভরণপোষণ সম্ভব নয়, তবু কষ্ট করে এতজন একসঙ্গে থাকার আনন্দও তো আলাদা। উমরাও খুব খুশি হয়েছিল বুঝতে পেরেছিলুম, ওর ওই খুশিটুকু আমি কেড়ে নিতে চাইনি। তার চেয়েও বড় কথা, আরিফকে তো আমার নিজের ছেলে বলেই মনে হত। ওর নাম কাগজে লিখতে গেলে আমার আঙুলে ধরা কলম যেন আনন্দে নেচে উঠত।

ওর শরীরের অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ত—জ্বর, কাশি। তারপর একদিন বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা রইল না। হাকিম এসে দেখে বললেন, ওর রু-আফ্ মানে যক্ষ্মা হয়েছে। মুখ দিয়ে জলের মতো রক্ত বেরোতে লাগল। আমরা ভেবেছিলুম ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এদিকে ওর বিবিও একই অসুখে ভুগছিল। আরিফের আগেই চলে গেল মেয়েটা। আরিফ তারপর আর মাস চারেক বেঁচেছিল। ওর দিকে তাকানো যেত না, মান্টোভাই। যেন একটা কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে আছে। উমরাও বেগম তো সবসময় তার বিছানার পাশে আর খোদার কাছে দোয়া মাঙে। একদিন আমার হাত আঁকড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল উমরাও, 'আমি যাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই, সে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় কেন মির্জাসাব?' এর তো কোনও উত্তর হয় না। খোদা কী খেলা খেলবেন আমাদের মতো ছায়াপুতুলদের নিয়ে, তা তিনিই জানেন। আরিফ চলে গেল. ওরা রেখে গেল দু'টো ছোট্ট বাচ্চাকে। বকিরের বয়স তখন পাঁচ, আর হুসেন দুই।

আমার মহল একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। নিজের কুঠুরিতে একা-একা বসে থাকতুম, কোথাও যেতে ইচ্ছে করত না। তবে দরবারে তো যেতেই হবে। বাদশার

চাকর কি না! আরিফের মৃত্যু একদিন ফুটে উঠল গজল হয়ে, মান্টোভাই। আমরা তো মৃত্যুকেই লিখি। এভাবে মৃত্যু রচনা করতে-করতে হয়তো একদিন অমৃতের পথে যাওয়া যায়। আমি অমরত্বের কথা বলছি না, মান্টোভাই; নিজেকে মুছতে-মুছতে, মৃত্যু লিখতে-লিখতে এই যে অমৃতের পথের দিকে যাওয়া, তা তো অমরত্বের জন্য নয়; আমার নাম এই দুনিয়ায় থেকে যাবে, হাজার বছর পরেও আমার গজল মানুষ পড়বে, তা আমি কখনও ভাবিনি; শুধু ভেবেছি, যে-ধুলো থেকে আল্লা আমাদের তৈরি করেছেন, আবার যেন সে-ধুলো হয়ে যেতে পারি—সে-ই আমার অমৃতের পথ।

আরিফ, বেটা আমার, তাকে ডেকে আমি বললুম;

লাজিম থা কে দেখো মেরা রাস্তা কোই দিন অওর
তন্‌হা গয়ে কিউঁ অব রহো, তন্‌হা কোই দিন অওর

আমাদের পথ, আরিফ বেটা আমার, কোনও একদিন গিয়ে মিলবে; একা চলে গেছো, আরও কিছুদিনের জন্য একাই থাকো।

মিট জায়েগা শর গর তিরা পাত্থর না ঘিসেগা
হুঁ দর পে তের নাসিয়া-ফর্‌শ কোই দিন অওর

তোমার কবরে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে আমার কপাল রক্তাক্ত হবে, আরিফ, তবু আমি সেই দিন-না-আসা পর্যন্ত কবরের পাশেই থাকব।

আয়ে হো কাল অওর হি কহতে কি যাউঁ
মানা কে হামেশা নহী আচ্ছা কোই দিন অওর

গতকাল তো এলে, আর আজই চলে যাওয়ার কথা বলছ? চিরদিন থাকবে না জানি, অন্তত কয়েকটা দিন তো থাকো।

যাতে হুয়ে কহতে হো কয়ামৎ কো মিলেঙ্গে
কেয়া খুব কয়ামৎ কা হ্যায় গয়া কোই দিন অওর

যাওয়ার সময় বলে গেলে, কেয়ামতের দিন দেখা হবে। তোমার চলে যাওয়াই তো আমার জীবনে কেয়ামতের দিন, আরিফ।

হাঁ আয়ে ফলক-এ-পীর জবান থা অভি আরিফ
কেয়া তেরা বিগড়তা জো না মরতা কোই দিন অওর

ওগো প্রাচীন আশমান, আরিফ তো যুবকই ছিল। আরও কিছুদিন ও বেঁচে থাকলে কী এমন ক্ষতি হত তোমার?

তুম মাহ্‌-এ-শব্‌-এ-চার-দুহম্‌ থে মেরে ঘর কে
ফির কিঁউ না রহা ঘর কা ওহ্‌ নক্‌শা কোই দিন অওর

তুমি আমার মহলের পূর্ণচাঁদ ছিলে আরিফ। আরও কিছুদিন কি অমন নকশা থেকে যেতে পারত না?

নাদান হো জো কহতে হো কি কিউঁ জিতে হ্যাঁয় গালিব
কিসমত্ মে হ্যাঁয় মরনে কি তমন্না কোই দিন অওর

বোকারা শুধোয়, গালিব এখনও কেন বেঁচে আছে? আমার ভাগ্য এমনই যে আরও কিছুদিন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে যেতে হবে।

হ্যাঁ, মান্টোভাই, আমাকে তো সব দেখে যেতেই হবে, সব ক্ষতচিহ্ন শরীরে বহন করতে হবে; খোদা তো আমাকে ফকিরির পথে যেতে দেননি; আমার সব প্রার্থনা না-জায়েজ হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে আমার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পূর্ণতায় ভরে গেছে মন। সেটুকুই আমার খোদাকে পাওয়া। আরিফের জন্য ওই গজলটা লেখার অনেকদিন পর আমি বুঝতে পেরেছিলুম উর্দু গজলে এমনটা আর কখনও হয়নি। কেন জানেন? আমার সময়ে কবি আনিস, দবীর-রা অনেক দীর্ঘ মার্সিয়া লিখে গেছেন। সেইসব শোকগাথার বিষয় ছিল কারবালা—হুসেন ও তাঁর পরিবারের শহাদৎ। কারবালা ছাড়া মার্সিয়া লেখার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। সেই প্রথম, আরিফের জন্য লেখা উর্দু গজলে মার্সিয়ার সুর ফুটে উঠল। এ-সব তো আমি ভেবে করিনি, কীভাবে যে হয়ে গেছে। শুধু কারবালা? প্রিয়জনের জন্য আমরা শোকগাথা লিখব না?

আরিফের জন্য শোকে ডুবে থাকার সময় তো আমাদের ছিল না। বকির আর হুসেনকে এতিম করে ওরা চলে গেছে। যে-জীবন দু'টো রয়ে গেল, এবার তাদেরই তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বকিরকে নিয়ে গেলেন আরিফের মা। হুসেনকে আমরা দত্তক নিলুম। ওইটুকুন ছেলে, সারাক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আমি বুঝতে পারতুম, মা-বাবার কথাই ও জানতে চায়। বাপ-মা হারা ছেলে, মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ত। উমরাও সারারাত ওর মাথার কাছে জেগে বসে থাকত। বুঝতে পারি, ওর সবসময় ভয়, হুসেনও যদি আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বছরখানেকের মধ্যে আরিফের মা-ও মারা গেলেন। বকিরকে নিয়ে এলুম আমাদের কাছে। ওকে কোথায় ফেলে দেব বলুন? তবে দু'টো বাচ্চার খেলাধুলো, কথাবার্তায় আমার মহলে প্রাণ ফিরে এল।

এর মধ্যে মিঞা কালে সাবের হাভেলি থেকে বল্লিমারোঁ মহল্লায় একটা বাড়িতে উঠে এসেছি। ১৮৫৪-তে এসে একটু পয়সাকড়ির মুখও দেখতে পেলুম। বছরে আমার রোজগার বাইশশো পঞ্চাশ টাকা। পেনশন পেতুম সাড়ে সাতশ টাকা, বাদশা দিতেন দু'শো টাকা, বাদশার উত্তরাধিকারী মির্জা ফকরউদ্দিন আমাকে তাঁর উস্তাদ মেনেছিলেন, সে জন্য চারশো টাকা। আর অওধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের জন্য কসীদা লিখে পাঠিয়েছিলুম বলে তিনি আমাকে বছরে পাঁচশো টাকা মঞ্জুর করলেন। ওই বছরেরই শেষে বাদশার উস্তাদ কবি জওকের মৃত্যু হল। কবি মোমিন খাঁও তখন আর বেঁচে নেই। মোমিন খাঁ-র একটা শের শুনুন, ভাইজানেরা :

তুম মেরে পাস হোতে হো গয়া
যব কোই দুসরা নহী হোতা।

(মনে হয় যেন আমার পাশে থাকো তুমি
যখন আর কেউ থাকে না।)

কেয়াবাৎ! এই শেরটা শুনে মোমিন খাঁকে বলেছিলুম, 'মিঞা, এই শেরটা আমাকে দিয়ে দিন, বদলে আমার পুরো দিবান নিয়ে নিন।'

জওক মারা গেলেন, মোমিন খাঁ নেই, জাঁহাপনাকে অগত্যা এই ব্যাঙকেই গিলতে হল। বাদশা আমাকে শায়র-উল্‌-মুলক্‌ পদে বরণ করলেন। আমি জানতুম জওক সাবের মতো মালিক-উশ-শুয়ারা উপাধি আমার জুটবে না। তা নিয়ে আমার তেমন মাথা ব্যথাও ছিল না। কিন্তু বাদশা টাকার অঙ্কও বাড়ালেন না। এদিকে বাদশার উস্তাদ হয়ে তাঁর গজলও আমাকে সংশোধন করে দিতে হবে। এই কাজটা আমার কোনও দিনই ভাল লাগত না। কবিতার কোনও সংশোধন হয়? যা লেখা হল, তা কবিতা, নয়তো কবিতা নয়। সংশোধন করে তো গাধাকে ঘোড়া বানানো যায় না। তবু চাকরি বলে কথা। একদিন দেওয়ান-ই-আমে নাজির হুসেন মির্জার সঙ্গে বসে গল্প করছি। নাজিরসাব হলেন বাদশার দেওয়ান। একজন রক্ষী এসে বলল, বাদশা তাঁর গজলগুলো দেখতে চাইছেন। আমি কাল্লুকে বললুম, 'যা পাল্কি থেকে কাপড়ের পোঁটলাটা নিয়ে আয়।' তো পোঁটলা এল, আমি সেটা খুলে আট-ন'টা কাগজ বার করলুম, বাদশার অর্ধেক লেখা সব শের। প্রত্যেকটার বাকি অর্ধেক আমি লিখে রক্ষীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম।

নাজিরসাব বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?'

—এ আর এমন কী কাজ! জাঁহাপনা খুশ হয়ে যাবেন।

কবিতার সংশোধন, বইয়ের ভূমিকা লিখে দেওয়া, এসব কাজ যে কত ঘেন্নার সঙ্গে করতে হয়েছে, মান্টোভাই। ও কি কোনও কবির কাজ? যাদের সব পণ্ড হয়ে গেছে, তারা এইসব করুক গিয়ে। হরগোপাল তফ্‌তা ছিল আমার এক শার্গিদ, দোস্তও বটে। সেকেন্দ্রাবাদে থাকত। ওর কত যে ফারসি কবিতা আমাকে সংশোধন করে দিতে হয়েছে। ওর দিবানের ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলুম। পড়ে তফ্‌তা খুব রেগে গিয়েছিল; ওর মনে হয়েছিল, আমি নাকি প্রশংসার আড়ালে ওর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছি। আমি আর কী বলব, বলুন? চিঠিতে লিখেছিলুম, 'তুমি আমার শত্রু নও, প্রতিদ্বন্দ্বীও নও। আমার বন্ধু এবং নিজেকে আমার শাগির্দ মনে করো। প্রশংসার আড়ালে আমি তোমাকে নিয়ে মজা করব? এত দূর হীন মনে করো আমাকে?' কিছুদিন বাদে আবার একটা দিবান প্রকাশের জন্য উঠে পড়ে লাগল তফ্‌তা। অনুরোধ এল আমাকে ভূমিকা লিখে দিতে। এবার সত্যিই বিরক্ত হলুম। সোজাসুজি ওকে লিখলুম, 'তুমি খুব সহজে দিবান লিখতে পার ঠিকই, কিন্তু আমি অত সহজে ভূমিকা লিখতে পারি না। কবিতাকে ভালবাসলে শুধু লিখে যাও, ছাপানোর জন্য অত তাড়াহুড়ো করো না। ধৈর্য ধরো। না-হলে দ্বিতীয় দিবান ছাপা হলেই তুমি তৃতীয়টার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দেবে। এত ভূমিকা তো আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। আমি এই বয়সে আমার পথ

থেকে সরে আসতে পারব না। প্রতি বছর তুমি দিবান লিখলে আমাকে ভূমিকা লিখে দিতে হবে? এইসব ফালতু লেখা আমি আর লিখব না।' তারপর তফ্‌তা আমাকে অনেকদিন চিঠি লেখেনি। এরা কী মনে করে, মান্টোভাই? কবিতার মতো গদ্য লেখাও খুবই কঠিন কাজ। আমার ওই বয়সে কারও সঙ্গে সমঝোতা করার কথা আমি ভাবতেই পারতুম না। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' সম্পাদনা করার সময় সৈয়দ আহমদ খান আমাকে একটা ভূমিকা লিখতে বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই দোস্তি ছিল। অতবড় দার্শনিক, নেতা। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এই নতুন সময়ে 'আইন-ই-আকবরি'-র কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তার ওপর আবুল ফজলের গদ্যশৈলী আমার একেবারেই না-পসন্দ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ইতিহাস সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহই ছিল না। তো, আমি ভূমিকা হিসাবে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তাতে 'আইন-ই-আকবরি' নতুন সময়ে কতটা অসাড়, সে-কথাই লিখেছিলুম। সৈয়দ সাবের পছন্দ হয়নি। কবিতাটি তিনি ছাপেনওনি। এজন্য আমি কী করতে পারি বলুন? বন্ধু বলেই তার সব কাজের প্রশংসা করতে হবে, এমনটা তো আমার ধাতে ছিল না। তাই ধীরে-ধীরে একা হয়ে যাচ্ছিলুম আর তা মেনেও নিয়েছিলুম। নতুন কিছু আর কী-ই বা ঘটতে পারে জীবনে?

কাল্লু একদিন কোথা থেকে এক দস্তানগোকে ধরে নিয়ে এল। ও তো শিকারি বাঘের মতো কিস্‌সা-বলিয়েদের খোঁজে থাকত। আমি আর কাল্লু তার কাছে কিস্‌সা শুনতে বসলুম। মওলা রুমির মসনবি থেকে, আহা, কী স্বর্গীয় কিস্‌সাই যে সে শোনাল আমাদের। মন দিয়ে শুনুন, ভাইজানেরা।

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময়ের কথা বলছি। মদিনায় তখন তসলিম নামে একজন গায়ক থাকতেন। শুধু গানই নয়, রবাব বাজানোতেও তিনি ছিলেন উস্তাদ। লোকে বলত, তাঁর গান শুনে বুলবুলও নাকি লজ্জা পেতে, মৃতরাও কবরে উঠে বসত। উঁচু-নিচু, সবরকম মানুষের সঙ্গেই ভাব-ভালবাসা ছিল তাঁর। তসলিম যেখানেই যেতেন, কত যে মানুষ তার পিছনে পিছনে যেত; যেন তসলিম ছাড়া তাদের জীবনে আর কেউ নেই।

তসলিমের বয়স বাড়তে লাগল, কণ্ঠস্বর আগের মতো রইল না, আঙুলও সুরঝঙ্কার তোলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে লাগল। একসময় তাঁর গলা শুনে মদিনার লোকজনদের মনে হতে লাগল, যেন গাধা ডাকছে। তসলিম যখন সত্তর বছরে পৌঁছলেন, তখন আর তাঁর গান ও রবাবের শ্রোতা কেউ রইল না। তসলিম ভেবেছিলেন, তাঁর জনপ্রিয়তা আজীবন একই রকম থেকে যাবে। তাই উপার্জনের সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভোগ-বিলাসে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ঋণগ্রস্ত। বাড়িওয়ালা তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিল। একটা রুটি কিনে খাবার মতো পয়সাও তাঁর ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ছেঁড়া তারের রবাব নিয়ে তিনি পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে

লাগলেন। একা-একা নিজের সঙ্গেই কথা বলেন। আল্লা, পরম করুণাময়, আমার এই এত যন্ত্রণা পাওয়ার কথা ছিল? একসময় সবাই তো তাঁকে খোদারই সুরসাধক মনে করত। আর খোদা তাঁকেই ভুলে গেলেন? এ দুনিয়ায় তা হলে কি কোনও বিচার নেই?

রাস্তায় তাঁর দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। দু'একজন 'সালাম আলেকুম' বলে পাশ কাটিয়ে যেত। মদিনার মানুষ তখন নতুন শিল্পীর কাছে ছুটছে। তসলিমকে দেখে মনে হত, যেন একটা খণ্ডহর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এভাবেই তিনি একদিন মদিনার বাইরে কবরস্থানে এসে পৌঁছলেন। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত তসলিম একটা কবরের উপর গিয়ে বসলেন। এই জীবনের অর্থ কী? যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, সবই আসলে মিথ্যে? যৌবনের খ্যাতি এখন তিক্ত স্মৃতি। আর তো তিনি গান গাইতে পারবেন না, রবাব বাজাতে পারবেন না। এই-ই তো তাঁর জীবনের দোজখ। তসলিমের মনে হল, নিজের প্রতিভার জন্য গর্বই কি তাঁর পাপ? খ্যাতির মোহের জন্যই কি আজকের এই শাস্তি? চারপাশের কবরগুলো তাঁকে একটা কথাই বলছিল : একমাত্র মৃত্যুই সত্য। তসলিম ভাবলেন, মৃত্যুর আগে খোদার উদ্দেশে প্রার্থনা করবেন। কখনও তো সেভাবে আল্লার কথা ভাবেননি তিনি। কবরের ওপরেই শুয়ে পড়লেন তিনি। অনুভব করলেন, তাঁর নীচে পড়ে আছে একজন মানুষ বা মানুষীর ঠাণ্ডা হাড়—হাড়ের কাঠামোটুকু শুধু। তাঁর চোখের অশ্রুর সঙ্গে মিশে গেল নীরব কথাগুলি, 'আল্লা, তুমি আমার গান কেড়ে নিয়েছ। গানই ছিল আমার শ্বাস-প্রশ্বাস, আমার রুটি। গান ছাড়া আমি কী করে বাঁচব? এই অধমকে তুমি অনেক দিয়েছ, আবার একসময় কেড়েও নিয়েছ। আমার তো নালিশ কিছু নেই। যা দিয়েছ, আর নিয়েছ, সবই তোমার। শুধু যেন এই যন্ত্রণাকে বহন করতে পারি। নাঙ্গা হয়ে আমি তোমার দরজায় এসে আজ দাঁড়িয়েছি। খোদা, আমাকে গ্রহণ করো। যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি, আমি শুধু তোমার জন্যই রবাব বাজাব, তোমার জন্যই গান গাইব। অন্তত কয়েকটা পয়সা জুটিয়ে দাও, যাতে রবাবের তার কিনতে পারি। যে তোমাকে ভুলে থাকে, তাকেও তো তুমি ক্ষমা করো। আমাকেও ক্ষমা করো খোদা।'

বলতে-বলতে তসলিমের প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেল সেই অনন্ত বাগানে যেখানে সবসময়েই বসন্ত। তাঁর আত্মা যেন মধুর সাগরে ডুবে গেল। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনও বাসনাই আর রইল না। সে জগতে তো খ্যাতি-সমৃদ্ধি-উচ্চাশা কিছুই নেই। তসলিমের আত্মা ভাবল, এর চেয়ে সুখের জায়গা আর কোথায়? তখনই সে সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ভাইজানেরা, সেই আদি শব্দ, যার পাশে সব শব্দই প্রতিধ্বনি মাত্র। কণ্ঠস্বর বলল, 'এখানে আটকে থেকো না। এ শুধু তোমার জন্য অন্য এক অভিজ্ঞতা। এবার বেরিয়ে পড়ো।'

—কোথায়? ওই দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে হবে? দয়া করো, কিছুতেই আমি ওখানে ফিরব না।

ঠিক সেইসময়, এই দুনিয়াতে, দরবারে বসে থাকতে থাকতে খলিফা ওমরের ঝিমুনি এসেছিল। দেখতে-দেখতে খলিফা ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে খলিফা ওমর সেই আদি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'মদিনার কবরখানায় আমার প্রিয় একজন মানুষ শুয়ে আছে। কোষাগার থেকে সাতশো দিনার নিয়ে তাঁকে দিয়ে এসো। আর বোলো, রবাবের জন্য সে যেন তার কিনে নেয়।'

ঘুম ভেঙে উঠেই খলিফা ওমর সাতশো দিনার নিয়ে কবরখানার দিকে দৌড়লেন। এক কবর থেকে আর এক কবরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখলেন থুত্থুরে একজন বুড়ো মানুষ একটা কবরের ওপর শুয়ে আছেন। খলিফা আরও খুঁজতে লাগলেন। শেষে তাঁর মনে হল, আমি বুড়োর বাইরের চেহারাটাই শুধু দেখেছি খোদার প্রিয় মানুষ হয়তো এই লোকটিই। ওমর বুড়োর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ খেয়াল করে দেখার পর তসলিমকে চিনতে পারলেন।

তসলিমের আত্মা তখনও অন্য দুনিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন সময় একটা হাঁচির শব্দ। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁচেছিলেন খলিফা ওমর। কিন্তু তসলিমের আত্মার মনে হল, এই হাঁচিরও নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে। খোদার দুনিয়ায় সবই নিয়মে বাঁধা। তসলিমের আত্মা তাঁর শরীরের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ল। তসলিম সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসলেন। খলিফাকে দেখে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন।—হুজুর, ধার-বাকির জন্য আমাকে কয়েদখানায় পুরবেন না। এবারের মতো আমাকে ছেড়ে দিন।

—ভয়ের কিছু নেই মিঞা। এই সাতশো দিনার রাখুন। নিজের ইচ্ছে মতো খরচ করবেন। তবে রবাবের জন্য অবশ্যই তার কিনে নেবেন।

তসলিম হাত বাড়িয়ে দিনারগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তারপর ওমরের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে লজ্জায়, নিজের প্রতি ঘৃণায় কবরে আঘাত করে রবাব ভেঙে ফেললেন, ছিঁড়তে শুরু করলেন নিজের পোশাক।

—এ কী করছেন আপনি? আপনি খোদার প্রিয় মানুষ। খোদাই তো আমাকে পাঠিয়েছেন।

—আমি এর যোগ্য নই খলিফা সাব। এই রবাবের জন্যই আমি তাঁর থেকে দূরে সরে গেছি। আমার কণ্ঠস্বরের জন্যই তাঁর সৌন্দর্যকে দেখতে পাইনি। আমার উচ্চাশা তাঁর কাছে আমাকে পৌঁছতে দেয়নি। বিখ্যাত হওয়ার জন্য যখন আমি ব্যস্ত ছিলাম, তখন তাঁর কাফেলা আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এই পাপ, এই অহং কিছুতেই মোছবার নয় খলিফা সাব।

—এত যে কথা আপনি বলছেন, তাও আপনার অহং-এরই পরিচয়, মিঞা। অনুতাপে পাপ আরও বাড়বে।

—কিন্তু ওই রবাব আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছতে দেয়নি।

—রবাব তো তিনিই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। না হলে কি পেতেন?

রবাবের তার কেনার জন্য তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে আল্লাই তো গান করেন।

তসলিম খলিফার কাছে দিনার নিয়ে তাঁকে সালাম জানালেন। তারপর বাজারের পথে রওনা দিলেন নতুন রবাব কেনার জন্য। এরপর থেকে তসলিমকে আর কেউ দেখতে পায়নি। নতুন রবাব বাজাতে বাজাতে তিনি সেই নীরবতার দিকে চলে গেলেন, কোনও কিস্‌সার শব্দ যাকে ছুঁতে পারে না।

থী খবর গর্ম্ কেহ্ গালিব-কে উড়েঁগে পূর্জে;
দেখনে হম-ভী গয়ে থে পেহ্ তমাশা নহ্ হুয়া।।
(চারদিকে খবর রটে গেল—গালিবকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হবে;
দেখতে আমিও গিয়েছিলাম, কিন্তু তামাশাটা হলই না।।)

মির্জাসাব, আমি তো একজন গল্পলেখক, অথচ দুনিয়ার আদালত আমাকে সবসময় অশ্লীল লেখক হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। পাকিস্তান সরকার কখনও বলেছে, আমি কমিউনিস্ট, সন্দেহভাজন; কখনও আবার আমাকে মহান লেখকের শিরোপা দিয়েছে। বেঁচে থাকার সামান্য সুযোগটুকু অবধি কখনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কখনও দয়া করে কিছু ভিক্ষে দেওয়া হয়েছে। একেক সময় ওরা বলেছে, আমি আসলে কেউ নই, একজন বহিরাগত; আবার নিজেদের মর্জি হলে আমাকে কাছে ডেকে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি বুঝেছি, মির্জাসাব ওদের চোখে আমি বহিরাগতই; শুধু পাকিস্তান সরকার কেন, যে-কোনও সরকার, যে-কোনও ক্ষমতার কাছে আমি বাইরের লোক, মোহাজির। আপনার জীবনটাও তেমনভাবেই কেটে গেছে। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছি, আমি তা হলে কে? আমার অবস্থান কোথায়? পাকিস্তানে আমার নিজের কোনও জায়গা হয়নি মির্জাসাব, তবু সেই জায়গাটা খোঁজবার চেষ্টা চালিয়ে গেছি পাগলের মতো। আর সেজন্যই কখনও হাসপাতালে, কখনও পাগলাগারদে দিন কেটে গেছে আমার। সবাই মুখে থুতু ছিটিয়েছে। মান্টো! আরে ও তো একটা অশ্লীল লেখক, পর্নোগ্রাফার। সারাদিন শরাব খায়, শরাবের টাকার জন্য ধার করে, ভিক্ষে চায়, আর তারপর ওর দোজখে ঢুকে নোংরা-নোংরা সব গল্প লেখে।

এ-সব অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, ভাইজানেরা। তখনও দেশটা দু-টুকরো হয়ে যায়নি। 'কালি শালোয়ার' গল্পটা বেরোনোর পরেই হইচই শুরু হয়েছিল। সেবারের মতো লাহোরের সেশন কোর্ট আমাকে মুক্তি দিয়েছিল। তারপর 'ধুঁয়া'-র বিরুদ্ধে উঠল অশ্লীলতার অভিযোগ। আর তখন 'কালি শালোয়ার'-কে আবার 'ধুঁয়া'-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল চার্জশিটে। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাস। লাহোর থেকে এক গোয়েন্দা পুলিশ এসে আমাকে গোরেগাঁও থানায় হাজিরা দিতে বলল। থানায় যেতেই আমাকে গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখতে চাইলে একজন অফিসার বললেন, 'তা তো আপনাকে দেখানো যাবে না।'

—কেন?

—হুকুম নেই।

—ওয়ারেন্ট না-দেখিয়ে তো আপনি অ্যারেস্ট করতে পারেন না।

—মিস্টার মান্টো, আপনার কোনও কথারই আমি উত্তর দিতে পারব না। এখান থেকে আপনাকে সোজা লাহোরের কোর্টে পাঠানোর নির্দেশ আছে।

আমি তখন থানা থেকে উকিল হীরালালকে ফোন করলাম। হীরালালজি অফিসারের সঙ্গে কথা বলার পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ রাতে আমাকে আবার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল। জামিনে মুক্তি পেলাম ঠিকই, কিন্তু লাহোরে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে আমাকে হাজির হতে বলা হল।

সেই সময় ইসমতকে 'লিহাফ্' গল্প লেখার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওকেও একইদিনে একই এজলাসে হাজির হতে হবে। শুনে বেশ মজাই পেয়েছিলাম, মির্জাসাব। যাক্, এবার তা হলে দু'জনে লাহোরে গিয়ে একটু মওজ-মস্তি করা যাবে। শফিয়াকে নিয়ে ইসমতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

—তোমরা দু'জনে যা শুরু করেছ! শহিদ আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'চলো সেলিব্রেট করা যাক। ইসমত তো গুম মেরে আছে।'

—কেন?

—আমিও তো তাই বলছি। ও এখন মনে হচ্ছে, 'লিহাফ্' লিখে ও যেন বড় গুনাহ্ করে ফেলেছে।

—সে কথা কখনও বলিনি। ইসমত হেসে ওঠে।

—তা হলে?

—একটা গল্প লেখার জন্য এত বিড়ম্বনা পোষায় না।

—মান্টোসাবকে আমিও তাই বলেছিলাম। শফিয়া বলে, 'গল্প লেখার জন্য জেলে যেতে হলে, ও-সব না-লেখাই ভাল।'

—শোনো, ইসমত বহিন, জীবনে এইরকম সময় খুব কম আসে।

—মানে? মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছ।

—তা ছাড়া কী? গল্প লেখার জন্য রানি তোমাকে-আমাকে কোর্টে হাজিরা দেওয়ার ফরমান পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আর হয় না কি?

—ওই সম্মান ধুয়ে তুমি জল খাও, মান্টোভাই। সব কিছুতেই নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা দেখতে, তুমি ভালবাস।

—ঝগড়া ক'রো না ইসমত। শহিদ, আইসক্রিম আনাও তো। ইসমত, কী একখানা গপ্পো লিখেছ, ভাবতে পারছ! হাজারবার নিজের পিঠ চাপড়াও। লাহোরের ট্রিপটা ভারি মজার হবে, ইসমত। শহিদ, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

—ও কী করবে গিয়ে? ইসমত ধমক দেয়।

—আরে বাবা, শীতের লাহোরের সৌন্দর্য তোমরা জানো না। কথায় বলে না, যো লাহোর নেহি দেখা, উও জন্মাই নাই। মাছ ভাজা আর হুইস্কি—ওঃ শহিদ, সে এক জন্নত—আশিকের চুমুর মতো গরম রেড ওয়াইন, ভাবা যায়?

—আপনি থামবেন মান্টোসাব?

—কেন শফিয়া? থামব কেন? আমি চোর, না জালিয়াত? আসলে বিচারের নামে রানি চান আমরা একটু লাহোর ঘুরে আসি।

কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য আমাদের লাহোর যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। হীরালালজিই আমাদের দু'জনের কেস লড়বেন।

আঃ লাহোর! মির্জাসাব, পুরো শহরটাই যেন একটা শিসমহল। না, লাহোর যেন সেই নারী, যার কটাক্ষে রামধনু খেলে, সে জুয়া খেলে তার ভাগ্য নিয়ে, আর দু'হাত বাড়িয়ে তার বুকের খুশবুর ভেতরে টেনে নেয়। আমরা লাহোরে পৌঁছতেই কত যে নেমন্তন্ন আসতে লাগল। সবাই তো আমার চেনা। কিন্তু ওরা দেখতে চায় ইসমতকে। এ কেমন আজিব অওরৎ, যে একটা গল্প লিখে শোর মাচিয়ে দিয়েছে!

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব সন্ত রামের এজলাসে আমাদের হাজিরা দিতে হল। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম, বম্বে থেকে লাহোর তো দীর্ঘপথ, তাই প্রতিবার যেন আমাদের হাজিরা মকুব করা হয়। আমাদের আবেদন গ্রাহ্যই হল না। তাই উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে হল। এরপর বিচারপতি অচ্ছুরামের এজলাসে হাজির হতে হল আমাদের। সে এক অবাক কাণ্ড! বিচারপতি অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমি আপনাদের দু'জনের গল্পই আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। আমার তো খুবই ভাল লেগেছে।' এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়া। এ যাত্রা তা হলে বাঁচা গেল। কিন্তু অচ্ছুরাম মামলাটা ঠেলে দিলেন দীন মহম্মদের এজলাসে। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, 'সাহিত্যের নামে আপনারা নোংরামি করেছেন।' তিনি আমাদের আবেদন নাকচ করে দিলেন। আমি তখন সত্যিই অসুস্থ ছিলাম, মির্জাসাহেব। তাই ডাক্তারের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। অগত্যা দীন মহম্মদসাব আমার হাজিরা মকুব করে দিয়েছিলেন।

মির্জাসাব, অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় রায় সাহেব সন্ত রামের এজলাসে পেশ করেছিলাম। হুজুর, মহামান্য, আপনার অনুমতি চেয়ে নিজের দু-একটি কথা বলতে চাই। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছুই নেই, যাকে আমরা অশ্লীল বলতে পারি। এই সম্পর্ক নিয়ে কোনও কথাই নোংরা হতে পারে না। কিন্তু যখন দু'জনের সম্পর্ককে শুধু চুরাশিরকম যৌনমুদ্রায় দেখানো হয়, তখনই তা একমাত্র নোংরা হয়ে যায়। গল্প, কবিতা, ভাস্কর্যকে দেখতে হবে সেই সৃষ্টির ভেতরের প্রণোদনাকে বুঝে। তার পিছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে, তাকেই আমরা অশ্লীল বলতে পারি। যৌনতা মানেই অশ্লীল নয়। তা হলে কোনারক, খাজুরাহোর মন্দির ভেঙে ফেলা উচিত। কোনও মানুষ নোংরা মন নিয়ে জন্মায় না, হুজুর। ভাল বা মন্দ, যাই বলুন, সবই তার ভেতরে বাইরে থেকে এসে ঢোকে। 'ধুঁয়া' গল্পে আমি শুধু একটা বিশেষ অবস্থাকে বর্ণনা করতে চেয়েছি। গল্পের বাবা ও মা, নিজেরা একটু আলাদা থাকার ভান করে লুকিয়ে যে যৌন উত্তেজনা উপভোগ করে, সেই উত্তেজনাই চারিয়ে যায় তাদের ছেলে মাসুদের মধ্যে, যেহেতু সে ঘটনাটা আচমকা দেখে ফেলেছিল। আমি জানি না, কেন এই গল্পকে অশ্লীল বলা হয়। কোনও অসুস্থ মন এই গল্পের মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে পাবে। আমি গল্প লিখেছি সুস্থ মনের মানুষদের জন্যই। হুজুর, আমি সামান্য গল্পলেখক; আমাকে পর্নোগ্রাফার বানিয়ে দেবেন না।

রায়সাহেব সন্ত রাম সম্ভবত কিছুই শোনেননি, বা শুনলেও, তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন। আমার দু'শো টাকা জরিমানা হল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে দু'শো টাকা বার করে দিলাম। সন্ত রামজি মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি তা হলে তৈরি হয়েই এসেছিলেন?'

—তা ছাড়া উপায় কী বলুন?

তবে জরিমানাটা আবেদন করে মকুব হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব আদালত-জরিমানা-অপমানের কথা না-হয় একটু মুলতুবি থাক, ভাইজানেরা। লাহোরে ওই শানশওকতের দিনগুলো কখনও ভুলতে পারব না। এজলাসে হাজিরার সময়টুকু ছাড়া আমি, ইসমত আর শহিদ টাঙ্গায় চেপে ঘুরে বেড়াতাম আর কেনাকাটা করতাম। ইসমত কত যে কাশ্মীরি শাল আর জুতো কিনেছিল। আমারও জুতো কেনার লোভ ছিল খুব। জুতো কিনতে গিয়ে প্রতিবারই ইসমত আমার ছোট-ছোট পায়ের দিকে তাকিয়ে বলত, 'তোমার পা দেখলে বড় লোভ হয়, মান্টোভাই।'

—ফালতু কথা বোলো না। এই পা দু'টোকেই আমি সবচেয়ে ঘেন্না করি।

—কেন?

—এক্কেবারে মেয়েদের মতো। কোনও মানে হয়! খোদা যে তখন কী করেছিলেন! ভুলে কোনও অওরতের পা লাগিয়ে দিয়েছেন।

—মেয়েদের পা তুমি এত ঘেন্না করো? এদিকে মেয়েদের প্রতি আগ্রহের তো কমতি নেই।

—তুমি সব কিছু উল্টো বোঝ ইসমত। মেয়েদের পা ঘেন্না করব কেন? পুরুষ হিসেবে আমি মেয়েদের পছন্দ করি। তার মানে তো এই নয় যে আমি মেয়ে হতে চাইব।

—বখোয়াশ বাদ দাও।

—বখোয়াশ তুমিই করো, তারপর বলো, বাদ দাও। শহিদ, তুমি একে সহ্য করো কী করে?

শহিদ হাসতে-হাসতে বলে, 'ওর বিষটুকু তো তুমিই নিয়ে নাও, মান্টো। আমার জন্য অমৃতই থেকে যায়।'

ইসমত গম্ভীর হয়ে বলে, 'নারী-পুরুষ ছেড়ে এবার মানুষের কথায় এসো তো মান্টোভাই।'

—মানুষ? সেটা কী চিজ?

—মানে?

—আমি তো জানি, পুরুষ আর নারী। মানুষ বলে তো কিছু জানি না।

—আবার তুমি বদমায়েসি করছ। ইসমত চোখ বড়-বড় করে তাকায়।

—আমি বিমূর্তকে পছন্দ করি না, ইসমত।

—মানে?

—মানুষ শব্দটা আমার কাছে বিমূর্ত। আমার কাছে আছে শহিদ, ইসমত, শফিয়া—তারা কেউ নারী, কেউ পুরুষ। 'মানুষ' শব্দটা একটা ফ্রড।

—সব তোমার কাছে ফ্রড, তাই না? ইসমত চিৎকার করে ওঠে।

—তুমি ফ্রড নও, ইসমত বহিন।

—আবার?

—কী?

—বহিন তোমাকে বলতেই হবে?

শহিদ হা-হা করে হেসে ওঠে।—ইসমত, এ-জীবনে, মান্টোর খেলাটা মেনে নাও। পরের জীবনে না-হয় অপেক্ষা কোরো।

আমি গম্ভীর মুখে বলি, 'শহিদ, এত সিরিয়াস মেয়ের কিছুতেই গল্প লেখা উচিত নয়।'

ইসমত কোনও কথা বলে না। অনেকক্ষণ পর সে আমার চোখে সোজাসুজি তাকায়।—তা হলে কী করব?

—মান্টো, আর রাগিও না ইসমতকে। শহিদ ইসমতের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলে।—তুমি চলে গেলে আমার গোস্ত কিমা করে ছাড়বে।

—পায়ের কথা কী এত বলছিলে, বলো তো ইসমত?

—না।

—এই নাও, পেস্তা খাও।

পেস্তার লোভ ইসমত কখনও ছাড়তে পারে? আমার হাত থেকে একমুঠো নিয়ে চিবোতে শুরু করল। অমনি অন্য এক ইসমত।—আমার কথাই তো তুমি শুনলে না। যাদের পা খুব সুন্দর, তারা খুব বুদ্ধিমান আর অনুভূতিপ্রবণ হয়।

—তা-ই? আমার তা হলে বুদ্ধি আর অনুভূতি, দু'টোই আছে?

—জানি না। ইসমত ঝাঁঝিয়ে ওঠে।—আমার দাদার ছিল। আজিম বেগের। কী সুন্দর পা! একেবারে মেয়েদের মতো। মরার সময় দু'টো পা এমন ফুলে গেছিল, তাকানো যেত না, মান্টোভাই।

এরপর ইসমতকে আর রাগানো যায় না। আজিম বেগ চুঘতাই যে ঢুকে পড়েছে আমাদের মধ্যে। আমি দেখতে পেতাম, ওই নামটা এলেই ইসমত স্থির হয়ে যেত; লোকটা এত বড় বজ্জাত, ইসমতকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে? আজিম বেগের ওপর ওর সব অভিমান লেখা আছে 'দোজখি' গল্পে।

সে বড় সুখের সময় ছিল, মির্জাসাব, লাহোরের সেই দিনগুলো। আমরা প্রায় সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। আনারকলি বাজার, শালিমার বাগ, নূরজাহানের সমাধি। মুশায়েরা, গাপ-বাজি, মাছভাজা, কাবাব, মুরগ্‌ কি টিক্কা। কত পুরনো দিনের জলছবি ছড়িয়ে আছে লাহোরের পথে-পথে। আমার প্রথম যৌবনের হাশ্‌মতের সব দিন।

আমার 'বু' গল্পটা ছাপা হতেই আবার শোরগোল পড়ে গেল। এর চেয়ে অশ্লীল গল্প নাকি আর হয় না। তার ওপর খ্রিস্টানরা নাকি আমার ওপর খুব চটেছে। এ-গল্পের রণধীর একটা খ্রিস্টান মেয়েকে ছেড়ে রাস্তার এক কালো মেয়ের শরীরের গন্ধে জীবনের উত্তাপ খুঁজে পেয়েছিল। আবার লাহোরের পথে ইসমত ও আমি। শহিদ তখন সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম শুনানি শুরু হল 'বু' নিয়ে।

আমার উকিল জিজ্ঞেস করলেন, 'মান্টোসাবের এই গল্প কি অশ্লীল?'

—আলবত। সরকার পক্ষের জবাব।

—কোন শব্দটা অশ্লীল?

—সিনা।

—মহামান্য আদালত, সিনা কি অশ্লীল শব্দ? আমার তো মনে হয় না।

সরকার পক্ষের উত্তর, 'সিনা অশ্লীল নয়। তবে এক্ষেত্রে মহিলার স্তনের কথা বলা হয়েছে।'

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, মির্জাসাব। আদালতের উকিল-মুহুরি-সরকারের চাকরবাকররা বলে দেবে, কোন শব্দের মানে কী? আর শব্দ নিয়ে যে জাগরণে-স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে বেঁচে থাকে, তার কিছু বলবার থাকবে না? হ্যাঁ, আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "মহামান্য আদালত, আমার গল্পে 'সিনা' শব্দে নারীর স্তনের কথাই বলা হয়েছে। নারীর স্তনকে নিশ্চয়ই কেউ চিনেবাদাম বলে না।"

এজলাসে হাসির হল্লা উঠল। আমিও হাসি থামাতে পারছিলাম না, মির্জাসাব। যারা আমার বিচার করছে, তারা কেউ স্তন দেখেনি, স্তন স্পর্শ করেনি, টেপেনি, চোষেনি? তা হলে স্তন শব্দ নিয়ে এদের এত আপত্তি কেন? আমি স্তন ভালবাসি, মির্জাসাব। কী আশ্চর্য গড়ন, যেন সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে এল দু'টি শঙ্খ, কত অজানা-অনামা প্রাণীদের কামনার সৌরভ ছড়িয়ে আছে তাদের শরীরে, আমি তাদের উষ্ণতায় হাত বোলাই, দেখি তাদের সৌন্দর্য, যেন মন্দিরের দুই গোপুরম, কখনও তারা দু'টি পাখি হয়ে যায়, আমি তাদের পালকে আদর সঞ্চার করি। আমি ভালবাসি নারীর গ্রীবা, বাহু, নাভিপুষ্প, নিতম্ব, ঊরু। খোদা যাকে এমন সৌন্দর্য দিয়েছেন, আপনি তাকে অশ্লীল বলবেন কোন সাহসে?

বিচারপতিরা তো প্রায়শই বেরসিক। অতএব তিনি ঘোষণা করলেন, 'অভিযুক্ত দ্বিতীয়বার এমন করলে, আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর শাস্তি হবে।'

আমি বসে পড়লাম। ইসমত আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সিনা যদি অশ্লীল হয়, তবে হাঁটু বা কনুই অশ্লীল নয় কেন?'

—এ-সব বখোয়াশ শুনো না।

—তুমি আর কিছু বলবে না?

—কী বলব?

—ওরা তোমাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করে যাবে, আর তুমি চুপচাপ বসে শুনবে মান্টোভাই?

—ইসমত, এমনটাই তো লেখকের নিয়তি। যে কেউ তোমাকে ছুরি দিয়ে ফালাফালা করবে। তোমাকে সব শুনে যেতে হবে। এই দুনিয়ায় সত্য কখনও জোর গলায় কিছু বলতে পারেনি।

—আমি বলব।

—কী বলবে?

—'লিহাফ্'-এর পক্ষে। আমি ভুল করিনি।

—বোলো। তোমার কথা প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরবে এই এজলাসে। তবু তুমি ক্ষমা কখনও চেয়ো না ইসমত।

—কী ভাব আমাকে, মান্টোভাই?

—মার খেতে-খেতে একসময় শিরদাঁড়া নুয়ে যায় তো। আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। ইসমত, আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে আমি চুপ করে থাকব। নীরবতা ছাড়া আমার আর কোনও অস্ত্র নেই।

সেদিন রাতে ইসমত হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মান্টোভাই, তোমার আগের মতো দম নেই কেন বলো তো?'

কী বলব ইসমতকে? ও কি জানে, আমি আসলে এক দুর্বল, নিরীহ মানুষ? শুধু বেঁচে থাকার জন্য আমি নিজেকে সবার সামনে এমনভাবে হাজির করেছি, যেন আমার মতো কালাপাহাড় আর কেউ নেই।

—ইসমত, জেলখানাকে আমি খুব ভয় পাই।

—তুমি জেলখানাকে ভয় পাও?

—আমার ভয়ের কথা কাউকে কখনও বলিনি, ইসমত। কাকে বলব, বলো? শফিয়াকে বলা যায় না। ও এত শান্ত আর ভাল মেয়ে। এমনিতেই আমাকে নিয়ে জেরবার হয়ে আছে। ইসমত, আমার দৈনন্দিন জীবনটাই তো একটা জেলের জীবন। তার মধ্যে যদি আরও একটা জেলখানায় আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, আমি এক মিনিটও বাঁচব না।

—কী হয়েছে তোমার মান্টোভাই?

—খুব ভয় করে ইসমত। এই জীবনটাকে চুষে-চিবিয়ে খাওয়ার খুব লোভ আমার। ধরো, রাস্তায় হাঁটছি, কেউ হঠাৎ এসে আমার বুকে গুলি করল, আমি মরে গেলাম, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জেলখানায় একটা ছারপোকার মতো আমি মরতে চাই না।

—এ-সব কেন ভাবো?

—আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে ইসমত।

—মান্টোভাই। ইসমত চিৎকার করে ওঠে।—কী মনে করো নিজেকে? শুধু নিজের জন্য সহানুভূতি চাও, তাই না?

—গাড়িতে যে পাঁচ নম্বর চাকাটা লাগানো থাকে, দেখেছ ইসমত? আমি ওই পাঁচ নম্বর চাকাটা।

—আমাদের কথাগুলো হিন্দি সিনেমার ডায়লগের মতো হয়ে যাচ্ছে, মান্টোভাই।

আমি আর কিছু বলিনি। তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। মনে-মনে বলেছিলাম, কেউ তো আমাদের নিয়ে একটা সিনেমাই তৈরি করছে ইসমত। হয়তো কেয়ামতের দিনে সিনেমাটা তিনি আমাদের দেখাবেন।

টুক্ মীর-এ জিগর-সোখতহ্ কী জল্‌দ খবর লে
কেয়া য়ার ভরোসা হ্যায় চিরাগ-এ সহরীকা।।
(পোড়া হৃদয় মীরের একটু তাড়াতাড়ি খবর নিও,
হে বন্ধু, রাত্রি শেষের প্রদীপ আর কতক্ষণ।।)

আপনি তো জানেন, মান্টোভাই, আমি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলুম, তখন নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় চলছে। শুধু খোদা কখন যবনিকা ফেলবেন, তারই অপেক্ষা। কিলা মুবারকে দেওয়ান-ই-খাসের দেওয়ালে জাঁহাপনা শাহজাহান আমির খসরুর কবিতার দু'টো পংক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, 'অগর ফিরদৌসে বররুইয়ে জমিন অস্ত, হামিন অস্ত এ হামিন অস্ত এ হামিন অস্ত।' পৃথিবীতে স্বর্গ যদি থাকে, তা হলে তা এখানে। আমি যখন জাঁহাপনা বাহাদুর শাহের দরবারে গিয়ে পৌঁছলুম তখন সেই স্বর্গ নরক হয়ে গেছে। ১৮৩৭-এ বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসলেন, তখন তাঁর বয়স বাষট্টি। সাম্রাজ্য বলতে তো আর কিছুই নেই। ইংরেজরা একে একে সব গ্রাস করেছে। কেল্লার ভিতরে আর কাছাকাছি দু-একটা জায়গায় যেটুকু নবাবি দেখানো। আয় বলতে ইংরেজের দেওয়া ভাতা আর যমুনার তীরের কয়েকটা অঞ্চল থেকে পাওয়া রাজস্ব। আর কেল্লায় কত লোক থাকত, জানেন? দু'হাজারের ওপর। এদের বেশির ভাগই অবৈধ সন্তান। ভাবতে পারবেন না মান্টোভাই, এই সব সুলাতিন পোকামাকড়ের মতো বেঁচে ছিল। বাহাদুর শাহ আসলে পোকামাকড়দের বাদশা হয়েছিলেন।

বাদশা হয়ে তিনি আবুল মুজফ্‌ফর সিরাজুদ্দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ বাদশা গাজি নাম নিলেন। আমার হাসি পেত। গাজি? গাজি মানে জানেন তো? পবিত্র যোদ্ধা। আরে যুদ্ধটা তিনি করলেন কোথায়? আর যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতাও তো তাঁর ছিল না। সেজন্য যে-সাহস, যে-আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন বাদশার তা ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তো তাঁকে পুতুল হিসাবে নাচানো হয়েছিল। বেগম জিনত মহল আর খোজা মেহবুব আলি খানের হাতের পুতুল হয়েই বেঁচেছিলেন তিনি। মেহবুব আলি যা বলত, বাদশা তা-ই করতেন। আর মেহবুব আলিকে চালনা করতেন বেগম জিনত মহল। অবাক হবেন না, ভাইজানেরা। মুঘল সম্রাটদের হারেমের নজরদারি করত খোজারা। সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের পথে, হারেমের খোজারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে

উঠেছিল যে বাদশা খোজা মেহবুবের কথা শুনেই চলতেন। ভেবে দেখুন মান্টোভাই, খোজারা যখন প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যের ধ্বংস তখন অনিবার্য।

আর আমাদের বাদশা? তিনিও তো খোজাই ছিলেন, হ্যাঁ, মান্টোভাই, মানসিক ভাবে খোজা। কোনও যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়নি তাঁকে। পূর্বপুরুষের পয়সায় বসে বসে খেয়েছেন, নবাবি চাল দেখিয়েছেন, আর ফালতু কিছু কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর আইনি বিবি চারজন; বেগম আশরাফ মহল, বেগম আখতার মহল, বেগম জিনত মহল, বেগম তাজ মহল। এছাড়াও কত যে ক্রীতদাসী আর রক্ষিতা। চুয়ান্নজন সন্তান হয়েছিল তাঁর, ভাবতে পারেন? বাইশটি ছেলে আর বত্রিশজন মেয়ে। এর নাম বাদশাহী জীবন, মান্টোভাই।

বাদশা নিজেও জানতেন, তৈমুরের সাম্রাজ্য অস্তাচলের পথে চলেছে। তাই কী করবেন, ভেবে উঠতে পারতেন না। রোজ দরবারে এসে বসতেন। কেন? তিনি নিজেই জানতেন না। কী হবে দরবার বসিয়ে? কিছুই তো তাঁর হাতে নেই। অন্য সকলের সঙ্গে আমাকেও রোজ হাজিরা দিতে হত। জাঁহাপনা কোনও গজল লিখলে সংশোধন করে দেওয়াই আমার কাজ। দরবারে যে-যার মতো গুলতানি করত। বাদশা হয়তো হঠাৎ একটা শের বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্বরে 'কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ,' 'মারহাব্বা, মারহাব্বা'। এককে সময় বাদশা ঘুমিয়ে পড়তেন। আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকতুম, কখন তাঁর ঘুম ভাঙবে, কখন তিনি আমাদের ছুটি দেবেন।

একদিন হঠাৎ বললেন, 'কাল সকালে সালিমগড়ে চলে আসুন উস্তাদজি।'

—জি হুজুর। কিন্তু কেন?

—পতঙ্গবাজি হবে। যমুনার তীরে পতঙ্গবাজির মজাই আলাদা।

—আপনি ঘুড়ি ওড়াবেন?

—অনেকদিন ওড়াই না, তাই সাধ হল।

পরদিন সকালে সালিমগড়ে হাজিরা দিতে হল। দুপুর পর্যন্ত বাদশার পতঙ্গবাজি দেখে বাড়িতে ফিরে খাওয়াদাওয়া করে আবার যেতে হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাদশার ঘুড়ি ওড়ানো দেখে যেতে হবে। ঘুড়ি ওড়ানো শেষ করে বাদশার এবার অন্য আবদার। পতঙ্গবাজি নিয়ে একটা শের তাঁর জন্য লিখে দিতে হবে। তক্ষুনি মুখে-মুখে বলে দিলুম। বাদশা খুশ আর আমি একটা গাধার মতো ধুঁকতে-ধুঁকতে খোঁয়াড়ে ফিরে এলুম। মান্টোভাই, আমি দিনে দিনে বুঝেছি, কবির জীবন বলে আসলে কিছু হয় না, আমরা সবাই চাকরবাকরের মতোই বেঁচে থাকি। কবি কুর্তা-পায়জামা পরে, চুলে টেরি কাটে, দাড়িতে মেহেন্দি লাগায়, আতরের খুশবু জড়িয়ে নেয় শরীরে, তবু সব কিছু পেরিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ঘামের গন্ধ—ক্রীতদাসের নিঃশ্বাস। সবাই অবশ্য তা বুঝতে পারে না। ক্ষমতার সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি করে নিজেকেও ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করে। আমি বলি, ওহে কবি, ক্ষমতার সতরঞ্চে তুমি একটা বোড়ে মাত্র।

তাই মজা করো, হ্যাঁ, মান্টোভাই, আপনি একমাত্র যা পারেন তা ক্ষমতাকে নিয়ে মজা করা। সব ক্ষমতাকে শুধু মজা দিয়ে হাস্যকর করে তুলতে হবে। আপনি যদি ভাবেন, এক ক্ষমতা থেকে অন্য ক্ষমতার কাছে গিয়ে আপনি সম্মান পাবেন, তা শুধুই মরীচিকা দেখা। ক্ষমতা শুধু আপনাকে ব্যবহার করবে, প্রয়োজন ফুরোলে লাথি মেরে নর্দমায় ফেলে দেবে। তাই কবিকে তার প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, হয়তো কোনও একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্য। তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতরে চলে যাবেন—শহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার, নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর; সেই কোন আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমার নিস্তব্ধ কোনও অদিতির কাছে।

একজন শাসক যখন পঙ্গু হয়ে যায় বা রাজ্যশাসনের যোগ্যতা যখন তার থাকে না, তখন সে কী করে জানেন, মান্টোভাই? সে তখন বিরক্তিকর কবিতা লেখে, মুশায়েরার আয়োজন করে, ঘুড়ি ওড়ায়, হাতির পিঠে চেপে শোভাযাত্রা বার করে। আমাদের বাদশাহেরও এছাড়া আর কিছু করার ছিল না। মোসায়েবের দল তাঁকে ঘিরে থাকত। বাদশাহের মুখ থেকে কোনও কথা বেরোলেই তারা গদগদ হয়ে 'হায়! হায়!' করে উঠত। আমি চুপচাপ বসে দেখতুম, ইতিহাসের কিতাবটাকে উঁইপোকারা কীভাবে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। ইতিহাস বলতে কি সত্যিই কিছু আর থাকে? পথের ধুলোয় ছড়িয়ে থাকে কিছু কিস্‌সা।

কাল্লু একদিন কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল এক দস্তানগোকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চেপে ধরে বললুম, 'মিঞা, আজ আমার সঙ্গে দরবারে চলো'।

—দরবার? কোন দরবার?

—বাদশার দরবার।

—মাফ করুন হুজুর। আমি কি দরবারে যাওয়ার লোক?

—আমি তো তোমাকে নিয়ে যাব।

—দরবারে আমার কী কাজ, হুজুর?

—বাদশাকে দস্তান শোনাবে।

—জাঁহাপনা দস্তান শোনেন?

—কেন শুনবেন না? বাদশার জীবনটাই তো এক আজিব দস্তান।

জাঁহাপনা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ আবার কাকে ধরে নিয়ে এলেন উস্তাদজি?'

—দস্তান শুনতে ভালবাসেন তো জাঁহাপনা?

—জরুর। কার বলা দস্তান আপনি শোনাবেন, মিঞা?

—মওলা রুমির হুজুর।

—বহুৎ খুব।

বাদশা গড়গড়ায় মৌজ করে টান দিতে শুরু করলেন।

—হুজুর, কিস্‌সাটা এক ইঁদুর আর উটের।

—মানুষ নেই?

—না, হুজুর। তবে ইঁদুর আর উটও তো একরকম মানুষ হুজুর।

—মতলব?

—হুজুর, কোনও মানুষের মধ্যে ইঁদুর লুকিয়ে থাকে, আবার কারও মধ্যে উট।

—শাবাস। আপনি কিস্‌সা শুরু করুন।

—হুজুর, এমন ইঁদুর খুব একটা দেখা যায় না। নিজেকে মনে করত একেবারে শাহেনশা।

—শাহেনশা? জাহাঁপনা হাসতে লাগলেন।—ইঁদুরও নিজেকে শাহেনশা মনে করে?

—কেন করবে না বলুন? অন্য ইঁদুররা যে-কাজ করার কথা ভাবতেও পারত না, এই ইঁদুরটা তা বুক ফুলিয়ে করত।

জাঁহাপনা হা-হা করে হেসে উঠলেন।—ইঁদুরেরও বুক ফোলে, মিঞা?

—হুজুর, আশমান থেকে যদি দেখেন, আমরাও তো একেকটা ইঁদুর। আমাদের সিনা ফোলে না?

—বাজে কথা বাদ দাও। কিস্‌সাটা বলো শুনি।

—ওইটুকুন ইঁদুর হলে কী হবে, মনে মনে সে নিজেকে সিংহ ভাবত, হুজুর। বড় বড় বিপদের মুখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারপর বুদ্ধির জোরে ঠিক বেরিয়ে আসত। অন্য ইঁদুরেরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। একদিন রাতে মরুভূমির পথে বাড়িতে ফিরছিল ইঁদুরটা। মরুভূমিতে একটা উট ঘুমিয়েছিল হুজুর। উটের গলায় বাঁধা দড়িতে জড়িয়ে আটকে গেল সে। তবে ইঁদুরটা তো খুব বুদ্ধিমান। নানা কসরত করে দড়ির ফাঁস থেকে বেরিয়ে এল।

—তারপর?

—অতি বুদ্ধিমানের মাথায় বদ বুদ্ধি খেলে হুজুর। দড়ির শেষ প্রান্ত ধরে ইঁদুরটা টানতে লাগল। উটের গেল ঘুম ভেঙে। ইঁদুরের পিছন পিছন সে এগিয়ে চলল। ইঁদুর তখন মনে মনে ভাবছে, 'একটা উট আমার পিছনে পিছনে আসছে। সবাই দেখে তাজ্জব হয়ে যাবে।' যেতে যেতে পথে পড়ল একটা নদী। তার স্রোত সবসময় ফুঁসছে। ইঁদুর নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কীভাবে পার হব এই অকূলবারিধি?

—তা কী করল সে? জাঁহাপনা জিজ্ঞেস করলেন।

—হুজুর, সব বুদ্ধিরই একটা শেষ আছে। ইঁদুর তো ভেবেই চলেছে। তখন উট বলল, 'তোমার মতো বুদ্ধিমান ইঁদুর তো নেই। দাঁড়িয়ে আছ কেন ভায়া? নদী পেরিয়ে আমাকে ওপারে নিয়ে চলো।' ইঁদুর বলল, 'বাজে কথা বোলো না। এ নদী বড় ভয়ঙ্কর। নামলেই আমরা ডুবে যাব।' উট তখন নদীতে গিয়ে নামল। ইঁদুরকে ডেকে বলল, 'যত গভীর ভাবছ, তা কিন্তু নয়। দেখো না, জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে। ভয় পাওয়ার কী আছে?'

—ঠিকই তো। জাহাঁপনা গড়গড়া টানতে টানতে বললেন।

—ইঁদুর বলল, আচ্ছা বুদ্ধু তো তুমি। নদীর জল তোমার হাঁটু অব্দি, কিন্তু আমি তো সেখানে ডুবে যাব।

—কেন? তোমার মতো বুদ্ধিমান ক'জন আছে? বুদ্ধি আর সাহসই তো তোমাকে বাঁচিয়ে দেবে। জলে নেমে পড়ো। আমি তোমার পিছন পিছন যাবো।

—তারপর?

—ইঁদুর ভাবল, এই হাঁদা উটের কাছে সে ছোট হবে? মুখে দড়ি নিয়ে সে নদীতে নামল। ভয়ঙ্কর স্রোতের ঝাপটা খেতে খেতে প্রায় আধমরা হয়ে সে ওপারে গিয়ে পৌঁছল। উটের পায়ের কাছে সে তখন কাতরাচ্ছে। উট বলল, 'ইঁদুরভায়া নিজেকে সিংহ মনে কোরো না। তোমার চেয়ে যারা বেশি দূর দেখতে পায়, তাদেরও বিশ্বাস কোরো। অতি বুদ্ধি একদিন তোমাকে ডোবাবে। এত দীর্ঘ পথ যাওয়া আমার কাছে সহজ। আমার কুঁজের ওপর উঠে বোসো, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

—তারপর?

—হুজুর, এরপর তো মওলা রুমি আর কিছু বলেননি।

—উস্তাদজি এই কিস্‌সার মানে কী? জাহাঁপনা আমার দিকে তাকালেন।

আমি অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে হাসছিলুম। মওলা তো কিস্‌সাটা বলেছেন মুর্শিদের ওপর বিশ্বাস রাখার কথা বোঝাতে। কিন্তু আর একটা অর্থও তো আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। ইঁদুররা কখনও কখনও কীভাবে শাহেনশা হয়ে উঠতে চায়। আমি বললুম, 'কিস্‌সা তো আমরা শুনি মজা পাওয়ার জন্য জাহাঁপনা। আপনি মজা পেয়েছেন তো হুজুর?'

কীভাবে, কত ভাবে মজা লুটবেন, তার বাইরে আর কিছুই ভাবতেন না জাহাঁপনা। প্রায়ই চলে যেতেন মেহরৌলির জাফর মহলে। মহলটা বানিয়েছিলেন তাঁর বাবা। বাদশা সেই মহলকে নিজের মতো করে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়েছিলেন। শিকার, মৌজমস্তি, আনন্দের ফোয়ারা—এরই জন্য জাফর মহল। অথচ ১৮৫৪-তেই ইংরেজরা জানিয়ে দিয়েছে বাদশার মৃত্যুর পর আর কেউ কেল্লায় থাকতে পারবে না;

কুতুব মিনারের কাছে কোনও মহলে চলে যেতে হবে তাদের। বাদশা দেখেও দেখছিলেন না, তৈমুরে বংশধরদের কীভাবে মুছে দিতে চাইছে ব্রিটিশ। তখনও কেল্লার ভিতর মাঝে মাঝে গজলের আসর বসত, মাঝে মাঝে আমি যেতুম, আর অন্তঃসারশূন্য মুশায়েরায় বসে বুঝতে পারতুম, খোদা যে-কোনও মুহূর্তে এই নওটঙ্কি মুছে দেবেন। মীর সাবের একটা শের বারবার মনে পড়ত—

শহর-এ দিল এক মুদ্দৎ হুয়া বসা গমোঁমেঁ
আখির উজাড় দেনা উসকো করার পায়া।
(দুঃখের মধ্যেই এক যুগ আগে এই হৃদয়নগরীর পত্তন হয়েছিল,
শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, একেও উজাড় করে দেওয়া হবে।)

কয়েকটা দিন একটু ভালভাবে কাটছিল, ভাইজানেরা; কিন্তু খোদা তো আমাকে রহম করবেন না। ১৮৫৬-তে আমার আশমানে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। বাদশার উত্তরাধিকারী, আমার শাগির্দ ফখরউদ্দিনের মৃত্যু হল। আর ইংরেজরা ঘোষণা করল, বাদশার পরে যিনি তখ্‌তে বসবেন, তাঁকে আর বাদশা বলা হবে না, তিনি হবেন শুধু শাহজাদা। বুঝতে পারলুম, শুধু তৈমুরের বংশ নয়, আমার মতো সভাকবিদের দিনও শেষ হয়ে আসছে। এর চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য, ওই বছরেই লখনউতে নবাবি আমল শেষ হয়ে গেল। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর কাছ থেকে বছরে পাঁচশো টাকা ভাতা পেতুম আমি, সে তো জানেনই, মান্টোভাই। বন্ধ হয়ে গেল সেই ভাতা। লখনউ ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হল নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে। নবাব যদি কাউকে বলতে হয়, মান্টোভাই, তবে তিনি ওয়াজিদ আলি শাহ। তাঁর তখল্লুস ছিল কায়সার। শুধু গজলই লেখেননি, কত ঠুংরিও যে লিখেছেন। নিজে ভাল গানও গাইতে পারতেন। আর একটা খুব সুন্দর নাম নিয়েছিলেন নবাব। আখতারপিয়া। ওই নামেও অনেক গজল, ঠুংরি লিখেছেন। ভৈরবী রাগে বাঁধা তাঁর ঠুংরি 'বাবুল মোরা নৈহর ছুটো হি যায়' শুনলে তো চোখের জল ধরে রাখা যায় না। নির্বাসনের যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে ঠুংরির প্রতিটি শব্দ। লখনউ ছেড়ে যাওয়ার সময় লিখেছিলেন :

দর্‌ ব দীওয়ার পর হস্‌রৎ সে নজর করতে হ্যাঁয়।
রুখ্‌সৎ অ্যায় অহল্‌-এ বতন্‌, হম তো সফর করতে হ্যাঁয়।
(দরজা আর দেওয়ালগুলোর দিকে অতৃপ্তনয়নে দেখছি
বিদায় হে দেশবাসী, আমি যে পথ চলছি।)

আমি তো একটা রাস্তার কুকুর। বাদশাহি আমলের শোকে ডুবে থাকলে তো আমার চলবে না। টাকা দরকার, নইলে খাব কী? রামপুরের নবাব ইউসুফ আলিকে চিঠি লিখলুম। একসময় তিনি আমার কাছে ফারসি শিখেছিলেন, কবিতা লেখেন, আমার গজলের ভক্ত। তিনি জানালেন, আমাকে তাঁর উস্তাদ হিসাবে বরণ করতে চান তিনি। আমি তো এইটুকুই চাইছিলুম। রামপুরের নবাবের উস্তাদ হওয়া মানেই কিছু

টাকা পাওয়া। মান্টোভাই, আমার তখন শুধু খেয়ে-পরে থাকার জন্য টাকার দরকার। কবিতার কথা আমি আর কিছু ভাবতুম না; সেসব দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে।

শুধু টাকার জন্যই মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি ফারসিতে একটা কসীদা লিখে ফেললুম। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলুম লন্ডনে পাঠানোর জন্য। সঙ্গে একটা চিঠিও দিলুম, মহারানি যেন এই সামান্য কবিকে একটু দয়া করেন। গদরের বছরের গোড়াতেই উত্তর পেলুম। আমাকে জানানো হল, যথাযথ তদন্তের পর খেতাব ও খিলাত দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু তারপর আর কিছু হয়নি। আমি কে? মহারানির কাছে তো ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা একটা মুখ মাত্র।

মান্টোভাই, আজ আপনাদের কাছে স্বীকার করতে কোনও লজ্জা নেই, আমি সত্যিই একটা উজবুক ছিলুম। জীবনে সবকিছুই তো আমার ভেস্তে গেছে, তবু প্রত্যেকবার ভাবতুম, এবার একটা কিছু হবেই, খোদা কি শুধু আমাকে মার খাওয়ানোর জন্য এই দুনিয়াতে এনেছেন? সারা জীবন আশার ফাঁদেই আটকে রইলুম।

তাব লায়ে-হী বনেগী, গালিব,<br>
বাকেয়া সখ্‌ৎ হৈ অওর জান অজীজ।।<br>
(পেরে উঠতেই হবে, গালিব,<br>
অবস্থা সঙ্গীন এবং প্রাণ প্রিয়।।)

তবু তারই মাঝে কয়েকদিনের জন্য আবার বসন্তের বাতাস এসেছিল, মান্টোভাই। আমি অবশ্য তাকে চোখে কখনও দেখিনি। সে আমার শাগির্দ হয়েছিল। তার শের শুনে মনে হত :

দেখ্‌না তক্‌রীর কী লজ্জত্‌। কে যো উসনে কহা<br>
ম্যায়নে ইয়ে জানা কে গোয়া য়ে ভি মেরে দিল মে হ্যায়।<br>
(দেখো তার কথার ইন্দ্রজাল, সে যা বলল<br>
আমার মনে হল এও তো আমার হৃদয়ে ছিল।)

আমি তার তখল্লুস দিয়েছিলুম 'তর্ক'। শাহজাহানাবাদের অভিজাত বংশের নারী। জাতিতে তুর্কি, তার পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন বুখারা থেকে। খুবই কম বয়সে শওহরকে হারিয়েছিল তর্ক। কবিতার কাছেই আশ্রয় খুঁজেছিল সে। তার মামা ওর লেখা শেরগুলো আমার কাছে নিয়ে আসতেন। আমি ওর লেখা অক্ষরগুলির শরীরে হাত বোলাতুম; এভাবেই ওকে স্পর্শ করতে পেরেছিলুম। কখনও কখনও ওদের হাভেলিতেও গিয়েছি। ও থাকত সবসময় পর্দার আড়ালে। ওইরকম পরিবারে তো বাইরের পুরুষের সামনে মেয়েরা আসতে পারে না। মান্টোভাই, সত্যি বলতে কী, আমি তর্কের কণ্ঠস্বর শুনতেই যেতুম। যেন সাইপ্রাস গাছের মধ্য দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। কী স্পষ্ট, কাটাকাটা উচ্চারণ। আর ওর গজলে ছিল কল্পনার অন্য এক উল্লাস। আপনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি মনে করি, নারীর কল্পনালোক

পুরুষের চেয়ে আলাদা। তর্ক আমাকে এক গোপন আতরের মতো টানত, যার গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোনওদিন ছোঁয়া যায় না।

দুখ অব ফিরাক কা হমসে সহা নহীঁ জাতা
ফির উসসে জুল্‌ম য়হ হ্যয় কুছ কহা নহীঁ জাতা।।
(বিরহের জ্বালা আর তো সইতে পারছি না,
আরও যন্ত্রণা এই যে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছি না।।)

আতরের খুশবুটা কবে যে হারিয়ে গেল বুঝতেই পারলুম না। একদিন ওদের হাভেলিতে গিয়ে শুনলুম, তর্ক আর দেখা করবে না। ওর মামাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে মিঞাসাব? ওনার কি শরীর খারাপ?'

—না মির্জাসাব। ও তো আর গজল লেখে না।

—কেন?

—সারাদিন শুধু কোরান পড়ে। ঘর থেকেও বেরোয় না।

—ইয়া আল্লা! অমন শায়রা গজল লেখা ছেড়ে দিলেন! কত বড় কবি হতে পারতেন।

—মির্জাসাব, আমাদের সমাজে মেয়েদের কতটুকু মূল্য বলুন! তার ওপর কবিতা লেখে। তাকে সবাই পাগল ভাবে।

—আপনারাও তাই ভাবেন?

—না। কিন্তু ও যে কেন এভাবে গুটিয়ে গেল, আমরা কেউ বুঝতেই পারলাম না।

—একবার ওনার সঙ্গে দেখা করা যায় না?

—না মির্জাসাব। ও জানিয়ে দিয়েছে, আপনি যেন আর কখনও না আসেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, নিজের লেখা গজলগুলো নিজের হাতে ছিঁড়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

সেদিন ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। যমুনার তীরে গিয়ে বসে রইলুম। কখন সন্ধ্যা নেমেছে, বুঝতেই পারিনি। অন্ধকারে যমুনার স্রোত নিজের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে। তখন তাকে দেখতে পেলুম। উৎকণ্ঠিতা নায়িকাকে। কুঞ্জবনে ঝরাপাতার আসনে বসে আছে সে প্রেমিকের অপেক্ষায়। ফুলভারানত গাছগুলি তাকে ঘিরে আছে, যেন বলছে, অমন উৎকণ্ঠিত হয়ো না রাধিকা, সে আসবে, আসবেই তোমার শ্যামরায়। নায়িকার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝরনা। সে-ও যেন বলে যাচ্ছে, আর একটু অপেক্ষা করো, ওই তো তাঁর বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে। ঝরনায় জল খাচ্ছে একটি ত্রস্ত হরিণী। আর গাছেদের পিছন থেকে এক হরিণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে নায়িকার দিকে। আমি বুঝতে পারলুম, তর্ক কেন গজল লেখা ছেড়ে দিল। গজলের এক-একটা শব্দের ভার সে আর সহ্য করতে পারছিল না। পর্দা সরিয়ে সে তো কোনও বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে না।

অব ম্যায় হুঁ অওর মাতম্ এক শহর-এ-আরজু
তোড়া যো তুনে আইনা, তিম্সাল্দার থা।
(এখন আমি আছি আর শোক আছে এক আশান্বিত শহরে,
যে আয়না তোমার হাতে বিচূর্ণ হল তাতে ছবি ছিল অসংখ্য।)
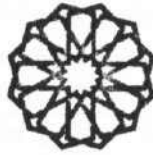
ঈমাঁ মুঝে রোকে হৈ তো খীঁচে হৈ মুঝে কুফ্র।
কাবহ্ মেরে পীছে হৈ, কলীমা মেরে আগে।।
(ধর্মবিশ্বাস আমাকে ধরে রাখে, অবিশ্বাস আমাকে টানে,
আমার পিছনে রয়েছে কাবা, সামনে প্রতিমার বেদি।।)

আমি যে অশ্লীল লেখক, তার বড় প্রমাণ হিসেবে আমার চারপাশের সব সচ্চা আদমিরা কী বলেছিল, জানেন মির্জাসাব? তাদের একটাই প্রশ্ন, আমার গল্পে বারবার বেশ্যাপল্লি আর বেশ্যারা ঘুরে-ফিরে আসে কেন? বেশ্যা কী করে গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে পারে? প্রশ্নগুলো কারা তুলেছে? তারা সব প্রগতিশীল, সমাজের নিচুতলার মানুষদের নিয়ে গল্প লেখে ব'লে গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, মির্জাসাব, এইসব লোকের কাছেও বেশ্যারা নর্দমার পোকার চেয়েও খারাপ। অথচ এরা অনেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে লালবাতি এলাকায় গিয়েছে। আমি যে গিয়েছি, তা নিয়ে রাখঢাক করিনি। চারপাশের বর্ণহীন মানুষদের মাঝে ওই পরিত্যক্ত রংচং-মাখা মেয়েরা, তাদের দালালরা, ও-পাড়ার ফুলওয়ালা, কাবাবওয়ালারা—ওদের অনেক বেশি জীবন্ত মনে হত আমার। ওই মেয়েরা যাকে একবার ভালবাসে, তাকে পুরোপুরি পাওয়ার জন্য খুন করেও ফেলতে পারে। আমাদের সমাজের বাইরে লালবাতির দুনিয়াটা যেন এক মহাকাব্য। সৌগন্ধী, সুলতানা, নেস্তি, বিসমিল্লা, মাহমুদা, জিনতদের কথা আমি বানিয়ে-বানিয়ে লিখিনি; দিল্লি, লাহোর, বম্বের বেশ্যাপল্লিতেই ওরা বেঁচে ছিল একদিন।

মাহমুদাবাদের রাজা সাহেবের সঙ্গে একদিন খুব তর্ক হয়েছিল আমার। তাঁরও একই বক্তব্য, 'এইসব নোংরা মেয়েছেলেদের মধ্যে তুমি কী দেখতে পাও, মান্টো? যাও ফুর্তি করতে, তারপর ওদের নিয়ে বড় বড় কথা লেখো।'

—ওদের নিয়ে লিখে আমি কী গুনাহ্ করেছি বলতে পারেন?

—সাহিত্য তো নোংরা জগৎ তুলে আনার জন্য নয়।

—তা হলে সাহিত্য লেখা হয় কেন রাজাসাহেব?

—আমাদের স্বপ্নের কথা তুলে ধরার জন্য।

আমি হেসে ফেলি।—এই আমাদের মধ্যে 'ওরা' নেই? ওদের স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই? ওদের স্বপ্নের কথা বলার কেউ থাকবে না? আমরা, ওরা-র খেলাটা খুব মজার রাজা সাহেব। কমিউনিস্টরা এ-খেলায় খুব ওস্তাদ।

—তুমি কমিউনিজ্‌মকে ঘেন্না করো?

—জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরাই সবচেয়ে আগে আমাকে অশ্লীল হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

—তুমি একের পর এক গল্পে বেশ্যাদের কথা লিখবে আর অশ্লীল বলবে না তোমাকে?

—বেশ্যাদের কথা বলা যদি অশ্লীল হয়, তবে তাদের অস্তিত্বও অশ্লীল। তা হলে সেই অশ্লীলতা টিকে আছে কেন? বেশ্যাদের কথা বলা যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে এই পেশাকেও নিষিদ্ধ করতে হবে, রাজাসাহব। বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করুন, তা হলে বেশ্যাদের কথা লেখার জন্য কোনও মান্টোর জন্ম হবে না। আমরা চাষি, মজুর, নাপিত, ধোপা, চোর, ডাকাতদের কথা বলতে পারি। জিন-পরীদের নিয়ে গল্প ফাঁদতে পারি। তাহলে বেশ্যাদের কথা কেন বলতে পারব না?

—বলো, বলো, যত খুশি বলো। তোমার লেখাও কিচর ছাড়া আর কিছু হবে না।

—আমি তো তা-ই চাই রাজাসাহেব।

—মানে?

—এই সমাজের সব নোংরা যেন আমার লেখায় জমে ওঠে। আপনারা যেন দেখতে পান, সাফসুরতির আড়ালে আসলে কী রয়ে গেছে।

—তুমি কি নিজেকে পয়গম্বর মনে করো?

—না। এই দুনিয়ায় লেখক-কবি সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী। তাকে যে কেউ লাথি মেরে যেতে পারে, রাজাসাহেব। তার হাতে তো কোনও ক্ষমতা নেই। সে শুধু যা দেখেছে, অনুভব করেছে, সে-কথাই সৎভাবে লিখে গেছে। না, এ-সব কথা আপনাকে আমি বলতে চাইছি না। কেননা, আপনি বুঝবেন না।

—যা বুঝব, তা-ই বলো তা হলে।

—বেশ্যাপল্লি আসলে কী জানেন?

—কী? বেশ্যাপল্লি তো বেশ্যাপল্লিই। তবে মান্টোর নতুন ভাষ্য শোনা যাক।

—একটা পচা-গলা মৃতদেহ। এই সমাজ মুর্দাটাকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। যতদিন না মরাটাকে কবর দেওয়া হবে, ততদিন মুর্দাটাকে নিয়ে কথাও চলবে,

রাজাসাহেব। তবে কি জানেন, মরাটা যতই পচাগলা হোক, যতই বীভৎস হোক, তার মুখের দিকে তো কেউ-না-কেউ তাকাবেই। তাকালে দোষই বা কী বলুন? মুর্দাটার সঙ্গে আমাদের কি কোনও সম্পর্ক নেই? রাজাসাহেব, একবার ভাবুন তো, আমরাই কি ওকে মেরে ফেলিনি? শুধু তার মুখের দিকে তাকালেই দোষ? তা হলেই মান্টোকে অশ্লীল বলে দেওয়া যায়?

—মান্টো, গল্পলেখক হিসাবে তুমি সেরা, আমি স্বীকার করি। ওই জগৎটাকে বাদ দিতে পারো না?

—না রাজাসাহেব। তা হলে নেস্তির গল্পটা আজ আপনাকে শোনাই।

—নেস্তি কে?

—একটা বেশ্যা। ও কীভাবে বেশ্যা হয়েছিল, সেই কিস্‌সাটা শুনুন।

—বলো। রাজাসাহেব হাসলেন।—কিস্‌সা ফাঁদায় তো তোমার জুড়ি নেই।

—এ কিস্‌সার শুরুতে নেস্তি কোথাও ছিল না, রাজাসাহেব। কোচোয়ান আবুকে নিয়েই গল্পের শুরুয়াত। আবু খুবই ভাল মানুষ, রাজাসাহেব। 'ভাল' শব্দে বাগানের খুশবু আছে, মনে রাখবেন। সে ছিল খুবই সৌখিন, আর তার ঘোড়ার গাড়ি শহরে এক নম্বর। গাড়িটাকে সে মনের মতো করে সাজিয়েছিল। যে-কোনও লোককে সে গাড়িতে তুলতই না। সব যাত্রীই ছিল নিয়মিত খদ্দের। অন্য কোচোয়ানের মতো নেশায় আসক্তি ছিল না আবুর; ওর নেশা ছিল ভাল জামাকাপড়ের প্রতি। আবুর ঘোড়ার গাড়ি যখন রাস্তা দিয়ে চলত, সবাই মুখ বেঁকিয়ে বলত, 'নবাবজাদা চলেছে'। সে-কথা শুনে আবুর যেমন বুক ফুলত, আবুর ঘোড়া চিন্নিরও গতি বেড়ে যেত। ঘোড়ার জিন আবুর হাতে থাকত ঠিকই, তবে চিন্নি আবুর মেজাজমর্জি এতটাই বুঝত যে ওকে কখনও চাবুক মারতে হত না। যেন আবু আর চিন্নি আলাদা কেউ নয়, রাজাসাহেব। অন্য কোচোয়ানরা কেউ কেউ আবুকে নকল করার চেষ্টা করত, কিন্তু ওর মতো রুচি তো তাদের ছিল না।

তো আবু একদিন দুপুরবেলা গাছের ছায়ার নীচে ওর গাড়িতে শুয়েছিল। ঘুমে চোখ বুজে এসেছে। এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর শুনে আবু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবু ধড়মড় করে উঠে বসল। মেয়েটির রূপ তিরের মতো তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে যে। ষোলো-সতেরো বছরের কালো মেয়েটি যৌবনের উদ্ভাসে ঝলমল করছে।

—কী চাই? আবু আমতা-আমতা করে বলে। যেন স্বপ্ন রাজাসাহেব, কোনও পরি জন্নত থেকে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—টেশন যেতে কত নেবে?

আবু হেসে বলল, 'এক পয়সাও না।'

মেয়েটা আবারও জিজ্ঞেস করে, 'টেশন যেতে কত নেবে, বলো না।'

—তোমার কাছ থেকে পয়সা নেব? উঠে বসো।

—তার মানে? মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে যায়।

—আরে ওঠোই না। তোমার যা ইচ্ছে হবে দিও।

মেয়েটা আবুর গাড়ির পিছনে উঠে বসে।—তাড়াতাড়ি চলো।

—এত তাড়া কিসের?

—তুমি—সে তুমি—। মেয়েটা কথা শেষ না-করেই থেমে যায়।

আবুর গাড়ি চলতে থাকে। চিন্নির খুরের ছন্দে যেন আজ অন্য রহস্য। পিছনেই বসে আছে মেয়েটা। আবু বারবার ফিরে তাকাতে গিয়েও পারে না। মেয়েটা একসময় বলে, 'টেশন এখনও এল না?'

—আসবে গো। আবু হেসে বলে।—তোমার আমার টেশন তো একই জায়গায়।

—মতলব?

—তুমি তো অত বোকা নও, জানেমন। তোমার আমার টেশন একই জায়গায়। তোমাকে দেখেই বুঝেছি। জান কসম, আমি তোমার বান্দা হয়ে গেছি।

মেয়েটা কোনও উত্তর দেয় না। গায়ের চাদর আরও ভাল করে জড়িয়ে নেয়।

আবু জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছ জানেমন?'

মেয়েটা তবু কোনও কথা বলে না। আবু হঠাৎ গাড়ি থামায়। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পিছনে মেয়েটির পাশে এসে বসে। তার হাত চেপে ধরে বলে, 'জানেমন, তোমার লাগাম আমার হাতে দাও।'

—খুব হয়েছে। মেয়েটা মাথা নিচু করে বলে।

আবু মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটা প্রথমে বাধা দিলেও শান্ত হয়ে যায়। আবু বলতে থাকে, 'এই গাড়ি আর ঘোড়াকে আমি আমার জানের চেয়েও ভালবাসি। খোদা কসম, তোমার জন্য ওদেরও আমি বেচে দিতে পারি। অনেক সোনার গয়না বানিয়ে দেব, জানেমন। বলো—বলো—আমার সঙ্গে থাকবে? না হলে এখনই—তোমার সামনে—গলার নলি কেটে ফেলব।'

মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আবু একসময় বিড়বিড় করে বলে, 'আজ যে কী হয়েছে আমার! চলো, তোমাকে টেশনে নামিয়ে দিয়ে আসি।'

—না। তুমি আমাকে ছুঁয়েছ।

—মাফ করো। আমি ভুল করেছি।

—ভুলের কোনও ইমান নেই? মেয়েটা ফুঁসে ওঠে।

আবু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের বুকে হাত রেখে বলে, 'তোমার জন্য জান দিতে পারি।'

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'তা হলে আমার হাত ধরো।'

আবু তার হাত চেপে ধরে বলে, 'আজ থেকে আমি তোমার বান্দা।'

ওই মেয়েটির নামই নেস্তি, রাজাসাহেব। নেস্তি এসেছিল গুজরাত থেকে; এক মুচির মেয়ে। বাড়ির লোকদের ছেড়ে নেস্তি আবুর কাছেই থেকে গেল। পরদিন ওদের শাদি হল। না, ঘোড়া বা গাড়ি, কিছুই আবু বিক্রি করেনি, জমানো টাকা দিয়ে নেস্তিকে সিল্কের কুর্তা-পায়জামা, কানের দুল কিনে দিয়েছিল। আবু নেস্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাঝে-মাঝেই বলত, 'তুম মেরি নবাবজাদি হো'।

মাসখানেক পরে পুলিশ হঠাৎ অপহরণের অভিযোগে আবুকে গ্রেফতার করল। নেস্তি সবসময় ওর পাশে ছিল। আদালতের রায়ে দু'বছরের জেল হল আবুর। নেস্তি আবুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'বাবা-মা'র কাছে আমি আর যাব না। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, মিঞা।'

—ভাল থেকো। গাড়ি আমি দিনোকে চালাতে দিয়েছি। ওর কাছ থেকে রোজকার টাকা গুনে নিও, বিবিজান।

বাবা-মা অনেক বোঝানো সত্ত্বেও নেস্তি তাদের কাছে ফিরে গেল না, রাজাসাহেব। অচেনা শহরে আবুর ফিরে আসার অপেক্ষায় সে একাই রয়ে গেল। দিনো তাকে রোজ সন্ধ্যায় পাঁচ টাকা করে দিয়ে যেত। নেস্তির তাতে ভাল ভাবেই চলে যেত। সপ্তাহে একদিন জেলে কিছুক্ষণের জন্য আবুর সঙ্গে দেখার করার সুযোগ হত। আবুর জন্য সে ভাল খাবার, ফল নিয়ে যেত।

আবু একদিন দেখল, নেস্তির কানে দুল নেই।—তোমার কানের দুল কোথায় গেল?

নেস্তি চোখ বড়-বড় করে দুই কানে হাত দিয়ে বলল, 'তাই তো। খেয়ালই করিনি। কোথায় যে পড়ে গেছে।'

—আমার জন্য খাবারদাবার আনতে হবে না বিবিজান। আমি ঠিক আছি।

নেস্তি দেখতে পাচ্ছিল, আবুর শরীর দিনে-দিনে ভেঙে যাচ্ছে। শেষবার জেলে গিয়ে নেস্তি শক্তসমর্থ আবুর বদলে একটা কঙ্কালকে দেখতে পেল। নেস্তি ভাবল, ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখে আবু ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসলে রাজাসাহেব, আবুর ছিল টিবি রোগ। আবুর বাবা, দাদাও টিবিতেই মারা গিয়েছিল। জেলের হাসপাতালে শুয়ে নেস্তিকে আবু বলেছিল, 'এভাবে মারা যাব জানলে আমি তোমাকে শাদি করতাম না বিবিজান। আমাকে ক্ষমা করো। চিন্নি আর গাড়িটাকে যত্ন কোরো। ওরাই তোমাকে দেখবে। চিন্নিকে বোলো, আমি ওর কথা কখনও ভুলব না।'

নেস্তিকে শূন্য প্রান্তরে ফেলে রেখে আবু এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু নেস্তি ছিল অন্য ধাতের মেয়ে, রাজাসাহেব। এত বড় বেদনা নিয়েও সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকল। সারাদিন একা-একা ঘরে কেটে যায় আবুর কথা ভাবতে ভাবতে। সন্ধেয় দিনো আসে বরাদ্দের টাকা দিতে।

—ভয় পেয়ো না ভাবিজি। আবু আমার ভাইয়ের মতো ছিল। তোমার জন্য আমি যথাসাধ্য করব। একদিন দিনো বলল।

—খোদা যা করবেন—

—খোদা তো মানুষকে দিয়েই করান ভাবিজি। তুমি এভাবে মুখ কালো করে থেকো না। আমার ভাল লাগে না।

—কী করব দিনোভাই?

—ফির শাদি করো। আবু ভাইয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে নাকি?

—শাদি!

—তুমি যেদিন বলবে, আমি রাজি।

—দিনোভাই!

—কী হল?

নেস্তির ইচ্ছে হয়েছিল, লাথি মেরে দিনোকে ঘর থেকে বার করে দেয়। তা তো পারেনি, শুধু বলেছিল, 'আমি আর শাদি করব না, দিনোভাই।'

সেদিন থেকে দিনোর ব্যবহারও বদলে গেল। পাঁচ টাকার বদলে কোনওদিন চার, কোনওদিন তিন টাকা দিতে শুরু করল। নেস্তি জিজ্ঞেস করলে বলত, সওয়ারি পাওয়া যাচ্ছে না, আগের মতো আর রোজগার নেই। এরপর দিনো দু'তিনদিন পর পর এসে টাকা দিয়ে যেত। একদিন নেস্তি বলেই ফেলল, 'তোমাকে আর গাড়ি চালাতে হবে না দিনোভাই। যা করবার আমিই করব।'

নেস্তি এরপর দিনোর আর এক বন্ধুকে গাড়ি চালাতে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে সে-ও নেস্তিকে শাদি করার কথা বলল। নেস্তি তাকেও না বলল। এবার অচেনা এক কোচোয়ানকে সে গাড়ি চালাতে দিল। একরাতে লোকটা মাতাল হয়ে এসে নেস্তির হাত ধরে টানাটানি শুরু করল, রাজাসাহেব।

আট-দশদিন গাড়ি আর ঘোড়া পড়ে রইল। নেস্তি কী করবে, ভেবে পায় না। নিজের দিন গুজরানের খরচ, চিন্নির খাবার, গাড়ি রাখার জায়গার ভাড়া—এ-সব কোথা থেকে আসবে? সবাই তো এসে তাকে শুধু বিয়ে করতে চায়। নেস্তি বোঝে, উদ্দেশ্য তো তার সঙ্গে শোওয়া। বাইরে বেরোলে সবাই তার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে থাকে। একরাতে পাশের বাড়ির লোকটা পর্যন্ত এসে দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছিল, আর বলছিল, 'কত টাকা চাস, মাগী? কত টাকা পেলে দরজা খুলবি?'

একদিন হঠাৎই নেস্তির মনে হল, আচ্ছা, আমিই তো গাড়ি চালাতে পারি। আবুর সঙ্গে যখন সে বেড়াতে যেত, তখন মাঝে-মাঝে সে-ও গাড়ি চালিয়েছে। পথ-ঘাটও সে ভালই চেনে। তাহলে অসুবিধে কোথায়? মেয়েরা যদি মাটি কাটতে পারে, ভাড়া

বইতে পারে, ঘোড়ার গাড়িই বা চালাতে পারবে না কেন? বেশ কয়েকদিন ভাবার পর নেস্তি ঠিক করল, সে নিজেই গাড়ি চালাবে।

নেস্তিকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে কোচোয়ানদের চোখ তো কপালে উঠল। অনেকে মজা পেয়ে হাসতে শুরু করল। সবচেয়ে বয়স্ক কোচোয়ান এসে নেস্তিকে বোঝাল, ঘোড়ার গাড়ি চালানো মেয়েদের কাজ নয়। নেস্তি তার কথায় কান দিল না। চিন্নিকে আদর করে, আবুর সঙ্গে মনে-মনে কথা বলে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সারা শহরে হইহই পড়ে গেল। এক খুবসুরত জেনানা ঘোড়ার গাড়ি চালাচ্ছে। লোকজন অপেক্ষা করে থাকে, কখন নেস্তির গাড়ি আসবে। প্রথম দিকে পুরুষ যাত্রীদের গাড়িতে তুলত না সে; তারপর সেই লজ্জাটুকুও চলে গেল। গাড়ি চালিয়ে নেস্তি বেশ ভালই রোজগার করতে লাগল। ওর গাড়ি কখনও দাঁড়িয়ে থাকত না, রাজাসাহেব। পুরুষরা তো ওর গাড়িতে চড়ার জন্যই মুখিয়ে আছে। একটা মেয়ের কাঁধ, কোমর, বাহু, স্তন, নিতম্ব কিছু সময়ের জন্য চেখে দেখার পুরুষালি লোভ আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না রাজাসাহেব! নেস্তি তা বুঝতও। কিন্তু কী করবে সে? সম্মানজনক ভাবে খেয়েপরে থাকতে হবে তো তাকে। গাড়ি চালানোর সময় ও ঠিক করেই নিয়েছিল। সকালে সাতটা থেকে বারোটা, আর দুপুর দু'টো থেকে সন্ধে ছ'টা। নেস্তি এভাবে নিজের মতো করে বেঁচেছিল, রাজাসাহেব।

একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি থেকে নেস্তিকে ডেকে পাঠিয়ে জানানো হল, ওর গাড়ির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। কেন? মেয়েদের ঘোড়ার গাড়ি চালানোর নিয়ম নেই। নেস্তিও বলল, 'আমি তো চালাতে পারি, হুজুর। তা হলে অসুবিধে কোথায়?'

—আর চালাতে পারবে না।

—কেন হুজুর? মেয়েরা যদি সব কাজ করতে পারে, ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পারবে না? এই ঘোড়া আর গাড়ি আমার শওহরের। আমি কেন চালাতে পারব না? গাড়ি না-চালালে আমি খাবার কোথা থেকে পাব হুজুর?

মিউনিসিপ্যাল অফিসার কী বললেন জানেন?—বাজারে গিয়ে জায়গা খুঁজে নাও। তাতে অনেক রোজগার হবে।

নেস্তির মতো একটা মেয়ে এর কী উত্তর দেবে বলুন তো? ঘোড়া আর গাড়ি বেচে দিতে হল ওকে। আবুর কবরের সামনে গিয়ে ও বসেছিল। রাজাসাহেব, আমি হলফ করে বলছি, ওর চোখে তখন জল ছিল না, মরুভূমির মতোই ধূ-ধূ করছিল দুই চোখ। আবুর কবরে মাথা রেখে নেস্তি বলেছিল, 'ওরা আমাকে বাঁচতে দিল না। আমাকে ক্ষমা করো।'

পরদিন নেস্তি মাংসের বাজারে দরখাস্ত করল। হ্যাঁ, এখন থেকে প্রতিরাতে ও নিজের মাংস বিক্রি করবে। রাজাসাহেব, নেস্তির এই গল্পটাকে আমরা ইতিহাস থেকে মুছে দেব? তা হলে সব সাফসুরত থাকবে তো?

না, মির্জাসাব, আমার এই প্রশ্নের উত্তর রাজাসাহেব দেননি। কীই বা উত্তর দিতে পারতেন? তিনি কি কখনও সুলতানার মতো মেয়েকে দেখেছেন? 'কালি শালোয়ার' গল্পে আমি সুলতানার কথা লিখেছিলাম, ভাইজানেরা। একটা বেশ্যা, মহরমে পরবে বলে শুধু একটা কালো শালোয়ার পেতে চায়, এই সামান্য আকাঙ্ক্ষায় অশ্লীলতা কোথায় আমাকে বলতে পারেন? কিন্তু ওরা—সমাজের মাতব্বররা—খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করে; ওরা তো সম্পূর্ণ মানুষকে দেখতে পায় না; কয়েকটা শব্দ, কিছু মুহূর্তকে কাটাছেঁড়া করে; এরা কারা জানেন, মির্জাসাব? পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর বসে থাকে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর অধ্যাপক,—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি; বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি।

এরা কী করে সুলতানাকে বুঝবে বলুন? বেশ্যাপল্লির সেই ভাঙাচোরা বাড়িটার ব্যালকনিতে ও বিকেল শেষে এসে দাঁড়াত। সুলতানার ব্যালকনি থেকে দেখা যেত রেল ইয়ার্ড। রেললাইনের দিকে তাকিয়ে ও নিজের হাতের দিকে তাকাত। ফুলে-ওঠা নীল শিরাগুলো একেবারে রেললাইনের মতো মনে হত ওর। রেল ইয়ার্ডের মধ্যে ট্রেনের বগি আর ইঞ্জিনগুলো সবসময় আসছে আর যাচ্ছে; ইঞ্জিনগুলো ধোঁয়া উগরে সুলতানার সামনের আকাশটাকে কালো করে দিচ্ছে। অনেক সময় কোনও গাড়িকে একটা লাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, গাড়িটা নির্দিষ্ট লাইন ধরে চলতে শুরু করত আর সুলতানার মনে হত, তাকেও ওই গাড়িটার মতো একটা নির্দিষ্ট লাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সে চলছে তো চলছেই। এই চলায় তার কোনও হাত নেই। অন্য কয়েকজন মানুষ সুইচ টিপে-টিপে তাকে চালাবে। সে কোনওদিন জানতেও পারবে না, কোথায় সে চলেছে। তারপর একদিন গতি হারিয়ে যেখানে সে থেমে যাবে, সেই জায়গাটাও তার কাছে অচেনা।

এক অদ্ভুত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুলতানার। তার নাম শঙ্কর। মাঝে-মাঝেই তাকে দেখা যেত, রাস্তার ও-পারে সুলতানাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সুলতানার ব্যবসা জমছিল না, সারাদিন একা-একা কাটত। একদিন সে শঙ্করকে হাত নেড়ে ডেকেই ফেলল। শঙ্কর এমনভাবে এসে ঘরে বসল, যেন সে নয়, আসলে সুলতানাই খদ্দের। বেশ মজা লেগেছিল সুলতানার। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার জন্য কী করব, বলুন?'

—আমার জন্য? তার চেয়ে বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি? তুমিই তো আমাকে ডেকে আনলে।

সুলতানা তার কথায় অবাক হয়ে যায়।

শঙ্কর বলে চলে, 'বুঝতে পেরেছি। এবার আমার কথা শোনো। তুমি যা ভেবেছ, তা ঠিক নয়। আমি সেই [illegible] নই যে, এ-বাড়িতে ঢুকে কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে বেরিয়ে

যাব। আমারও মজুরি আছে, বুঝলে? ডাক্তার ডাকলে ফি দাও না? আমাকে ডাকলে আমারও মজুরি দিতে হবে।'

শঙ্করের কথা শুনে হতচকিত হয়েও সুলতানা হাসি চাপতে পারেনি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা, তোমার কী করা হয়?'

—তোমরা যা করো। শঙ্কর বলে।

—সেটা কী?

—তুমি কী করো?

—আমি...আমি...আমি কিছু করি না।

—আমিও কিছু করি না।

—এ-কথার কোনও মানে নেই। কিছু তো একটা করো।

—তা হলে তুমিও তো কিছু করো।

—জানি না। শুধু সময় কাটাই।

—আমিও।

মাঝে মাঝেই শঙ্কর আসত, সুলতানা একদিন জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'তুমি আমাকে শাদি করবে?'

—শাদি? মাথা খারাপ! তোমার-আমার দুজনেরই কখনও বিয়ে হবে না, সুলতানা। ও-সব বস্তাপচা ব্যাপার আমাদের জন্য নয়। আর কখনও এইরকম বাজে কথা বোলো না। তুমি একটা মেয়ে। আমাকে কিছুক্ষণ ভাল রাখার জন্য কিছু বলো। জীবনটা তো শুধু কেনা-বেচার জায়গা নয়।

—সোজা কথা বলো তো। কী চাও আমার কাছে?

—অন্যরা যা চায়। শঙ্কর ভাবলেশহীন গলায় বলে।

—তাহলে অন্যদের চেয়ে তুমি আলাদা কোথায়?

—শোনো সুলতানা, তোমার-আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু ওই অন্যদের সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

হ্যাঁ, মির্জাসাব, আমি মনে-মনে জানতাম, এমনকী জোর গলায় বলেওছি, আমার চারপাশের অন্যদের চেয়ে আমি আলাদা। কিন্তু সুলতানাদের চেয়ে আমি কোথাও আলাদা নই। কোনও না কোনওভাবে এই দুনিয়ার বাজারে আমি নিজেকে বেচতেই এসেছিলাম। যারা আমাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছে, তারাও নিজেদের বেচেছে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তিটা আড়াল করে নিজেদের মহত্ত্বের বেলুন উড়িয়েছে। আমি আপাদমস্তক একটা বেশ্যা, আমার ঠিকানা দুনিয়ার সব লালবাতির এলাকা।

আহোঁকে শোলে জিস জা উঠতে থে মীর সে শব্
বাঁ জাকে সুবহ দেখা মুশত্-এ গুবার পায়া।।
(যে জায়গাটিতে মীরের হাহাকারের শিখা লেলিহান ছিল কাল রাতে
আজ ভোরবেলা সেখানে গিয়ে শুধু এক মুঠো ছাই দেখতে পেলাম।।)

অবধ অধিকার ক'রে ব্রিটিশ যখন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে কলকাতায় নির্বাসনে পাঠাল, রাগে-ঘৃণায় আমি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলুম, মান্টোভাই। অবধের কাছে তো আমি বাইরের মানুষ। তবু মনে হয়েছিল, যেন আমাকেই উৎখাত করা হয়েছে। যে-ব্রিটিশকে একদিন নতুন সভ্যতার দূত মনে হয়েছিল, অবধের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আমি তাদের দাঁত-নখ দেখতে পেলুম। শুধু রাগ আর ঘৃণা নয়, হতাশাও আমাকে গ্রাস করেছিল। এক-একটা রাজ্যকে ধ্বংস করে, নবাবদের নির্বাসনে পাঠিয়ে, ব্রিটিশ কি তা হলে এভাবেই আমাদের তহ্জীবকে গোরে পাঠাবে? বিচারবোধ যে-মানুষের আছে, তার পক্ষে কখনও এই ধ্বংস-প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ভাইজানেরা। অবধের একজনকে চিঠি লিখে আমি এ-কথা জানিয়েও ছিলুম। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর নির্বাসন আমি মেনে নিতে পারিনি। মান্টোভাই, আমার মনে হয়েছিল, ওরা এবার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের গ্রাস করবে, গোটা হিন্দুস্তানের মানুষকেই—হিন্দু বা মুসলমান যেই হোক—ওরা নির্বাসনে পাঠাবে; মোহাজির হয়ে এবার পথে-পথে ঘুরতে হবে আমাদের।

তখনই আরেকরকম কথাও শোনা যাচ্ছিল। ব্রিটিশরা তো ততদিনে জানিয়েই দিয়েছে, কেল্লা থেকে সরিয়ে মুঘল বংশধরদের কুতুব শাহী-র কাছে কোনও মহলে নিয়ে যাওয়া হবে আর জাঁহাপনা জাফরের পর বাদশা খেতাব কেউ পাবেন না। ব্রিটিশ যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা-ই সবাইকে মেনে নিতে হবে? শাহজাহানাবাদের অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, পারস্যের শাহেনশা বা রুশের সম্রাট জার এসে এই ফিরিঙ্গিদের তাড়িয়ে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব আবার ফিরিয়ে দেবেন। গদর শুরু হওয়ার দু'মাস আগে জামা মসজিদের দেওয়ালে কারা যেন একটা কাগজ সেঁটে দিয়ে গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, পারস্যের শাহ তাঁর নিপীড়িত মুসলমান ভাইদের বাঁচাতে খুব তাড়াতাড়ি এ-দেশে আসবেন। কেল্লার পিরজাদা হাসান আক্সারিও গণনা করে বলেছিলেন, এমন কিছু ঘটতে চলেছে যাতে মুঘল সাম্রাজ্যের ইমান ও নিশান আবার আকাশে উড়বে। কিন্তু তা যে গদর—সিপাইদের বিদ্রোহ—তা আমরা বুঝতে পারিনি।

তবে হাওয়ায় কত যে গুজব ভাসছিল, ভাইজানেরা। ওইসব গুজব শুনে মনে হত, আমরা যেন পরিস্তানে বেঁচে আছি। কথাগুলো সবাই এর-ওর কানে ফিসফিস করে বলত। তো একদিন চাঁদনি চকে গুলাম নবির পানের দোকানে পাহাড়গঞ্জের থানেদার মইনুদ্দিন হাসান খানের সঙ্গে দেখা। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলুম, 'চারদিকে কী সব শুনছি, মিঞা?'

—আরে মির্জাসাব, আমার তো দিমাক খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—এসব গাপবাজি তা হলে সত্যি?

—কী করে বলি, বলুন! তবে তলে-তলে কিছু একটা চলছেই, মির্জাসাব।

—চাপাটির ব্যাপারটা কী?

—ওসব তো আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি, মির্জাসাব। কাল ভোরে হঠাৎ ইন্দ্রপুর গাঁওয়ের চৌকিদার এসে আমাকে একটা চাপাটি দেখাল। সরাই ফারুক খানের চৌকিদার নাকি তাকে চাপাটিটা দিয়েছে। ওইরকম পাঁচটা চাপাটি বানিয়ে কাছাকাছি পাঁচটা গাঁওয়ে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ গাঁওয়ের চৌকিদারকেও জানিয়ে দিতে হবে, তারাও যেন পাঁচটা করে চাপাটি বানিয়ে পরের গাঁওগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। এ যে কী ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না, মির্জাসাব।

—চাপাটির ভেতরে কেউ কোনও খবর পাঠাচ্ছে নাকি?

—না। চাপাটির ভেতরে তো কিছু নেই। আবার শুনলাম কোথাও কোথাও নাকি খাসির গোস্ত বিলি করা হচ্ছে।

—এ তো জাদুকরের খেলা, মিঞা।

দিনে-দিনে সবকিছু কেমন রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল, মান্টোভাই। ফিসফিস করে কথা বেড়ে যেতে লাগল। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হত, কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নানা জায়গা থেকে সিপাইদের বিদ্রোহের খবর আসতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ সিপাইরা নাকি নানারকম সুযোগসুবিধা পায় আর এ-দেশের সিপাইদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হয়। এদিকে পলাশির যুদ্ধের একশো বছর হতে আর কয়েক মাস বাকি। শুনলুম, ওয়াহাবিরা নাকি ঘোষণা করেছে, ২৩ জুন হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। শাহজাহানাবাদ এমনিতে শান্ত ছিল, কিন্তু চারদিক থেকে ভেসে আসছিল যুদ্ধ পরিস্থিতির হাওয়া।

১১ মে। দিনটা যেন ওঁৎ পেতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভাইজানেরা। একেবারে একটা চিতাবাঘের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুপুরে কেল্লার দরজা ও দেয়াল কেঁপে উঠল আর তাঁর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল শহরের চার কোণে। সে ছিল ভূমিকম্পের চেয়েও ভারী, ভাইজানেরা। মেরঠ থেকে বিদ্রোহী সিপাইরা এসে অধিকার করল শাহজাহানাবাদ। দরিয়াগঞ্জের কাছে রাজঘাট দরজা দিয়ে ওরা শহরে ঢুকেছিল। শহরের রক্ষী-সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলাল। শুরু হল হত্যার

বীভৎস উৎসব। রক্তে-রক্তে মুছে গেল শাহজাহানাবাদের চেনা মানচিত্র। ব্রিটিশ আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দেখলেই হত্যা করো, তাদের বাড়িঘর লুঠপাট করে জ্বালিয়ে দাও; কিন্তু যে-কোনও হত্যাকাণ্ডে তো শুধু শত্রুপক্ষই মরে না, ভাইজানেরা, উলুখাগড়ারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শাহজাহানাবাদের কত সাধারণ মানুষও যে হারিয়ে গেল, তার কোনও হিসাব নেই।

বিদ্রোহী সিপাইদের নেতা মহম্মদ বখত্‌ খান ছিল বেরিলি-র পদাতিক বাহিনির এক সুবেদার। তার নেতৃত্বে জাঁহাপনা বাহাদুর শাহকে একরকম বন্দিই করে ফেলা হয়েছিল। শুধু সিপাইরা যা করবে সে-ব্যাপারে তাঁকে সম্মতি দিতে হবে। বখত্‌ খানের একটাই কথা, 'আপনিই আবার হিন্দুস্তানের সম্রাট হবেন জাঁহাপনা। শুধু আমাদের কথা শুনে চলতে হবে।' শাহজাদা মির্জা মোঘলকেও ওরা তখন পাশে পেয়ে গিয়েছে। সব কিছুতে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া জাঁহাপনার আর কিছুই তখন করার ছিল না। হয়তো তাঁরও লোভ হয়েছিল, এই হাঙ্গাম-হুজ্জোতের মধ্য দিয়ে যদি আবার পুরনো তখত্‌ ফিরে পাওয়া যায়। নিজের তো কোনও মুরোদ ছিল না। কীই বা করতে পারতেন তিনি? তখন তাঁর বিরাশি বছর বয়স, সারাক্ষণ তো শুয়ে-বসে শুধু ঝিমোন।

জাঁহাপনাকে সামনে রেখে বড় ছেলে মির্জা মোঘলই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। শাহজাদা জওয়ান বখত্‌ হল উজির। কোতোয়ালকে আবার কাজে বহাল করা হল। আর মহম্মদ বখত্‌ খানের খেতাব কী হল জানেন? সাহেব-ই-আলম বাহাদুর। মুঘল দরবারে আগে এমন কোনও পদই ছিল না। জাঁহাপনা যাঁকে সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, সেই হাকিম আসানুল্লা খানকে ব্রিটিশের গুপ্তচর হিসাবে চিহ্নিত করা হল। একদিন তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর হাভেলিতে লোকজন চড়াও হল, কিন্তু তখন তিনি কেল্লায় বাদশাহর সঙ্গে; হাভেলিতে না-পেয়ে উন্মত্তরা কেল্লায় এসে হাজির হল, বাদশাহ্‌ তাঁকে নিজে জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু হাকিমসাবের বাড়িতে লুঠপাট করা হল, চিনা ছবির মতো অমন সুন্দর মহল জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

মান্টোভাই, জাঁহাপনা জাফর যেমনই হোন, তাঁর তো তহ্‌জীব ছিল—জাঁহাপনা বাবর থেকে সেই তহ্‌জীব রচনা শুরু হয়েছিল আর তা ফুলে-ফলে ভরে উঠেছিল জাঁহাপনা আকবরের সময়ে—শুধু ফতেপুর সিক্রির কথা ভাবলে ওই তহ্‌জীবের সৌন্দর্য আপনি বুঝতে পারবেন—মিঞা তানসেনের গান তো সেই সংস্কৃতির শিখর—জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের তসবিরখানায় এই তহ্‌জীবের কত আশ্চর্য ছবিই যে দেখা যেত—মান্টোভাই, এই অসভ্য, বর্বর, সিপাইদের মেনে নেওয়া জাঁহাপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেল্লা যেন ওদের কাছে একটা আস্তাবল মাত্র। মির্জা মোঘলকে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'এদের নিয়ে তুমি এই সাম্রাজ্য রক্ষা করবে মির্জা? ঘোড়ায় চড়ে ওরা যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়ে; ব্রিটিশ অফিসাররা কখনও এমন করতেন না, দিওয়ান-ই-আমের দরজার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে খালি পায়ে ঢুকতেন।'

—সাম্রাজ্য রাখতে হলে ওদের দরকার জাঁহাপনা।

—এই বেত্তমিজদের? আমি কিছু খবর রাখি না ভাব? বাজারের পর বাজার ওরা লুঠ করছে। ইংরেজরা লুকিয়ে আছে ধুঁয়ো তুলে যে-কোনও শরিফ আদমির বাড়িতে ঢুকে পড়ছে, আর লুঠতরাজ চালাচ্ছে।

—তাতে আপনার কী জাঁহাপনা? আপনি সম্রাট থাকতে চান না? ওরা তো আপনাকেই সম্রাট বানিয়েছে।

—ছোটোলোকদের সম্রাট।

—তবু সম্রাট তো।

হ্যাঁ, মান্টোভাই, আসলে সে এক ওলোটপালোটের সময় এসেছিল। আমিও কিছু বুঝতে পারছিলুম না। এ এমন এক অন্ধকার সময়, যখন আপনাকে কোনও একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে : হয় আপনি জাঁহাপনার দিকে, না হলে ব্রিটিশের পক্ষে থাকবেন। আমার মতো মানুষ কি অত সহজে পক্ষ বেছে নিতে পারে? আমি জানতুম, কবি হিসাবে আমার কারুর কাছেই মূল্য নেই; ওরা শুধু প্রয়োজন মতো আমাকে ব্যবহার করবে। আমি তো উলুখাগড়া ছাড়া আর কিছু নই। আমাকে দু'দিকই সামলে চলতে হবে। বাদশাহর কোপ যেন আমার ওপর না-পড়ে; আবার গোরারাও যাতে আমাকে সন্দেহ করতে না-পারে।

তাই ঘরের কোণ বেছে নিয়ে আমি লিখতে বসে গেলুম, মান্টোভাই। এইরকম সময়ে একজন কবি কী আর করতে পারে? কয়েক শতাব্দীর সাম্রাজ্য যখন একটা পচাগলা মৃতদেহ, আর সভ্যতার দূত হিসাবে যারা এসেছে, তাদের কোমরবন্ধে লুকনো ছুরিও যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন অক্ষরের সামনে বসে শবসাধনা ছাড়া আমি আর কী করতে পারতাম? আমি 'দস্তম্বু' লিখতে বসে গেলুম। চারপাশে যা দেখছি, যা শুনছি, যেভাবে জীবন কাটছে, সেই কথাগুলোই ফারসি গদ্যে লিখে ফেলতে হবে। সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ের নাম আমি দিয়েছিলাম দস্তম্বু—ফুলের তোড়া—ভেবেছিলুম, ও যে রক্তাক্ত ফুলের তোড়া, তা কেউ না কেউ বুঝতে পারবে, কিন্তু পরে বুঝেছিলুম, ইঙ্গিতটুকু কারও মাথাতেই ঢোকেনি। সেজন্য নিজের তারিফও করেছিলুম। মিঞা, এত দিনে এসে তা হলে তুমি ঠারেঠোরে কথা বলার আদবকায়দা শিখেছ। ওটুকু তো শিখতেই হবে, মান্টোভাই। নইলে বিদ্রোহীদের বা গোরাদের গুলি আমার বুকে এসে বিঁধত।

বাদশাহের দরবারে আমাকে যেতেই হত। কবিতা সংশোধনের কাজ ছাড়াও আমাকে তো বোঝাতে হবে, আমি তাঁদের সঙ্গেই আছি। বিদ্রোহীদের সহায়তায় তাঁর চারমাসের রাজত্বে জাঁহাপনা যে মুদ্রা বাজারে ছাড়লেন, তার গায়ে লেখা শেরটিও আমি লিখে দিয়েছিলুম :

বর জরি আফতাব ও নুকরা-এ-মাহ্<br>
সিক্কা জদ্ দর জাহাঁ বাহাদুর শাহ্

বিদ্রোহীরা জাঁহাপনাকে হিন্দুস্তানের সম্রাট ঘোষণার পর আমি তাঁর উদ্দেশে একটা কসীদাও লিখেছিলুম।

জাঁহাপনা একদিন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'উস্তাদজি, কী দেখছেন বলুন তো?'

—জাঁহাপনা, আবার আপনার দিন ফিরে এসেছে।

—না। প্রদীপ নেভার আগের শিখা আপনি দেখেননি?

—জি জাঁহাপনা।

—আমিই প্রদীপের সেই শিখা।

বাদশাহ না-বললেও আমি তা জানতুম। আমি তাঁকে সেদিন একটা শের শুনিয়েছিলুম :

হম-নে বহ্‌শৎকদহ্‌-এ বজম্‌-এ জহাঁ-মেঁ জুঁ শমা
শোলহ্‌-এ ইশ্‌ক-কো অপনা সর ও সামাঁ সমঝা।।
(দুনিয়ার এই ভয়ানক উজাড় মজলিসে প্রদীপের মতো আমি
প্রেমের শিখাকেই আমার সর্বস্ব জ্ঞান করলাম।।)

—কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, উস্তাদজি।

মাঝে মাঝে দরবারে গিয়ে নিজের আনুগত্য প্রমাণ করা ছাড়া নিজের কুঠুরিতে বসে আমি 'দস্তম্বু' লেখার কাজই চালিয়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হয়েছিল, আমি কার পক্ষে বা বিপক্ষে, এটা জানানোর চেয়েও, এই বয়ানটা রেখে যাওয়া জরুরি। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে আমাকে দুর্দশার দিনলিপি লিখে যেতে হবে। আমি জানি, নিরপেক্ষ ভাবে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তবু ঘটনার বিবরণ আমি লিখে রাখতে চেয়েছিলুম।

মান্টোভাই, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন জানি, তবু ওই ছোটোলোক সিপাহিদের রাজত্ব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার তহ্‌জীব তো আলাদা। আমি না-খেয়ে মরে গেলেও কারও তসবিরমহল পুড়িয়ে দিয়ে আসতে পারব না। তসবির তো আমার চোখের—মনের খিদে মিটিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কেল্লার এক-একটি সৌন্দর্য সিপাইরা কীভাবে ধ্বংস করেছে। বিদ্রোহ জিইয়ে রাখার জন্য ওদের তখন দরকার শুধু রুটি আর পয়সা। ওরা কত অমূল্য সম্পদ বেচে দিয়েছিল। বিদ্রোহের নাম যদি এই বর্বরতা হয়, আমি তাকে সমর্থন করি না। তাই আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলুম, ব্রিটিশ যেন শাহজাহানাবাদ অধিকার করতে পারে। তাতে অন্তত শান্তি ফিরে আসবে।

ধীরে বন্ধু, আপনি অবধ অধিকারের কথা তুলতে চাইছেন তো, মান্টোভাই? আমি মনে-প্রাণে তাকে ঘৃণা করি। তবু একফোঁটা বিশ্বাস আমার ছিল, ব্রিটিশ হয়তো এভাবে সব সৌন্দর্যকে শেষ করে দেবে না। ভাবুন মান্টোভাই, সিপাহিরা সব ব্যারাকে থাকে—সে তো জেলখানার মতোই জায়গা—খাওয়া-ঘুম-যৌনখিদের বাইরে আর কিছুই শেষ পর্যন্ত তাদের থাকে না। যে-তহ্‌জীব নিয়ে ওরা ব্যারাকে আসে, যুদ্ধের

প্রস্তুতির জন্য নিষ্ঠুরতায় তা-ও একদিন হারিয়ে যায়। সিপাইরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারে—নগরের পর নগর ধ্বংস করতে পারে—স্বাধীনতা কখনও আনতে পারে না, মান্টোভাই। স্বাধীনতা আনতে পারে একমাত্র পথের মানুষ—তাদের হাতে অস্ত্র বলতে পাথর, গাছের ডাল, বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘ-দীর্ঘ শতাব্দীর লড়াইয়ের স্মৃতি—নিজের ঘর, নিজের নদী, নিজের জঙ্গল বাঁচানোর লড়াই—স্বাধীনতা তো শুধু মানুষের জন্য নয় মান্টোভাই—ঝরনার স্বাধীনতা, গাছের স্বাধীনতা, পাখির স্বাধীনতা, মাছের স্বাধীনতা—ব্যারাকের সৈনিক কি সেই স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারে? ওদের তো শুধু যুদ্ধই শেখানো হয়েছে—স্বাধীনতার লড়াই তো বন্দুক-কামান নিয়ে যুদ্ধের চেয়ে বেশি কিছু।

আমি আজ আপনাদের এতসব কথা বলতে পারছি, কিন্তু তখন তো মুখে কুলুপ এঁটে রাখার সময়। তাই 'দস্তম্বু' লিখে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না আমার। এদিকে বিদ্রোহীরা শহর দখল করার পর সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পেনশনও বন্ধ হয়ে গেছে। কী করব, বাড়ির এতগুলো লোকের পেটের খাবার কোথা থেকে জোটাব জানি না। মান্টোভাই, ভাবতে ভাবতে আমার শুধু হাসি পেত।

জুজ নাম নহীঁ সুরৎ আলম্ মুঝে মনজুর
জুজ ওয়াহ্ম্ নহীঁ, হস্তী-এ অশিয়া মেরে আগে।
(পৃথিবী রয়েছে শুধু নামেই,
সবই কল্পনা, সবই অস্তিত্বহীন এখানে।)

দিনগুলি মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছিল। আর আমি ভাবছিলুম, কবে ইংরেজরা শাহজাহানাবাদের দখল নেবে, কবে আবার অবস্থা স্বাভাবিক হবে। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, সে তো জানেনই, মান্টোভাই। মে মাসের এক সোমবার সিপাইরা শাহজাহানাবাদ তাদের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল, আর ওই বছরই ১৪ সেপ্টেম্বর, আরেক সোমবার, ইংরেজরা শহর দখল করল। লড়াই চলেছিল ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই কেল্লা দখল করল ব্রিটিশ। জাঁহাপনা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন সম্রাট হুমায়ুনের কবরে। মান্টোভাই, এ যেন গজলের একটি শের। মরণোন্মুখ সম্রাট শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে পেলেন কবরে! তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে, এই আশ্বাস পেয়ে ক্যাপ্টেন হড্‌সনের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর দুই সন্তান মির্জা মোঘল আর মির্জা খিজর সুলতানকে খুনি দরওয়াজার সামনে নিজের হাতে গুলি করে মারলেন ক্যাপ্টেন হড্‌সন। জাঁহাপনা তাদের দিকে ফিরেও তাকাননি, তখন শুধু নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। শুনেছিলুম, মির্জা মোঘল নাকি মরার আগে বলেছিল, হিন্দু-মুসলমান ভাইয়েরা, মনে রেখো, তোমরা এক হলে অনেক কিছু পেতে পারো। মান্টোভাই, সেসব দিনে কী ভয়ানক সব দৃশ্য দেখেছি। একুশজন শাহজাদাকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মেরে চাঁদনি চকে ফেলে রাখা হয়েছে, তাদের নগ্ন শরীরে সামান্য

এক টুকরো কাপড়। এই কি মুঘল বংশধরদের প্রাপ্য ছিল? কেল্লার একটা ছোট্ট, অন্ধকার ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল জাঁহাপনা আর বেগম জিনত মহলকে। তিনি যেন চিড়িয়াখানার এক জন্তু, গোরারা তখন জাঁহাপনাকে এভাবেই দেখতে যেত। একটা চারপাইয়ের ওপর ময়লা পোশাকে শুয়ে থাকতেন আর বারবার বলতেন 'বরা খুশ হুঁ', 'বরা খুশ হুঁ'। কারও কারও কাছে শুনেছি, দিন-রাত চুপচাপ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন তিনি, মাঝে মাঝে ঘুমঘোর থেকে জেগে উঠে নিজের লেখা গজল আবৃত্তি করতেন। তারপর একুশদিন ধরে চলল তাঁর বিচার। শুনেছি, বিচারপর্ব চলার সময়ও তিনি প্রায়শই ঘুমিয়ে থাকতেন। যে-কুঠুরিতে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তারই দেওয়ালে খড়ি দিয়ে তিনি লিখে রেখেছিলেন জীবনের শেষ গজল :

ন কিসি কি আঁখ কা নূর হু, ন কিসি কে দিল কা করার হুঁ
যো কিসি কে কাম ন আ সকে, ম্যায় উয়ো এক মুশ্‌ত-এ-গুবার-হুঁ।

কারও চোখের আলো নই, কারও হৃদয়ের শান্তিও না, যে কোনও কাজেই এল না, আমি সেই একমুঠো ধুলো।

মেরা রঙ্গরূপ বিগড় গয়া, মেরা য়ার মুঝ্‌সে বিছর গয়া
যো চমন্ খিজা সে উগড় গয়া, ম্যায় উসিকি ফসল-এ-বহার হুঁ।

ঝরে গেছে আমার রং রূপ, ছেড়ে গেছে বন্ধু, যা হেমন্তে শুকিয়ে গেছে, আমি সেই বাগানের ফসল।

ম্যায় নহীঁ হুঁ নগ্‌মা-এ-জাঁফজা, মুঝে শুনকে কোই কারগা কেয়া
ম্যায় বড়ে বরোগ কি হুঁ সদা, ম্যায় বড়ে দুখী কি পুকার হুঁ।

আমি তো প্রাণের সঙ্গীত নই, আমাকে শুনে আর কী হবে, আমি তো বিচ্ছিন্ন এক বিলাপ, বড় দুঃখের এক আর্তনাদ।

মান্টোভাই, ইংরেজরা অধিকারের পর শাহজাহানাবাদকে এক মৃতপ্রায় পশুর আর্তনাদের মতোই মনে হয়েছিল আমার। যেদিন ওরা শহর দখল করল সেদিনই ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল উইলসন দেওয়ান-ই-খাসে নৈশভোজের ব্যবস্থা করল। এক রাতেই দেওয়ান-ই-খাসের ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে গেল। এখনও ভাবলে, জালে-আটকে পড়া এক জন্তুর মতো আমার ভেতরে রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। সব বলব, ভাইজানেরা, সব—কীভাবে শাহজাহানাবাদ উজাড় হয়ে গেল—দিল্লিতে পড়ে থাকা আমরা কিছু মানুষ দোজখের আগুনের ভেতরে দিন গুজরান করতে লাগলুম।

এই দিনগুলোতেই মির্জা ইউসুফ আমাদের ছেড়ে চলে গেল, মান্টোভাই। আমার এই ভাইয়ের কথা তো আগেই বলেছি; প্রায় তিরিশ বছর ইউসুফ উন্মাদের জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু কারও কোনও অসুবিধে কখনও করেনি; নিজের মনে চুপচাপ বসে বিড়বিড় করত, কখনও কখনও কয়েকদিনের জন্য হারিয়ে যেত, আবার ফিরে আসত। ব্রিটিশরা দিল্লি দখলের পর অত্যাচার আর মৃত্যুর ভয়ে অনেকেই তো পালাচ্ছিল,

ইউসুফের বিবি-মেয়েরাও ওকে একা ফেলে চলে গেল। মান্টোভাই, 'দস্তম্বু'-তে ইউসুফ মিঞার মৃত্যুর যে-কারণ আমি লিখেছিলুম, তা মিথ্যে। আসলে 'দস্তম্বু' তো আমি লিখছিলুম ইংরেজদের কাছে পেশ করার জন্য, যাতে এই কিতাব পড়ে ওঁরা আমাকে খেতাব ও খিলাত দেন, আমার পেনশানের সুরাহা করেন। সচেতনভাবে 'দস্তম্বু'-তে আমি এমন কিছুই লিখতে চাইনি, যাতে ইংরেজরা আমাকে বিদ্রোহীদের পক্ষের লোক হিসাবে সন্দেহ করতে পারে। তবু কী জানেন, লেখা একসময় লেখকের হাতের বাইরে চলে যায়; লেখা নিজের জীবনের ধর্মেই সত্যের অনেক হালহদিশ তার ভিতরে লুকিয়ে রাখে; তাই ব্রিটিশ আমাদের কোন নরকে নিয়ে গেছে, তার ছবিও আপনি 'দস্তম্বু-র মধ্যে পাবেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই হিন্দুস্তানের মুক্তির দূত, হ্যাঁ, এ-কথা আমি বারবার 'দস্তম্বু'-তে লিখেছি, কিন্তু বিদ্রোহ শুরুর পর থেকে পনেরো মাসে শাহজাহানাবাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া, আমাদের পোকামাকড়ের মতো বেঁচে থাকার ছবিটাও সেখানে আঁকা আছে।

'দস্তম্বু'-তে আমি লিখেছিলুম, পাঁচদিন প্রবল জ্বরে ভুগে মির্জা ইউসুফ মারা গেছে। তার বাড়ির চৌকিদার এসে আমাকে খবরটা দিয়েছিল। কিন্তু, ইউসুফ মারা গিয়েছিল ব্রিটিশের গুলিতেই। তখন চারদিকে সবসময় গোলাগুলি চলছে। তারই আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে ইউসুফ রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল; তারপর ব্রিটিশের গুলিতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল। মান্টোভাই, আমি জানি, খোদা কখনও আমার এই গুনাহ্‌ মাফ করবেন না। নিজের গায়ের চামড়া বাঁচাতে আমার ভাইয়ের মৃত্যুর মিথ্যে খতিয়ান আমি রেখে গেছি আমার লেখায়। দোজখ থেকে আমার কখনও মুক্তি নেই। এবার আমি তার মৃতদেহ নিয়ে কী করি? শাহজাহানাবাদের তখন যা অবস্থা, কফনের একটুকরো কাপড় কোথায় পাব জানি না। শবদেহ পরিষ্কার করবে কে, কোথায় পাব কবর খননকারী, ইট-চুনও বা কোথা থেকে আসবে? কোন কবরস্তানে আমি ওকে শুইয়ে দিয়ে আসব? হিন্দুরা অন্তত যমুনার তীরে গিয়ে মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু, আমরা, মুসলমানরা কী করব? রাস্তায় সবসময় গুলিগোলা চলছে, ইউসুফকে কবরস্তানে নিয়ে যাবই বা কীভাবে? কয়েকজন প্রতিবেশী পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছিল কাল্লু আর আমার বাড়ির আরেক নোকর। ওরাই শবদেহের গোসল করাল, কয়েকটুকরো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ইউসুফদের বাড়ির কাছেই মসজিদের জমিতে গর্ত খুঁড়ে ওকে কবর দিল। রক্তের শেষ সম্পর্কটুকুও হারিয়ে গেল, মান্টোভাই।

সে তো হারিয়ে যাওয়ারই সময়। কত লোক পালিয়ে গেছে, কত লোককে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যারা রয়ে গিয়েছিলুম, তারা ভয় আর আশার কারাগারে বন্দি। যারা চলে গেছে আর যারা রয়ে গেছে, কারও মনের শান্তির জন্যই কোনও মলম তখন ছিল না। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হত, সবার মুখেই বিবর্ণ মুখোশ

পরিয়ে দিয়ে গেছে মৃত্যু। চাঁদনি চক যেন মৃত্যুর এক উপত্যকা। ব্রিটিশরা যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে, গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। চারিদিকে গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো আপনার সঙ্গে আমার কোনও কারণে শত্রুতা ছিল, এই সুযোগে আমি আপনাকে বিদ্রোহীদের দলের লোক বলে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিচ্ছি।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমিও কি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি? করেছি ভাইজানেরা, আজ সে-কথা কবুল করতেই হবে। 'দস্তম্বু' ফারসি গদ্যের যত উজ্জ্বল নিদর্শনই হোক না কেন, তা একই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতারও দলিল। একটা দুঃসময়ের ছবি আমি এঁকেছিলুম, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে বিদেশি সাম্রাজ্যের কাছে ছবিটাকে বেচেও দিয়েছি।

জিন্দগী অপনী যব ইস্ শকল্ সে গুজরী গালিব
হম্ ভি কেয়া ইয়াদ করেঁ কে খুদা রখতে থে।
(জীবন যখন এভাবেই কাটল গালিব,
ঈশ্বরের কৃপার কথা কীই-বা স্মরণ করব।)

কিস্ তরহ্ কাটে কোঈ শব্‌হা-এ তার-এ বর্ষগাল
হৈ নজর খুক্‌রদহ্-এ অখ্‌তর-শুমারী, হায় হায়।।
(কেমন করে কাটবে বর্ষার অন্ধকার রাত্রিগুলি,
আমার চোখ যে তারা গুনতেই অভ্যস্ত হয়ে আছে, হায়।।)

একটা কিস্‌সা শুনুন, ভাইজানেরা। মহাভারত-এ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই বৃত্তান্তটা বলেছিলেন। বনের ভিতরে এক শিকারির বিষাক্ত তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এসে লেগেছিল বিরাট, প্রাচীন এক গাছের শরীরে। সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা পুড়তে শুরু করল। সেই গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকত নানারকম পাখি। গাছের মৃত্যু অবধারিত জেনে পাখিরাও পালাতে শুরু করল। শুধু একটা শুকপাখি তার বাসাতেই রয়ে গেল। এদিকে গাছকে জড়িয়ে আগুন ছড়াচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আগুন শুকপাখিকেও গ্রাস করবে। নিজের মৃত্যু সামনে দেখেও শুকপাখিটি তার বাসা ছেড়ে নড়ল না। আকাশপথ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই ঘটনা দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শুকপাখিকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'সবাই উড়ে চলে গেল, তুমি এখনও বসে আছ কেন? তুমি কি আগুনে পুড়ে মরতে চাও?'

—দেবরাজ, এই গাছেই আমার জন্ম, এর ডালে-পল্লবে ঘুরে ঘুরে আমি বড় হয়েছি, এই প্রাচীন বৃক্ষের কাছেই শিখেছি, কীভাবে ধৈর্য ধরে বেঁচে থাকতে হয়, কত ঝড়-ঝঞ্ঝায় এই গাছই আমাদের বাঁচিয়েছে।

—কিন্তু গাছের সঙ্গে সঙ্গে তো তুমিও মরবে।

—তাই হোক, দেবরাজ।

—মৃত্যুকে ভয় পাও না, তুমি?

—কে না পায়? শুকপাখি ম্লান হেসে বলে, 'কিন্তু দেবরাজ, মৃত্যুভয়ের জন্য কি কেউ ধর্মকে ত্যাগ করতে পারে?'

—কী তোমার ধর্ম?

—এই গাছের জন্য আমি এখনও বেঁচে আছি। দুর্দৈবের দিনে তো আমি তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি না।

—সাধু, সাধু। এমন ধার্মিক উত্তর আমি তোমার কাছে আশা করেছিলাম, হে শুকশ্রেষ্ঠ। তুমি কী বর চাও, বলো?

—আমার প্রার্থনা আপনি পূরণ করবেন?

—অবশ্যই।

—তা হলে এই প্রাচীন বৃক্ষের জীবন ফিরিয়ে দিন।

ইন্দ্রের বরে বৃক্ষ আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু যে-প্রাচীন গাছটিতে আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম, তাকে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না, মির্জাসাব। দেশভাগের বিষাক্ত তির তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছিল। একটা দেশ ভেঙে পরপর দু'দিনে দু'টো দেশের জন্ম হল সারা হিন্দুস্থান জুড়ে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কে ভুল, কে ঠিক, তা আমি আজ আর বিচার করতে চাই না—তার জন্য তো রাজনৈতিক নেতা, ঐতিহাসিকরাই আছেন—এই কবরেও দুঃস্বপ্নগুলো ফিরে ফিরে আসে। কেউ বলেছে, এক লাখ হিন্দু মারা গেছে, কেউ বলেছে, এক লাখ মুসলমান মারা গেছে। আমি তাদের বলেছি, বলো, দু'লাখ মানুষ মারা গেছে। হিন্দুদের মেরে মুসলমানরা ভেবেছে, হিন্দুত্ব নিকেশ হয়ে গেছে, হিন্দুরা মুসলমানদের মেরে ভেবেছে ইসলামকে কবরে পাঠানো গেছে। মির্জাসাব, কাকে বোঝাবেন বলুন, ধর্ম তো এভাবে মরে না, ধর্ম বেঁচে থাকে আমাদের হৃদয়ে, বিশ্বাসে। শুধু ধর্মের নামে ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, ভাই বোনকে ধর্ষণ করেছে, আর এক দেশ থেকে অন্য দেশে উদ্বাস্তুর স্রোত বয়ে গেছে। ওই নেহরু-জিন্না-পটেলদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কী ঘৃণা, কী অবিশ্বাস চারদিকে! এই নেতারা সব ছারপোকা, ভাইজানেরা, গরম জল ঢেলে তাদের নিকেশ করতে হয়। আমাদের মতো মানুষের রক্ত খাওয়া

ছাড়া এদের আর কোনও কাজ নেই। না, মির্জাসাব, এদের কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

এমন এক গনগনে আগুনের মধ্য দিয়ে দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছিল, যখন বন্ধুও বন্ধুকে হত্যা করতে পিছপা হয় না। হত্যালিপ্সা আসলে কী চেহারা নিতে পারে, তা আমি একদিন বুঝতে পেরেছিলুম। প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মরছে। একদিন শ্যাম আর আমি রাওয়ালপিন্ডি থেকে আসা এক শিখ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শ্যাম তো রাওয়ালপিন্ডিরই ছেলে। কীভাবে ওই পরিবারের আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করা হয়েছে, শুনতে শুনতে আমার হাড় হিম হয়ে যাচ্ছিল। শ্যামও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, ওর মনের ভিতরে কী চলছে। বেরিয়ে আসার পর দেখলাম, শ্যাম তখনও কেঁপে-কেঁপে উঠছে। আমি ওর পিঠে হাত রাখলাম। শ্যাম আমার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল, যেন আমাকে চেনেই না।

—শ্যাম—

ও চুপচাপ হাঁটছিল।

—কী হয়েছে শ্যাম?

ম্লান হেসে বলল, 'কিছু না।'

—তোমার কষ্ট হচ্ছে, না?

—না। শ্যামের দাঁত ঘষটানির আওয়াজ পেলাম।

—শ্যাম, আমি তো মুসলমান। আমাকে তুমি মারতে চাও না? আমি তার কাঁধ চেপে ধরে বলি।

শ্যাম ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকায়।

—বলো শ্যাম, সত্যি বলো, আমাকে মারতে চাও না?

শ্যাম কেটে কেটে বলল, 'না, এখন আর চাই না।'

—তার মানে?

—যখন ওদের কথাগুলো শুনছিলাম—মুসলিমরা কীভাবে আমাদের হত্যা করেছে—হ্যাঁ, তখন—তখন আমি তোমাকে সত্যিই খুন করতে পারতাম, মান্টো।

শ্যাম আমার হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করো মান্টো।'

মির্জাসাব, এ তো শুধু হিন্দুস্থান কা তক্‌সীম্ নয়, এ যে বন্ধুত্বেরও তক্‌সীম্। এত খুন-খারাবি, লুঠপাট—রক্তের স্রোতে ভাসছে মুণ্ডহীন শরীর—শিশুদেরও দু'ঠ্যাং ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে—উপর্যুপরি ধর্ষিতা মেয়েটির মুখের উপর ভনভন করে মাছি উড়ছে—আমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, চারদিকে এত ঠাণ্ডা গোস্ত, ইয়া আল্লা, আমি বেঁচে আছি তো?

হ্যাঁ, বেঁচে তো ছিলাম, ঈশ্বর সিংয়ের মতোই বেঁচেছিলাম। তখন ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে,

আমি পুড়ছি। ঈশ্বর সিং কীভাবে বেঁচে থাকল, আমি ভেবেই পাই না, মির্জাসাব। ভাইজানেরা, অনেকদিন আগে কথা দিয়েছিলাম, 'ঠাণ্ডা গোস্ত'-এর গল্প একদিন আপনাদের শোনাব।

সে এক মধ্যরাত্রির কাহিনি। ঈশ্বর সিং-এর জীবনের এক মধ্যরাত্রি, আর আমাদের জীবনেরও, যারা ভারতবর্ষ নামের একটা দেশের বুকেই বেঁচে ছিলাম, কিন্তু বুকটা দু'ফালি করে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে, কে জানত! সেই রাতে ঈশ্বর সিংকে ঘরে ঢুকতে দেখে কুলবন্ত কাউর বিছানা থেকে নেমে এসেছিল। ধারালো চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল কুলবন্ত। বিছানায় এসে বসে কুলবন্ত দেখল, ঈশ্বর সিং কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনও সমস্যার সমাধান কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। হাতে কৃপাণ নিয়ে সে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাগড়িটা ঢিলে হয়ে গেছে। কুলবন্ত দেখল, কৃপাণ ধরে থাকা হাতটা কাঁপছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর নীরবতা সহ্য করতে না পেরেই কুলবন্ত ডেকে উঠল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ।'

ঈশ্বর সিং এক মুহূর্ত কুলবন্তের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

—ঈশ্বর সিয়াঁ, ক'দিন ধরে কোথায় থাকো, কী করো, বলো তো? কুলবন্ত চেঁচিয়ে ওঠে।

—জানি না।

—এ আবার কোনও উত্তর হল!

কৃপাণটা ছুড়ে ফেলে ঈশ্বর সিং বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে দেখে মনে হয়, বেশ কয়েকদিন ধরে সে অসুস্থ। ঈশ্বরের কপালে হাত রেখে কুলবন্ত বলল, 'কী হয়েছে জানি?'

ঈশ্বর সিং সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। কুলবন্তের দিকে তাকিয়ে সে গুমরে উঠল, 'কুলবন্ত'।

—বোলো জানি।

পাগড়ি খুলে ফেলে ঈশ্বর সিং আবার কুলবন্তের দিকে তাকাল। তার চোখ দেখে মনে হয়, কুলবন্তের কাছে সে আশ্রয় পেতে চায়। তারপর একটা গোঙানি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'আমি পাগল হয়ে যাব কুলবন্ত।'

ঈশ্বর সিংয়ের চুলে বিলি কাটতে কাটতে কুলবন্ত বলল, 'ক'দিন ধরে কোথায় আছ বলো তো?

দাঁতে-দাঁত চিপে ঈশ্বর সিং বলল, 'শালা মাদারচোদ, আমার শত্তুরের মায়ের সঙ্গে বিছানায়।' হঠাৎই সে কুলবন্তকে জড়িয়ে ধরে তার বুক টিপতে-টিপতে হাসতে লাগল, 'কসম ওয়াহে গুরু কি, তোমার মতো অওরৎ আমি আর দেখিনি কুলবন্ত।'

কুলবন্ত বুক থেকে ঈশ্বর সিংয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, 'মেরি কসম, সাচ্চা বলো, কোথায় ছিলে? শহরেই?'

—না।

—আমার মন বলছে, শহরেই ছিলে। প্রচুর টাকা লুঠ করে এখন আমার কাছে লুকোতে চাইছ, তাই না?

—তোমাকে মিথ্যে বললে আমি বাপের পুত্তর না।

কুলবন্ত কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফুঁসে উঠল, 'সেদিন রাতে তোমার কী হল, আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না। আমার পাশেই তো শুয়েছিলে। লুঠ করে আনা অত গয়না আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলে। চুমু খেতে খেতে কত কথাই না বলছিলে। তারপর হঠাৎ কী হল তোমার। একটা কথাও না বলে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেলে। কী—কী হয়েছিল বলো তো?'

ঈশ্বর সিংকে দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ তার মুখ থেকে সব রক্ত শুষে নিয়েছে।

—ঈশ্বর সিয়াঁ তোমার ভেতরে কিছু চলছে। আমাকে লুকোচ্ছ।

—কিচ্ছু না। তোমার দিব্যি কুলবন্ত।

—কিন্তু আটদিন আগে যে মানুষটাকে দেখেছি, সে তো তুমি নও। কেন? কী করেছ, বলো?

ঈশ্বর সিং কোনও কথা না বলে কুলবন্তকে জড়িয়ে ধরে, পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বলে, 'জানি, আমি তোমার সেই ঈশ্বর সিয়াঁ।'

—সেদিন রাতে কী হয়েছিল, সত্যি সত্যি বলো।

—শালা মাদারচোদের মাকে—

—আমাকে বলবে না?

—কী বলব? কী বলার আছে?

—মিথ্যে বললে তুমি নিজের হাতে আমাকে পোড়াবে ঈশ্বর সিয়াঁ।

কুলবন্তকে আরও জোরে চেপে ধরে ঈশ্বর সিং, তার গলায় চুমু খেতে থাকে। কুলবন্ত হেসে ওঠে, ঈশ্বর সিং-ও হাসতে থাকে। তারপর সে জামা খুলে ফেলে বলে ওঠে 'এসো, এবার তা হলে তাস খেলা যাক।'

কুলবন্ত ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলে, 'জাহান্নামে যাও।'

ঈশ্বর সিং কুলবন্তের ঠোঁট চুষতে শুরু করে। কুলবন্ত আর বাধা দিতে পারে না। ঈশ্বর সিং চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা এবার তুরুপের তাস।' কুলবন্তকে নগ্ন করে তার শরীর চাটতে থাকে সে।

কুলবন্ত বলে ওঠে, 'তুমি একটা জন্তু।'

—হ্যাঁ, জন্তুই তো।

কুলবন্তের ঠোঁট, কানের লতি কামড়াতে থাকে সে, বুক টেপে, চোষে, পেটে মুখ

ঘষতে থাকে। কুলবন্তের শরীরও জ্বলে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বর সিং টের পায়, এত কিছু করেও তার নিজের শরীর জাগছে না। কুলবন্ত একসময় গোঙাতে-গোঙাতে বলে, 'অনেক তাস ভেঁজেছো ঈশ্বর সিয়াঁ। তুরুপের তাস কোথায়?'

না, তুরুপের তাস আজ তার হাতে নেই। অবসন্ন, হতাশ ঈশ্বর সিং বিছানায় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে। এবার কুলবন্ত তাকে নানাভাবে জাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষে বিরক্ত কুলবন্ত চেঁচিয়ে ওঠে, 'কোন ডাইনের সঙ্গে এই ক'দিন বিছানায় শুয়েছো ঈশ্বর সিয়াঁ? সে তো তোমাকে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছে।'

ঈশ্বর সিং হাঁফাতে থাকে। কুলবন্ত আরও চেঁচায়, 'বলো কোন ডাইন—তার নাম বলো—

—কেউ না কুলবন্ত। আমার জীবনে আর কেউ নেই।

—আজ আমাকে সত্যিটা জানতেই হবে। ওয়াহে গুরুর নামে দিব্যি করে বলো, মাগীটা কে? মনে রেখো, আমি সর্দার নিহাল সিংয়ের মেয়ে। মিথ্যে বললে তোমার মাংস কিমা করে ছাড়ব। এবার বলো, মাগীটা কে?

ঈশ্বর সিং শুধু মাথা নাড়ছিল। কুলবন্ত তখন রাগে উন্মাদ। মেঝেয় পড়ে থাকা কৃপাণ তুলে নিয়ে সে ঈশ্বর সিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঈশ্বর সিংয়ের গাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। কুলবন্ত ঈশ্বর সিংয়ের চুল ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গালাগালির ফোয়ারা ছোটায়। ঈশ্বর সিং ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'এবার থামো কুলবন্ত।'

—কুত্তিটা কে, আগে বলো।

ঈশ্বর সিংয়ের গাল বেয়ে রক্তধারা নামছে। জিভ দিয়ে সে নিজের রক্তের স্বাদ নেয়। তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। সে মাতালের মতো বলে, 'কী বলব আমি কুলবন্ত? এই কৃপাণ দিয়ে আমি ছ'জনকে খতম করেছি।'

—আবারও জিজ্ঞেস করছি, কুত্তিটা কে?

—মেয়েটাকে কুত্তি বোলো না। ঈশ্বর সিং ধরা গলায় বলে।

—মানে? কে ও?

—বলছি। মুখ মুছে সে তার রক্তমাখা হাতের দিকে তাকায়। তারপর বিড়বিড় করে বলে, 'শালা সব—আমরা সব মাদারচোদ।'

—আসল কথায় এসো ঈশ্বর সিয়াঁ। কুলবন্ত চেঁচিয়ে ওঠে।

—অপেক্ষা করো। সব তোমাকে বলব। তবে সময় দিতে হবে, কুলবন্ত। সব কথা কি সহজে বলা যায়? মানুষ—বুঝলে কুলবন্ত—ওই যে বললাম—মাদারচোদ—মানুষ একমাত্র মাদারচোদ। শহর জুড়ে লুঠপাট চলছিল, আমিও ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। যত টাকা, গয়না পেয়েছিলাম, সব তো তোমার হাতেই দিয়েছি। কিন্তু ওই একটা কথা, কুলবন্ত, আমি তোমাকে বলিনি, বলতে পারিনি।

—কী?

—একটা বাড়ির দরজা ভেঙে আমরা ঢুকেছিলাম...হ্যাঁ, সাত—সাতজন মানুষ ছিল বাড়িটাতে—এই কৃপাণ দিয়ে আমি একা ছ'জনকে মেরেছি—বাদ দাও—এ সব কথা বাদ দাও কুলবন্ত—একটা মেয়ে ছিল জানো—কী যে সুন্দর—ওকে আমি সবার মতোই কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে পারতাম—কিন্তু ভাবলাম—। ঈশ্বর সিং হেসে ওঠে, 'কী যে সুন্দর মেয়েটা, জানি, কী বলব তোমাকে। ভাবলাম, রোজ তো কুলবন্তকেই খাই, আজ না হয় নতুন কিছু খাওয়া যাক।'

—আমি জানতাম। কুলবন্তের ধারালো চোখে একই সঙ্গে ঘৃণা ও বিদ্রূপ।

—মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

—তারপর?

—যেতে যেতে—। ঈশ্বর সিং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।—কী যেন বলছিলাম? মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে—সামনে একটা খাল পড়ল, চারপাশ ঝোপঝাড়ে ভরা। মেয়েটাকে ঝোপের ভেতরে শুইয়ে দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণ তাস ভাঁজা যাক। কিন্তু চারপাশে কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে, জানি না। তাই তুরুপের তাসই—

—বলো—বলে যাও!

—তুরুপের তাসই ছুড়লাম।

—তারপর—

ঈশ্বর সিং অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর যেন দীর্ঘদিনের ঘুম ভেঙে সে চোখ খুলছে, সেভাবেই কুলবন্তের দিকে তাকাল।—মেয়েটা মরে গেছে—কখন যেন মরে গেছে—একতাল ঠাণ্ডা গোস্ত শুধু। জানি—তোমার হাতটা—জানি—

কুলবন্ত ঈশ্বর সিংয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখল, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা।

হ্যাঁ, মির্জাসাব, সে যেন এক হিমযুগের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। কত লোক খুন হয়েছিল? কত নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল? কত মানুষ মোহাজির হয়েছিল। এসব হিসেব আমার হাতে নেই, ভাইজানেরা। আর তা দিয়ে আমরা করবই বা কী বলুন? আমি একটা বাচ্চাছেলেকে দেখেছিলাম, সে কথা বলতে ভুলে গেছে। তার চোখের সামনে বাড়ির সবাইকে কুপিয়ে, গুলি করে মারা হয়েছে। সবাই যখন সংখ্যার কথা বলত, আমি ওই বাচ্চাটার মুখ দেখতে পেতাম—শূন্য দৃষ্টি, নির্বাক—জলন্যাকড়ার এক ঘষায় ওর সব স্মৃতি মুছে গেছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, এবার বম্বেকেও আমার জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে। শফিয়া, আমাদের বাচ্চারা অনেক আগেই লাহোর চলে গিয়েছিল। বারবার আমাকে লাহোরে যাওয়ার কথা লিখছিল শফিয়া। বম্বে আমার দ্বিতীয় জন্মস্থান, আমি কী করে তাকে ছেড়ে চলে যাব? তখন বম্বে টকিজে কাজ করি। নায়ক অশোককুমার

আর সাভাক ওয়াচা বম্বে টকিজের মালিক। মুসলমানরা তখন সেখানে বড়বড় পদে। তাই হিন্দুদের বিদ্বেষ দিনে-দিনে বাড়ছিল। ওয়াচা সাবকে হত্যা, বম্বে টকিজ পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে কত যে চিঠি আসত। হিংসা আর অবিশ্বাসের পরিবেশটা আর ভাল লাগছিল না, মির্জাসাব। দিনে-দিনে মদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। অনেক হিন্দু কর্মচারী মনে করত, আমার জন্যই বম্বে টকিজে মুসলমানদের রমরমা। আমি, শহিদ, ইসমত, কামাল আমরোহি, হসরত লাখনভি, নজির আজমিরি, গোলাম হায়দার— আমরা সবাই তখন বম্বে টকিজে।

একদিন অশোককে বললাম, 'আমাকে এবার বরখাস্ত করো দাদামণি।'

—মানে?

—আমি চাই না, আমার জন্য বম্বে টকিজ শেষ হয়ে যাক।

—তুমি পাগল হয়ে গেছ, মান্টো। ধৈর্য ধরো। আস্তে আস্তে সব থেমে যাবে।

কিন্তু দিনে-দিনে পাগলামি বাড়তে লাগল। ঘরে ঘরে আগুন, লুঠতরাজ, পথেঘাটে খুনখারাবি। একদিন অশোক আর আমি বম্বে টকিজ থেকে বাসায় ফিরছিলাম। অশোকের বাড়িতে পৌঁছে ভাবছিলাম, কী করে নিজের বাসায় পৌঁছব। অশোক বলল, 'চলো মান্টো, তোমাকে পৌঁছে দিই। যা হয় হবে।'

রাস্তা শর্ট করার জন্য অশোক মুসলমান বস্তির ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। সামনে থেকে একটা বিয়ের বরাত আসছিল। আমি অশোকের হাত ধরে বললাম, 'এ তুমি কোথায় এলে দাদামণি?'

—চুপ করো। কোনও চিন্তা নেই।

আমি সত্যিই খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। অশোককে কে না চেনে? ওর মতো বিখ্যাত হিন্দুকে হত্যা করতে পারলে ওদের অস্ত্র সার্থক হবে। ওর গাড়ি যখন বরাতের সামনে এসে ঠেকল, তখন চিৎকার উঠল, 'অশোককুমার, অশোককুমার।' আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অশোক কিন্তু নির্বিকার। আমি গাড়ির জানলা থেকে মুখ বার করে বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি মুসলমান। অশোককুমার আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন।' তার আগেই দুজন যুবক জানলার কাছে এসে বলল, 'অশোকভাই সামনের রাস্তা বন্ধ। বাঁদিকের গলি দিয়ে চলে যান।'

আমরা নিরাপদে সেই রাস্তা পেরিয়ে এলাম। অশোক হেসে বলল, 'তুমি অযথা ঘাবড়াচ্ছিলে, মান্টো। আর্টিস্টদের ওরা ভালবাসে।'

তাই? কে জানে! যারা দাঙ্গা করে, রাস্তাঘাট রক্তে ভাসিয়ে দেয়, তাদের কাছে শিল্পের কোনও মূল্য আছে? কবিরজি একদিন লাহোরের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন, এক দোকানি কবি সুরদাসের বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা তৈরি করছে। তিনি কান্না সামলাতে পারলেন না। তিনি গিয়ে দোকানিকে বললেন, 'এ কী করেছ তুমি?'

—কেন?

—দেখতে পাচ্ছ না, এই বইতে কবি সুরদাসের কবিতা রয়েছে। এর পাতা ছিঁড়ে তুমি ঠোঙা তৈরি করছ?

—সুরদাস? দোকানি হেসে ওঠে।—সুরদাস যার নাম, সে কখনও ভগত হতে পারে না।

—কেন?

—সুর মানে কী?

—যেমন গানের সুর। ঈশ্বরের নামও তো—

—সুর মানে যে শুয়োর, জানো না? দোকানি হাসতে থাকে।

—তুমি ওই মানেটাই ধরে বসে আছ?

আরেকদিন কবিরজি দেখলেন, কারা যেন দেবীলক্ষ্মীর মূর্তিকে খড়ে ঢেকে দিয়ে গেছে। কবিরজি দেবীর মূর্তি থেকে নোংরা পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন। একদল লোক এসে বলল, 'এ কী করছেন আপনি?'

—কেন?

—আমাদের ধর্মে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ জানেন না?

—সুন্দর প্রতিমাকে নোংরা করার কথা তো কোনও ধর্মে বলা নেই।

কবিরজির কথা শুনে লোকগুলো হাসতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে কবিরজি লাহোরের পথে-বিপথে ঘুরতে লাগলেন। অবাক হচ্ছেন ভাইজানেরা? কবিরজি কবে আর লাহোরে আসবেন? আমি তাঁকে নিয়েই একটা কিস্‌সা লিখেছিলাম—দেখ কবিরা রোয়ে। কবিরজি যেখানে খুশিই যেতে পারেন, মির্জাসাবের সঙ্গে মণিকর্ণিকার ঘাটে যদি তাঁর দেখা হতে পারে, তবে লাহোরের পথে-পথেই বা তিনি হাঁটবেন না কেন?

শেষ পর্যন্ত লাহোরেই ফিরে যেতে হল আমাকে। ১৯৪৮-এর জানুয়ারি মাসে সব কিছু গুছিয়ে বম্বে থেকে করাচির জাহাজে উঠে বসলাম। হয়তো ভয় পেয়েছিলাম। আমি তো ভীতু মানুষ। ইসমতকেও বলেছিলাম, লাহোর চলো, ওখানকার হিন্দুরা তো এপারে চলে আসছে, কারও না কারও বাড়ি পেয়ে যাবে। চলো ইসমত, লাহোরে আবার সব নতুন করে শুরু করা যাক।

ইসমত রাজি হয়নি। শুধু বলেছিল, 'নিজের চামড়া বাঁচাতে এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?'

—আমি এ-দেশে বহিরাগত, ইসমত।

—কে বলল?

—আমি জানি।

—না জানো না। ইউ আর আ কাওয়ার্ড। তাই পালাচ্ছ।

আমি তার চোখ দেখে বুঝেছিলাম, মির্জাসাব, সেদিন থেকে ইসমত আমাকে ঘৃণা

করতে শুরু করল। তাই বলে একটাও চিঠি লিখবে না? আমার একটা চিঠিরও উত্তর দেবে না? ঘৃণা কি সব স্মৃতি মুছে দেয়? হয়তো। না-হলে দাঙ্গার দিনগুলোর ঘৃণা কত-কত শতাব্দীর স্মৃতি মুছে দিয়েছিল কীভাবে?

বহ্ দিল নহীঁ রহা হ্যয় নহ্ বহ্ অব দিমাগ হ্যয়
জী তনমেঁ অপনে বুঝতাসা কোই চিরাগ হ্যয়।।
(সেই হৃদয়ও নেই, সে মাথাও নেই এখন,
শরীরে প্রাণ আছে, যেন একটি নিভু নিভু প্রদীপ।।)

হ্যাঁ, মান্টোভাই, এরপর শুধু বিস্মৃতির কুয়াশার ভিতরে জেগে থাকার সময়। চোখ আর কিছু দেখতে পায় না। মন আর কোনও কথা বলে না, হৃদয়ে কোনও ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে না। শাহজাহানাবাদ দখল করে ব্রিটিশ আমাদের উপহার দিল একটা মৃত শহর। সেখানে সব সময় হিম বাতাস বয়, ঝরা পাতা উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়, রাস্তাগুলো নিহত মানুষের শুকিয়ে যাওয়া রক্তে কালো হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা দিন অভিশপ্ত, আমি জানতুম, এর কোনও শেষ নেই, সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

মহল্লার পর মহল্লা ফাঁকা হয়ে গেল। মুসলমানদের তো ওরা কচুকাটা করেছে, যারা বাঁচতে পেরেছিল, তারা পালিয়ে গেছে। রাতে তাদের ঘরে বাতি দেখা যায় না, সকালে দেখা যায় না উনুনের ধোঁয়া। কথা বলবার মতো কেউ ছিল না। আমি তো কথা না-বলে থাকতে পারতুম না। বন্ধুরা ছাড়াও প্রত্যেকটা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক ছিল আমার। হাসি, ঠাট্টা, খোসগল্প না-করতে পারলে হাঁফিয়ে উঠতুম। এত নীরবতা আমি কী করে সহ্য করব বলুন। শেষ পর্যন্ত নিজের কলমের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করলুম, আর নিজের ছায়াই হল আমার বন্ধু। চিঠি লিখে যে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব, তারও তো উপায় ছিল না। ডাক-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। খবরের কাগজ আর আসে না। ফরাসি মদও পাওয়া যায় না। রাত্তিরে ওটুকু না-পেলে আমি ঘুমোতে পারতুম না। এক বন্ধু মাঝে মাঝে রম পাঠাতেন, তাই কোনও মতে বেঁচে ছিলুম।

পেনশন বন্ধ, কিন্তু অতগুলো লোকের পেটের ভাত তো জোগাড় করতে হবে। উমরাও বেগমের গয়নাগাঁটি বিক্রি করা শুরু হল। বিছানা, জামাকাপড়ও বিক্রি করতে হয়েছে। হেসে নিজেকে বলতুম, মির্জা, অন্য লোকেরা রুটি খায় আর তুমি খাচ্ছ কাপড়। কিন্তু সব কাপড় খাওয়া হয়ে গেলে কী করবে? আঙুল চুষব। বাকি পেনশন যদি পাই তবুও আয়না থেকে রং মুছে যাবে না, আর না-পেলে তো আয়নাটাই চুরমার হয়ে যাবে। হেঁয়ালি করছি না, ভাইজানেরা। এই হৃদয় তো আয়নার মতোই। রোজ ভাবতুম, দিল্লি ছেড়ে এবারে পালাতেই হবে, এখানে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হিসেব মেপে খেতে হয়। ভাবতে পারেন, মান্টোভাই, দু'দিন আমাদের ঘরে এক ফোঁটা জল ছিল না।

তবু এরই মধ্যে যে বেঁচে থাকতে পেরেছি, তা দু'চারজন মানুষের সাহায্যে। খোদা আমাকে এই অমূল্য রত্ন দিয়েছিলেন—মানুষ—দুঃসময়ে তারা কেউ না কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হীরা সিং, শিবজিরাম ব্রাহ্মণ—ওরা আমার ছেলের মতো, শাগির্দ, আমাকে কতভাবেই না সাহায্য করেছে। শিবজিরামের ছেলে বালমুকুন্দও পাশে-পাশে থেকেছে। আর হরগোপাল তফ্‌তা তো সেকেন্দ্রাবাদ থেকে যখন যেমন পেরেছে টাকা পাঠিয়েছে।

ওই দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলে সব কেমন গুলিয়ে যায়। মনে হয়, একটা ভুলভুলাইয়ার মধ্যে হারিয়ে গেছি, আর সেই ভুলভুলাইয়ার পথে পথে জমাট বেঁধে আছে রক্ত, ছড়িয়ে আছে কত চেনা-অচেনা মানুষের কাটা মুণ্ডু, তারা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কিছু বলতে চায়, আমি দেখতে পাই তাদের ঠোঁট ঘৃণায়-অপমানে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এইরকম বেওয়ারিশের মতো মৃত্যু তো তাদের প্রাপ্য ছিল না, মান্টোভাই।

বাদশাহের সঙ্গে যাদেরই সম্পর্ক ছিল, তাদের ওরা কোতল করতে ছাড়েনি। ওদের চোখে তখন মুসলমান মানেই বিশ্বাসঘাতক। আমিও সন্দেহভাজনদের তালিকায় ছিলুম। একদিন কর্নেল বার্ন গোরা সিপাই পাঠালেন আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং প্রথম থেকেই ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন। আমার বাড়ির গলিতেই থাকতেন মাহমুদ খান, মুর্তাজা খান, গুলামুল্লা খানের মতো হাকিম। এঁরা সব পাতিয়ালা দরবারের মানুষ। ব্রিটিশের সঙ্গে কথা বলে মহারাজা নরেন্দ্র সিং আমাদের গলিতে নিজের সিপাই বসিয়েছিলেন। তাই আমরা খাবারদাবার, জলের যোগাড় করতে একটু বেরুতে পারতুম। তবে চাঁদনি চকের ওপারে যাওয়ার হুকুম ছিল না। তা হলেই গর্দান যাবে। তো গোরা সিপাইরা পাঁচিল ডিঙিয়ে আমাদের গলিতে ঢুকে পড়ল। সোজা এসে আমার বাড়িতে হানা দিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে বকির, হুসেন, কাল্লু, আশেপাশের বাড়ির দু'একজনকেও কর্নেল বার্নের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। চওকের কাছেই কুতুবউদ্দিনের হাভেলিতে ছিলেন কর্নেল। এরা সত্যিই অদ্ভুত মানুষ,

যেন সেদিনই দুনিয়াতে পয়দা হয়েছেন। আমাকে ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, 'আপনি মুসলমান?'

মজা করার সুযোগ আমিই বা ছাড়ব কেন? বললুম, 'আধা মুসলমান হুজুর।'

—মতলব?

—মদ খাই, তবে শুয়োর হারাম।

কর্নেল হা-হা করে হেসে উঠলেন।—আপনি তো রসিক দেখছি।

—রসে বশেই তো ষাটটা বছর কেটে গেল, হুজুর। বলতে বলতে আমি তাঁর দিকে লন্ডন থেকে পাঠানো চিঠিটা এগিয়ে দিই। মহারানি ভিক্টোরিয়ার জন্য যে কসীদা পাঠিয়েছিলুম, তারই প্রাপ্তিস্বীকারের চিঠি।

—এটা কী?

—হুজুর একবার দেখুন।

কর্নেল বার্ন একটু চোখ বুলিয়েই চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।—এসব ফালতু জিনিস আমার দেখার দরকার নেই।

—জি হুজুর।

—দিল্লিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি কেন?

—দেখা করতে চেয়েছিলুম, হুজুর! কিন্তু পথে বেরুলেই তো গুলি করে মারবে।

—নিমকহারামদের তা হলে কী করবে?

—ঠিকই তো হুজুর।

—তা হলে আসেননি কেন?

—হুজুর—

—আমি জানতে চাই, আসেননি কেন?

—আমি একজন মির্জা, সাহেব।

—মতলব?

—পালকি ছাড়া তো আমি কোথাও যাই না। শহরে একজনও বেহারা নেই। কী করে আসব বলুন?

—তুমি কোন লাটের বাঁট হে, পাল্কি ছাড়া চলতে পারো না? কর্নেল বার্ন চিৎকার করে ওঠেন, 'গেট আউট—কেল্লার কাগজপত্রে তোমার নাম ছিল না বলে ছেড়ে দিলাম—গেট আউট—'

অপমান করাটা ওদের মজ্জায়-মজ্জায়। মানুষকে ওরা যত অপমান করতে পারে, ততই ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। আমি কি কর্নেল বার্নের মুখে মুতে দিতে পারতুম না? কিন্তু আমাদের তো তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। শাহজাহানাবাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া, অন্য কোনও পথ তো আমাদের সামনে খোলা ছিল না। শুধু মুসলমান বলেই এত অপমান, অত্যাচার, খুন হয়ে যাওয়া? শুধু মুসলমান বলেই আমি

সন্দেহভাজন? ওরা যে বিজ্ঞানের বড়াই করে, তা কাদের থেকে পেয়েছিল, মান্টোভাই? এই মুসলমানদের থেকেই তো। এত সহজে ইতিহাস মুছে ফেলা যাবে? সত্যিই তো যায়, আমি নিজের চোখে দেখেছি, শাহজাহানাবাদকে কীভাবে মুছে ফেলা হল।

কাউকে মুছে ফেলার জন্য আগে কী করতে হয়, জানেন? তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করো। এরপর কাজটা খুব সহজ। তার বিচারের প্রহসন ও মৃত্যুদণ্ড। জাঁহাপনা বাহাদুর শাহের ক্ষেত্রে ওরা একুশ দিনের প্রহসন চালিয়ে বাদশাকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। বাদশার অধীন ঝঝ্‌ঝর, বাহাদুরগড়, বল্লভগড়, লোহারু, ফররুকগর, দুজানা, পতৌদির নবাবদের কী অবস্থা করেছিল শুনুন। দুজানা, পতৌদি ছাড়া সব নবাবকেই কেল্লায় এনে বন্দি করা হয়েছিল শাহজাহানাবাদ দখলের কয়েকদিনের মধ্যে। চাঁদনি চকের কাছে গাছ থেকে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় ঝঝ্‌ঝর, বল্লভগড়, ফররুকনগরের নবাবদের।

এখন শস্ত্রধারী ইংরেজ সৈনিক
স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন।

আতঙ্কহিম নিশ্চল মানুষ,
পথ জনহীন।

নিরানন্দ বাসভূমি আজ কারাগার।
চওক্‌ পরাজিতের রক্তে রঙিন।

নগর মুসলমানের শোণিত-তৃষিত
প্রতিটি ধূলিকণা তৃপ্তিবিহীন।

আমি বসে বসে শুধু মৃত আর হারিয়ে যাওয়া মানুষদের সংখ্যা গুনি। তারা কেউ আমার আত্মীয়-বন্ধু, কেউ পরিচিত। বন্ধু ফজল-ই-হককে সারা জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শইফতা সাত বছরের জন্য কারাবন্দি হলেন। অন্যদের হত্যা করা হল বা শাহজাহানাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। শুধু এক-একটা নাম বেঁচে রইল আমার জীবনে—মুজফ্‌ফরাদ্দৌল্লা, মির নাসিরুদ্দিন, মির্জা অসুর বেগ, আহমদ মির্জা, হাকিম রাজিউদ্দিন খান, মুস্তাফা খান, কাজি ফয়জুল্লা, হুসেন মির্জা, মীর মহদী, মীর শরফরাজ হুসেন, মীরন...। আমার শয়তানের কুঠুরিতে বসে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। ওই তো মীর মেহদি আসছেন। আরে ইউসুফ মির্জা না? মীরনও তো আসছেন। ইউসুফ আলি খানকেও দেখতে পাচ্ছি। ইয়া আল্লা! এত বন্ধুর মৃত্যু আমাকে বহন করতে হবে? আমি মরলে শোক করার জন্য আর কেউ রইল না, মান্টোভাই।

কথায় কথায় যারা আইন দেখায়, তাদের রাজত্বে আইনের কোনও বালাই রইল

না। শুধু, আপনি—হিন্দুস্তানের আদমি—বলতে পারবেন না, ওরা আইনকে কবরে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। ওরা বলে দেবে, কারা আইন মানে না, আপনাকে তা মেনে নিতে হবে। একটা ঘটনা বলি। হাফিজ মাম্মু আমাদের কাছের মানুষ ছিলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ যখন ধোপে টিকল না, তখন তো মাম্মুর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতেই হবে। কমিশনার মাম্মুকে ডেকে পাঠালেন।

—হাফিজ মুহম্মদ খান কে?

—আমি হুজুর।

—হাফিজ মাম্মু কে?

—আমি সাব।

—তার মানে?

—আমার নাম হাফিজ মুহম্মদ খান। তবে সবাই হাফিজ মাম্মু বলেই ডাকে।

—কেন?

—মানুষের মর্জি হুজুর।

—দু'জন যে একই লোক আমি কী করে বুঝব?

—হুজুর, আমি তো বলছি।

—আমিও তা হলে বলছি, তুমি কিছুই পাবে না।

—কেন হুজুর।

—আগে প্রমাণ করো, তুমি কে?

হাফিজ মাম্মুকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল। আইনের রাজত্ব বলে কথা। শুনেছিলুম, লাহোরে নাকি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দফতর খোলা হয়েছে। বিদ্রোহী সিপাইরা যাদের সম্পত্তি লুঠ করেছে, তারা ১০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ পাবে। হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ আপনি পাবেন একশো টাকা। আর গোরা সিপাইরা যে লুঠপাট চালিয়েছে, তার জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না। এর চেয়ে বড় সুবিধার আর কী হতে পারে? হিন্দুস্তান তো ওদের বাপের সম্পত্তি, লুঠপাট চালিয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে কেন?

কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করত না, মান্টোভাই। বকির আর হুসেন এসে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরত। এটা দাও, ওটা দাও। আমার হাতে পয়সা কোথায় বলুন? কিন্তু ওদের তো সে কথা বলা যায় না। একদিন বিরক্ত হয়ে কাল্লুকে মহলসরায় পাঠালুম। উমরাও বেগমের কোনও গয়না যদি বিক্রি করা যায়।

কাল্লু ফিরল না, কিছুক্ষণ পর উমরাও এল আমার ঘরে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বেগম, তুমি এলে কেন?

—আর তো আমার কাছে কিছু নেই।

—হারামজাদা কাল্লুই তো এসে বলতে পারত। ও গেল কোথায়?

—ওর কোনও দোষ নেই মির্জাসাব। আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল।

—বসো। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কথা হয়?

—আমাকে ক্ষমা করুন মির্জাসাব।

—কী হয়েছে বেগম?

—আমি বেওকুফ। বুঝতে পারিনি—

—কী হয়েছে, বলো তো? চুরি করে কিছু খেয়েছ না কি? আমি হেসে বলি।—তবে খাবেই বা কী? হাওয়া ছাড়া তো কিছু নেই।

—মির্জাসাব—। কথা শেষ না করেই সে কাঁদতে শুরু করে। আরে, এত চোখের জল কোথা থেকে আসে এই জেনানাদের?

—কেঁদো না বেগম। ব্রিটিশরা দেখলে গুলি করবে। দেশটাকে ওরা মরুভূমি বানাতে চায়, আর তুমি চোখের ভিতরে এত জল লুকিয়ে রেখেছ? এবার বল তো, কী বেওকুফিটা করেছ? আমার চেয়ে বড় বেওকুফ তো তুমি নও।

—সিপাইরা যখন এল আমি একটা বাক্স-ভর্তি কিছু গয়না কালেসাবের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। জাঁহাপনার মুর্শিদ তিনি, সিপাইরা তো আর তাঁর বাড়ি লুঠ করবে না।

—হুঁ। সব খোয়া গেছে, তাই তো?

সিপাইরা কালেসাবের বাড়িতে লুঠপাট করেনি, কিন্তু গোরা সৈনিকেরা তো আর জাঁহাপনার মুর্শিদকে ছেড়ে দেবে না, মান্টোভাই। উমরাওয়ের শেষ সম্বলটুকুও এভাবে লোপাট হয়ে গেল। বলতে বলতে উমরাও কাঁদছিল। আমি তার হাত ধরে বললুম, 'বেগম, তুমি তো এত বছর দ্বীনের পথেই আছ। খোদা যে এবার পথের ভিখিরি করে ছাড়লেন, তার মানে বোঝ না? এখন তো গোটা দুনিয়াটাই তোমার।'

উমরাও ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আনন্দ করো বেগম, আনন্দ করো। জীবন থেকে যত অলঙ্কার ঝরে পড়ে, ততই তো আনন্দের পথ খুলে যাবে।

—আমরা খাব কী মির্জাসাব?

—গু। নিজেদের গু খেয়ে বেঁচে থাকব। ওখানে তো বেজন্মাগুলো হাত দিতে পারবে না।

—কী কথায় কী বলেন আপনি মির্জাসাব, নিজেও জানেন না।

—ঠিক বলছি, বেগম, ওরা আমাদের দুনিয়া থেকে লোপাট করে দেওয়ার জন্য হিন্দুস্তানে এসেছে।

কেল্লায় আর লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খানের কিতাবখানায় আমার কত যে গজল ছিল! আমি যা-ই লিখতুম নবাব জিয়াউদ্দিন তার নকল রাখতেন। প্রায় ন'শো

পৃষ্ঠার গদ্য আর দু'হাজারের বেশি কবিতা তাঁর কাছে ছিল। দেখবার মতো ছিল সে-সব কিতাব। মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো, ওপরে সোনা-রুপোর সুতোর অলঙ্করণ। জাঁহাপনার সন্তান, আমার শাগির্দ মির্জা ফকরুদ্দিনও আমার গজলের একটা সংগ্রহ তার কিতাবখানায় রেখেছিল। নিজের লেখা তো আমি কখনও গুছিয়ে রাখতে পারিনি। এতগুলো বছর পেটের ধান্দায়, নানারকম ফন্দিফিকির করে কেটে গিয়েছে। ফিরিঙ্গিরা যখন লুঠপাট শুরু করল, কিতাবখানাকেও ওরা রেহাই দেয়নি। কত যে আশ্চর্য কিতাব এই দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল। একদিন রাস্তার এক ভিখিরি আমার গজল গাইছে শুনতে পেলুম। আমি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গজল তুমি কোথায় পেলে, মিঞা?'

—রাস্তায় হুজুর।

—কাগজটা তোমার কাছে আছে?

সে তার আলখাল্লার পকেট থেকে একটা ছেঁড়া কাগজ বার করে আমার হাতে দিল। হ্যাঁ, আমার লেখা গজল। কেল্লার কিতাবখানায় যে হাতে-লেখা বই ছিল, তারই একটা পৃষ্ঠা। আমি কান্না সামলাতে পারিনি, ভাইজানেরা।

—কী হল, হুজুর?

—কাগজটা আমাকে দেবে?

—নিন না। ও দিয়ে আর আমার কী হবে?

—তুমি গাইবে কী করে?

ভিখিরি হেসে বলল, 'দিলকেতাবে সব লিখে নিয়েছি, হুজুর।'

একেকটা দিন পার হয়ে যায়, মান্টোভাই, আমার দিলকেতাবের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে যায়। মন খুলে কথা বলার মতো একজন লোকও নেই। অনেক মানুষের সঙ্গে খোশগল্প করা যায়, ঠাট্টা-ইয়ার্কি মারা যায়, কিন্তু সবাই তো তার নিজের মতো করে হাম জুবান, হাম শুখন্ লোগ চায়। সেইরকম দুয়েকজনকে তো আমার পেতে ইচ্ছে করত, যাঁদের সঙ্গে আমি কবিতা নিয়ে, আমার কল্পনা নিয়ে কথা বলতে পারি। তাঁরা পাশে না থাকলে তো গুলবাগও শুকিয়ে যায়। দিল্লিতে তখন তো শুধু সৈনিক, ইংরেজ, পাঞ্জাবি আর হিন্দু লোকজন। আমার তহ্‌জীব-এর মানুষ কোথায়? জওক নেই, মোমিন খান নেই, কোথায় গেলেন নিজামুদ্দিন মামনুন? কবিদের মধ্যে শুধু আমি আর আর্জুদা বেঁচে ছিলুম। আর্জুদা একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে, আর আমার হতবুদ্ধি অবস্থা। কেউ আর গজল লেখে না, কেউ আর কবিতার কথা বলে না। দুনিয়ায় কখনও কখনও এমন দুর্ভাগ্যের সময় আসে, মান্টোভাই, যখন কবিতার মৃত্যু হয়। আমি যেন গজলের কবরের পাশে বসেই প্রহরের পর প্রহর গুনে যাচ্ছিলুম। মৃত্যু এসে কবে আমাকে এই দুনিয়াদারির বাইরে নিয়ে যাবে, তার জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতুম না।

সারা রাত জেগেই কেটে যেত। একদিন দেখি, এক ছায়ামূর্তি আমার কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে আছে। কে এই মানুষটি? কীভাবে আমার কুঠুরিতে এসে পৌঁছলেন? দীর্ঘকায় এক পুরুষ, তাকে দেখে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন?'

—হুজুর, আমি জালালুদ্দিন রুমি।

—মওলা রুমি! আমি তাঁর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।—আমার কেয়ামতের দিন তবে এসে গিয়েছে?

—না, হুজুর।

—আপনি আমাকে হুজুর বলছেন কেন? এর চেয়ে বড় গুনাহ্ তো আর হয় না মওলা।

—সবাই আমরা হুজুর, মির্জা। হুজুর বলেছেন, একমাত্র ঘাস হয়ে বেঁচে থাকাই আনন্দের। ঋতুরা আসবে যাবে, পাতা ঝরবে, আবার গজাবে, শুধু ঘাসই প্রান্তরে প্রান্তরে ঠিক বেঁচে থাকবে। ঘাসই জানে, কীভাবে মাঝখান থেকে ছড়িয়ে পড়তে হয়।

—আপনি বলুন মওলা, আপনার জন্য কী করতে পারি, বলুন?

মওলা রুমি মুখোমুখি বসে আমার পিঠে হাত রাখলেন।—আপনাকে একটা কিস্‌সা শোনাতে এলাম, মির্জা।

—আমার আজ নবজন্ম হল, মওলা। আপনার মুখ থেকে কি স্‌সা শোনার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

—আমারও নবজন্ম হল, হুজুর। হিন্দুস্তানের সেরা শায়রকে কিস্‌সা শোনানোর সুযোগ দিয়েছেন খোদা।

—আপনার পাশে আমি কে?

—আসমানে ছড়িয়ে থাকা এক-একটা নক্ষত্র আমরা। কে কত দূরে আছি, খোদা ছাড়া কেউ জানেই না। কেউ মরে গেছে, কেউ বেঁচে আছি। তবু খোদার দয়ায় আমাদের সংলাপ চলছে, মির্জা। একদিন সন্ধেবেলা খেজুর গাছের নীচে বসেছিলেন পয়গম্বর মহম্মদ। তাঁর শিষ্যরা, আশপাশের গ্রামের মানুষরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। সূর্যাস্তের আকাশে তখন গোলাপি আর নীলের খেলা চলেছে। হঠাৎ জহ্ল উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'মহম্মদ, আপনার পূর্বপুরুষ হাসিমের মতো কুৎসিত আর নোংরা মানুষ দুনিয়াতে দেখা যায় না। তাঁর সন্তানরাও একের পর এক কুৎসিত সন্তান পয়দা করেছেন।'

হজরত মহম্মদের সবচেয়ে অনুরক্ত ভক্ত হায়দার তো সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে তরবারি বের করেছে। মহম্মদ শান্ত স্বরে বললেন, 'তুমি সত্যি কথাই বলেছো, জহ্ল।' এ-কথা শুনে হায়দার চুপসে গেল। তার তো ইচ্ছে ছিল, জহ্লের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে দেবে।

কিছুক্ষণ পর আবু বকর মহম্মদের সামনে নতজানু হয়ে বলল, 'জহ্‌লকে ক্ষমা করুন পয়গম্বর। আপনার পূর্বপুরুষ হাসিমের মতো সাহসী ও সুন্দর মানুষ দেখা যায় না। আপনিও তেমনই।'

মহম্মদ তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি সত্যি কথাই বলছ, আবু বকর।'

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হায়দার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'হুজুর, পয়গম্বর, দু'জন দু'রকম কথা বলছে। আপনার কাছে দু'জনের কথাই সত্যি? কী করে হতে পারে?'

মহম্মদ হায়দারের দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন।—তুমিও সত্যি কথাই বলেছ, হায়দার।

—আমিও সত্যি বলেছি?

—হ্যাঁ। আমি তো একটা আয়না, হায়দার। খোদা কবে থেকে আমাকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে যাচ্ছেন। আমার আয়নায় সবাই তার নিজের ছবি দেখতে পায়। নীল কাচের মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে দেখলে তবে তা নীল, আর লাল কাচের মধ্য দিয়ে যদি দ্যাখো, তবে লালই দেখবে। মানুষ যা দেখে, তা তারই প্রতিচ্ছবি।

—দুনিয়ায় তা হলে সত্য বলে কিছু নেই?

—সত্যকে তুমি পেতে চাও?

—জি হুজুর।

—তা হলে সব উত্তেজনা—আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত কর হায়দার। ভিতরের আয়নাটাকে ঘষতে থাকো, যতক্ষণ না সব রং মুছে গিয়ে একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়। তখন তুমি তাকে দেখতে পাবে, হায়দার।

—কাকে মওলা? আমি জালালুদ্দিন রুমির দুই পা আঁকড়ে ধরে বললুম।

—পা ছাড়ুন মির্জা। আপনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন—এই সৃষ্টির গভীরে হারিয়ে যাচ্ছেন—এর চেয়ে বড় আনন্দ ও সত্য আর কিছু নেই। আমি আশীর্বাদ করি, বিড়ালের মতো যেন মৃত্যু হয় আপনার।

—কেন?

—মৃত্যুর সময় বুঝতে পেরে বিড়ালরা একা হয়ে যায়। কাউকে বিরক্ত করে না, কারুর করুণা চায় না। মৃত্যুর মুখোমুখি সে একা। মির্জা, একাকিত্বই একমাত্র সত্য। আপনি এত উদ্বেল কেন? সবই তো একদিন কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে যাবে। এই দুনিয়ায় জন্মেছেন, একে ছেড়ে চলে যাবেন—কী হাল্কা, পালকের মতো উড়ে যাওয়া—এই আনন্দটুকুই তো আপনার একাকিত্বের সঙ্গী।

জানা হ্যায় জিস্‌ম জহাঁ, দিল ভি জল্ গয়া হোগা
কুরেদ্‌তে হো যো অপ্ রাখ্ জুস্‌তজু কেয়া হ্যায়?
(শরীর জ্বলে গেছে যখন, তখন হৃদয়ও পুড়ে গেছে
ছাই রয়ে গেছে শুধু, আর খোঁজো কী।)

আমি তো ঐতিহাসিক নই ভাইজানেরা, তাই দেশটা দু'ভাগ হয়ে কত লাখ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়েছিল, কত মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল চিরতরে, কত মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, কত মানুষকে 'হর হর মহাদেব' বা 'আল্লাহু আকবর' চিৎকার করতে করতে হত্যা করা হয়েছিল, আমি বলতে পারব না। আমার ঝোলায় আছে শুধু কয়েকটা কিস্‌সা, আমি সেই কাহিনিগুলোই আপনাদের বলতে পারি। তবে কি না, ইতিহাস তো শুধু কতগুলো সাল-তারিখ, সংখ্যার হিসেব নয়; মানুষের মুখে মুখে-গল্পে-গানেও তো ইতিহাসের ছবিটা তৈরি হয়ে ওঠে। দিল্লির এক দোস্তের কাছে শুনেছিলাম, ওখানে কুড়ি হাজারের বেশি মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল, পুরনো দিল্লিতে চল্লিশ হাজারের বেশি মুসলমানদের বাড়ি-সম্পত্তি অধিকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এইসব তথ্য নিয়ে আমি কী করব বলতে পারেন? শরিফান বা বিমলাদের মতো কিশোরীর জীবন কীভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তার কি কোনওভাবে ক্ষতিপূরণ সম্ভব? সহায়ের মতো মানুষের কি ওভাবে কুকুরের মৃত্যু মরে যাওয়া উচিত ছিল? আর যে বৃদ্ধা তার মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গিয়ে রাস্তাতেই মারা গেল, তার স্মৃতি আমি কী করে মুছব বলুন তো? রামখিলবানের মতো ভাল মানুষ কোন হিংসার উন্মাদনায় আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? আমরা যারা দাঙ্গার বলি হইনি, তারা সারা জীবন তো এরকম ইতিহাসই বহন করেছি, যে ই[illegible] মহাফেজখানায় নয়, রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে পাওয়া যায়। সেই ইতিহাসের ভেতরে ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে নামহীন এক ছোট ভূমিখণ্ডে পড়ে থাকে টোবাটেক সিং। এরা—মির্জাসাব—এই মানুষগুলোই—এরাই এখনও আমাদের নির্বাসিত হওয়ার দিনগুলির জীবন্ত ইতিহাস। শরিফানের কথা শুনলে, তাকে কি আর কখনও কেউ ভুলতে পারবে? দিল্লিতে কত মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল, তার হিসেব এক-এক ঐতিহাসিক এক-একরকম দিতে পারেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হিসেবটা বাড়তে পারে, কমতেও পারে; কিন্তু মেয়ে সকিনার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজুদ্দিন যখন চিৎকার করেছিল, 'আমার লেড়কি জিন্দা হ্যায় হুজুর, আমার লেড়কি জিন্দা হ্যায়', সেই মুহূর্তটাকে আর তো বদলে ফেলা যাবে

না। দুনিয়া যতদিন থাকবে, ওই ক্ষতচিহ্নটা থেকেই যাবে, যেভাবে নাৎসি ক্যাম্পের, গুলাগের গণহত্যাকে মুছে ফেলা যাবে না।

দেশভাগ আমাদের জীবনে হত্যার বীভৎস উৎসব হয়ে উঠেছিল, মির্জাসাব। শুধু তো মানুষ মানুষকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতাকে। একটা পরিবার কোনও মতে দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে বেঁচে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়েছিল। তবে তাদের কিশোরী মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছোট মেয়েটাকে কোলে আঁকড়ে রেখেছিল মা। দাঙ্গাবাজরা ওদের বাড়ির মোষটাকে নিয়ে গিয়েছিল। গরুটা ছিল, কিন্তু তার বাছুর হারিয়ে গিয়েছিল। তো, রাতে ঝোপের মধ্যে গরুটাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী লুকিয়েছিল। ছোট মেয়েটা ভয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছিল। মা আতঙ্কে মেয়েটার মুখ চেপে ধরেছিল। এমন সময় দূর থেকে একটা বাছুরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গরুটাও উন্মত্ত হয়ে ডেকে উঠল; সে চিনতে পেরেছিল, ওটা তার সন্তানেরই আওয়াজ। স্বামী-স্ত্রী কিছুতেই গরুটাকে শান্ত করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর ওরা দেখতে পেল, দূর থেকে মশালের শিখা এগিয়ে আসছে। বউটা তখন রাগে-হতাশায় স্বামীকে বলে উঠল, 'জন্তুটাকে কেন আমাদের সঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে এলে?' দাঙ্গার আগুন এভাবেই আমাদের সব অনুভূতিকে পুড়িয়ে আঙরা বানিয়ে দিচ্ছিল।

মির্জাসাব, বারে বারে মনে পড়ে, কোথায় কে যেন, উন্মাদের মতো বিড়বিড় করে বলে চলেছে :

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে ভয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
তবুও কোথাও আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের' পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে

বলে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলায়, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'

হ্যাঁ, কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে। আর যেন কখনও জ্বলে উঠবে না। সে-রকমই একদিনে কাসিম খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়িতে এসে পৌঁছল। ওর ডান পায়ে গুলি লেগেছিল, রক্তে পা ভিজে গেছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই কাসিমের চোখের সামনে কালচে রক্তের পর্দা দুলে উঠল। জমাট রক্তের মধ্যে পড়ে আছে তার বিবির মৃতদেহ। কাসিম কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর কাঠ কাটার কুড়ুলটা হাতে তুলে নিল। এবার হত্যার বদলে হত্যা। রাস্তায়, বাজারে এবার সে-ও রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে। বেরোতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল, শরিফান—তার লেড়কি শরিফান কোথায়? কাসিম চিৎকার করে উঠল, 'শরিফান—শরিফান—'।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। শরিফান হয়তো ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। ভেতরের বারান্দায় যাওয়ার দরজায় মুখ রেখে কাসিম ফিসফিস করে ডাকল, 'শরিফান—বেটি—আমি এসে গেছি।'

যেন নির্জন কোনও গুহায় এসে সে ঢুকেছে, এমনই নীরবতা। দরজা ঠেলে বারান্দায় পা রাখতেই কাসিম স্থির হয়ে গেল। একটু দূরেই পড়ে আছে শরিফানের সম্পূর্ণ নগ্ন মৃতদেহ। যেন এইমাত্র একটা গোলাপকে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলা হয়েছে। কাসিমের ভেতর থেকে একটা বিস্ফোরণ বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু ঠোঁট চিপে সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর দু'হাতে মুখ চেপে সে আর্তনাদ করে ওঠে, 'শরিফান—বেটি আমার—।' অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সে কিছু কাপড় জোগাড় করে আনে, ছড়িয়ে দেয় শরিফানের ওপর। তারপর আর ফিরে তাকায়নি। স্ত্রীর মৃতদেহের সামনেও আর দাঁড়ায়নি। হয়তো শরিফানের নগ্ন শরীরটাই সে শুধু দেখতে পাচ্ছিল। কুঠার নিয়ে কাসিম বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা লাভার মতো সে দৌড়তে লাগল। চওকের কাছে এসে এক শিখকে দেখতে পেয়েই কাসিম কুঠার চালাল। ঝড়ে শিকড়-উপড়োনো গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটি। কুঠার ঘোরাতে ঘোরাতে কাসিম এগিয়ে চলল। কাসিমের কুঠারের আঘাতে পর পর আরও তিনটি মৃতদেহ রাস্তায় ছড়িয়ে থাকল। শুধু নগ্ন শরিফানকেই সে দেখতে পাচ্ছিল; তার ভেতরের বারুদের স্তূপ তখন সশব্দে জ্বলছে। একের পর এক জনশূন্য বাজার পেরিয়ে সে একটা গলিতে এসে ঢুকল। কিন্তু সেখানে শুধুই মুসলমানদের বাড়ি। অন্য পথ ধরল সে। তার মুখে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে খিস্তির ফোয়ারা আর হাতে ঝলসাচ্ছে রক্তমাখা কুঠার।

একটা বাড়ির দরজায় হিন্দিতে নাম লেখা দেখে কাসিম দাঁড়িয়ে পড়ল। কুঠার দিয়ে সে দরজায় আঘাত করতে শুরু করল। দরজা ভেঙে পড়ল। কাসিম ভেতরে ঢুকেই খিস্তি দিতে দিতে বলতে লাগল, 'ভেতরে যারা আছিস, বেরিয়ে আয় বেজন্মার বাচ্চারা।'

ভেতরে দরজা ঠেলে খুলতেই কাসিমের মুখোমুখি একটা মেয়ে, শরিফানেরই বয়সি, নিষ্পাপ, সবুজ। কাসিম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কে তুই?'

—বিমলা। মেয়েটার কণ্ঠস্বরে কচি পাতার কাঁপুনি।

—শালি হিন্দুর বাচ্চা—

কাসিম কিছুক্ষণ স্থির চোখে পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হাতের কুঠার নামিয়ে রেখে মেয়েটাকে দু'হাতে চেপে ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। পাগলের মতো মেয়েটার জামাকাপড় ছিঁড়তে সুরু করল। সময় তখন স্থির হয়ে গেছে, মির্জাসাব। কাসিম মেয়েটাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে গলা টিপে মারল, তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। একেবারে শরিফান—শরিফানই শুয়ে আছে। কাসিম দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল। শরীরের ভেতরে এতক্ষণ আগুন জ্বলছিল, এখন শুধুই বরফ। আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেছে। নড়বার মতো ক্ষমতা ছিল না কাসিমের।

কিছুক্ষণ পর একটা লোক তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে এসে ঢুকল। সে দেখল, অন্য একটা লোক চোখ বন্ধ করে মেঝেয় পড়ে থাকা কোনও কিছুর ওপর কাঁপা কাঁপা হাতে কম্বল ছুঁড়ে দিচ্ছে। লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'কওন হো তুম?'

কাসিম চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

—কাসিম! এখানে কী করছ?

কাসিম কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় পড়ে থাকা কম্বলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডুকরে উঠল, 'শরিফান—'

যারা হত্যা করেছে, তাদের মধ্যে কত লোক এভাবেই যে পাগল হয়ে গেছে। এরা তো কেউ হত্যাকারী নয়, মির্জাসাব। তাই ঠাণ্ডা মাথায় এত বড় পাপকে সারাজীবন বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ-সব তো পারে রাজনীতির মানুষরা, ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই যারা কখনও ভালবাসেনি, তারা প্রিয়জনের রক্তও হাত থেকে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু কাসিমের মতো মানুষের কাছে তো শরিফান, বিমলা—সবাই একাকার হয়ে যায়। শুধু তো নিজের ঘর, দেশ থেকে নয়, মানুষ এভাবে সম্পর্ক থেকেও উৎখাত হয়ে যায়, সে তখন মহাকাশ থেকে ছিটকে পড়া একটা উল্কা খণ্ড। এতটাই পরিত্যক্ত যে নিজের কাছেও আর আশ্রয় নেই। মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে। আমিই তো একটা বধ্যভূমি হয়ে বেঁচে আছি।

আমার স্মৃতির বধ্যভূমিতেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই মা, মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে যায় সে, তারপর একদিন মরে পড়ে থাকে রাস্তায়। আমি তখন পাকিস্তানে মির্জাসাব। তখনও মুসলমানরা ওপার থেকে এপারে আসছে; হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। উদ্বাস্তু শিবিরগুলি যেন গরু-ছাগলের খোঁয়াড়। খাবার নেই, চিকিৎসা নেই। মানুষ পোকার মতো মরছে। এপারে-ওপারে যেসব নারী ও শিশু পালিয়ে

গিয়েছিল, আসলে অপহরণ করা হয়েছিল, তাদের উদ্ধার করার কাজ চলছে। কত মানুষ যে স্বেচ্ছায় সে-কাজে যোগ দিয়েছিল। দেখে, মনে আশা জাগত। সব তা হলে শেষ হয়ে যায়নি। খোদা নিশ্চয়ই মানুষকে একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে কত ঘটনাই না শুনতাম। একজন বলেছিল, সাহারানপুরের দু'টি মেয়ে নাকি আর মা-বাবার কাছে ফিরতে চায় না। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কত যে মেয়ে লজ্জায়-ঘৃণায় আত্মহত্যা করেছিল। অত্যাচারিত হতে হতে নেশায় ডুবে গিয়েছিল অনেকে, তেষ্টা পেলে জলের বদলে মদ চাইত, না দিলে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত খিস্তির স্রোত।

মির্জাসাব, এইসব অপহৃত মেয়ের কথা ভাবলে আমি শুধু তাদের ফুলে-ওঠা পেট দেখতে পেতাম। পেটগুলোর ভেতরে যারা আছে, তাদের কী হবে? কে নেবে ওদের? ভারত, না পাকিস্তান? আর দশ মাস ধরে বহন করার দাম কোন দেশ দেবে? নাকি এর কোনও মূল্য নেই? সবটাই আমরা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেব?

ওপার থেকে হারিয়ে যাওয়া মুসলমান মেয়েরা এপারে আসছিল; এপারের ঠিকানাহীন হিন্দু মেয়েরা ওপারে চলে যাচ্ছিল। ওদের সরকারিভাবে বলা হল 'পলাতক'। কিন্তু আসলে তো কেউ পালায়নি। তাদের অপহরণ করা হয়েছিল, উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়েছিল; কেউ পাথর হয়ে গিয়েছে, কেউ উন্মাদ, কেউ তার অতীতকেই মুছে ফেলেছে।

সে-ই মায়ের কাহিনিটা আমাকে একজন স্বেচ্ছাসেবক বলেছিল।

—সীমান্তের ওপারে তো আমাদের বহুবার যেতে হয়েছে, মান্টোসাব। প্রত্যেকবারই একজন মুসলিম বৃদ্ধাকে দেখেছি। প্রথমবার জলন্ধরে। পরনে ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুল ভর্তি ধুলো-ময়লা, সবসময় কাউকে খুঁজে চলেছেন।

—কাকে?

—ওঁর মেয়েকে। বৃদ্ধার ঘর ছিল পাতিয়ালায়। দাঙ্গায় ওঁর একমাত্র মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে খোঁজার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, পাওয়া যায়নি। হয়তো খুনই হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধাকে সে-কথা বললেও কিছুতেই মানতেন না। দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখেছিলাম সাহারানপুরে। তখন ওঁর চেহারা আরও খারাপ, আরও নোংরা। চুলে জটা ধরে গেছে। অনেকবার কথা বলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, মেয়েকে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিন। ওকে মেরে ফেলেছে। বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বললেন, 'মেরে ফেলেছে?...না, কিছুতেই না। ওকে কেউ মারতে পারে না। আমার মেয়েকে কেউ মারতেই পারবে না।'

—তারপর?

—তৃতীয়বার যখন তাঁকে দেখলাম, তখন বৃদ্ধার শরীরে একফালি ন্যাকড়া, প্রায় নগ্ন। আমি কাপড় কিনে দিতে চাইলেও নিলেন না। আমি আবার তাঁকে বোঝালাম,

আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনার মেয়ে পাতিয়ালাতেই খুন হয়ে গেছে। বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বললেন, 'কেন মিথ্যে বলছ?'

—মিথ্যে নয়। মেয়ের জন্য আপনি তো অনেক চোখের জল ফেলেছেন। চলুন, আপনাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাব।

—না—না—আমার মেয়েকে কেউ মারতেই পারে না।

—কেন?

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে যেন শিশির ছড়িয়ে পড়ল।—ও কী সুন্দর ছিল, জানো না! এত সুন্দর—ওকে কেউ মারবেই না। চড় মারতে গেলেও হাত উঠবে না।

—আশ্চর্য!

—আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মান্টোসাব। এত মার খাওয়া মানুষও বিশ্বাস করতে পারে, সুন্দরকে কেউ হত্যা করবে না?

—মার খাওয়া মানুষই তো পারে, ভাই। মার খেতে খেতে তার শেষ অবলম্বন তো সামান্য একটু সৌন্দর্য। তারপর কী হল?

—সীমান্তের ওপারে যতবার গেছি, বৃদ্ধাকে দেখেছি। দিনে দিনে তাকে প্রায় কঙ্কাল হয়ে যেতে দেখেছি। একসময় চোখেও খুব কম দেখতেন, তবু সবসময় খুঁজে চলেছেন। যত দিন গেছে, ততই তাঁর আশা দৃঢ় হয়েছে, তাঁর মেয়েকে কেউ মারতে পারে না। একদিন তিনি মেয়েকে খুঁজে পাবেনই।

—আশাকে তাই হালাল করে জবাই করতে হয়। আমি হেসে বলি।

—একজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক আমাকে বলেছিল, ওঁকে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই, একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। তার চেয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে পাগলাগারদে ঢুকিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি তা চাইনি, মান্টোসাব।

—কেন?

—মেয়েকে ফিরে পাবেন, এই আশাতেই তো বেঁচে ছিলেন তিনি। এই বিরাট পাগলাগারদে তিনি অন্তত নিজের মতো ঘুরে-ফিরে মেয়েকে খুঁজে চলেছেন। কিন্তু একটা কুঠুরিতে আটকে ফেললে, উনি তো আর বাঁচবেনই না। শেষবার ওঁকে অমৃতসরে দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, মান্টোসাব। তখন ভেবেছিলাম, এবার ওঁকে সত্যিই পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে পাগলাগারদে ভরে দেব।

—তোমার বিবেকের কামড়ানিটা তা হলে কমত, কী বলো?

—হয়তো।

—তারপর বলো।

—ফরিদ চকে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রায় দৃষ্টিহীন চোখে চারপাশে তাকাচ্ছেন আর খুঁজছেন। আমি তখন একজনের সঙ্গে অপহৃত একটা মেয়ের ব্যাপারে কথা বলছিলাম। মেয়েটা সাবুনিয়া বাজারে এক হিন্দু বানিয়ার সঙ্গে থাকত। এমন সময়

দোপাট্টায় মুখ ঢেকে একটি মেয়ে এক পাঞ্জাবি যুবকের হাত ধরে সেই পথে হাজির। বৃদ্ধার সামনে এসেই পাঞ্জাবি যুবকটি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে টানল। মেয়েটির মুখ থেকে হঠাৎ দোপাট্টার আড়াল সরে গিয়েছে আর ঝলসে উঠল তার গোলাপি মুখ। মান্টোসাব, সেই মুখের সৌন্দর্য আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।

—জানি।

—মানে?

—আমরা সেই ভাষা ভুলে গেছি, ভাই। তারপর বলো।

—আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পাঞ্জাবি যুবকটি মেয়েটিকে বলল, 'ওটাই তোমার আম্মিজান।' মেয়েটা একবার ফিরে তাকাল বৃদ্ধার দিকে, তারপর যুবকটিকে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো।' আর তখনই বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, 'ভাগভরী! ভাগভরী!' আমি গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বললাম, 'কী হয়েছে?'

—আমি ওকে দেখছি, বেটা।

—কাকে?

—ভাগভরী—আমার বেটি। ওই তো চলে গেল।

—ভাগভরী কবেই মারা গেছে আম্মিজান। বিশ্বাস করুন, আপনার বেটি আর বেঁচে নেই। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর চওকের রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন। নাড়ি টিপে দেখলাম, তিনি মারা গেছেন।

—খোদা কখনও তাঁর এতিমকে দয়া করবেন না, তা কখনও হয়?

—দয়া? এই-ই খোদার দয়া?

—মৃত্যুই তাঁর সেরা দান, ভাই।

দাঙ্গার দিনগুলিতে যে-মৃত্যু আমাদের কাছে এসেছিল, তা তো খোদার দান নয়, ভাইজানেরা। তাদের জন্য জানাজা হয়নি; শুনতে পাবেন, এখনও তাদের অতৃপ্ত আত্মারা ডানা ঝাপটায়—তাদের হাত-পায়ের শিকলের ঝনঝন শোনা যায়—এখনও কাসিম পুরনো দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, চিৎকার করে ডাকে, 'শরিফান—শরিফান—'

বম্বের জে জে হসপিটালের সামনের ফুটপাতে সহায়-এর মৃত্যুযন্ত্রণার স্বর এখনও চাপা পড়ে আছে, আমি জানি। ফরিস্তারা হয়তো সহায়-এর মতো মানুষ হয়েই এই দুনিয়াতে আসেন। সহায় দালাল—হ্যাঁ, বেশ্যাদের দালাল। কিন্তু তার মতো নিষ্ঠাবান হিন্দু আমি দেখিনি, ভাইজানেরা। সহায়-এর বাড়ি ছিল বেনারসে। এমন নিখুঁত মানুষ খুব কম দেখা যায়। একটা ছোট্ট ঘরে বসে সে ব্যবসা চালাত, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার অভাব ছিল না কোথাও। সহায়-এর মেয়েদের খদ্দেরদের জন্য বিছানা ছিল না; মাদুরের ওপর চাদর পাতা আর বালিশ। চাদরে কখনও নোংরা লেগে থাকতে দেখিনি। একজন চাকর ছিল, তবু সহায় নিজেই দেখেশুনে সব পরিষ্কার রাখত। আমি জানি, মির্জাসাব,

ও কখনও কাউকে মিথ্যে কথা বলেনি, কাউকে ঠকায়নি। একবার আমাকে বলেছিল, 'মান্টোসাব, তিন বছরে আমি কুড়ি হাজার টাকা রোজগার করেছি।'

—কী করে?

—মেয়েরা তো দশ টাকা করে পায়। আমার কমিশন আড়াই টাকা।

—তা হলে তো অনেক টাকা জমিয়েছ।

—আর দশ হাজার টাকা হলেই আমি কাশীতে চলে যাব।

—সে কী? কেন?

—একটা কাপড়ের দোকান খুলব। এই ধান্দাতে আর থাকব না।

—কাপড়ের দোকান কেন? অন্য ব্যবসাও তো করতে পার। সহায় কিছু বলেনি। সে নিজেই যেন জানত না, কেন কাপড়ের দোকান খুলতে চায়। মাঝে মাঝে সহায়-এর কথা শুনে মনে হত, লোকটা একটা বুজরুক, ফ্রড। কে বিশ্বাস করবে বলুন, যে মেয়েদের ও ব্যবসায় খাটায়, তাদের নিজের কন্যাসম মনে করে? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েগুলোর জন্য সহায় পোস্ট অফিসে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল। দশ-বারোটা মেয়ের থাকা-খাওয়ার খরচও সে দিত। আমার হিসেব কিছুতেই মিলত না। সহায়-এর এই ছোট্ট কোঠায় সবাইকে নিরামিষ খেতে হত। তাই সপ্তাহে একদিন সে মেয়েদের ছুটি দিত বাইরে গিয়ে আমিষ খেয়ে আসার জন্য। একদিন আমি যেতেই সহায় খুশিতে ফেটে পড়ল, 'মান্টোসাব, দাতা সাহেব আমাকে দয়া করেছেন।'

—মতলব?

—ইরফান এই কোঠায় আসত, মান্টোসাব। চন্দ্রার সঙ্গে ওর খুব ভাল-ভালবাসা হয়ে গেল। তা ওদের বিয়ে দিয়ে দিলাম। চন্দ্রা এখন লাহোরে থাকে। আজই চিঠি এসেছে, দাতা সাহেবের দরগায় আমার জন্য দোয়া করেছিল। দাতা সাহেব নাকি চন্দ্রার কথা শুনেছেন। বাকি দশ হাজারের জন্য আমাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

এরপর সহায়-এর সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি। শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। কারফিউ চলছে, রাস্তায় লোকজন, ট্রাম-বাস নেই। একদিন সকালে আমি ভিন্ডিবাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। জে জে হসপিটালের কাছে এসেই দেখলাম, একটা লোক ফুটপাথে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সারা শরীর। দাঙ্গার আর এক শিকার। হঠাৎ দেখলাম, শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। আমি ঝুঁকে পড়ে লোকটার দিকে তাকালাম। আরে, এ যে সহায়, রক্তের কুয়াশা ছড়িয়ে আছে তার মুখে। আমি ওর নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে যখন উঠতে যাব, তখনই সহায় চোখ মেলে তাকাল।—মান্টোসাব—

আমি তাকে অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না সহায়-এর। কোনওমতে বলতে পারল, 'আমি আর বাঁচব না, মান্টোসাব।'

তখন অদ্ভুত এক অবস্থা হয়েছিল, মির্জাসাব। একটা মুসলিম মহল্লায় সহায় রক্তের

ভিতরে পড়ে আছে—কোনও মুসলিমই তাকে মেরেছে—আর আমিও একজন মুসলিম, তার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। কেউ দেখতে পেলে, আমাকে তো তার হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। একবার ভেবেছিলাম, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব; পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, ও যদি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমাকেই ফাঁসিয়ে দেয়! দাঙ্গা এভাবেই আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, আমি তখন পালিয়ে যেতে চাইছি। সহায় আমার নাম ধরে ডাকল। আমি কিছুতেই যেতে পারলাম না।

সহায় ওর জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু বার করার চেষ্টা করছিল। শেষপর্যন্ত না-পেরে বলল, 'মান্টোসাব, আমার জামার ভেতরের পকেটে কিছু গয়না আর বারো হাজার টাকা আছে...সবগুলোই সুলতানার...আপনি তো ওকে চেনেন...ওকে ফেরত দিতে যাচ্ছিলাম...দিনকে দিন যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে...কে কোথায় থাকবে, কেউ তো জানে না...আপনি দয়া করে ওগুলো সুলতানাকে দিয়ে দেবেন...বলবেন, ও যেন এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়...হ্যাঁ আপনি...আপনিও কোথাও চলে যান...নইলে বাঁচবেন না...।'

সহায়-এর বাকি কথাগুলো তার রক্তের সঙ্গেই ফুটপাতে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। ওর মতো আমিও তো বম্বের রাস্তায় খুন হয়ে যেতে পারতাম। সে এক সময় ছিল, ভাইজানেরা, যখন বাঁচা আর মরার মধ্যে সত্যিই কোনও পার্থক্য ছিল না। একদিন মান্টোর বন্ধুরা করাচিগামী জাহাজে তার মৃতদেহ তুলে দিয়ে এসেছিল।

জের-এ ফলক্ ভলা তূ রোতা হ্যয় আপকো মীর,  
কিস কিস তরহ্ কা আলম য়াঁ খাক্ হো গয়া হ্যায়।।  
(আকাশতলায় বসে তুমি নিজের দুঃখ নিয়েই কাঁদছ মীর;  
কত সমাজ সংসার এখানে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।।)

মৃতের শহর দিল্লির দিকে তাকিয়ে কত পুরনো কথাই মনে পড়ত, মান্টোভাই। সেসব দিন তো আমরা দেখিনি, শরিফ আদমিদের মুখে-মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গল্পগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সব বাস্তবই তো একদিন না একদিন গল্প হয়ে যায়। তারা যেন জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের তসবিরখানার এক-একটা ছবি—কী রং, কী জেল্লা, কী সূক্ষ্মতা—যেন একবিন্দু জলের ভিতরে প্রতিবিম্বিত

আশ্চর্য দুনিয়া। মুঘলরা তো শুধু একটা সাম্রাজ্য তৈরি করেনি, লুঠপাট করে এই দেশ থেকে সম্পদ নিয়ে যায়নি। তহ্‌জীবেরও জন্ম দিয়েছিল। এই তহ্‌জীব-ই আমাদের শিখিয়েছে, আদব ও আখলাক ছাড়া কেউ শরিফ হতে পারে না। সুফি কবি খাজা মীর দর্দ বলতেন, আদবের শেষ কথা ছিলেন তাঁর ওয়ালিদ। অন্তরের সৌন্দর্য ফুটে উঠত মানুষটির বাইরের চেহারাতেও। দিল্লির রাস্তা দিয়ে যখন ঘোড়ায় চেপে যেতেন চেনা-অচেনা সবাই এসে তাঁকে কদমবুসি করত। আমরা যে 'সালাম আলেকুম' সম্ভাষণ করি, শুধুই তো দু'টো শব্দ নয়, এই অভিবাদনে বলা হয়েছে, আপনার ওপর খোদার শান্তি বর্ষিত হোক। কত শতাব্দীর আদব এই সম্ভাষণের মধ্যে রয়ে গেছে, ভাবুন তো। দিল্লির মৃত্যু আমার কাছে আদব ও আখলাকের মৃত্যু।

ব্রিটিশদের মধ্যে কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছিল, কেল্লাকে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া হোক, জামা মসজিদকে ধুলোয় মিশিয়ে দাও। সেখানে তৈরি হবে রানি ভিক্টোরিয়ার নামে প্রাসাদ আর গির্জা। এতটা না হলেও লাহোর আর দিল্লি দরজার নাম দেওয়া হল ভিক্টোরিয়া ও আলেক্সান্দার গেট। পুরো কেল্লাটাকেই ওরা বানিয়ে ফেলল সেনাছাউনি। জামা মসজিদ আর গাজিউদ্দিন মাদ্রাসারও একই হাল হল। ফতেপুরি মসজিদ বিক্রি করে দেওয়া হল হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে। জিনাতুল মসজিদে তৈরি হল বিলিতি রুটি বানানোর কারখানা। আমি তখন অন্ধকার কুঠুরিতে বসে কী দেখতে পাচ্ছি জানেন? ওই তো কিলা মুবারক তৈরি হয়ে গিয়েছে। সরকারি দস্তাবেজে, সবার মুখে মুখে প্রাসাদ-দুর্গের নাম কিলা মুবারক—পুণ্য দুর্গ। ১৬৪৮-এর ১৯ এপ্রিল। জাঁহাপনা শাহজাহান দৌলতখানা-ই-খাস' এ প্রবেশ করলেন। জ্যোতিষীরা ওই দিনটাই স্থির করে দিয়েছিলেন। সেই উৎসবের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারব না, মান্টোভাই। হিন্দুস্থান, কাশ্মীর, ইরান থেকে কত যে গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছিলেন। পেশকার সাদাউল্লা খান যেসব আসবাব ও গালিচা দিয়ে ঘরটিকে সাজিয়েছিলেন, তার দাম নাকি ছিল ষাট হাজার টাকা। শুনেছি তিনি একটা কবিতা লিখে খোয়াবগাহ্-র দেওয়ালে খোদাই করে দেন। খোয়াবগাহ্ জানেন তো? সম্রাট সেই বাড়িতে ঘুমোতেন আর খোয়াব দেখতেন। ঘুমোনোর বাড়ির নাম খোয়াবগাহ্; এই নামের সঙ্গে কত কল্পনা জড়িয়ে আছে, ভাবুন তো মান্টোভাই।

পাথরের বিরাট পাঁচিল ঘিরে রেখেছিল শাহজাহানাবাদকে। যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছিল সাতটা বড় দরজা—কাশ্মীরি, মোড়ি, কাবুলি, লাহোরি, আজমিরি, তুর্কোমানি ও আকবরাবাদি। লাহোরি আর আকবরাবাদি ছিল প্রধান দুই দরজা। জাঁহাপনা শাহজাহান জোড়া হাতির মূর্তি বসিয়েছিলেন সেখানে। জাঁহাপনা ঔরঙ্গজেব এসে মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপর দিল্লির ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে জানেনই তো, মান্টোভাই। নাদির শাহ, মারাঠাদের আক্রমণে দিল্লি বারবার নাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। মীরসাব লিখেছিলেন :

দিল্লি যো এক শহর থা, আলম সে ইন্তিখাব
রহতে থে মুন্তাখাব হি, জাঁহা রোজগার কে
উসকো ফলক নে লুটকে, বরবাদ কর দিয়া
হম রহনেবালে হ্যায়, উসি উজরে দিবার কে।

ব্রিটিশরা আরও নৃশংস, ভাইজানেরা। ১৮৫৮-র নভেম্বরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকার এ-দেশের শাসনভার নিয়ে নিল। মান্টোভাই, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে কয়েকদিন ধরেই আমি ধূমকেতু দেখতে পাচ্ছিলুম। ভয়ে বুক কেঁপে উঠছিল। বুঝতে পারছিলুম, আমাদের ধ্বংস আসন্ন। ইংল্যান্ডেশ্বরীর হয়ে শাসনভার হাতে নিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর। হায় আল্লা! আমি জানতুম, এবার ওদের লক্ষ্য, শাহজাহানাবাদকে—তার তহ্‌জীবকে মুছে দেওয়া। গোরারা এবার নিজের মতো করে শহরটাকে গড়েপিটে নেবে, আর আমরা, ভাঙাচোরা মানুষেরা, ক্ষতবিক্ষত ছায়ার মতো পড়ে থাকব।

আমার তখন একমাত্র বন্ধু মহল্লার একটা ঘেয়ো কুকুর। যারা পালিয়ে গেছে, তাদেরই কারও বাড়ির পাহারাদার কুকুর ছিল সে। হাড় জিরজিরে চেহারা, লোম ঝরে গেছে, সারা শরীরে পোকা। একদিন আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে শুয়ে কুঁইকুঁই করে কাঁদছিল। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

আমিও মজা করে ডাকলুম, 'ঘেউ—ঘেউ—'।

—মির্জাসাব—

আমি তো ভয়ে পিছিয়ে গেলুম। আরে, কুকুর আবার মানুষের মতো কথা বলে নাকি? কে জানে, গোরাদের রাজত্বে কখন কী হবে, কিছুই তো বলা যায় না।

সে আবার ডাকল 'মির্জাসাব—'।

—বেত্তমিজ, কুত্তা কাঁহি কা।

—দু'দিন কিছু খাইনি মির্জাসাব।

আমি চিৎকার করে ডাকলুম, 'কাল্লু, এই কাল্লু হারামজাদা।'

কাল্লু দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কাল্লু তখন প্রায় কথাই বলে না বলতে গেলে। দস্তান ছাড়া তো ও বাঁচতে পারত না। কারবালা দিল্লিতে তখন আর ওকে দস্তান শোনাবে কে?

—কুত্তাটাকে কিছু খেতে দে।

—খাবার কোথায় পাব হুজুর?

—কেন খাবার নেই কাল্লু? এখন তো ইংরেজ বাহাদুর এসেছেন—তাদের দেশে কতরকম খাবার, কত মদ—লাল, নীল, সাদা—আমাদের জন্য কেন খাবার নেই? ভিতরে গিয়ে দেখ একবার, শুকনো হাড়-টাড় কিছু পড়ে আছে কি না।

—হুজুর—

—কী হুজুর? এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? কুত্তাটা কি না খেয়ে মরবে নাকি?

—আপনিও তো না খেয়েই আছেন।

—তাতে কী? সাচ্চা মুসলমানের কাছে কেউ কিছু চাইলে, তাকে ফিরিয়ে দিতে নেই, জানিস না?

—ঘেউ—ঘেউ—

—কী হল মিঞা? একটু অপেক্ষা করো, কিছু না কিছু জুটে যাবেই।

কুকুরটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে বলে, 'চলুন না হয় রাস্তায় ঘুরে আসি। পথে ঠিক খাবার পাওয়া যাবে মির্জাসাব।'

আমি তার কথা শুনে হেসে ফেলি। কাল্লুর পিঠে হাত রেখে বলি, 'দ্যাখ, আমার ধর্মরাজ কেমন বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। এবার মহাপ্রস্থানের পথে যাব। তোর আর দুঃখ থাকবে না কাল্লু। এবার থেকে মহাপ্রস্থানের কিস্‌সা শুনতে পাবি। যা আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।'

—কোথায় যাবেন হুজুর?

—শাহজাহানাবাদ হারিয়ে যাওয়ার আগে একটু ঘুরে ঘুরে দেখি।

সেই আমার মহাপ্রস্থানযাত্রা শুরু হল, মান্টোভাই। ধর্মরাজ আমার বাড়িতে বারান্দাতেই রয়ে গেলেন। আমি তাকে মিঞা বলেই ডাকতুম। হাঁটতে কষ্ট হয়, পা দিনে দিনে ফুলছে, চোখেও ঠিকঠিক দেখি না; মিঞা আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায়। গলির পর গলি, মহল্লার পর মহল্লা মুছে যেতে থাকে। ব্রিটিশ শহরকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সেখানে গোলকধাঁধার মতো গলি ও মহল্লা তো থাকতে পারে না। গোলকধাঁধা মানেই কোথাও না কোথাও বিপদ লুকিয়ে থাকবে; বিদ্রোহীরা তো এইসব জায়গাতেই ডেরা বাঁধে। তাই বড় বড় রাস্তা বানাতে হবে, যাতে ব্রিটিশের নজরের বাইরে কিছু থাকতে না পারে। কেল্লার দেওয়ালের বাইরে চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত যত বাড়ি-ঘর ছিল সব ভেঙে দেওয়া হল। শহরের বুজুর্গ আদমিদের আবেদনে কোনও মতে বেঁচে গেল দরিবা বাজার। মান্টোভাই, বাজার ছাড়া কি শাহজাহানাবাদের কথা ভাবা যায়? উর্দু বাজার, খাস বাজার, খরম-কা বাজার, সবার ওপরে চাঁদনি চক। শাহজাহানাবাদের প্রাণস্পন্দন তো বাজারগুলোয় হাঁটলেই শোনা যেত। বাজার তো শুধু কেনাবেচার জায়গা নয়, কতরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হত বাজারেই। কতদিন আমি একা-একা এইসব বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছি। কেন জানেন? শুধু রংয়ের ফোয়ারা দেখার জন্য আর হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে উঠত নতুন কোনও মুখ, যাকে আগে কখনও দেখিনি। উদ্দেশ্যহীন ভাবে বাজারে ঘুরতে ঘুরতেই তো কত শের কুড়িয়ে পেয়েছি আমি। ভিড়ের মাঝে একা একা হেঁটে যাওয়ার মৌতাত আপনি বাজার ছাড়া কোথায় পাবেন বলুন? তো উর্দু বাজার, খাস বাজার, খরম-কা-বাজার—সব ওরা লোপাট করে দিল।

—ঘেউ—ঘেউ—মির্জাসাব—

—বলুন মিঞা। ঘেউ—ঘেউ—

—আমরা তা হলে কোথায়?

—মাটির তলায়। শাহজাহানাবাদে যখন প্রথম এসেছিলুম, মাটির গভীর থেকে উঠে এসে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। কারা জানেন, মিঞা? শাহজাহানাবাদ তৈরির সময় যাদের মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। এটাই শহর তৈরির তরিকা। ইংরেজরা এবার নতুন শহর তৈরি করছে, আমাদের তো মাটির তলাতেই যেতে হবে। তা খারাপ হবে না, মিঞা, একে অপরকে জড়িয়ে শুয়ে থাকব।

মান্টোভাই, ইংরেজদের নতুন শহরে আমার মতো মানুষ বেঁচে থেকে কী করবে, বলুন? আমাদের শহর আর ওদের শহর তো আলাদা। আমাদের দেশে যে-সব শহর তৈরি হয়েছিল, সেখানে চওড়া, সিধে রাস্তা আপনি খুব কমই দেখতে পাবেন। এখানে গলির পর গলি, সেইসব গলিকে ঘিরে একের পর এক মহল্লা। শহর নির্মাণের এই পরিকল্পনার পিছনে রয়ে গিয়েছে আমাদের অন্য জীবনবোধ। আমরা সবাই কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি। গলিপথে আমরা ঢিমে তালে চলতে পেরেছি, চলতে-চলতে কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু খোশগল্প করেছি, কারুর বারান্দায় বসে এক ছিলিম তামাক খেয়েছি, আড়চোখে তাকিয়ে কোনও বাড়ির জানলায় হঠাৎই কোনও সুন্দরীকে দেখে ফেলেছি, কত অমরুৎওয়ালা, ফুলওয়ালা, কুলপিওয়ালারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে, এইসব পথ তো শুধু হাঁটার জন্য ছিল না, বলতে পারেন এ একরকম মণ্ডপ, যেখানে চেনা-অচেনা মানুষরা মিলতে পারতুম। ব্রিটিশ যে নতুন শহরটা তৈরি করছিল তা আমাদের ওপর নজরদারির জন্য। জামা মসজিদের চারপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে সব ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হল। আর্জুদার তৈরি দার-উল-বাকাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেখানে বিনে পয়সায় সাহিত্য, চিকিৎসা, ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হত। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে, চিকিৎসায়, ধর্মতত্ত্বে ওদের কি প্রয়োজন? খোদা মেহেরবান, আমি কানে কম শুনতে শুরু করেছিলুম, নইলে তো সারাক্ষণ শুধু ভাঙনের আওয়াজেই আমার মাথা ভরে যেত।

এই ধ্বংসস্তূপে বসে আমি আর গজলকে স্পর্শ করতে পারতুম না, মান্টোভাই। আমি—আমিই একসময় গজল লিখতুম? ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যেতুম। ইবন সিনার দর্শন বা নাজিরি-র কবিতা, কোথাও কোনও শান্তি নেই। সব ফালতু—সব—কবিতা, সাম্রাজ্য, দর্শন—কিছুতেই কিছু এসে যায় না। শুধু একটু আনন্দে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় আর কিছুই নয়। হিন্দুদের তো কত অবতার, মুসলমানদের কত পয়গম্বর—তাতে কী এসে যায়? আমি হরগোপাল তফতাকে লিখেছিলুম, বিখ্যাত বা অনামা, যাই হও, তাতে সত্যিই কিছু এসে যায় না। খেয়ে-পরে, সুস্থ হয়ে বাঁচাই শেষ কথা। শিল্প

আসলে এক বধ্যভূমি, তফ্‌তা, যেখানে তুমিই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, তুমিই জহ্লাদ। খোদা, এই মায়াপাশ থেকে আমাকে মুক্ত করো। এতগুলো বছর আমি নিজের, আমার কাছের মানুষদের রক্ত ঝরিয়েছি, আর সেই রক্তেই রাঙা হয়ে উঠেছে আমার শিল্পের গুলবাগ। জাঁহাপনা ঔরঙ্গজেব, আমি আপনাকে সমর্থন করি। ধ্বংস করুন সব ছবি, মূর্তি—মিঞা তানসেনের শ্বাসরোধ করুন—গর্দান নিন মীর তকী মীরের...এত মাংস নিয়ে আমরা কী করব বলুন? আমার অন্ধকার কুঠুরিতে বসে কিছুই আর চিনতে পারতুম না, মান্টোভাই। চারপাশের দুনিয়া—কাউকে নয়। যদি অনেক শতাব্দী পরে সাদি বা হাফিজসাবের সঙ্গে আমার নাম কেউ উচ্চারণ করে, তাতে কী এসে যায়? আমি তো একটা কুকুরের মতো তাড়া খেয়েই বেঁচেছিলুম।

ওদের চোখে মুসলমানরা রাস্তার কুকুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দিল্লি অধিকারের কিছুদিন পর থেকে হিন্দুরা শহরে ফিরে আসতে পারছিল, মুসলমানদের ফিরতে দেওয়া হয়নি। অনেক পরে তারা শহরে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল। মান্টোভাই, বড়-বড় খানদানের বেগম, ছেলেমেয়েরা তখন রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করছে। কেল্লার চাঁদপানা মুখের বেগমরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের মনে বিড়বিড় করছে, হাসছে। আমার মহাপ্রস্থানের পথে এইসব ভাঙাচোরা, মরেও হেঁটে-চলে বেড়ানো মানুষকে দেখতে পেতুম মান্টোভাই। আর প্রার্থনা করতুম, খোদা, আমাকে আমার কবরে নিয়ে চলো। একটুকরো কফন আমার জন্য রেখো।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে জামা মসজিদের চত্বরে বসে পড়লুম। শ্বাস নিতে পারছিলুম না, মনে হচ্ছিল, শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলুম, মান্টোভাই, দরজায় তার ছায়া এসে পড়েছে। রোজ মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসতুম। ঘুমের মধ্যে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। একের পর এক গাছ থেকে ঝুলছে মৃতদেহ। বুকের বাঁদিকে ছুরি চালানোর ব্যথা নিয়ে আমি জেগে উঠতুম। ভয় হত, যদি এই মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড বোবা হয়ে যায়? খোদা, আমাকে রহ্‌ম করো, মৃত্যুকে এবার পাঠাও, মনে মনে সবসময়ই তো এ-কথা বলতুম, অথচ ভয় পেয়ে কেন জেগে উঠতুম, কেন বুকের বাঁদিক চেপে ধরে ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতুম? জামা মসজিদের চত্বরে বসে যখন হাঁফাচ্ছি, আমার মিঞা ডেকে উঠল।

—ঘেউ—ঘেউ—

—একটু জিরিয়ে নিতে দিন মিঞা। ঘেউ—ঘেউ—

—এখনই জিরোবেন? আরও কত দেখার বাকি আছে, মির্জাসাব।

—ঘেউ—ঘেউ—। আপনি চলে যান, মিঞা। আমি আর মহাপ্রস্থানের পথে হাঁটব না।

—বেশ তো, তবে না হয় একটা কবিতা শুনুন। ঘেউ—ঘেউ—

—কবিতার পেছনে আমি লাথি মারি।

—ঘেউ—ঘেউ—। ভালবাসার ধনকে এভাবে লাথি মারতে নেই, মির্জাসাব। আমি তো জানি, কবিতা ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসেননি আপনি।

—কাউকে নয়?

—না। কাউকে নয়। দুনিয়ার সব রং-রূপ আপনি অক্ষরের ভিতরেই দেখেছিলেন, মির্জাসাব। অক্ষরই আপনার রক্তমাংস। আমি আপনার শেষ কবিতাটা বলছি, শুনুন।

—আমার শেষ কবিতা?

—ঘেউ—ঘেউ—। এক শতাব্দী পরে তা লেখা হবে।

—বলুন মিঞা।

—ঘেউ—ঘেউ—। কবিতা কেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যায়, তাই না মির্জাসাব?

আমার ধর্মরাজ মিঞা স্থির হয়ে বসে জামা মসজিদের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে :

এই তো জানু পেতে বসেছি পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপ ন ক্ষয়
চোখের কোণে এই সম ় পরাভব
বিযায় ফুসফুস ধমনী শি ।

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চ
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

নাকি এ শরীরের পাপের বীজাণু
কোনই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে।

নাকি এ প্রাসাদে আলোর ঝলকানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কিন্তু আমার আর কোনও স্বপ্ন ছিল না, মান্টোভাই। গোরারা সব স্বপ্ন কিমা করে ওদের তেলে কিমার গোল্লা ভাজছে। সেদিন ফিরে দেখলুম, বাড়ির সামনে কিছু লোকজন, উমরাও বেগম বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই উমরাও কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'মির্জাসাব—'

—কী হয়েছে, বেগম?

—কাল্লু—

—কী করেছে কাল্লু হারামজাদা?

এতদিনের কাল্লু আমাদের ছেড়ে চলে গেল, ভাইজানেরা। কী করেই বা বাঁচবে? ওকে কিস্‌সা শোনাবে কে? কাল্লু তাই ঘুমিয়ে পড়ল, ওর মুখের কষ বেয়ে গ্যাঁজলা নামছিল। আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ডাকলুম, 'কাল্লু—বেটা আমার—'

—হুজুর—

—আর হুজুর বলিস না কাল্লু। তুই আমার বাপ—তুই আমার বেটা—কী কষ্ট হয়েছিল কাল্লু?

—দস্তানগোর-রা সব কোথায় গেল হুজুর?

—আমিই তো রোজ এসে কত দস্তান বলতুম তোকে কাল্লু।

—মাফ কিজিয়ে হুজুর। আপনার দস্তানে কোনও রং ছিল না।

—রং দেখবি? আয়, তা হলে আমার হাত ধর।

—কোথায় যাব হুজুর?

—জাঁহাপনা সলোমনের দরবারে।

—মাশাল্লা।

—কত মণি-মুক্তো-হিরে-জহরত থেকে রং ঠিকরোচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস?

—জি হুজুর। আঃ! কী আলো—কী আলো—হুজুর, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। দস্তানের ভেতরে তো একেকরকম আলো দেখতে পেতাম হুজুর।

—ওই দেখ, সভাকবি শাহেদ এসে জাঁহাপনার পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না—কথা জড়িয়ে গেছে তাঁর।

সলোমন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে আপনার? এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন?'

ভয়ে শাহেদের ঠোঁট নীল হয়ে গিয়েছে। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'আমাকে বাঁচান জাঁহাপনা।'

—কী হয়েছে বলুন? কে আপনাকে মারতে চায়?

—হাওয়া হুজুর—রাস্তায় রাস্তায় শুধু একই হাওয়া—কী যে ঠাণ্ডা—তলোয়ারের মতো আমার বুকে, পেটে, চোখে এসে ঢুকছে—আমাকে বাঁচতে দেবে না।

—কে?

—ইস্‌রাফিল হুজুর। আপনার দরবারে আসতে আসতেই তাঁকে দেখলাম। কালো কাপড়ে তাঁর মুখ ঢাকা। তাঁর দৃষ্টি ছোরার মতো আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। হুজুর, ইস্‌রাফিলের নিশ্বাস থেকে আমাকে বাঁচান। কত কাজ আমার বাকি রয়ে গেছে। আমি এখনই মরতে চাই না।

—আমি কী করব, বলুন?

—হাওয়া তো আপনার ক্রীতদাস।

—হুঁ।

—তাঁকে বলুন আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে। ইস্‌রাফিলের থেকে দূরে মহাসাগরের ওপারে থাকব আমি।

—তাই হোক।

জাঁহাপনা সলোমন হাওয়াকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর প্রিয় কবিকে পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে হিমালয়ের ওপর দুর্গম অরণ্যে রেখে আসতে বললেন।

পরদিন তাঁর দরবারে ভিড়ের মধ্যে ইস্‌রাফিলকে দেখতে পেলেন জাঁহাপনা। তিনি মৃত্যুর ফরিস্তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল আপনি আমার প্রিয় কবিকে ভয় দেখিয়েছেন?'

—না জাঁহাপনা। কবি শাহেদকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। খোদা আমাকে বলেছিলেন, কালকের মধ্যেই তাঁকে ভারতবর্ষে পৌঁছে দিতে। তো আমি ভাবলাম, কবির ডানা থাকলেও তো তিনি একদিনে পৌঁছতে পারবেন না। তাই—

—হুজুর—। কাল্লু চোখ মেলে তাকাল।

—বল কাল্লু।

—এটা কোন দেশ হুজুর?

—ভারতবর্ষ।

—সালাম আলেকুম, হুজুর। কাল্লু আবার চোখ বুজল।

কাল্লুকে কবরে শুইয়ে দিয়ে এসে আমার কুঠুরিতে বসেছিলুম। যেন নক্ষত্রহীন আকাশের মধ্যে বসে আছি। বেগম কখন এসেছে টেরও পাইনি। একসময় কান্নার শব্দ পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে?'

—আমি মির্জাসাব।

—উমরাও—কী হয়েছে—ঘুমোওনি?

—আপনিও তো ঘুমোননি।

—কিছু বলবে?

—চলুন, এই দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাই।

—কোথায়?

—আপনি জানেন।

—কবর ছাড়া তো আর কোনও জায়গা নেই, বেগম। খোদা কখন কাকে ডাকবেন, তিনিই জানেন। কয়েকটা দিন তোমাকে শুধু স্বপ্ন দেখতে হবে, বেগম। তুমি শাহজাহানাবাদেই আছো। কান খাড়া করে শোনো—ওই তো ফতেপুর সিক্রি থেকে মিঞা তানসেনের পুকার ভেসে আসছে—

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। আমার ধর্মরাজ মিঞা ভিজতে ভিজতে কুঁই কুঁই করে ডাকছে।

মান্টোভাই, রহম্ করুন, এবার আমাকে শেষবারের মতো ঘুমোতে দিন। আল্লা মেহ্‌রবান।

> হম-নে বহ্‌শৎকদহ্-এ বজম-এ জঁহা-মেঁ জুঁ শমা
> শোনহ-এ ইশ্‌ক-কো অপনা সর ও সাঁমা সমঝা।।
> (দুনিয়ার এই ভয়ানক উজাড় মজলিসে প্রদীপের মতো আমি
> প্রেমের শিখাকেই আমার স্বর্বস্ব জ্ঞান করলাম।।)
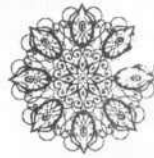
> য়েহ্ লাশ-এ বেকফান অসদ খুস্তহ্ জাঁ-কী হৈ;
> হক মগ্‌ফিরৎ করে, অজব আদাজ মর্দ্ যা।।
> (এই কফনহীন মৃতদেহ ভগ্নহৃদয় আসাদেরই;
> ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন, বড়ো স্বাধীনচিত্ত পুরুষ ছিলো।।)

লাহোরে পৌঁছনোর পর তিন মাস যেন আমার ভিতরে একটা ঘূর্ণিঝড় চলছিল, মির্জাসাব। কখনও মনে হত, বম্বেতেই আছি, কখনও করাচিতে দোস্ত হাসান আব্বাসের বাড়িতে, আবার কখনও মনে হত, লাহোরেই তো আছি। তখন লাহোরের হোটেলে-হোটেলে কয়েদ-এ-আজম জিন্নার তহবিলের জন্য নিয়মিত নাচ-গানের আসর বসানো হত। কী করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না; মাথার ভিতরের

মরুভূমিতে বালির ঝড়। যেন সিনেমার একটা বিরাট পর্দায় জটপাকানো সব দৃশ্য ভেসে উঠছে। বম্বের বাজার, রাস্তাঘাট দেখতে পাচ্ছি; তার সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে করাচির পথের ছোট ছোট ট্রাম আর গাধায় টানা গাড়ি; পরক্ষণেই ভেসে উঠছে লাহোরের কোনও উদ্দাম পানশালার ছবি। আমি তা হলে কোথায় আছি? মমির মতো চেয়ারে বসে বসে ভাবনার ঢেউয়ে লুটোপুটি খেতাম। শফিয়া প্রায়ই বলত, 'এভাবে কতদিন ঘরে বসে থাকবেন মান্টোসাব?'

—কোথায় যাব বলো তো?

—একটা চাকরি-বাকরির তো ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে সংসারটা চলবে কী করে?

—কে আমাকে চাকরি দেবে শফিয়া?

—ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়া-আসা শুরু করলে—

ইন্ডাস্ট্রি মানে লাহোরের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। শফিয়া তো জানত না, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলে লাহোরে তখন কিছুই নেই বলতে গেলে। অনেক ফিল্ম কোম্পানির নাম শোনা যেত বটে, তাদের ছোটখাটো অফিসও ছিল, কিন্তু বাইরে সাইনবোর্ডের শোভা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রযোজকরা লাখ-লাখ টাকার ছবির কথা বলত, অফিস তৈরি করত, ভাড়া করে অফিসের জন্য আসবাব আনাত, তারপর অফিসের কাছাকাছি ছোট ছোট রেস্তোরাঁর টাকা না মিটিয়েই চম্পট দিত। এরা সবাই এক-একটা জোচ্চোর। যারা নিজেরাই ধার করে জীবন চালায়, তারা দেবে চাকরি? কিন্তু সত্যিই তো আমার কিছু কাজ করা দরকার। বম্বে থেকে যেটুকু টাকা নিয়ে এসেছিলাম, তা ফুরিয়ে এসেছে। শুধু সংসার খরচ নয়, ক্লিফটন বার-এ আমার মদের বিলও তো মেটাতে হয়েছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, আমি লাহোরেই আছি আর এই ছন্নছাড়া লাহোরেই আমাকে বাকি জীবনটা থেকে যেতে হবে। মোহাজিররা তো বটেই, যারা উদ্বাস্তু নয় তারাও তখন নানা ফিকিরে কোনও দোকান বা কারখানা বানিয়ে নেওয়ার ধান্দায় ব্যস্ত। আমাকেও সবাই বলেছিল, এই সুযোগে কিছু গুছিয়ে নাও। লুঠেরাদের দলে গিয়ে আমি ভিড়তে পারিনি, মির্জাসাব। একটা ভুল রাজনীতির জন্য দেশভাগ আর তার সুযোগ নিয়ে একদিনেই বড় লোক হয়ে যাব আমি? নিজেকে এত দূর নীচে নামানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চারপাশে এত বিভ্রান্তি আমি আর কখনও দেখিনি। একজন মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে তো আরেকজন হতাশ্বাসে ডুবে গেছে। একজন্যের বেঁচে থাকার মূল্য অন্যজনের মৃত্যু। যেন এক মৃত্যু উপত্যকায় আমরা বেঁচে আছি। রাস্তার রাস্তার স্লোগান 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কয়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ'; আর স্লোগানের ভিতরে আমি শুনতে পেতাম গুমরে ওঠা কান্না। শুধু তো মানুষের নয়; গাছেদের, পাখিদের কান্না। যে-সব মোহাজিরের রাস্তা ছাড়া আশ্রয় জোটেনি, তারা বড়-বড় গাছের বাকল খুলে শীতের রাতে আগুন জ্বালাত; নইলে

ওরা বাঁচবেই বা কী করে? উনুন জ্বালানোর জন্যও কত যে গাছ আর গাছের ডাল-পালা কাটা হয়েছিল। লাহোরের পথে পথে শুধু নগ্ন গাছ—গাছেদের কান্না একটু খেয়াল করলেই শোনা যেত। বাড়িগুলো যেন সব শোকে অন্ধকার হয়ে আছে। মানুষের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কেউ তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে—সবাই যেন কাগজে তৈরি মানুষ।

হয় বাড়িতে একটা কাঠের পুতুলের মতো চেয়ারে বসে থাকতাম, না-হলে ভবঘুরের মতো লাহোরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। মানুষের মুখচোখের হাবভাব দেখতাম, কথাবার্তা শুনতাম, হ্যাঁ মন দিয়ে শুনতাম, তারা কী পেয়েছে, কী পায়নি, স্বপ্নগুলো কীভাবে চুরমার হয়ে গেছে, এমনকী আলতু-ফালতু কথাও আমি গোগ্রাসে গিলতাম। হাঁটতে হাঁটতে, মানুষের কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় জমে-থাকা ধোঁয়াশা কেটে যাচ্ছিল। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কথারা, তাদের গায়ে জড়িয়ে থাকা উত্তাপ, দীর্ঘশ্বাস শুকিয়ে যাওয়া কান্না আমার ভিতরে ঢুকে পড়ছিল; বাড়িতে ফিরে যখন চুপচাপ বসে থাকতাম, তখন কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চাইত, মনে হত, আমার প্রতিটি রোমকূপ যেন ফেটে যাবে—ওরা—কথারা বেরিয়ে আসতে চাইছে ক্ষোভে-ঘৃণায়-দুঃখে; রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া কথারা তো কারও না কারও কাছে পৌঁছতে চায়, মির্জাসাব। তারা যেন আমাকে খুঁজে পেয়েছে—আমার ভিতরেই কথারা মেলে ধরতে চায় তাদের উদ্বাস্তু জীবন।

আমি আস্তে আস্তে লিখতে শুরু করলাম। এছাড়া তো কিছু করারও ছিল না। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নেই যে তাদের জন্য গল্প লিখে রোজগার করব। তাই কাগজে-পত্রিকায় লিখেই যেটুকু পাওয়া যায়। আমি সারাদিনের জন্য একটা টাঙ্গা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়তাম। গল্পের ফিরিওয়ালা বলতে পারেন। কাগজের অফিসের সামনে টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে গিয়ে গল্প লিখতে বসে যেতাম। গরমাগরম গল্প নাও, হাতে-হাতে টাকা দাও। তারপর চলো আরেক পত্রিকার দফতরে। এরা চায় আমার ব্যঙ্গরচনা; বসে গেলাম লিখতে। টাকা পকেটে গুঁজে টাঙ্গায় চেপে আবার ছুট। টাকা-পয়সা কোনওদিনই গুনিনি; ও-সব আমার ধাতে ছিল না। মোটামুটি রোজগার হলেই প্রথমেই চাই মদ, তারপর সংসারের জন্য খরচ।

লাহোরে এসে আমার মদ্যপান অসম্ভব বেড়ে গেল, মির্জাসাব। চারপাশে বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, সামনের দিনগুলো একেবারে অন্ধকার, আমি মরে গেলে বিবি-বাচ্চারা একেবারে পথে গিয়ে বসবে—মাঝে মাঝেই ওই এক ঘোর—আমি তো বম্বেতেই আছি—ভেবেছিলাম, পাকিস্তান আমাকে লেখক হিসাবে মর্যাদা দেবে, আমি তো নিজের দেশ মনে করেই এখানে এসেছি, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম, আমাকে ওরা রাস্তার কুকুর ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। সবসময় নেশার ঘোরের মধ্যেই থাকতে ইচ্ছে করত, যেন কুয়াশাচ্ছন্ন এক টিলায় একা একাই বসে আছি। লিখে

রোজগার করার জন্য যে-টুকু সময় জেগে থাকা, তা ছাড়া নেশার ঘুমঘোরে ডুবে থাকার মতো শান্তি আর কিছুতে নেই। সেই ঘোরের ভিতরে কত যে মানুষ এসে হানা দিত—ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট তাদের চেহারা—আমি যেন একটা ভূতে পাওয়া বাড়ির মতো বেঁচে আছি। ছায়া-মানুষগুলোর সঙ্গে আমি অনর্গল কথা বলে যেতাম। শফিয়া এসে আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোর ভেঙে দিত। ঘোর কেটে যেতেই শরীর তার নিজের নিয়মে মদের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠত। আমার উন্মাদনা আরও বেড়ে যেত। নেশার এই চক্র থেকে বের করে আনার জন্য শফিয়া তো কম চেষ্টা করেনি। আমি ততই নতুন ফন্দি-ফিকির বার করে ঘোরের জগতে ঢুকে পড়তাম। কয়েকজন স্যাঙাত জুটেছিল; আমি জানতাম, লেখক মান্টোকে ওরা চেনে না—জানে না; আমরা শুধু এক গ্লাসের ইয়ার; হাতে পয়সা না থাকলে ওরাই তো আমাকে বাঁচাত, তাই ওদের ছাড়ব কী করে বলুন? মদ খেতে খেতে শরীর-মনের এমন একটা অবস্থা, কেউ ভাল কথা বলতে এলেও আমি ক্ষেপে উঠতাম। আহমদ নাদিম কাসিমি কতবার আমাকে বুঝিয়েছে; কিছুদিন চুপ করে শুনেছিলাম, তারপর একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে বলেই ফেললাম, 'কাসিমি তুমি আমার দোস্ত। মসজিদের মোল্লা নও যে আমার চরিত্র দেখভাল করার ভার তোমার ওপর দেওয়া হয়েছে।' কাসিমি এরপর থেকে আর কিছু বলেনি। লাহোরে পুরনো যে দু-একজন বন্ধু ছিল, তারাও দূরে সরে যেতে থাকল। আত্মীয়রাও কেউ আর কথা বলত না। সবাই আমাকে দেখে পালায়। আরে ওই যে মান্টো—পালাও, পালাও—শালা আবার টাকা ধার চাইবে। হ্যাঁ, এতটাই নীচে নেমে গিয়েছিলাম আমি। লিখে আর ক'টা টাকা রোজগার হত বলুন? রোজ নেশা করার জন্য তো টাকা চাই। হাতের কাছে যাকেই পেতাম, তার কাছেই ধার চাইতাম। কখনও শফিয়ার শরীর খারাপ, কখনও মেয়েরা অসুস্থ—এইসব মিথ্যে কথা বলে। মির্জাসাব, নেশা যে আমাকে কোন অতল সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পারতাম, কিন্তু সেই অন্ধ প্রবৃত্তি তখন আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। পেটে মদ না পড়লে স্থির থাকতে পারি না, হাত-পা কাঁপে, মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়ে যায়।

সবচেয়ে নোংরা কাজটা করে বসলাম বড় মেয়ে নিঘাতের টাইফয়েডের সময়। ওর ওষুধ কেনার জন্য এক আত্মীয়ের কাছে টাকা ধার করে মেয়ের ওষুধের বদলে হুইস্কির বোতল নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রোজ এত চিৎকার-চেঁচামেচি করে, কিন্তু শফিয়া সেদিন আর একটা কথাও বলল না। অনেকক্ষণ আমার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর এক গ্লাস জল রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে নিঘাতের জ্বরে আচ্ছন্ন গোঙানি। জল না-মিশিয়ে কিছুটা খেতেই বমি করে ফেললাম। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি নিঘাতের মাথার কাছে বসে ওর কপালে জলপট্টি দিচ্ছে শফিয়া। আমি শফিয়ার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

—ওর খুব জ্বর। আপনি ও ঘরে যান মান্টোসাব।

—না, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নিঘাতের কসম, আমি আর মদ ছোঁব না।

—আর কত কসম খাবেন আপনি মান্টোসাব?

—বিশ্বাস করো—এবার সত্যিই—আবার সব নতুন করে শুরু করব শফিয়া।

শান্ত গলায় শফিয়া বলল, 'আমার যে দম ফুরিয়ে গেছে মান্টোসাব।'

—শফিয়া, শেষ বার আমাকে বিশ্বাস করো। তুমি তো আমার মনের জোর জানো। চেষ্টা করলে আমি সব পারি।

শফিয়া হাসে, 'ঠিক আছে। আপনি এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

আমি নিঘাতের পাশে গিয়ে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছিল। আমি মরমে মরে যাচ্ছিলাম, এ কীরকম পিতা আমি, মেয়ের ওষুধের টাকায় মদ কিনে আনি। নিঘাত, বেটি, আমাকে ক্ষমা করো। আমি ওকে কোলে তুলে নিতে চাইছিলাম, কিন্তু সেই শক্তি তখন আমার শরীরে নেই। শফিয়া এক সময় চিৎকার করতে করতে আমার হাত ধরে টানতে শুরু করল, 'যা করেছেন তো করেছেনই। এবার মেয়েটাকে শান্তিতে থাকতে দিন, মান্টোসাব।'

—না, আজ রাতে আমি ওর পাশে থাকব।

—আপনি এইরকম করলে নিঘাত আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

—ও আমার মেয়ে—আমি ওর পাশে—

—দয়া করুন মান্টোসাব। আমরা আপনার খেলার পুতুল নই। কী ভাবেন নিজেকে? তার চেয়ে নিজের হাতে আমাদের চারজনকে খুন করে ফেলুন।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে কারা কারা যেন ঘরে এসে ঢুকেছিল। হামিদের বিবি শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, 'বহুৎ হো গিয়া চাচাজি। ইয়ে দারুখানা নেহি হ্যায়। আপনি ও ঘরে যান'।

জীবনে প্রথম কেউ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এভাবে কথা বলতে পারল, মির্জাসাব। আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। একটা শামুকের মতো খোলায় গুটিয়ে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উত্তর দেবার মতো মনের জোরই আমার ছিল না। অপমান নয়, নিজের ওপর ঘৃণাও নয়, মনে হচ্ছিল, আমার আর কোনও অবলম্বন নেই। আমাকে আঘাত করার অস্ত্র আমিই অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছি। ঠিক করলাম, এবার সত্যিই আর মদ নয়; বম্বেতে যেমন সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসার করতাম, লাহোরেও আবার তা নতুন করে শুরু করতে হবে।

পরদিন সকাল থেকেই ঘরের কাজে লেগে গেলাম। প্রত্যেকটা ঘর নিজের হাতে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করলাম, দেওয়ালের-আসবাবপত্রের ঝুল ঝাড়লাম। একটা চেয়ারের পায়া ভেঙে গিয়েছিল, বসে বসে সেটার মেরামতি করলাম। পুরনো কাগজপত্র, জমে ওঠা মদের বোতল বিক্রি করে দিলাম। বাচ্চাদের জন্য বারান্দায় টাঙিয়ে দিলাম দোলনা। বাজার থেকে বড় খাঁচাভর্তি এক ঝাঁক রংবেরংয়ের পাখি

কিনে নিয়ে এলাম। নজত আর নসরত—নিঘাতের পরের দুই মেয়ে আমার—এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল ওদের চোখ। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, মির্জাসাব; দু'টো ছোট ছোট মেয়ে কত ছোট কিছু পেয়েই খুশি হয়ে ওঠে, নেশার ঘোরে ডুবে থেকে আমি দেখতেই পাইনি।

শফিয়া এসে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার নতুন কী পাগলামি মান্টোসাব?'

—পাখি ছাড়া সংসার সুন্দর হয় শফিয়া?

—কোন সংসারের কথা বলছেন, মান্টোসাব?

—কেন, আমাদের—আমাদের ছাড়া আর কোন সংসার আমি সাজাতে যাব শফিয়া?

—আবার সাজাবেন? নতুন করে ভাঙার জন্য?

শফিয়ার হাত চেপে ধরে বললাম, 'আমাকে এই শেষবার বিশ্বাস করো শফিয়া। আর আমাকে একটু সাহায্য করো। আমি সব নতুন করে সাজিয়ে তুলব।'

—মান্টোসাব, শুধু আপনার ওপর বিশ্বাস নিয়েই আমি এতদিন বেঁচে আছি। নইলে কবেই খুদকুশি করতাম।

—ছিঃ! শফিয়া, তোমার তিনটে মেয়ে আছে ভুলে যেও না।

—তারা আপনার মেয়ে নয়?

—আমাকে বিশ্বাস করো শফিয়া। দুঃস্বপ্নের দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। কয়েকটা দিন একেবারে নতুন জীবন। মদ না খাওয়ার জন্য শরীর খুব দুর্বল লাগত, তার জন্য এল ভিটামিন ট্যাবলেট, টনিক। শুধু আমার সংসারই নয়, চারপাশের আত্মীয়-পরিজনরা মিলে যেন এক উৎসব শুরু হয়ে গেল। মান্টো মদ ছেড়ে দিয়েছে—এর চেয়ে সুখবর তাদের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তবে পুরোপুরি কেউই বিশ্বাস করে উঠতে পারত না। আগেও তো কতবার এরকম হয়েছে। এবারও একইভাবে সকলের বিশ্বাস ভেঙে দিল মান্টো। দিন কয়েক পরেই ইয়ারদের সঙ্গে জুটে গেল সে। আবার বোতল এল বাড়িতে। আমি বুঝতে পারছিলাম, মদের ওপর আমার নির্ভরতা চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। যে ক'দিন মদ খেতাম না, একটা শব্দও লিখতে পারতাম না। না-লিখলে সংসার খরচের টাকা আসবে কোথা থেকে? বাঁচি বা মরি, মদই আমার শেষ আশ্রয় হয়ে গেল মির্জাসাব।

অনেক আশা নিয়ে তো আমি পাকিস্তানে এসেছিলাম। সেই আশার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেক প্রশ্নও। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাহিত্য কি আলাদা হবে? যদি হয়, তবে তার রূপ কেমন হবে? অবিভক্ত ভারতে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, কারা তার যথার্থ অধিকারী? সেই সাহিত্যও কি দু'ভাগ হয়ে যাবে? ওপারে কি উর্দুকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হবে? পাকিস্তানেই বা উর্দু ভাষা কী চেহারা নেবে? আমাদের রাষ্ট্র কি

ইসলামি রাষ্ট্র হবে? রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও আমরা সরকারকে সমালোচনা করতে পারব? ইংরেজ শাসনে যে অবস্থায় আমরা ছিলাম, তার চেয়ে কি ভালভাবে থাকতে পারব? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, মির্জাসাব। গল্প ফিরি করে যে সংসার চালায়, এত বড়-বড় প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তার? তার ওপর পাকিস্তান সরকার তো সব সময় আমার পিছনে লেগেই ছিল। 'ঠাণ্ডা গোস্ত' আর 'উপর, নিচ অওর দরমিয়াঁ' গল্পের জন্য অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা, জরিমানা। পাকিস্তানের বহু লেখক বুদ্ধিজীবী চাইছিল, আমাকে জেলে ভরে খুব এক চোট শিক্ষা দেওয়া হোক। প্রায়ই আদালতে হাজিরা দেওয়া, জেরার পর জেরা—এত মানসিক চাপ আমি আর বইতে পারছিলাম না মির্জাসাব। মদ খেলেও কষ্ট, না-খেলেও কষ্ট। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আমার লিভার শেষ হতে বসেছে—মাথাও আর ঠিকঠাক কাজ করে না—একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ আমার সামনে খোলা ছিল না। তবু কতবার যে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি! তখন আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। একবার শফিয়া বলল, 'মান্টোসাব, আপনি সত্যিই মদ ছেড়ে দিতে চান?'

—শফিয়া, এর চেয়ে বড় মুক্তি আমার জীবনে নেই।

—তা হলে আমার কথা শুনবেন!

—বলো।

—কিছুদিন চিকিৎসা প্রয়োজন আপনার।

—কোথায়?

—পাঞ্জাব মেন্টাল হসপিটালের অ্যালকোহলিক ওয়ার্ডে ভর্তি হতে হবে আপনাকে। ওরা ঠিক আপনাকে সারিয়ে তুলবে। আর মদ খেতে ইচ্ছে করবে না।

—ঠিক বলছ?

—অনেকে সুস্থ হয়ে গেছে মান্টোসাব।

—ঠিক হ্যায়। আমি ভর্তি হব। হামিদকে ডাক।

হামিদ এলে ওকে বললাম, 'আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো হামিদ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

পরদিনই হামিদ সব ব্যবস্থা করে ফেলল। ওরা যখন হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তার কিছু আগে অবশ্য আমাকে পালাতে হয়েছিল। শুনেছিলাম, হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের ফি নাকি বত্রিশ টাকা। টাকাটা তো জোগাড় করতে হবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে লেখা দিয়ে ধার মিটিয়ে দেব বলে দু-একটা পত্রিকা থেকে টাকা পাওয়া গেল। আরও দুয়েকজনের কাছে ধার করে টাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। ওরা ভেবেছিল, আমি হাসপাতালে ভর্তি হব না বলে পালিয়ে গেছি। হাসপাতালে ভর্তিও হলাম। প্রথম কয়েকটা দিন খুব কষ্ট পেয়েছি। শরীরের ভিতরে একটা দৈত্য নড়েচড়ে উঠত, তার খাবারের জন্য। ছয় সপ্তাহ পরে এক অন্য মান্টো

বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে। শরীর ভেঙে গেছে ঠিকই, তবু যেন পুরনো জেল্লা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন, ভাইজানেরা, এর পর আট মাস মদ খাইনি। একের পর এক গল্প ছাড়াও কতরকম যে লেখা লিখেছি।

একদিন শফিয়াকে বললাম, 'আমি তো ভাল হয়ে গেছি। চলো এবার পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাই।'

—কোথায় যাবেন, মান্টোসাব?

—বম্বে।

—বম্বের কথা ভুলতে পারেন না?

—বম্বে আমার দ্বিতীয় জন্মস্থান শফিয়া।

—কে আপনাকে চাকরি দেবে বম্বেতে?

—ইসমতকে চিঠি লিখি—ও নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে।

—ইসমত বহিন আপনার কোনও খোঁজ নেয় না, মান্টোসাব।

—ও একটা পাগলী। আমি বম্বে ফিরতে চাইলে ও ঠিক সাড়া দেবে। তুমি যেতে রাজি তো?

—আপনি যেখানে যাবেন, আমি সেখানেই যাব।

ইসমতকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে ফেললাম।—আমি বম্বেতে ফিরতে চাই। ভারতেই থাকতে চাই। কিছু একটা ব্যবস্থা করো ইসমত। যাতে আমরা সবাই যেতে পারি। আমি এখন একেবারে সুস্থ। কোনও স্টুডিওতে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে আমরা আবার সবাই একসঙ্গে জীবন কাটাতে পারব।

আরও দু-তিনবার ইসমতকে চিঠি লিখেছিলাম। ও কোনও উত্তর দেয়নি। ইসমত কি তা হলে শেষ জীবন পর্যন্ত মনে করত, আমি বিশ্বাসঘাতক, নিজের আখের গোছানোর জন্য পাকিস্তানে চলে গেছি? বা ও হয়তো জেনে গিয়েছিল, মদ আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে, আমার ফেরার আর কোনও পথ নেই। কিন্তু আমি ওর চিঠির জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করে গেছি। আমার মদ খাওয়ার মাত্রাও তত বেড়ে গেছে। নেশার ঘোরের ভিতরে আমার গল্পের চরিত্রের সঙ্গে কথা বলে কেটে যায় দিনের পর দিন।

হ্যাঁ, আমি মরছিলাম, মির্জাসাব, সচেতনভাবেই একটু-একটু করে মরছিলাম। গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে বা হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করার মতো সাহস আমার ছিল না। নিজেকে, শফিয়াকে, তিন মেয়েকে—আমি পাগলের মতো ভালবাসতাম। তাই শরীরে ধীরে বিষক্রিয়া চালিয়ে আমি মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলাম। যে দেশ আমাকে শুধু অপমান আর ধিক্কার দিয়েছে, সেখানে বেঁচে থাকার ইচ্ছে আমার ছিল না। আর আমি বুঝতে পারছিলাম, দিনে দিনে পরিবারের

কাছেও আমি বোঝা হয়ে উঠছি। ঘৃণা নয়, অনুকম্পাও। ওরা তখন আর আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না।

একদিন রাতে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম, কে যেন ফিসফিস করে ডাকছে, 'মান্টোভাই—মান্টোভাই—'।

তাকিয়ে দেখি আমার মাথার পাশে বসে আছে ইসমত। কড়মড় করে আইসক্রিম চিবোচ্ছে আর হাসছে।

—ইসমত বহিন, তুমি কখন এলে?

—অনেকক্ষণ—কখন থেকে ডাকছি।

—শহিদ কোথায়? শহিদ আসেনি?

—এসেছে তো। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

—কেন?

—তুমি বম্বে যাবে।

—বম্বে! আমি লাফিয়ে উঠিলাম।—আমার চাকরি পাকা করে এসেছ তো?

—আলবৎ?

—শফিয়া—শফিয়া—। আমি চিৎকার করে উঠলাম।—তাড়াতাড়ি এসো শফিয়া। আমি তোমাকে বলেছিলাম না, আমার চিঠি পেলে ইসমত চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।

শফিয়া এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।—কী হয়েছে, মান্টোসাব? কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন?

—ইসমতকে নাস্তা-পানি দাও। শহিদ কোথায়—ডাকো ওকে—

—ইসমত কোথায়, মান্টোসাব?

—এই তো—এই তো ইসমত—কোথায় গেল ইসমত? ও নিশ্চয়ই তোমার ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে শফিয়া।

শফিয়া ওর বুকের ভিতরে আমাকে শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে। আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বিছানায় শুইয়ে দেয়।—ঘুমিয়ে পড়ুন, মান্টোসাব, ঘুমিয়ে পড়ুন। আমার সারা শরীরে তার আঙুলগুলি পালকের মতো খেলতে থাকে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। কবেকার শোনা একটা পাঞ্জাবি লোকগানের সুর যে কোথা থেকে ভেসে আসছিল। দেখলাম, শফিয়া আমার পায়ের কাছেই ঘুমিয়ে রয়েছে। যেন এই ভোরেই সদ্য জন্ম হয়েছে শফিয়ার এমনই দীপ্তিময় হয়ে আছে তার মুখ। সেই মুখে দেশভাগের ছায়া নেই, দাঙ্গার রক্তের ছিটে লাগেনি। পাহাড়ি ছবিতে আঁকা ঘুমন্ত নায়িকা সে, তাকে ঘিরে জন্ম নিচ্ছে নতুন পৃথিবী। আকাশ, জল, বাতাস, মেঘ, উড়ন্ত সারসদল, হরিণ-হরিণী—আমার ঘর যেন হয়ে উঠেছে এক উৎসব।

হঠাৎ পেট মুচড়ে বমির দমক উঠে এল। বাথরুমের বেসিনে নীলচে-হলুদ জলের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল রক্ত। তারপর শুধু রক্ত আর রক্ত। মুখ ধুয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম, মির্জাসাব। এ কে? সাদাত হাসান মান্টো? না, স্বয়ং মৃত্যু? আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'এবারের মতো জিতে গেলে মান্টো। শুধু আর কয়েকটা দিন দাঁতে দাঁত চিপে পড়ে থাকো।'

হে আমার দোসর পাঠক, মান্টো এবার তার কলম বন্ধ করবে। মির্জাসাব গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। আর কীই বা বলবার আছে তাঁর? শাহজাহানাবাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে-তহ্‌জীবের মৃত্যু তা একইসঙ্গে মির্জা গালিবেরও মৃত্যু। পরবর্তী বারো বছর তো জীবন্মৃতের মতো থেকে যাওয়া। রোগ আর জরার আক্রমণ, হাঁটতে পারেন না, কানে শুনতে পান না, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা, স্মৃতিও দিনে-দিনে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংসস্তূপের কাহিনী আমি আর লিখতে চাই না। এখন শুধু অপেক্ষা সামনের সেই দিনটার জন্য; সেদিন 'খুদা হাফিজ' বলে আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব।

তবে কাল রাতের স্বপ্নটা আপনাদের বলে যেতে চাই। আমি জামা মসজিদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ কে যেন এসে আমার হাত চেপে ধরল। মুখ তুলে দেখলাম, কাল্লু।

—এখানে কী করছেন, মান্টোভাই?

—তুমি আমাকে চেনো?

—চিনব না? কাল্লু হাসে, 'কবরে শুয়ে শুয়ে এতদিন মির্জাসাব আর আপনার কত কিস্‌সা শুনলাম।'

—কবরে?

—আপনিও তো কবরে ছিলেন, মনে নেই?

—আমি তো এখনও মরিনি কাল্লু।

—তাই? কাল্লু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'তা হলে হয়তো স্বপ্নে দেখেছি।'

—স্বপ্নে! তুমি তো মরে গেছ কাল্লু—

—তাতে কী মান্টোভাই?

—মরা মানুষ স্বপ্ন দেখে?

—আলবাত দেখে। দুনিয়াময় কত খোয়াব ঘুরে বেড়াচ্ছে জানেন? যত মানুষ আছে দুনিয়ায়, খোয়াব তার চেয়ে অনেক বেশি। মুর্দাদের ঘাড়েও ওরা চেপে বসে। আপনি কি কিস্‌সা শুনতে চান, মান্টোভাই?

—কিস্‌সা? কে শোনাবে?

—আরে আমি তো রোজই একবার এখানে আসি। একজন না একজন দস্তানগোকে ঠিক পেয়ে যাই। ওই যে দেখুন—

—কে?

—ওই যে লোকটা, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে, ও ঘুরে ঘুরে তো সবাইকে কিস্‌সাই শোনায়।

—তুমি কী করে বুঝলে কাল্লু?

—দেখুন না—লোকটা আপনমনে হেসেই যাচ্ছে। কেন জানেন? যাদের পেটে কিস্‌সা গিজগিজ করে তারা কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না। আসুন—আমার সঙ্গে আসুন।

কাল্লু লোকটার সামনে গিয়ে বসে পড়ে।—মিঞা—

—কে? লোকটা কাল্লুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। —আরে, কাল্লু মিঞা—

—তুমি আমাকে চেনো মিঞা?

—তামাম দুনিয়ায় কে তোমাকে চেনে না। শালা কাল্লু কিস্‌সাখোর।

কাল্লু হা-হা করে হেসে ওঠে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলে, 'বসে পড়ুন, মান্টোভাই, বসে পড়ুন।'

—তুমি তো বিখ্যাত দেখছি কাল্লু। আমি হেসে বলি।

কম্বলমুড়ি দেওয়া লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কিস্‌সা শোনার মত ক'টা লোক আছে, জনাব? শুনতে শুনতে কেউ কান চুলকোয়, পোঁদ চুলকোয়, এদিক-ওদিক তাকায়। কিস্‌সা শোনারও তহ্‌জীব আছে। খোদাকে যেমন বিশ্বাস করেন, কিস্‌সাকেও তেমনি বিশ্বাস করে শুনে যেতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই—মানুষ খুঁজি—আজকাল কারুর কিস্‌সা শোনার অবসরই নেই। দুনিয়াটা বড় অশান্ত হয়ে গেছে, জনাব। কেউ বোঝে না, কিস্‌সা শুনতে-শুনতে মনে শান্তি ফিরে আসে।'

—মিঞা, তা হলে শুরু করো। কাল্লু উত্তেজিত হয়ে বলে।

—অত তাড়াহুড়ো ক'রো না কাল্লু মিঞা। দিলকেতাবটা একটু উল্টোনোর সময় তো দাও। মন যদি না-ভরে, তেমন কিস্‌সা শুনিয়ে আমিই বা খুশ হব কী করে?

লোকটা অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে, নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলে, অস্ফুট গান গায়, তারপর একসময় হাসতে-হাসতে বলে, 'আজ শেখের কিস্‌সাটাই জমবে ভাল। এ হচ্ছে হৃদয়ের ভিতরে যে চোখ আছে, তাকে খোঁজার গল্প।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকে সে, তারপর গল্প শুরু করে।

এক শেখের দুই ছেলেই অসুখে ভুগে মারা গিয়েছিল। কিন্তু তাকে কখনও কেউ কাঁদতে দেখেনি, সন্তানদের জন্য বিলাপ করতেও শোনেনি। সে রোজ সময়মতো ব্যবসার কাজে যেত, কাজ করতে করতে গানও গাইত, বাড়ি ফিরে সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করত। শেখের মা-বিবি তাকে এইরকম দেখে দিনে দিনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একদিন শেখ যখন সকালের খাবার খাচ্ছিল, মা হঠাৎ বলে উঠল, 'বেটা, বাড়ির দু'টো তাজা ছেলেকে হারিয়ে আমাদের কী অবস্থা তুমি বুঝতে পারো? সবসময় বুকের ভেতরে রক্ত ঝরছে। খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না। বিবির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ? দিনে দিনে চুলের মতো হয়ে যাচ্ছে। তুমি রোজ ঠিকমতো কাজে যাচ্ছ, যেন কিছুই হয়নি...।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে শেখের মা।

তার বিবিও রাগে ফেটে পড়ে, 'আপনার হৃদয় বলে কিছু আছে? এককোঁটা জলও দেখিনি আপনার চোখে। বাচ্চাদের ভালবাসলে আপনি এইরকম থাকতে পারতেন? যেন কিছুই বদলায়নি...যেন ওরা এখনও বেঁচে আছে...'

—কিছুই বদলায়নি বিবি। ছেলেরা আমার ভিতরেই বেঁচে আছে। আমি তো সবসময় ওদের দেখতে পাই।

—আর আমি ওদের সব জায়গায় খুঁজি। রাতে ঘুমোতে পারি না। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আম্মা, বড় শীত লাগে, বড় খিদে পায়। আমাদের ভেতরে নিয়ে চলো।' আমি কেন ওদের দেখতে পাই না?

—বিবি, হৃদয়ের চোখ দিয়ে ওদের খোঁজো, ঠিক দেখতে পাবে।

—আপনার ওই চোখটা অন্ধ। আপনি কিছু দেখতে পান না।

—না, অন্ধ নয়। আমাদের দু'টো চোখ দিয়ে আমরা ভুল দেখি। দু'রকম দেখি। আমার কাছে সব একাকার। আমি আমার সন্তানদের সবসময় দেখতে পাই। ওরা আমার চারপাশেই খেলাধুলো করে।

—কোথায়? আমাকে দেখান। আমি তো ওদের দেখতে পাই না।

—আমাদের চোখ দিয়ে ওদের দেখা যায় না। জলের ওপর জংলা গাছ দেখেছ? আমাদের অনুভূতি ওই জংলা গাছের মতো। ওগুলো সরাতে সরাতে এগোলেই তুমি দেখতে পাবে। চোখ বুজে কল্পনা করো তাকে, যা দেখা যায় না। তোমরা সন্তানরা তখন তোমাকে এসে জড়িয়ে ধরবে, বিবি।

—আমার বুক খালি হয়ে গেছে শেখ। আপনার সুন্দর সুন্দর কথায় তা ভরবে না। শেখের বিবি কাঁদতে কাঁদতে নিজের বুকে আঘাত করতে থাকে।

শেখের মা বলে, 'তুমি যে চোখের কথা বলছ, আমরা তা বুঝি না, বেটা, কথা দিয়ে আমাদের ভুলিও না।'

শেখ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। মা-বিবির প্রতি প্রাথমিক বিরক্তি কেটে গিয়ে দুঃখে ভরে উঠল তার মন। ওদের শোক দূর করার ক্ষমতা তার নেই। ওরা তো বিচ্ছেদকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। শেখ তখন একটা গল্প বলতে শুরু করল।—একটা মেয়ের কথা শোনো। তার যত সন্তান জন্মেছিল, জন্মের কয়েকমাস পরেই তারা মারা গিয়েছিল।

—আমাদের ছেলেরা তো কয়েক বছর বেঁচে ছিল। তার মা বলে ওঠে।

—আর মেয়েটা? শেখের বিবি জিজ্ঞেস করে।—ও নিশ্চয়ই শোকে মারা গিয়েছিল। আমিও তো মরতে চাই—কেন তবু মৃত্যু আসে না!

—মেয়েটার কুড়িটা বাচ্চা মারা গিয়েছিল। দু'টো নয়, কুড়িটা। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আর খোদাকে অভিশাপ দিত। একদিন রাতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

—কী?

—স্বপ্নের ভেতরে মেয়েটা মরুভূমি পেরিয়ে যাচ্ছিল। ওর পেট থেকে রক্ত ঝরছে, রক্তে ভিজে যাচ্ছে বালি। ও একটা ছোট্ট দরজার কাছে এসে পৌঁছল। দরজা পেরিয়ে মাতৃগর্ভের মতো সরু পথ ওকে পৌঁছে দিল এক আশ্চর্য দুনিয়ায়। সেখানে অনন্ত জীবনের ঝরনা আর বাগানের মধ্য দিয়ে বইছে জন্নতের নদী। সেই বাগানের গাছেরা কখনও মরে না। বাগানটা কেউ কখনও চোখে দেখেনি। যারা বিশ্বাস করে, এমন বাগান আছে, তারাই শুধু দেখতে পায়। সব আনন্দের উৎসব এই বাগানেই।'

শেখের বিবি চিৎকার করে ওঠে, 'সব আপনার খোয়াব, এমন বাগান কোথাও নেই।'

—এই বাগানের কোনও নাম নেই, তার রূপ বর্ণনা করা যায় না। তবু সে এই দুনিয়াতেই আছে, বিবিজান।

—মেয়েটার কী হল, বলুন। এতগুলো সন্তান হারিয়ে বাগানে গিয়ে সে কী পেল?

—জন্নতের নদীতে গিয়ে সে নামল। সঙ্গে সঙ্গে তার সব দুঃখ, সন্দেহ ময়লার মতো মিলিয়ে গেল। স্নান করতে-করতে সে তার সন্তানদের হাসি শুনতে পেল। সত্যিই, বিশ্বাস করো, কুড়িটি সন্তান তার চারপাশে সাঁতার কাটছিল, হাসছিল। আনন্দের উৎসব জেগে উঠল মেয়েটির হৃদয়ে।

—তা হলে আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে। বলুন, কী করে আমি যাব?

—ফকিরদের কথা ভাবো, বিবিজান। তাদের জীবনে যা ঘটে, তা নিয়ে কোনও অভিযোগ তাদের নেই। আল্লা যা নিয়েছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি দেবেন।

ফকিররা আল্লার কাছে কিছুই চান না। তিনি যে পথে নিয়ে যাবেন, সেই পথেই যেতে হবে।

—আমরা কী করে এই কঠিন পথে যাব?

—সহজ নয়। এমনকী দাকুকিরও সন্দেহ হয়েছিল।

—দাকুকি কে?

—তবে সেই পথিকদের গল্প শোনো, যারা পথের সব ঘটনাকেই মেনে নেয়।

—বলো বেটা, তোমার গল্প শুনে বুকের ভিতরটা অনেক হাল্কা লাগছে। শেখের মা বলতে বলতে রুটি খেতে শুরু করল।

—দাকুকি এক তীর্থযাত্রী। সবসময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলেছে। কারুর কাছে, কোনও জায়গায় সে আটকে পড়ত না।

—আশ্চর্য! এমন মানুষ হয় না কি?

—তবে একটা টান তার ছিল।

—সন্তানদের প্রতি? শেখের স্ত্রী বলে ওঠে।

—না। ফকিরদের প্রতি। সে যে কী অমোঘ টান। ফকিরদের মধ্যেই সে বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে পেত। মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছেন খোদা, ফকিররাই তাকে জানিয়েছিল। ফকিরদের খোঁজে কোথায় কোথায় না ঘুরে বেড়াত দাকুকি। পথ চলতে চলতে তার পা থেকে রক্ত ঝরত। কেউ যখন বলত, এমন রক্তাক্ত পায়ে তুমি মরুভূমিতে হেঁটে যাবে কীভাবে, দাকুকি হেসে বলত, ও কিছু নয়।

—তারপর?

—একদিন সন্ধেবেলা দাকুকি এক সমুদ্রসৈকতে এসে পৌঁছল। দাকুকি দেখল, অনেক দূরে তাল গাছের চেয়েও লম্বা সাতটা মোমবাতি জ্বলছে। আলোয় ভরে গেছে চারদিক। দাকুকি সেই মোমবাতির দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। গ্রামের মানুষরা হাতে আলোহীন প্রদীপ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—কী হয়েছে তোমাদের? দাকুকি একজনকে জিগ্যেস করল।

—দেখতে পাচ্ছ না? আমাদের প্রদীপে তেল নেই, পলতে নেই। পেট ভরানোর মতো খাবারও আমাদের গ্রামে নেই।

—আরে ভাই, তাকিয়ে দেখো। আকাশ তো আলোয় ভরে আছে। সাতটা মোমবাতি দেখতে পাচ্ছ না? খোদা তো এমনি-এমনিই আমাদের আলো দেন।

—আলো কোথায়? সারা আকাশ অন্ধকার, আর তুমি আলো দেখতে পাচ্ছ? পাগল কাহিঁ কা।

দাকুকি লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর চোখ খোলা হলেও আসলে তা সেলাই করা। চারপাশের সবার চোখ একইরকম। খোলা, কিন্তু বন্ধ।

সকাল হতেই সাতটা মোমবাতি হয়ে গেল সবুজ সাতটা গাছ। মরুভূমি যখন উত্তপ্ত

হয়ে উঠল, দাকুকি গাছেদের ছায়ায় গিয়ে বসল, ফল পেড়ে খেল। সে দেখল, গ্রামের লোকেরা সূর্যের তাপ থেকে বাঁচতে ছেঁড়া জামাকাপড় দিয়ে শামিয়ানা বানিয়েছে। দাকুকি চিৎকার করে গ্রামবাসীদের ডেকে বলল, 'আরে তোমরা গাছের ছায়ায় এসে বসো। কত ফল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না? ফল খেলেই তো তৃষ্ণা মিটে যাবে।'

—আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গাছ? সব তো মরুভূমি। আমাদের বুরবাক বানাচ্ছ? আমরা আজই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

—ওই যে সমুদ্রে জাহাজ নোঙর করা আছে, আমরা সেই জাহাজে চেপে যেখানে খুশি চলে যাব।

—আমার কথা শোনো বন্ধুরা। তোমরা সবাই সবাইকে মিথ্যে দিয়ে ভোলাচ্ছ।

—চুপ করো। বাজে কথা বলে আমাদের ভুলিও না। গাছ আমরাও দেখেছি, কিন্তু সব স্বপ্ন। ওতে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বাস্তবে ফিরতে চাই।

—বাস্তব? কী বাস্তব? খিদে, তৃষ্ণা, প্রখর রৌদ্র? গাছে এত ফল ফলে আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

—না। সমুদ্রের ওপারে ভাল জায়গা আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাব।

দাকুকি বিহ্বল হয়ে বসে রইল। সে ভাবছিল, আমিই কি তা হলে পাগল? এতগুলো লোক তো ভুল কথা বলতে পারে না। তারপর সে একটা গাছকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার কানে কানে বলল, 'আমি বুরবাক, তুমি তো জানো। শুকনো বুদ্ধির চেয়ে আমার সজল পাগলামি তোমার ভাল লাগে না?'

হঠাৎ ছ'টি গাছ এক সারিতে এসে দাঁড়াল আর একটি গাছ তাদের সামনে যেন ইমামের মতো প্রার্থনায় মগ্ন হল। ধীরে-ধীরে সাতটি গাছ সাতজন মানুষ হয়ে গেল। তারা সমস্বরে ডাকল, 'দাকুকি।'

—আমার নাম আপনারা জানলেন কী করে?

—যে হৃদয় আল্লাকে খোঁজে, তার কাছে কিছুই গোপন থাকে না দাকুকি। আমাদের একটাই হৃদয়। আল্লার হৃদয়। আলাদা করে কোনো হৃদয়কে খুঁজো না দাকুকি। এসো, এবার আমাদের নামাজ পড়াও।

—আমি কিছু জানি না হুজুর। গাধারও অধম আমি।

—তোমার মতো পবিত্র গাধা সবার চেয়ে ওপরে।

শেখের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আমার বেটাদের সঙ্গে কোথায় আমার দেখা হবে, বলুন।'

—আরও অপেক্ষা করো বিবিজান।

—দাকুকির কী হল বেটা? শেখের মা জিগ্যেস করে।

—নামাজ পড়তে পড়তে দাকুকির কানে ভেসে আসছিল বহু মানুষের আর্ত

চিৎকার। দাকুকি চোখ খুলে দেখল, চাঁদের আলোয় উত্তাল হয়ে উঠেছে সামনের সমুদ্র। ঢেউয়ের ওপর খড়কুটোর মতো উথালপাথাল খাচ্ছে সেই জাহাজ। গ্রামের সব মানুষরা রয়েছে জাহাজে। তারা চিৎকার করছে, বাঁচাও...রহম করো খোদা...আমাদের বাঁচাও...। হঠাৎ জাহাজ দু-ভাগ হয়ে ভেঙে গেল—

—সবাই মরে গেল বেটা?

—দাকুকির চোখ থেকে তখন অঝোর ধারায় জল ঝরছে। সে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে প্রার্থনা করছিল, খোদা, ওদের বাঁচাও, ওদের অজ্ঞানতাকে ক্ষমা করো, ওদের চোখ খুলে দাও, তোমার জন্নতের পথে নিয়ে চলো।

বলতে বলতে শেখ কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার মা পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল, 'মানুষগুলো বেঁচেছিল তো, বেটা?'

—হ্যাঁ। সমুদ্র শান্ত হল। ওরা সাঁতার কাটতে কাটতে তীরে এসে পৌঁছল।

অনেকদিন পর শেখের বিবি এক টুকরো রুটি চিবোতে চিবোতে জল খেল।

—তারপর? শেখের মা জিগ্যেস করল।

—সেই সাতজন মানুষ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খোদার ওপর খোদকারিটা কে করল হে?' দাকুকি ছাড়া তো আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। দাকুকিও আবার পথে পথে ঘুরতে শুরু করল, তার এতদিনের সাতজন সঙ্গীকে খুঁজে পেতে।

পথ চলতে চলতে একদিন কুয়োর ভিতরে তাকিয়ে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল সে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে গান গাইতে লাগল, নাচতে শুরু করল। হঠাৎ মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদকে। হারিয়ে গেল প্রতিবিম্ব। কুয়োর পাশে অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে দাকুকি উঠে বসল। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আহাম্মক! আমি একটা আহাম্মক! এখনও প্রতিবিম্ব দেখে ভুলে যাই! আল্লা তো বাতি ছাড়াও আলো দেন। সাতটা লোককে কেন এখনও খুঁজছি আমি? আর কতদিন বাইরের রূপ আমাকে ভুলিয়ে রাখবে? খোদা একমাত্র তোমাকে স্মরণ করার শক্তি দাও আমাকে।'

দস্তানগোর নীরবতা ভেঙে কাল্লু উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তারপর?'

—তারপর আবার কী?

—দাকুকির কী হল?

—শেখের বাড়িতে সবাই নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল। দাকুকি আবার হাঁটতে শুরু করল।

—দাকুকি এবার কোথায় যাবে?

—কোথায় আবার যাবে? আমার ঝোলায় ছিল, ঝোলাতেই আবার ফিরে এসেছে। বলতে বলতে দস্তানগো তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা কাঠের পুতুল বের করে আনে।—দ্যাখো মিঞা, এই হল দাকুকি।

—আর কে কে আছে তোমার ঝোলায় মিঞা?

—দ্যাখো তবে—এটা কে, চিনতে পারো?

—হুজুর—মির্জাসাব—

—আর একে চিনতে পারো?

—জাঁহাপনা বাহাদুর শাহ।

—এইটে?

কাল্লু লাফিয়ে ওঠে, 'মান্টোভাই—আপনি—আপনি—আপনিও কাঠপুতলি হয়ে গেছেন?'

দস্তানগো তার ঝোলা থেকে একের পর কাঠের পুতুল বের করে মসজিদের চত্বরে সাজিয়ে দিতে থাকে। আমি অবাক হয়ে দেখি, এরা সবাই আমার 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসের চরিত্র। রঙিন পুতুলগুলো আলোয় ঝলমল করতে থাকে। ইতিহাসের ধুলোবালিতে ওরা মলিন হয়ে যায়নি।

হে আমার দোসর পাঠক, এবার মান্টোকে বিদায় দিন। খুদা হাফিজ।

তবসুম, মান্টোর উপন্যাস শেষ হওয়ার পর থেকে মিঞা তানসেনের জীবনের এক আশ্চর্য ঘটনা মনে পড়ছে। মিঞা ছিলেন ভৈরব রাগে সিদ্ধ। শুধু জাঁহাপনা আকবরের ঘুম ভাঙার সময় এই রাগ আলাপ করতেন। জাঁহাপনার কাছে তানসেনের জায়গা ছিল সব উস্তাদের ওপরে। অন্যান্য উস্তাদরা তাই তানসেনকে ঈর্ষা করতেন। একবার তাঁরা যুক্তি করে তানসেনের জীবননাশের উপায় ভাবলেন। তাঁরা বাদশাকে গিয়ে বললেন, 'জাঁহাপনা, আমরা কখনও দীপক রাগ শুনিনি। একবার শুনতে চাই। মিঞা তানসেন ছাড়া এই রাগ তো কেউ জানেন না।' বাদশা তো আর উস্তাদদের অভিসন্ধি জানেন না। তিনি তানসেনকে বললেন, 'মিঞা, আমার দীপক রাগ শোনার খুব ইচ্ছে হয়েছে। আপনি শোনাবেন?' তানসেন বললেন, 'জাঁহাপনা ওই রাগ গাইলে আমার মৃত্যু হবে।'

—কেন?

—আপনি তা বুঝবেন না।

—একটা রাগ গাইলে কখনও মৃত্যু হতে পারে?

—আমি সত্যি বলছি, জাঁহাপনা।

—তা হতে পারে না, মিঞা। আপনি আমাদের দীপক রাগ শোনান।

তানসেন অনেক ভেবে পনেরো দিন সময় চাইলেন। তিনি জানতেন, দীপক রাগের তেজে—সুরের আগুনে—মর্ত্য-গায়কের শরীর পর্যন্ত জ্বলে যায়। তাই সঙ্গে কাউকে সুরের শীতল ধারায় সেই আগুন নেভাতে হবে। তিনি যখন দীপক গাইবেন,

তখনই কোনও শিল্পী মেঘ রাগকে আবাহন করবেন। তা হলেই তানসেন বাঁচবেন। এরপর তানসেন পনেরো দিন ধরে তাঁর কন্যা সরস্বতী ও স্বামী হরিদাসের শিষ্যা রূপবতীকে মেঘ রাগ শেখালেন।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে তানসেন দরবারে এলেন। সভায় লোকে লোকারণ্য। তানসেন দীপক রাগের যজ্ঞ শুরু করলেন। অন্যদিকে সরস্বতী এবং রূপবতীও নিজেদের ঘরে মেঘ রাগের যজ্ঞ শুরু করেছে। তানসেন তাদের বলে এসেছিলেন, দীপক রাগের অর্চনা শেষ করে যখনই তিনি গাইতে আরম্ভ করবেন, সরস্বতী-রূপবতীও যেন মেঘের আলাপ শুরু করে।

যজ্ঞ ও পূজা শেষ হওয়ার পর জাঁহাপনা আকবর দরবারে এলেন। বাদশার অনুমতি নিয়ে তানসেন দীপক রাগ শুরু করলেন। সভার চারিদিকে বহু প্রদীপ সাজানো ছিল। তানসেন বলেছিলেন, প্রদীপগুলি জ্বলে ওঠা মাত্র তিনি গান বন্ধ করবেন। আলাপ শুরু করতেই সভার সকলের মনে হল, প্রখর গ্রীষ্মের দিন এসে গেছে। তানসেনও ঘামতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তারপর তানসেনের শরীর জ্বলতে লাগল, সভার সব প্রদীপ জ্বলে উঠল—আগুন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। যে যেদিকে পারল সভা ছেড়ে পালাল। অর্ধদগ্ধ তানসেনও নিজের বাড়ির দিকে দৌড়তে লাগলেন।

আর তখনই সরস্বতী ও রূপবতী মেঘের রাগালাপ শুরু করেছে। গানের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল, ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল, তারপর শুরু হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। তানসেনের দগ্ধ শরীর শীতল হল।

তবসুম, মান্টোর এই উপন্যাস যেন মিঞা তানসেনের গাওয়া দীপক রাগ। একের পর এক অগ্নিচক্র পেরিয়ে এলাম আমরা। সরস্বতী-রূপবতীরা আজ কোথায়? যারা মেঘ রাগ গেয়ে মির্জা আর মান্টোর দগ্ধ শরীরমন বর্ষাস্নাত করবে? তাদের খুঁজতে আমি নতুন উপন্যাসের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই উপন্যাসের নাম 'নায়িকা-রহস্য'।

## সহায়ক গ্রন্থ

১. গালিবের গজল থেকে, চয়ন ও পরিচিতি : আবু সয়ীদ আইয়ুব, দে'জ পাবলিশিং।

২. মীরের গজল থেকে, চয়ন ও পরিচিতি : আবু সয়ীদ আইয়ুব, দে'জ পাবলিশিং।

৩. হাফিজের কবিতা, অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ।

৪. মির্জা গালিব, সঞ্চারী সেন, উর্বী প্রকাশন।

৫. গালিবের স্মৃতি, মৌলানা আলতাফ হুসেন হালি, অনুবাদ : পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি।

৬. গাঞ্জে ফেরেশতে, সাদাত হাসান মান্টো, অনুবাদ : মোস্তাফা হারুন, প্রতিভাস।

৭. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত, সারানুবাদ : রাজশেখর বসু, এম সি সরকার।

৮. কবীর, ক্ষিতিমোহন সেন, আনন্দ।

৯. কবীর, প্রভাকর মাচওয়ে, সাহিত্য অকাদেমি।

১০. কবীর বীজক, রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি।

১১. কুট্টনীমত, দামোদর গুপ্ত, সম্পাদনা ও ভাষান্তর : চৈতালী দত্ত, নবপত্র প্রকাশন।

১২. রামপ্রসাদী, সম্পাদনা : সর্বানন্দ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি।

১৩. নিধুবাবুর গান, বিভাব, শীত-বর্ষা সংখ্যা ১৪১৬।

১৪. মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, অনিরুদ্ধ রায়, আনন্দ।

১৫. কবিজীবনী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

১৬. হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, থীমা।

১৭. কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, বিনয় ঘোষ, বাকসাহিত্য।

১৮. কলকাতার রাস্তায় ফিরিওলার ডাক, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, আনন্দ।

১৯. বাংলা ভাষায় আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী, উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা : কাজী রফিকুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২০. চলিত ইসলামি শব্দকোষ, মিলন দত্ত, গাঙচিল।

২১. The Oxford India Ghalib, Ed by Ralph Russel, Oxford

University Press (OUP)

২২. Ghalib, Life and Letters, Translated and Ed by Ralph Russel, and Khurshidul Islam, OUP.

২৩. Ghalib, The man The times, Pavan K. Varma. Penguin books.

২৪. Mirza Ghalib, Selected Lyrics and Letters, K. C. Kanda, Sterling Paperbacks.

২৫. Glimpses of Urdu Poetry, K. C. Kanda, Lotus Press.

২৬. Ghalib, Epistemologies of Elegance, Azra Raza and Sara Suleri Goodyear, Penguin Viking.

২৭. A Moral Reckoning, Muslim Intellectuals in 19th Century Delhi, Mushirul Hasan, OUP.

২৮. Private Life of the Mughals of India, R. Nath, Rupa & Co.

২৯. The Penguin 1857 Reader, Ed by Pramod K. Nayar, Penguin Books.

৩০. The Trial of Bahadur Shah Jafar, H. L. O Garret, Roli Books.

৩১. City of Djinns, William Dalrymple, Penguin Books.

৩২. City of Sin and Splendour, Writings on Lahore, Ed by Bapsi Sidhwa, Penguin Books.

৩৩. Manto Naama, Jagadish Chander Wadhawan, Roli Books.

৩৪. Black Margins, Stories of Sadat Hasan Manto, Selected by M. Asaduddin, Katha.

৩৫. Bitter Fruit, The very best of Sadat Hasan Manto, Ed and translated by Khalid Hasan, Penguin Books.

৩৬. Naked Voices, Sadat Hasan Manto, translated by Rakhshanda Jalil, Indiaink.

৩৭. Manto, Selected Stories, translated by Aatish Taseer, Random House India.

৩৮. Life and Works of Sadat Hasan Manto, Ed by Alok Bhalla, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla.

৩৯. Lifting the Veil, Ismat Chugtai, Penguin Books.

৪০. Partition dialogues, Memories of a Lost Home, Alok Bhalla, OUP.

৪১. The Long Partition, Vazira Fazila-Yacoobali Zamindar, Penguin Viking.

৪২. Three Mughal Poets, Khursidul Islam and Ralph Russel, OUP.

৪৩. Zikr-i-Mir, translated with introduction by C. M. Naim, OUP.

৪৪. Sufism, The Heart of Islam, Sadia Dehlvi, Harper Collins.

৪৫. The Essence of Sufism, John Baldock, Chartwell Books.

৪৬. Tales from the Land of the Sufis, Mojdeh Bayat and Mohammad Ali Jamnia, Shambala.

৪৭. The conference of the Birds, Farid ud-din Attar, Penguin Books.

৪৮. The way of the Sufi, Idries Shah, Rupa & Co.

৪৯. Pilgrimage to Paradise, Sufi tales from Rumi, Kamla K. Kapur, Penguin Books.

৫০. Couplets from Kabir, G. N. Das Motilal Banarasidass Publishers.

৫১. The Rubaiyat of Omar Khayyam, Peter Avery and John Heath Stubbs, Penguin Books.

৫২. Internet edition of Annual Urdu Studies.

---